Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a text book for Higher Secondary Schools (Humanities) on revised syllabus introduced from 1969 (Vide No. T. B—16 dated 23 12 68)

অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতি

[উচ্চ মাধ্যমিক কলাধারার নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য]

সুব্রত গুপ্ত, এম্. এ., ডিপ্. ইকন্, ডেভেলপমেন্ট
(ম্যাঞ্চেস্টার)
অর্থশাস্ত্র বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, যোগমায়া দেবী কলেজ, কলিকাতা,
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নলেজ হোম
৫৯ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শান্তিকুমার মজুমদার, বি. এ.
৫৯, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—নভেম্বর ১৯৬৮
দ্বিতীয় সংস্করণ—জানুয়ারী ১৯৬৯
তৃতীয় সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

মূল্য—ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা

মুদ্রণে :
বেঙ্গল প্রিণ্টার্স
১১৭/১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

শ্রীকান্ত প্রেস
৭৫, বৈঠকখানা রোড কলিকাতা—৯

শ্রীমুদ্রণালয়
১২, বিনোদ সাহা লেন
কলিকাতা—৯

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতি" বইটির তৃতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণভাবে পরিমার্জিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী সংস্করণের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি বর্তমান সংস্করণে সংশোধন করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যসূচীর ভিতরেই কতিপয় নূতন জিনিস বর্তমান সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা ও ব্যাংক জাতীয়করণ সম্পর্কে নূতন আলোচনা বর্তমান সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ভারত সরকারের অর্থনৈতিক কাজ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় সাম্প্রতিককালের বহু জিনিস নূতনভাবে আলোচিত হইয়াছে। গৃহস্থের অর্থনৈতিক কাজ, মূল্যতত্ত্ব, বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রভৃতি অধ্যায় বহু ক্ষেত্রে পুনর্লিখিত হইয়াছে। রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় ভারতের রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থার সাম্প্রতিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের পর্যালোচনাও কিছু সংশোধিত হইয়াছে। যদি বর্তমান সংস্করণটি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন আরও ভালভাবে মিটাইতে পারে, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। বিভিন্ন অধ্যায়ের শেষে যে প্রশ্নপত্র দেওয়া হইয়াছে, ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে সেগুলির উত্তর-সংকেতও দেওয়া হইয়াছে।

যোগমায়া দেবী কলেজ
কলিকাতা-২৬
২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০

বিনীত
সুব্রত গুপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কলাধারায় অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতির যে নূতন পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন তদনুযায়ী বর্তমান বইটি লিখিত হইল। বইয়ে ধারাবাহিক ভাবে নূতন পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হইয়াছে। ভাষাও যতদূর সম্ভব প্রাঞ্জল করা হইয়াছে যাহাতে অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতির জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট সহজবোধ্য হয়। পাঠ্যসূচী বহির্ভূত বিষয়গুলি বইয়ে স্থান পায় নাই। প্রথম সংস্করণকালে বইটির যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়িয়াছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি দূর করা হইয়াছে। একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচীক্রমে অনগ্রসর দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে, এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করা হইয়াছে। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রতি পদক্ষেপ কিরূপ হওয়া উচিত তাহাও এই বইয়ে আলোচিত হইয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা সর্বশেষ তথ্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে।

আশা করি বর্তমান বইটি পাঠ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীগণ অর্থশাস্ত্র ও পৌরনীতির বিভিন্ন প্রাথমিক তত্ত্বগুলি সহজেই বুঝিতে পারিবে। বর্তমানে বইটি পাঠ করিবার পর অর্থশাস্ত্র এবং পৌরনীতি সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার আগ্রহ যদি ছাত্র-ছাত্রীদের মনে সঞ্চারিত হয় তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। বর্তমান বইটির দ্রুত অথচ সুষ্ঠু ছাপার জন্য প্রকাশক নলেজ হোমের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারীবৃন্দ আন্তরিক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

REVISED SYLLABI IN ELEMENTS OF ECONOMICS AND CIVICS

(for Higher Secondary Examination)

A. ECONOMICS

CLASS IX

I. The nature of economic activities.

II. Economic activity of the household—Consumption.

III. Production—the concept of the firm—Classification of factors of production and their earnings.

IV. Classification of firms: Single-ownership, Partnership. Joint-Stock Companies.

Co-operation—different types of co-operative societies. Small-scale and large-scale production.

CLASS X

V. The Market.

Demand and supply—Elastic and Inelastic demand—Elastic and Inelastic supply—Price and output of the firm under perfect competition and under monopoly.

VI. Money—functions of money—Description of the banking system (commercial and central banking).

CLASS XI

VII. The National Income—composition of the National Income—National Income as the National Product.

VIII. Main structural features of an underdeveloped economy—need of planning in an underdeveloped economy (Illustrations are to be given from the case of the Indian economy).

XI. Economic functions of the government—Description of the different sources of Government revenue and expenditure. (Illustrations are to be given from the case of the Indian economy).

B. CIVICS

CLASS IX

I. The individual and society—man as a social animal—the family and its functions.

II. The State and Society—the State and other Associations—characteristics of the State.

III. The citizen—qualities of a good citizen—hindrances to good citizenship.

IV. Rights and duties—the right to vote and its importance.

V. The nation and nationalism.

CLASS X

I. Constitutions—forms of Government—Democracy and Dictatorship—merits and demerits of Democracy—Unitary and Federal Government—Parliamentary and Presidential Government.

II. Organs of Government—Separation of Powers.

III. Functions of Government.

IV. Law and Liberty.

V. Political Parties.

IV. Local Self-Government.

CLASS XI

A brief outline of the Constitution of India with special reference to :—

The Preamble.

Fundamental Rights and Directive Principles.

The Union and its units.

The Federation of India—Its characteristics.

The Division of legislative powers.

The President, the Union Council of Ministers and the Parliament.

The Governor, the State Council of Ministers and the State Legislature.

The Judiciary.

সূচীপত্র

অর্থশাস্ত্র

নবম শ্রেণী

দশম শ্রেণী

একাদশ শ্রেণী

[পৌরনীতি]
নবম শ্রেণী

দশম শ্রেণী

একাদশ শ্রেণী

অর্থশাস্ত্র

প্রথম অধ্যায় | অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের স্বরূপ (The Nature of Economic Activities)

অভাব ও অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা (Wants and Economic Efforts)—মানুষের অভাবের শেষ নাই। মানুষের অসংখ্য অভাব এবং সীমিত আয়ের মাধ্যমে সেই অভাব পূরণ করার প্রচেষ্টারই একটি বিশেষ রূপ হইতেছে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ।

অভাবের বৈশিষ্ট্য : মানুষের অভাবের কোন সীমা নাই

মানুষের অভাব সীমাহীন বলিয়াই একটি অভাব মিটাইবার পর আরেকটি অভাব মিটাইবার চিন্তা করিতে হয়। অবশ্য একটি বিশেষ অভাবের সীমা আছে। তাহা ছাড়া, অভাবগুলি পরস্পরের প্রতিযোগী হইতে পারে ; যেমন, চা এবং কফি পরস্পরের প্রতিযোগী। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অভাবগুলি পরস্পরের পরিপূরক হইতে পারে ; যেমন, কলম ও কালি পরস্পরের পরিপূরক। অভাব মিটাইবার প্রধান উপকরণ হইতেছে অর্থ ; অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টা সব মানুষেরই থাকে। উপার্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন উপায়ে মানুষ প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা করে। অল্প আয়ের সাহায্যে অনেক অভাব দূর করার প্রচেষ্টাকেই আমরা বলি অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা।

সীমিত আয়ের সাহায্যে অভাব দূর করার প্রচেষ্টাই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা

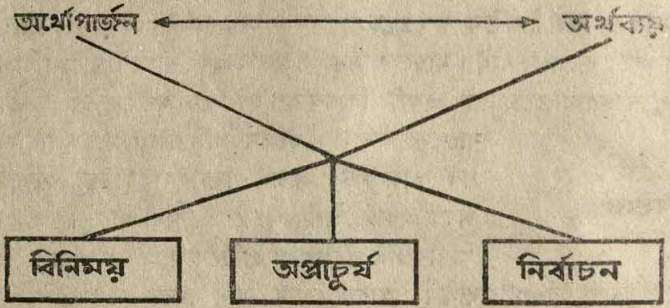
অর্থনৈতিক কাজকর্ম (Economic Activities)—অল্প আয়ের সাহায্যে অভাব মিটাইবার কাজে আমরা যখন ব্যস্ত থাকি তখন আমাদের সেই কাজকেই অর্থনৈতিক কাজ (Economic activities) বলা হয়। অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে অভাবের পরিতৃপ্তি করা। এইজন্য দরকার কর্মপ্রচেষ্টা এবং অর্থোপার্জনের অক্লান্ত প্রয়াস। অর্থশাস্ত্র এই অর্থনৈতিক কাজের অনুশীলন করে। অর্থনৈতিক কাজের মূল কথা হইল,—অর্থ উপার্জন করা এবং বিভিন্ন উপায়ে সেই উপার্জিত অর্থের ব্যবহার করিয়া যতদূর সম্ভব অভাব মিটাইবার চেষ্টা করা। উপার্জিত অর্থ আমরা খরচ করি অভাব মিটাইবার জন্য। অর্থের অপ্রাচুর্য থাকায় আমরা সব অভাব একই সঙ্গে মিটাইতে পারি না। সেইজন্য অভাবগুলির মধ্যে নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে। একটি জিনিস বিক্রয়



১ম চিত্র

অর্থশাস্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুশীলন করে

করিবার সময় ইহার বিনিময়ে আমরা অর্থ পাই। আবার সেই উপার্জিত অর্থের বিনিময়ে আমরা অন্যান্য জিনিস কিনিতে পারি। সুতরাং অর্থ নৈতিক সমস্যার মূল বিষয় হইতেছে বিনিময় (Exchange), অপ্রাচুর্য (Scarcity) এবং নির্বাচনের (Choice) সমস্যা। এইগুলির সহিত অর্থোপার্জন এবং অর্থ ব্যয়ের সমস্যা জড়িত



২নং চিত্র

(২নং চিত্রে দেখানো হইল)। অর্থশাস্ত্র মানুষের বিভিন্ন কাজের মধ্যে এই একটি বিশেষ দিকের অনুশীলন করে।

অর্থ নৈতিক কাজকর্মের লক্ষ্য (Aims of Economic Activities)— অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যায় যে ইহার প্রথম লক্ষ্য হইতেছে অভাব দূর করার জন্য **একদিকে উপার্জন বাড়াইবার চেষ্টা এবং অপরদিকে ব্যয় সংক্ষেপ** (Economising) করা। আয় সীমিত থাকার দরুন এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। আবার যেহেতু প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি অনেকক্ষেত্রেই দুষ্প্রাপ্য থাকে সেজন্য সেইগুলির অপচয় বন্ধ করা উচিত। প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির অপচয় বন্ধ করার জন্য এবং সেইগুলির যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্য কখন কোন্ সামগ্রী কতটা ব্যবহার করা প্রয়োজন সেই সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। ইহা হইতেছে মূলত **নির্বাচনের** (Choice) সমস্যা।

অভাব পূরণ করা অথবা সম্পদ বৃদ্ধি করা প্রভৃতি কাজের মধ্যে আমাদের একটি জিনিস চিন্তা করিতে হয়, তাহা হইতেছে, কোন্ অভাবটি আগে পূরণ করিতে হইবে এবং কোন্ সম্পদ আগে বাড়াইতে হইবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সেইজন্যই বলা হয়, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলি হইতেছে মনোনয়নের বস্তু ("Economic activities are matters of choice")। পরিমিত আয়ের সাহায্যে আমাদের সব অভাব দূর করা এবং পরিমিত উপকরণের সাহায্যে আমাদের সব জিনিস উৎপাদন করা সম্ভবপর নয় বলিয়াই এই মনোনয়নের প্রশ্ন উঠে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষকে বিভিন্ন কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। এই কাজগুলি অনুশীলন করাও অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

একটি নির্দিষ্ট সম্পদকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা চলে। বাড়ীর সংলগ্ন ভূমিতে যেমন চাষ আবাদ করা চলে, তেমনি আবার পুকুর কাটিয়া মাছের যোগানও বাড়ানো চলে। এইক্ষেত্রে, কোন্ ব্যবস্থাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় জমির মালিককে। বলা বাহুল্য, এখানে এই উভয় প্রচেষ্টাই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা এবং এই দুইটির মধ্যে একটিকে নির্বাচন করিতে হইবে। নির্বাচনের সঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন জড়িত। যখন বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ করিতে হইবে কিংবা উৎপাদন করিতে হইবে তাহা নির্বাচন করিতে হয়, তখন সেই সঙ্গে আমাদের স্থির করিতে হয়, একটি জিনিসের পরিবর্তে অন্য একটি জিনিস গ্রহণ করা যায় কিনা। ধরা যাক্ এমনও হইতে পারে, খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে সম্পূর্ণ অংশ চাউল গ্রহণ না করিয়া ইহার পরিবর্তে কিছু পরিমাণ আটা গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইভাবে একটি জিনিসের ব্যবহার কমাইয়া ইহার পরিবর্তে কয়েকটি জিনিসের ব্যবহার বাড়ানোকে আমরা **পরিবর্তন** (Substitution) বলিতে পারি। অর্থনৈতিক কাজকর্মের মূল লক্ষ্য হইতেছে ব্যয় সংক্ষেপ করা, ভোগ এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে নির্বাচন করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একটি জিনিসের পরিবর্তে অপর একটি জিনিস ব্যবহার করা; এইজাতীয় সব কাজেরই মূল উদ্দেশ্য হইতেছে সীমিত আয়ের মাধ্যমে অভাব মোচন করা।

অর্থ নৈতিক কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক (Different Aspects of Economic activities)—মানুষের বিভিন্ন অভাব দূর করিবার জন্য টাকা খরচ করিতে হয়; সুতরাং মানুষ মাত্রেরই টাকার প্রয়োজন থাকে। অর্থোপার্জনের জন্য মানুষ যে চেষ্টা করে, সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ সে তাহার বিভিন্ন অভাব পূরণ করিতে পারে। অর্থশাস্ত্রে আমরা মানুষের বিভিন্ন কাজের মধ্যে শুধু এই বিশেষ দিকটি অনুশীলন করি। টাকার সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন পণ্য বিনিময় করে। ধরা যাক্, আমার একটি বিশেষ জিনিসের দরকার। আমার যে জিনিসটির দরকার, সেই জিনিসটি আর একজনের নিকট আছে। আবার আর-একজনের যে জিনিসটি দরকার সেই জিনিসটি আমার কাছে আছে। তখন দুইজনের মধ্যে জিনিস দুইটির বিনিময় করা যাইতে পারে; কিন্তু, বিনিময় করিবার সময় প্রশ্ন উঠিবে, জিনিস দুইটির মূল্য এক কিনা। টাকার সাহায্যে আমরা জিনিস দুইটির মূল্য পরিমাপ করিতে পারি।

অভাব দূর করিবার জন্য :পণ্য-বিনিময়ের প্রয়োজন

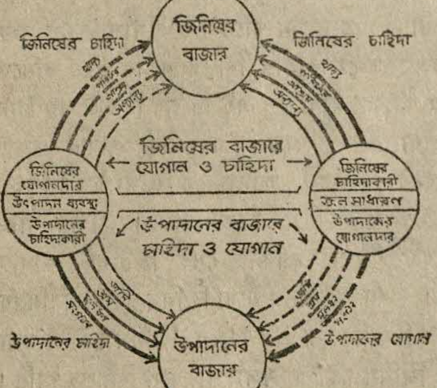
আমার জিনিসটির মূল্য হয়ত একশত টাকা এবং আর একজনের জিনিসটির এক ইউনিটের মূল্য হয়ত পঞ্চাশ টাকা। তখন আর একজনের জিনিসটির দুই ইউনিটের মূল্য আমার জিনিসটির মূল্যের সমান হইবে। এইভাবে বিভিন্ন লেনদেন পর্যবেক্ষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, টাকার লেনদেনের মূল্য হইতেছে পণ্য-বিনিময়।

পণ্য-বিনিময়ের প্রশ্ন তখনই উঠে, যখন আমরা আমাদের বিভিন্ন অভাব পুরণ করিতে চাই। এই অভাববোধের তাড়নাই মানুষকে অর্থ উপার্জনের জন্য প্রেরণা

দেয়। কিন্তু, অভাব যাহাতে পূরণ হইতে পারে, সেজন্য দেশে প্রয়োজনীয় জিনিস-গুলির উৎপাদন হওয়া দরকার। অভাব দূর করিবার পক্ষে উপযুক্ত সামগ্রীগুলির উৎপাদন হইলে সেইগুলির মূল্য নির্ধারণের প্রশ্ন উঠে। উৎপাদন করিবার সময় আমাদের কতিপয় উপাদানের উপর নির্ভর করিতে হয়; যেমন, জমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন। এই উপাদান-গুলি যাঁহারা সরবরাহ করিবেন, তাঁহাদিগকে আমাদের পারিশ্রমিক দিতে হইবে। এক কথায় উৎপাদিত সামগ্রীগুলি বিক্রীত হইলে বিক্রেতা যে টাকা পায় তাহা উপরি-উক্ত উপাদানগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হয়।

পণ্য-বিনিময়ের সহিত পণ্য-উৎপাদনের প্রশ্ন জড়িত

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের স্বরূপ আলোচনাকালে দেখিতে পাই যে ইহার ফলে একটি **আয়প্রবাহ** (Flow of Incomes) এবং একটি **পণ্যপ্রবাহের** (Flow of Goods) সৃষ্টি হয়। প্রতিনিয়ত অর্থোপার্জন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টার ফলেই এই প্রবাহের সৃষ্টি হয়। জিনিসপত্র বিক্রয়কারীর আয় বাড়িলে তাহার উৎপাদন বাড়াইবার উৎসাহ বাড়ে। অপরদিকে ক্রেতার আয় বাড়িলে আরও বেশী জিনিস করিবার চাহিদা বাড়ে। অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টার সঙ্গে এই আয়প্রবাহ এবং পণ্য-প্রবাহ জড়িত। ক্রেতার দিক হইতে জিনিসপত্রের চাহিদার সৃষ্টি হইলে উৎপাদকগণ সেই জিনিস উৎপাদন করে। উৎপাদকগণ আবার কোন জিনিস উৎপাদন করিতে চাহিলে কতিপয় উপকরণের জন্য চাহিদার সৃষ্টি হয়; যেমন, উৎপাদনের জন্য জমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠনের প্রয়োজন। সেই উপকরণগুলির উপযুক্ত যোগান উৎপাদন-ব্যবস্থার ধারা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। সুতরাং জিনিসের বাজারে যেমন চাহিদা ও যোগানের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে, সেই প্রকার উপাদানের বাজারেও চাহিদা ও যোগানের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। পাশের ৩নং চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে। এই চিত্রে দেখানো হইয়াছে, একদিকে যেমন আছে জিনিসের বাজার, অপর দিকে সেই প্রকার আছে উপাদানের বাজার; একদিকে যেমন জিনিসের চাহিদাকারী ও যোগানদার আছে, অপরদিকে সেই প্রকার আছে উপাদানের চাহিদাকারী ও যোগানদার।



৩নং চিত্র

অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Economics)—অর্থনৈতিক ক্রিয়া-

কলাপগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে স্বভাবতই অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়। অধ্যাপক মার্শালের মতে অর্থশাস্ত্র হইতেছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজগুলির অর্থাৎ, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুশীলন। মানুষ কিভাবে অর্থ উপার্জন করে এবং অভাব পূরণের জন্য কিভাবে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে,—অর্থশাস্ত্র ইহারই অনুশীলন করে। মানুষের অর্থোপার্জন এবং অর্থ ব্যয়ের কাজ সমাজের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। সমাজের বাহিরে যাঁহারা বাস করেন, যেমন, সন্ন্যাসী ও ফকিরগণ,—তাহাদের অভাবের তাড়নাও নাই, অর্থোপার্জনের তাগিদও নাই। সন্ন্যাসী এবং ফকিরের হয়ত অন্য অনেক কাজ থাকিতে পারে,—কিন্তু সে সকল কাজের অনুশীলন অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু নহে। সমাজে বাস করিলেই মানুষকে অর্থনৈতিক কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। যাহারা সমাজে বাস করে না, তাহাদের কাজের সহিত অর্থশাস্ত্রের কোন সংস্রব নাই। সেইজন্য অর্থশাস্ত্রকে একটি "সামাজিক বিজ্ঞান" ("A social science") বলা হয়।

অর্থশাস্ত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজগুলির অনুশীলন করে

যদি কোন একটি বিশেষ কাজের সহিত অর্থোপার্জনের কোন যোগাযোগ না থাকে অথবা অভাব পূরণের কোন যোগাযোগ না থাকে, তবে সেই কাজ অর্থশাস্ত্রের বিবেচ্য বিষয় নয়। মা যদি অসুস্থ ছেলের শুশ্রূষা করেন, তবে সেই কাজ অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না; কারণ, এই কাজের মধ্যে অর্থোপার্জনের চেষ্টা নাই। কিন্তু যদি হাসপাতালের কোন নার্সকে কোন রোগীর শুশ্রূষা করিতে হয়, তবে সেই কাজ অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বস্তু হয়। কারণ, নার্সকে এইজন্য পারিশ্রমিক দিতে হয়।

অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দুইজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অর্থশাস্ত্রের জনক হিসাবে পরিচিত অ্যাডাম স্মিথের (Adam Smith) মতে অর্থশাস্ত্র নিছক ধনের বিজ্ঞান ("Economics is a science of wealth")। অ্যাডাম স্মিথের সংজ্ঞায় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি বিশ্লেষিত হয় নাই। এই মতবাদের ফলে ইংলণ্ডে কার্লাইল, রাস্কিন প্রমুখ দার্শনিকগণ অর্থশাস্ত্র আলোচনার সার্থকতা অস্বীকার করিতেন। তাঁহাদের মতে অর্থশাস্ত্র ছিল যখের শাস্ত্র (Gospel of Mammon); অর্থাৎ কিভাবে কৃপণের ন্যায় শুধু অর্থ উপার্জন করা যায় অর্থশাস্ত্র কেবল ইহাই শিক্ষা দেয়। অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে এই বিরূপ ধারণার পরিবর্তন আনয়ন করেন অধ্যাপক মার্শাল। মার্শালের দৃষ্টিভঙ্গী (যাহা উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচিত হইয়াছে) ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে অর্থশাস্ত্রকে বিচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সমাজে বাস করে যাহারা, তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে অভাব মোচনের জন্য অর্থোপার্জন এবং অন্যান্য প্রচেষ্টার অনুশীলন করাই অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু।

অর্থশাস্ত্র নিছক ধনের বিজ্ঞান নয়

মার্শালের ভাষায় "Economics is a study of mankind in the ordinary business of life." অর্থাৎ, অর্থশাস্ত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ক্রিয়া-কলাপগুলির অনুশীলন করে। অবশ্য সাধারণ ক্রিয়াকলাপ বলিতে বুঝায় একদিকে অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টা এবং অপরদিকে উপার্জিত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন অভাব মোচনের সমস্যা। সুতরাং অর্থশাস্ত্র শুধু ধনের বিজ্ঞান নয়। অর্থশাস্ত্র হইতেছে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুশীলন।

মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া সম্প্রতি অধ্যাপক রবিন্স অর্থশাস্ত্রের একটি সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে একদিকে অনন্ত অভাব এবং অপর দিকে সঙ্গতির দুষ্প্রাপ্যতার মধ্যে মানুষ কিভাবে সামঞ্জস্য আনয়ন করিবার চেষ্টা করে, অর্থশাস্ত্র তাহাই অনুশীলন করে।* অর্থাৎ রবিন্সের মতে অর্থশাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুশীলন করে।

ক্যানান অর্থশাস্ত্রকে বস্তুগত কল্যাণের কারণসমূহ অনুশীলনকারী বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। "কল্যাণ" ও "সম্পদ" এক জিনিস নয়। অর্থশাস্ত্র বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার উপর আলোকসম্পাত করে এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে, মূল্য-বিচার (value judgment) করে না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলা যাইতে পারে যে আধুনিক অর্থশাস্ত্র বস্তুগত কল্যাণের দিকটি একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। অর্থনৈতিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইলেই মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়; এই কল্যাণ ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত অথবা সামাজিক কল্যাণ হিসাবে পরিগণিত হয়।

অর্থশাস্ত্র ও বস্তুগত কল্যাণ

অর্থশাস্ত্রের কতিপয় মৌলিক ধারণা (Some Fundamental concepts in Economics)—অর্থশাস্ত্রের মৌলিক ধারণাগুলির মধ্যে অন্যতম হইল **দ্রব্য** (Commodities) ও **সেবা** (Service)। বস্তুগত পণ্যকে (Material goods) বলা হয় দ্রব্য (Commodities) এবং অবস্তুগত পণ্যকে (Non-material goods) বলা হয় সেবা। কতিপয় দ্রব্য আছে যেগুলির যোগান অফুরন্ত, যেগুলি আমরা প্রকৃতির নিকট হইতে পাইয়া থাকি; সেগুলিকে আমরা **মূল্যহীন দ্রব্য** (Free goods) বলিয়া থাকি। মূল্যহীন দ্রব্যগুলির সরবরাহ এত বেশী যে ব্যবহার করার পরও সেগুলির অতিরিক্ত যোগান থাকে। কিন্তু আবার কতিপয় দ্রব্য আছে যেগুলির যোগান খুব বেশী নয়; অথচ যেগুলির সাহায্যে আমরা আমাদের অভাব মিটাইতে পারি। সামগ্রীগুলির যোগান সীমিত বলিয়া এইগুলিকে **অর্থনৈতিক দ্রব্য বা মূল্যবান**

দ্রব্য

* রবিন্সের (Robbins) ভাষায় "Economics is a study of human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses."

দ্রব্য (Economic goods) বলা হয়। এই দ্রব্যগুলি পাইবার জন্য লোকে দাম দিতে প্রস্তুত থাকে। খাবার, কাপড় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ভোগ-সামগ্রীগুলি সবই মূল্যবান দ্রব্য। আবার নদীর জল একটি মূল্যহীন দ্রব্য। অথচ শহরে আমরা কল হইতে যে জল পাই তাহা মূল্যবান দ্রব্য ; কারণ, এই জলের যোগান সীমাবদ্ধ এবং এই জলের জন্য আমাদের কিছু দাম দিতে হয়।

ধন বা সম্পদ (Wealth)—অর্থনৈতিক দ্রব্যগুলিকেই (Economic goods) ধন বলা হয়। ধনের চারিটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, ইহার উপযোগ (Utility) বা অভাব পূরণ করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। দ্বিতীয়ত, ইহার যোগান সীমিত বা অপ্রচুর (Scarce) থাকা চাই। তৃতীয়ত, ইহা হস্তান্তরযোগ্য (Transferable) হওয়া চাই। চতুর্থত, ইহা একটি বাহিরের বস্তু (External) হওয়া চাই। বাহ্য, হস্তান্তরযোগ্য এবং সীমাবদ্ধ দ্রব্যাদির যদি অভাব মিটাইবার ক্ষমতা থাকে তবেই সেগুলিকে আমরা ধন বলিতে পারি। ধন অনেক সময় অবাস্তব পদার্থও হইতে পারে ; কিন্তু, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদার্থকে বাহ্য ও হস্তান্তরযোগ্য হইতে হয়। যেমন, ব্যবসায়ের সুনাম, বই ছাপাইবার স্বত্ব প্রভৃতি পদার্থগুলি বাহ্য ও হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া ধন হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু নদীর জল অথবা খোলা মাঠের মুক্ত বাতাস ধন নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে আমরা ধন বলিতে পারি না। কারণ, ইহা বাহিরের বস্তু নয়।

ধনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করিতে পারি।

ধন (Wealth)

উপযোগ (Utility)	সীমিত যোগান (Limited Supply)	হস্তান্তর যোগ্যতা (Transferability)	বাহ্যতা (Externality)

ব্যক্তিগত ধন ছাড়াও আমরা যৌথ ধন (Collective wealth) এবং জাতীয় ধন (National wealth) ইত্যাদি দেখিতে পাই। কোন শহরের রাস্তাঘাট, পার্ক ইত্যাদির মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য—এইজাতীয় দ্রব্যাদিকে আমরা যৌথ ধন বলি। সব রকম ব্যক্তিগত এবং যৌথ ধনের সমষ্টিকে আমরা জাতীয় ধন বলি। সরকারী ঋণপত্র, বৈদেশিক অর্থ সাহায্য ইত্যাদি জাতীয় ধনের অন্তর্গত।

মূল্য ও দাম (Value and Price)—একটি জিনিসের বিনিময়ে, অন্য কোন জিনিসের যে পরিমাণ পাওয়া যায়, তাহাই প্রথম জিনিসটির মূল্য এবং সেই জিনিসের বিনিময়ে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে ইহার দাম। প্রকৃতপক্ষে মূল্য ও দামের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না যদি মূল্যের পরিমাণ সর্বদাই অর্থের মাধ্যমে করা হয়। সুতরাং যখন আমরা টাকা দিয়া মূল্যের পরিমাপ করি, তখন ইহাকে দাম বলা হয়। মূল্য দুই প্রকার হইতে

মূল্য ও দামের মধ্যে পার্থক্য

পারে—বিনিময়-মূল্য (Value-in-exchange) এবং ব্যবহারিক মূল্য (Value-in-use)। অর্থশাস্ত্রে কোন জিনিসের বিনিময়-মূল্যই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

উপযোগ (Utility)—কোন দ্রব্য বা সেবার যদি এমন ক্ষমতা থাকে যাহার সাহায্যে অভাব মোচন করা যায়, তবে সেই দ্রব্য বা সেবার অভাব মোচন করিবার ক্ষমতাকে "উপযোগ" আখ্যা দেওয়া হয়। মূলত উপযোগ হইতেছে একটি মানসিক অনুভূতি। ইহা কখনই পরিমাপ যোগ্য নয়। উপযোগ অনেক প্রকার হইতে পারে। যেমন, রূপগত উপযোগ (Form utility), স্থানগত উপযোগ (Place utility), সময়গত উপযোগ (Time utility) এবং সেবাগত উপযোগ (Service utility)। প্রকৃতিদত্ত উপকরণের রূপান্তর হইতে যে উপযোগ পাওয়া যায়, যেমন, বনের গাছ কাটিয়া যে আসবাবপত্র পাওয়া যায় তাহা রূপগত উপযোগের পরিচায়ক। কোন জিনিসকে স্থানান্তরিত করিয়া যদি ইহার উপযোগ বাড়ানো হয় (যেমন দার্জিলিং হইতে কলিকাতায় চা চালান দিয়া ইহার উপযোগ বাড়ানো হয়), তখন আমরা স্থানগত উপযোগ দেখিতে পাই। আবার কোন জিনিস যদি উৎপাদনের পরেই জমাইয়া রাখা হয় এবং প্রয়োজনমত এমন সময়ে বাজারে ছাড়া হয় যখন ইহার জন্ম বেশী দাম পাওয়া যাইবে, তখন এই উপযোগ বৃদ্ধিকে সময়গত উপযোগ বলা হয়। শিক্ষকের শিক্ষাদান, চিকিৎসকের চিকিৎসা, ভৃত্যের সেবা, এইগুলি সেবাগত উপযোগের নিদর্শন।

Exercise

1. Discuss the nature of economic activities.

(অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি আলোচনা কর)। (১-৪ পৃষ্ঠা)

2. "Economic activities deal with unlimited wants, limited income and alternative uses of limited income."—Discuss the statement.

("অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপ অসীম, সীমিত আয় এবং সীমিত আয়ের বিকল্প ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত।"—এই উক্তিটির আলোচনা কর)। (১-৪ পৃষ্ঠা)

3. "Economics is a study of mankind in the ordinary business of life."—Discuss the statement.

("অর্থশাস্ত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ক্রিয়াকলাপগুলির অনুশীলন করে।"—এই উক্তিটির আলোচনা কর।

উত্তর-সংকেত: এই প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চম পৃষ্ঠা হইতে মার্শাল প্রদত্ত সংজ্ঞার আলোচনা এবং সেই সঙ্গে ২-৪ পৃষ্ঠা হইতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।)

4. What are the aims of economic activities ? Briefly discuss the nature of economic activities.

(অর্থ নৈতিক কাজকর্মের উদ্দেশ্য কি কি ? অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।) (২-৪ পৃষ্ঠা)

5. Write short notes on :

(a) Commodities, (b) Wealth, (c) Utility (d) Value and Price.

[সংক্ষিপ্ত টিকা লিখ :

(ক) দ্রব্য, (খ) সম্পদ বা ধন (গ) উপযোগ, (ঘ) মূল্য ও দাম।] (৬-৮ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the characteristics of wealth. Is the Howrah Bridge wealth ?

(ধনের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর : হাওড়ার সেতু কি ধন ?) (৭ পৃষ্ঠা)

[**সংকেত :** হাওড়ার সেতুকে আমরা যৌথ ধন বলিতে পারি।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৃহস্থের অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপ—ভোগ (Economic activity of the Household—Consumption)

ক্রেতা বা গৃহস্থের অর্থ নৈতিক কাজ (Economic activity of the Household)—ক্রেতা অথবা গৃহস্থের অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূল কথা হইতেছে, বিভিন্ন ভোগ-সামগ্রীগুলির জন্য অভাব বা চাহিদা পূরণ করা, এই চাহিদা কত হইবে তাহা নির্ভর করে ক্রেতার অভাবের তাড়না এবং সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্রয়শক্তির (Purchasing Power) উপর। অর্থাৎ যাহা কিনিবার ক্ষমতা গৃহস্থের অথবা ক্রেতার নাই, তাহার জন্য চাহিদাও কখনই কার্যকর হয় না। আর প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রেতার চাহিদা এবং ক্রয়শক্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু শুধু গৃহস্থের দিক হইতে কোন জিনিসের জন্য চাহিদা থাকিলেই চলিবে না, উৎপাদকের দিক হইতেও সেই জিনিসের যোগান থাকা চাই। উৎপাদক কোন্ জিনিসের কতটা যোগান দিবে তাহাও গৃহস্থের চাহিদার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কোন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদকের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, গৃহস্থের বা ক্রেতার ভূমিকাও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ক্রেতার চাহিদার উপর উৎপাদন নির্ভরশীল। গৃহস্থের অনেক অভাব থাকে এবং ভালভাবে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিবার জন্য এই অভাবগুলি পূরণ করা দরকার। অভাবগুলি (wants) পূরণ করা হইলেই গৃহস্থের ভোগ-জনিত ক্রিয়াকলাপের (consumption-activities) সার্থকতা দেখা যায়। গৃহস্থ হইতেছে মূলত একজন ক্রেতা; এবং প্রয়োজনীয় ভোগ-সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য অথবা ক্রয় করিবার ক্ষমতা অর্জন করিবার জন্যই গৃহস্থ চেষ্টা করিয়া থাকে। প্রশ্ন হইতেছে, গৃহস্থ কী ধরনের জিনিস ক্রয় করিতে চাহে। এমন কতিপয় জিনিস আছে যেগুলি না কিনিলে গৃহস্থের পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব; যেমন, খাদ্য, পরিধেয় প্রভৃতি একান্ত আবশ্যকীয় জিনিস। উপার্জন না থাকিলেও গৃহস্থকে যেভাবেই হোক এই জিনিসগুলি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু উপার্জনের চেষ্টা না করিয়া কোন গৃহস্থের পক্ষেই এই জিনিসগুলি বরাবরের মত সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এই জিনিসগুলির জন্য চাহিদা কখনই সাময়িক চাহিদা নয়; এই চাহিদা চিরকালীন। সেজন্য গৃহস্থের অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রধান অঙ্গ হইতেছে অভাব পূরণের জন্য আয় উপার্জনের চেষ্টা করা। আয় উপার্জিত হইলেই অভাব পূরণ করা সম্ভবপর। কিন্তু আয় উপার্জন করিবার জন্য

অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় গৃহস্থের ভূমিকা

অভাব পুরণের ব্যবস্থা

অভাব পুরণের জন্য আয় উপার্জনের প্রচেষ্টা

কাজের সংস্থান থাকা চাই। কেননা কাজের সুযোগ বা সংস্থান (employment opportunity) না থাকিলে আয়েরও সংস্থান থাকে না। কিন্তু কাজের সংস্থান নির্ভর করে উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর। দেখা যাইতেছে ক্রেতার ক্রিয়াকলাপ এবং উৎপাদনের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রহিয়াছে।

ভোগ-সামগ্রীর শ্রেণী-বিভাগ (Classification of Consumption-goods)—অভাব মিটাইবার জন্য যখন কোন জিনিস ব্যবহার করে অথবা ইহা ক্রয় করে, তখন সেই কাজকে আমরা ভোগ বলি। অভাব দূর করিবার উপায় হইতেছে ভোগ। ক্রেতাগণ স্থির করে, অভাব পূরণের জন্য তাহাদের কোন্ জিনিস কত পরিমাণে ক্রয় করা উচিত।

তিন প্রকার ভোগ-সামগ্রী

ক্রেতা তিন প্রকার দ্রব্য ভোগ করে। যথা, একান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি (Necessaries), স্বাচ্ছন্দ্য-দ্রব্যাদি (Comforts) এবং বিলাস-দ্রব্যাদি (Luxuries)। একান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মধ্যে কতিপয় দ্রব্য জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়; আবার কতিপয় দ্রব্য কার্যক্ষমতাবৃদ্ধির সহায়ক। কতিপয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য আছে যেগুলি অভ্যাসবশত মানুষের একান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি হিসাবে বিবেচিত হয়; যেমন, তামাক, চা-পান ইত্যাদির অভ্যাস। আবার কতিপয় সামগ্রী আছে যেগুলি কোন কোন ক্রেতার নিকট বিলাস-সামগ্রী, আবার কাহারও নিকট প্রয়োজনীয় অথবা স্বাচ্ছন্দ্য-দ্রব্য; যেমন, বৈদ্যুতিক পাখা। বিলাস-সামগ্রী মাত্রই যে নিন্দনীয় তাহা নহে। অর্থশাস্ত্রের দিক হইতে চিন্তা করিলে বিভিন্ন বিলাস-সামগ্রীর উৎপাদন পরোক্ষভাবে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে।

নিম্নলিখিত ভাবে আমরা ভোগের শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি:

ভোগ (Consumption)

- একান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি (Necessaries)
- স্বাচ্ছন্দ্য-দ্রব্যাদি (Comforts)
- বিলাস-দ্রব্যাদি (Luxuries)

গৃহস্থের অভাবের বৈশিষ্ট্য (Features of the wants of the House-hold)—উপরে ভোগ-সামগ্রীর শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। গৃহস্থ এই তিন প্রকার ভোগ-সামগ্রী ক্রয় করিতে চাহে। এই ভোগ-সামগ্রীগুলি ক্রয় করিবার সময় গৃহস্থের অভাবগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

প্রথমত, গৃহস্থের **অভাবের কোন শেষ নাই**। একটি অভাব পূরণ করা হইলেই গৃহস্থকে নূতন একটি অভাব পূরণ করিবার চিন্তা করিতে হয়। শুধু খা

এবং পরিধেয় পাইলেই চলে না, সুস্থ জীবনযাত্রার জন্য আরও অনেক জিনিস বিশেষ দরকার।

দ্বিতীয়ত, **সাধারণভাবে অভাব সীমাহীন হইলেও একটি বিশেষ অভাবের সীমা আছে।** একটি জিনিস মানুষ যতই পাইতে থাকে, ততই জিনিসটির প্রয়োজনীয়তাও কমিতে থাকে। যদি গৃহস্থের আয়ের কোন পরিবর্তন না হয় অথবা গৃহস্থের রুচি ও অভ্যাস অপরিবর্তিত থাকে এবং যদি বাজারে সংশ্লিষ্ট কোন জিনিসটির বিকল্প সামগ্রী না থাকে, তবে গৃহস্থ যতই জিনিসটি কিনিতে থাকিবে ততই জিনিসটির উপযোগ ক্রমশ কমিয়া আসিবে। ইহাই **ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির** (Law of Diminishing Marginal Utility) ভিত্তি। অভাব পূরণ যেমন ভোগের একটি বৈশিষ্ট্য, সেই প্রকার উপযোগ-হ্রাসও ভোগের আর একটি বৈশিষ্ট্য (Competitive)।

তৃতীয়ত, **বিভিন্ন অভাব পরস্পরের প্রতিযোগী হইতে পারে।** যদি একাধিক অভাব থাকে, তবেই এই প্রতিযোগিতা বিশেষ ভাবে প্রতিভাত হয়। অল্প টাকায় আমি আগে বই কিনিব, না স্কুলের মাহিনা দিব, অর্থাৎ, কোন্ অভাবটি আগে পূরণ করিব, এই সম্বন্ধে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তখন এই দুইটি অভাব পরস্পরের প্রতিযোগী।

চতুর্থত, **অনেকগুলি অভাবের মধ্যে কোন্‌টি আগে পূরণ করিতে হইবে তাহা লইয়া সমস্যার সৃষ্টি হয়।** তখন মানুষকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভাবটি আগে পূরণ করিতে হয়। সব অভাবের পরিতৃপ্তির জন্য ক্রেতাকে একটি নির্দিষ্ট আয় বিভিন্ন জিনিসের উপর এমনভাবে ব্যয় করিতে হয় যেন প্রতিটি জিনিস হইতেই তাহার উপযোগ সর্বাধিক হয়। অর্থাৎ প্রতিটি জিনিসের জন্য ক্রেতা যত টাকা খরচ করে, সেই জিনিস হইতে যেন সেই অনুপাতে উপযোগ পাওয়া যায় এবং সব জিনিসের ক্ষেত্রেই যেন এই অর্থব্যয় এবং উপযোগ-প্রাপ্তির অনুপাত সমান থাকে। এই নিয়মটি অর্থশাস্ত্রে **সমপ্রান্তিক উপযোগের নিয়ম** (Law of Equimarginal Utility) বলিয়া পরিচিত।

পঞ্চমত, **একটি অভাব আরেকটি অভাবের পরিপূরক** (Complementary) হইতে পারে। মোটর গাড়ী কিনিলেই পেট্রোলের প্রয়োজন হয়; অথবা, কলম কিনিলেই কালির দরকার হয়; এইজাতীয় অভাবগুলি পরস্পরের পরিপূরক।

উৎপাদক ও গৃহস্থের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between the Producer and the Household)—ভোগ-সামগ্রীর শ্রেণী-বিভাগ; বিভিন্ন ভোগ-সামগ্রীর জন্য গৃহস্থের কখন কিরূপ চাহিদা থাকিবে, গৃহস্থের বিভিন্ন অভাবের আপেক্ষিক তীব্রতা কিরূপ, গৃহস্থের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়িয়াছে অথবা কমিয়াছে কিনা প্রভৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিয়া উৎপাদকগণ নিজেদের উৎপাদন-ব্যবস্থা

পরিচালন করিয়া থাকে। সেইজন্য উৎপাদক ও গৃহস্থের মধ্যে সর্বদাই একটি সম্পর্ক থাকে।

উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সম্পর্ক

উৎপাদন এবং ভোগ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কোন জিনিস যদি ক্রেতা কিনিতে চাহে, তবে উৎপাদক সেই জিনিস উৎপাদন করিবে। উৎপাদক যদি বুঝিতে পারে যে তাহার উৎপাদিত জিনিসের জন্য কাহারও চাহিদা আছে, তবেই সে জিনিসটি উৎপাদন করিবে। আবার যদি জিনিসটির উৎপাদন ভালভাবে হয়, তবে ক্রেতার চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বেশী হইলে যখন জিনিসপত্রের দাম কমিয়া যায়, তখন ক্রেতারও চাহিদা বাড়িয়া যায়। অপরদিকে ক্রেতার চাহিদা বাড়িলে উৎপাদন বাড়ে। যদি কোন কারণে ক্রেতার চাহিদা বাড়িলেও উৎপাদন না বাড়ে, তবে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায়।

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বিভিন্ন জিনিসের জন্য চাহিদা থাকে; আমাদের খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান প্রভৃতি জিনিসের দরকার। এই জিনিসগুলির যোগান দেয় উৎপাদকগণ। একদিকে ভোগের জন্য চাহিদা এবং অপরদিকে মুনাফা অর্জনের জন্য উৎপাদন বাড়াইবার তাগিদ, ইহাই যথাক্রমে গৃহস্থ এবং উৎপাদকের কাজ করিবার প্রেরণা।

সমপ্রান্তিক উপযোগ নিয়ম (Law of Equimarginal Utility) এবং গৃহস্থের ক্রয়-প্রচেষ্টায় ভারসাম্যের অবস্থা—ক্রেতার ভারসাম্যের অবস্থা বুঝাইবার জন্য অধ্যাপক মার্শাল সমপ্রান্তিক উপযোগের নিয়ম আলোচনা করিয়াছিলেন। এই নিয়মের মূল কথা হইতেছে এই যে, যখন কোন ব্যক্তি তাহার নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়ের সাহায্যে কতিপয় জিনিস (যেমন, A, B, C ইত্যাদি) কিনিতে চাহে, তখন সে তাহাদের নির্দিষ্ট আয়কে এমনভাবে বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে বণ্টন করিবে যে প্রত্যেকটি জিনিস হইতেই তাহার প্রান্তিক উপযোগ সমান হইবে। যদি A কিনিয়া B অপেক্ষা বেশী উপযোগ পাওয়া যায়, তবে ক্রেতা B কম করিয়া কিনিয়া A বেশী করিয়া কিনিবে। ক্রেতার উদ্দেশ্য হইতেছে A, B, C প্রভৃতি জিনিস এমনভাবে কিনিয়া ফেলা যেন সবগুলি জিনিস হইতেই তাহার পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হয়। এইজন্য এই নিয়মটির আর একটি নাম হইতেছে "সর্বাধিক পরিতৃপ্তির নিয়ম" (Doctrine of Maximum Satisfaction)। এক্ষেত্রে একটি জিনিসের বদলে অপর একটি জিনিস বেশী করিয়া কেনা হয় বলিয়া এই নিয়মটির আরও একটি নাম হইতেছে "প্রতিস্থাপনের নিয়ম" (Principle of Substitution)। যদি ক্রেতা দেখে যে, কফি হইতে চায়ের দাম বেশী অথচ দুইটিই তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়, তখন সে তাহার নির্দিষ্ট আয় চা এবং কফির মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করিবে যে উভয় ক্ষেত্রেই মূল্যপ্রদান ও উপযোগ প্রাপ্তির অনুপাত সমান থাকে,—অর্থাৎ, উভয় ক্ষেত্রেই যেন সমান তৃপ্তি পাওয়া যায়। চা কিনিয়া এরকম যেন মনে না হয় যে চা আরও কম

কিনিয়া কফি বেশী করিয়া কিনিলেও চলিত, অথবা কফি কিনিয়া এরকম যেন মনে না হয় যে, কফি আরও কম কিনিয়া চা বেশী কিনিলেও চলিত। ক্রেতা চা এবং কফি কিনিয়া যে তৃপ্তিলাভ করিবে এবং ইহার জন্য যে দাম দিবে, তাহার অনুপাত সর্বদাই সমান থাকিবে। এই অবস্থায় চা এবং কফি কিনিলে ক্রেতার ভারসাম্য (Consumer's equilibrium) অর্জিত হইবে। এই নিয়মটিকে নিম্নলিখিতভাবে বুঝান যায়—

$$\frac{\text{চায়ের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{চায়ের দাম}} = \frac{\text{কফির প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{কফির দাম}}$$

মার্শালের এই নিয়মটি পরবর্তী অর্থবিজ্ঞানীদের নিরপেক্ষ রেখা পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রেতার আচরণ সম্বন্ধে আলোচনার ভিত্তি।

বাস্তব জগতে এই তত্ত্বটিকে কয়েকটি সীমার সম্মুখীন হইতে হয়। অনেক জিনিস আছে যেগুলি অবিভাজ্য indivisible) এবং আকারেও বড়। এই জিনিসগুলি কিনিতে হইলে একসঙ্গে বহু টাকার প্রয়োজন। এই ধরনের একটি জিনিস কিনিবার ক্ষেত্রে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া অপর একটি ক্ষুদ্র জিনিস কেনা সম্ভবপর নাও হইতে পারে এবং এক্ষেত্রে সমপ্রান্তিক উপযোগ নিয়মটি কার্যকরী হয় না।

এই তত্ত্বটির সীমা

দ্বিতীয়ত, আবার কতিপয় জিনিস আছে যেগুলির ভোগ অনেক দিন ধরিয়া চলে। যেগুলি দীর্ঘস্থায়ী জিনিস এবং যেগুলি অস্থায়ী জিনিস, সেইগুলির মধ্যে আয়ের বণ্টন এমনভাবে নাও হইতে পারে যে উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রান্তিক উপযোগ সমান হইবে।

গৃহস্থের ক্রয়-পদ্ধতির পরিবর্তন (Changes in the Purchase Plan of the Household)—গৃহস্থের ক্রয়-পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রধান লক্ষণ হইল তাহার চাহিদার পরিবর্তন। গৃহস্থের ক্রয়-পদ্ধতির পরিবর্তন অথবা তাহার চাহিদার পরিবর্তন অনেকগুলি উপাদানের উপর নির্ভরশীল। দামের পরিবর্তনের দরুন গৃহস্থের চাহিদার পরিবর্তন হয়। কিন্তু অনেক দামের পরিবর্তন না হইলেও গৃহস্থের চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে। দামের পরিবর্তন ছাড়া চাহিদার পরিবর্তন নিম্নোক্ত কারণে হইতে পারে :

দামের পরিবর্তন না হইলেও চাহিদার পরিবর্তন

(১) আয়ের পরিবর্তন :—ক্রেতার আয় বাড়িয়া গেলে ক্রয়শক্তি বাড়ে এবং সেইজন্য চাহিদার পরিমাণও বাড়িয়া যায়। আবার আয় কমিয়া গেলে ভোগ-সামগ্রীর জন্য চাহিদাও কমিয়া যায়।

(২) ক্রেতার রুচি, অভ্যাস ও পছন্দের পরিবর্তন :—যদি কোন কারণে ক্রেতার রুচি, অভ্যাস অথবা পছন্দের পরিবর্তন হয়, তবে তাহার চাহিদারও পরিবর্তন হয়। মোটর গাড়ীর জন্য যত চাহিদা বাড়িতেছে ঘোড়ার গাড়ীর জন্য চাহিদা তত কমিয়া যায়। রেডিয়োর জন্য চাহিদা বাড়িতেছে বলিয়া গ্রামোফোনের জন্য চাহিদা কমিতেছে।

(৩) জনসংখ্যার পরিবর্তন :—জনসংখ্যার পরিবর্তনের ফলে সামগ্রিকভাবে গৃহস্থের চাহিদারও পরিবর্তন হয়।

(৪) ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থার পরিবর্তন :—ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থার উন্নতি কিংবা অবনতির সৃষ্টি হইলে গৃহস্থের চাহিদাও বাড়িবে কিংবা কমিবে।

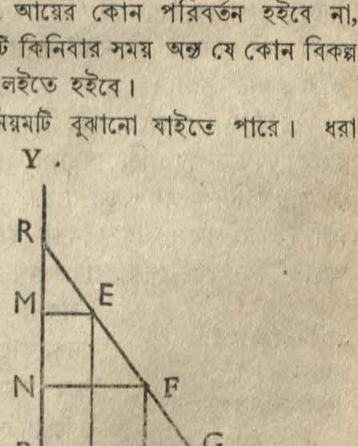
(৫) পরস্পর সম্পর্কিত দামের পরিবর্তন :—চায়ের জন্য চাহিদা বাড়িলে চিনির জন্য চাহিদা বাড়ে, অথবা কলমের জন্য চাহিদা বাড়িলে, কালির জন্য চাহিদা বাড়ে ; কারণ, এই জিনিসগুলির দাম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

(৬) সর্বশেষে, উপযোগের পরিবর্তন হইলে চাহিদার পরিবর্তন হয়। উপযোগ বাড়িয়া গেলে চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং উপযোগ কমিয়া গেলে চাহিদা কমিয়া যায়।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়ম (Law of Diminishing Marginal Utility)—মানুষের অভাবের কোন শেষ নাই ; কিন্তু একটি বিশেষ অভাবের শেষ আছে। যেমন, আমি যতই কমলালেবু কিনিতে থাকিব ততই আমার কমলালেবু কিনিবার আকাঙ্ক্ষা কমিয়া আসিবে। এমন একটি অবস্থায় আমি উপনীত হইব যখন কমলালেবুর কোন উপযোগই আমার নিকট থাকিবে না। এই নিয়মটি বুঝাইবার সময় দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, কোন ক্রেতা যখনই কোন জিনিস কিনিবে, তখন তাহার রুচি, অভ্যাস এবং আয়ের কোন পরিবর্তন হইবে না, ইহা ধরিয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, জিনিসটি কিনিবার সময় অন্য যে কোন বিকল্প জিনিসের দাম অপরিবর্তিত আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির সর্ত

এখন একটি উদাহরণের সাহায্যে এই নিয়মটি বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাক্, একজন লোক এক কাপ চা কিনিয়া পান করিল। প্রথমে এক কাপ চা ভালই লাগিবে। ইহার পর যদি সে আরও এক কাপ চা কিনিয়া পান করে, তখনও ইহা ভাল লাগিতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় কাপ হইতে যতখানি উপযোগ পাওয়া যাইবে, প্রথম কাপ হইতে তাহা কম হইবে। ইহার পর যদি তৃতীয়বার এক কাপ চা কেনা হয়, তখন তৃতীয়বারের চা হইতে যে উপযোগ পাওয়া যায়, তাহা দ্বিতীয়বারের অপেক্ষা আরও কম হইবে। এইভাবে একজন লোক যতই একটি জিনিস কিনিতে থাকিবে, পরবর্তী ইউনিট-গুলির উপযোগ ততই কমিতে থাকিবে। উপরের ৪নং চিত্রের সাহায্যে এই নিয়মটি বুঝানো যাইতে পারে। এই চিত্রে OX রেখা একটি জিনিস ক্রয়ের পরিমাণ এবং OY



৪নং চিত্র

রেখা উপযোগ বুঝাইতেছে। যখন OA পরিমাণ জিনিস কেনা হইয়াছে, তখন ক্রেতার নিকট ইহার উপযোগ হইতেছে AE ; ইহার পর যখন AB পরিমাণ জিনিস কেনা হইল, তখন উপযোগ হইতেছে BF ; ইহার পর BC পরিমাণ জিনিস কেনা হইলে উপযোগ কমিয়া CG হইল। এইভাবে যতই একটি জিনিস কেনা হইতেছে সেই জিনিস হইতে উপযোগ ততই কমিয়া যাইতেছে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ নিয়মের কতিপয় ব্যতিক্রম আছে। যেমন, কৃপণ যতই টাকা জমাইতে থাকিবে, তাহার নিকট হইতে উপযোগ ততই কমিতে থাকিবে না। অথবা যে বালকের নিকট ডাক-টিকিট জমানো একটা খেয়াল, সে যদি ক্রমাগত ডাক-টিকিট পাইতে থাকে, তবুও তাহার নিকট ডাক-টিকিটের উপযোগ কমিবে না। কিন্তু কৃপণ অথবা খেয়ালী বালকের ক্রিয়াকলাপ অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নহে। কারণ, তাহারা কখনই স্বাভাবিক ক্রেতা নহে এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপকে আমরা অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলিতে পারি না।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম

একটি জিনিস পাইতে থাকিলে ইহার উপযোগ ক্রেতার নিকট তখনই কম হয় যখন ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যদি জিনিসটি খুব দুর্লভ হয়, তবে ইহার প্রথম ইউনিট কিনিবার পর দ্বিতীয় ইউনিটের উপযোগ নাও কমিতে পারে। আবার, জিনিসটি যদি এরূপ হয় যে ভবিষ্যতে ইহার দাম বাড়িয়া যাইতে পারে তবে বর্তমানে জিনিসটি বেশী পরিমাণে কেনা হইতে থাকিলেও ইহার উপযোগ কমিতে থাকিবে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই নিয়মটি ব্যাখ্যা করিবার সময় আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে ক্রেতার রুচি, অভ্যাস এবং আয়ের কোন পরিবর্তন হইবে না। যদি ক্রেতার রুচি, অভ্যাস এবং আয়ের পরিবর্তন হয়, তবে কোন জিনিস বেশী পরিমাণে কিনিতে থাকিলেও তাহার নিকট ইহার উপযোগ নাও কমিতে পারে। তাহা ছাড়া, অন্যান্য বিকল্প জিনিসের ব্যয়ও অপরিবর্তিত ধরিয়া লইতে হয়। ধরা যাক্, একজন লোক কমলালেবু কিনিতেছে, এমন সময়ে যদি সরবতী লেবু, আপেল, আঙুর ইত্যাদি ফলের দাম খুব বাড়িয়া যায়, তবে কমলালেবু ক্রমাগত কিনিতে থাকিলেও ইহার উপযোগ হয়ত তাহার নিকট নাও কমিতে পারে। কিন্তু, এই নিয়মটি বুঝাইবার সময় অধ্যাপক মার্শাল ধরিয়া লইয়াছেন যে ক্রেতার আয়, রুচি ও অভ্যাস এবং অন্যান্য বিকল্প জিনিসের দাম সবই অপরিবর্তিত থাকিবে। এই নিয়ম হইতে আমরা প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility) এবং মোট উপযোগের (Total Utility) মধ্যে একটি সম্পর্ক বাহির করিতে পারি।

এই নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য জিনিস পরিবর্তিত থাকে

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Total Utility and Marginal Utility)—যখন কোন জিনিস

কেনা হয়, তখন ইহার সবগুলি ইউনিট হইতে যে উপযোগ পাওয়া যায়, তাহার সমষ্টিকে বলা হয় মোট উপযোগ। কিন্তু বর্তমান ইউনিটগুলির অতিরিক্ত যদি একটি ইউনিট ক্রয় করা হয়, তবে অতিরিক্ত ইউনিট হইতে যে অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায়, তাহাকে বলা হয় প্রান্তিক উপযোগ। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়ম হইতে আমরা দেখিতে পাই, মোট উপযোগ যতই বাড়িতে থাকে, প্রান্তিক উপযোগ ততই কমিতে থাকে। যখন প্রান্তিক উপযোগ সর্বনিম্ন হয়, তখন মোট উপযোগ সর্বাধিক পরিমাণ হয়।

উপযোগ মূলতঃ মনস্তত্ত্বের ব্যাপার

উপযোগ কি পরিমাণে বাড়িতেছে অথবা কমিতেছে তাহা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কারণ, উপযোগ মূলতঃ একটি মানসিক অনুভূতি ; অর্থ দিয়া ইহার পরিমাপ করা যায় না। আবার, বিভিন্ন লোক একই জিনিস ক্রয় করিয়া কত উপযোগ পাইতেছে তাহা তুলনা করাও সম্ভব নয়।

ভোগোদ্বৃত্ত (Consumer's Surplus)—অধ্যাপক মার্শাল ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটির অবতারণা করেন। ক্রেতা যে দামে কোন জিনিস কিনিতে প্রস্তুত থাকে, অনেক সময় তাহা অপেক্ষা কম দামে সে সেই জিনিস কিনে ; সাধারণ অর্থে ইহাকেই আমরা ভোগোদ্বৃত্ত বলি। মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগের সাহায্যে ভোগোদ্বৃত্ত নির্ধারণ করা হয়।

ক্রেতা যে দামে কোন জিনিস কিনিতে চাহে, তাহাকে আমরা ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য (Individual demand price) বলি এবং যে দামে ক্রেতা বাস্তবিকপক্ষে জিনিসটি কিনে, তাহাকে বাজার মূল্য (market price) বলি। ব্যক্তিগত চাহিদা মূল্য বাজার মূল্য হইতে যত বেশী, তত হইতেছে ভোগোদ্বৃত্তের (consumer's surplus) পরিমাণ। যদি কোন জিনিসের জন্য ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য হঠাৎ বাড়িয়া যায়। অথচ বাজার মূল্য ঠিক থাকে তবে ভোগোদ্বৃত্ত বেশী হয়। আবার যদি ব্যক্তিগত চাহিদা-মূল্য বাজার-মূল্যের সমান হয় তবে ভোগোদ্বৃত্ত থাকে না। কিন্তু ধরা যাক্, একজন ক্রেতা একটি কমলালেবু ছয় আনা দিয়া কিনিতে চায়। দ্বিতীয় কমলালেবুটি কিনিতে হইলে সে পাঁচ আনা দিতে রাজী থাকে। তৃতীয় কমলালেবুটি কিনিতে হইলে সে চার আনা দিতে প্রস্তুত। চতুর্থ কমলালেবুটি কিনিবার সময় সে তিন আনা দিতে প্রস্তুত। এক্ষেত্রে চতুর্থ কমলালেবুর জন্য সে যাহা দিতে প্রস্তুত আছে তাহাই প্রান্তিক উপযোগ। বাজার দর প্রান্তিক উপযোগের সমান। সুতরাং এক্ষেত্রে বাজার দর হইতেছে তিন আনা, এবং তিন আনায় সে চারিটি কমলালেবু কিনিতেছে। চারিটি কমলালেবুর জন্য তাহাকে মোট বার আনা খরচ করিতে হইতেছে যদিও চারিটি লেবুর জন্য সে মোট আঠারো আনা বা এক টাকা দুই আনা (ছয় আনা+পাঁচ আনা+চার আনা+তিন আনা) দিতে প্রস্তুত। এক্ষেত্রে ক্রেতা মোট ছয় আনার (১৵০ – ৸০) ভোগোদ্বৃত্ত বা উদ্বৃত্ত তৃপ্তি (Surplus

satisfaction) লাভ করিয়াছে। প্রথম কমলালেবুর ক্ষেত্রে তিন আনা (।৶০ – ৶০), দ্বিতীয় কমলালেবুর ক্ষেত্রে দুই আনা (।৵০ – ৶০) এবং তৃতীয় কমলালেবুর ক্ষেত্রে এক আনা (।০ – ৶০), মোট ছয় আনা ভোগোদ্বৃত্ত হইয়াছে। চতুর্থ কমলালেবুর ক্ষেত্রে ক্রেতার কোন উদ্বৃত্ত তৃপ্তি নাই। নিম্নলিখিত সূত্রটির সাহায্যে আমরা এই তত্ত্বটি মনে রাখিতে পারি :-

ভোগোদ্বৃত্ত = মোট উপযোগ – (প্রান্তিক উপযোগ × ক্রীত জিনিসের সংখ্যা)

[Consumer's Surplus = Total utility – (Marginal utility × Number of units purchased).]

গৃহস্থের ব্যয়নির্বাহ সম্পর্কে এঞ্জেলের সূত্র (Engel's Law of Household Expenditure)—গৃহস্থের আয় বাড়িয়া গেলে সব জিনিসের ক্রয় সমান পরিমাণে না-ও বাড়িতে পারে। কারণ, আয় বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের স্বল্প দামের জিনিস অপেক্ষা বেশী দামের জিনিস ক্রয় করিবার প্রবণতা বাড়িয়া যায়। গৃহস্থের ব্যয়নির্বাহ সম্পর্কে এই সূত্রটি উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান পরিসংখ্যান বিজ্ঞানী (Statistician) এঞ্জেল প্রচার করেন। এইজন্য ইহা এঞ্জেলের সূত্র (Engel's Law) নামে পরিচিত। এই সূত্রের মূলকথা হইল, গরীব গৃহস্থের আয়ের বেশীর ভাগ ব্যয় হয় খাদ্যদ্রব্য এবং ভরণপোষণের জন্য। গরীব গৃহস্থের ক্ষেত্রে আমোদপ্রমোদ, শিক্ষা প্রভৃতির জন্য ব্যয় খুবই নগণ্য এবং তাহার সঞ্চয় করিবার ক্ষমতাও সামান্য। কিন্তু ধনী গৃহস্থের ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্যের জন্য যতটা খরচ হয়, শিক্ষা, বিলাসসামগ্রী ক্রয় এবং আমোদপ্রমোদের জন্য বেশী অনুপাতে খরচ হয়। তাহা ছাড়া, ধনী গৃহস্থের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের পরিমাণও বেশী হয়। আজ যে গৃহস্থ গরীব আছেন, তিনি যদি আগামীকাল ধনী হন, তবে তাঁহার ব্যয়নির্বাহের পদ্ধতিও পাল্টাইয়া যাইবে এবং ধনী-গৃহস্থের ব্যয়নির্বাহ পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করিবেন।

Exercise

1. Discuss the nature of the economic activity of the Household.

(গৃহস্থের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি আলোচনা কর।) (১০-১১ পৃষ্ঠা)

2. Classify the consumption goods. What are the features of wants?

(ভোগ-সামগ্রীর শ্রেণী-বিভাগ কর। অভাবের কি কি বৈশিষ্ট্য?) (১১ পৃষ্ঠা)।

3. Discuss the relationship between the Producer and the Household.

(উৎপাদক এবং গৃহস্থের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।) (১২-১৩ পৃষ্ঠা)

4. Show how a household seeks to maximum satisfaction from its limited expenditure.

(সীমিত ব্যয়ের পরিমাণ হইতে গৃহস্থ কিভাবে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে তাহা দেখাও।) (১৩-১৪ পৃষ্ঠা)

5. Account for the changes in the Purchase Plan of the Household.

(গৃহস্থের ক্রয়-পদ্ধতির পরিকল্পনার কারণগুলি দেখাও।) (১৪-১৫ পৃষ্ঠা)

6. Write a note on the Law of Equi-marginal Utility.

(সমপ্রান্তিক উপযোগের নিয়মের উপর একটি টীকা লিখ।) (১৩-১৪ পৃষ্ঠা)

7. Explain the Law of Diminishing Marginal Utility and comment on it.

(ক্রমহ্রাসমান উপযোগবিধির নিয়মটি ব্যাখ্যা কর এবং ইহার উপর মন্তব্য কর। (১৫-১৬ পৃষ্ঠা)

8. Explain the relationship between Total Utility and Marginal Utility.

(মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।) (১৬-১৭ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the doctrine of Consumer's Surplus.

(ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটি আলোচনা কর।) (১৭-১৮ পৃষ্ঠা)

10. Write a short note on Engel's Law.

(এঞ্জেলের নিয়মের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।) (১৮ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় অধ্যায় | উৎপাদন (Production)

উৎপাদন ক্ষেত্রের মূল সমস্যা (Basic Problems in Production)— উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা হইতেছে তিনটি :—

(১) কি কি দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইবে, (২) কেমন করিয়া উৎপাদন করিতে হইবে এবং (৩) কাহাদের জন্য উৎপাদন করিতে হইবে। উৎপাদকের লক্ষ্য হইতেছে নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের জন্য যেন খরচের পরিমাণ সর্বনিম্ন হয়, অথবা সর্বনিম্ন খরচে যেন সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদককে এমন জিনিস

উৎপাদন করিতে হইবে যাহার জন্য বাজারে যথেষ্ট চাহিদা আছে, অর্থাৎ, উৎপাদকের পক্ষে যাহা বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব হইবে। উৎপাদক তাহাদের জন্যই উৎপাদন প্রচেষ্টা চালাইয়া থাকে যাহারা উৎপাদিত জিনিস ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকিবে। কিন্তু একই ব্যক্তি একাধারে ক্রেতা এবং অপর দিকে উৎপাদক (Producer) হইতে পারে। ক্রেতার চাহিদা থাকে বিভিন্ন জিনিসের জন্য এবং সেই জিনিসগুলির যোগান উৎপাদকগণ দিয়া থাকে। উৎপাদকদের আবার জমি, মূলধন এবং শ্রমের জন্য চাহিদা থাকে এবং সেইজন্য তাঁহাদিগকে জমির জন্য খাজনা, মূলধনের জন্য সুদ এবং শ্রমের জন্য মজুরি দিতে হয়। জিনিসপত্রের যেমন একটি বাজার আছে এবং সেখানে যেরূপ চাহিদা ও যোগানের দ্বারা দাম নিরূপিত হয়,—উৎপাদনের উপাদানেরও সেই প্রকার একটি বাজার আছে এবং সেখানেও চাহিদা ও যোগানের দ্বারা দাম নিরূপিত হয়।

ফার্ম কাহাকে বলে? (What is a firm ?)—অর্থশাস্ত্রে ফার্ম (firm) বলিতে বুঝায় উৎপাদক (Producer)। এই উৎপাদক একজন ব্যক্তিবিশেষ হইতে পারে, অথবা একটি সংস্থাও হইতে পারে। যখন একজন মাত্র উৎপাদক সমুদয় উপকরণগুলি নিজের মালিকানাধীনে প্রয়োগ করিয়া উৎপাদক-কাজে প্রবৃত্ত হয়, তখন আমরা এক মালিকানার ফার্ম (Single-ownership firm) দেখিতে পাই। একটি ফার্মে একাধিক উৎপাদক অংশীদার (Partner) হিসাবে কাজ করিতে পারে। আবার যৌথকারবারী ফার্মও দেখা যায়; তখন উৎপাদনের দায়িত্ব একজনের উপর থাকে না; যৌথকারবারে যে কয়জন শেয়ারহোল্ডার (Shareholder) বা অংশপত্রের মালিক থাকে, তাহারাই উৎপাদনের জন্য দায়ী। অবশ্য যৌথ কারবারের প্রকৃতপক্ষে পরিচালকমণ্ডলীই উৎপাদননীতি পরিচালনা করিয়া থাকে।

যখন কয়েকটি ফার্ম একই অবস্থায় একই ধরনের জিনিস উৎপাদন করে, তখন তাহারা একটি শিল্প (Industry) গঠন করে।

জাতীয় উৎপাদনের উপাদান (Broad Factors determining National Product)—জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয় (National Product) দেশের মোট উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং উৎপাদনের উপকরণগুলি জাতীয় আয়ের উপাদান। জাতীয় উৎপাদন বাড়াইবার উপাদানগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমশক্তি, যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উৎপাদনের ব্যবস্থাপনাই প্রধান। উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। জমির সাহায্যে মানুষ তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে। যে দেশে উর্বর জমি, নিত্যবহ নদী বা খাল থাকে, যে দেশে প্রচুর পরিমাণে খনিজ সামগ্রী বিদ্যমান এবং সর্বোপরি যে দেশের জলবায়ু উৎপাদনের অনুকূল সেই দেশে

জাতীয় আয় উৎপাদনের উপাদান

প্রাকৃতিক সম্পদ

জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ বেশী হয়। যে দেশে মরুভূমির প্রাধান্য দেখা যায় এবং জমিগুলিও অনুর্বর থাকে, সে দেশে জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণও কম হয়।

কিন্তু, শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ এককভাবে জাতীয় উৎপাদন খুব বেশী বাড়াইতে পারে না। জাতীয় উৎপাদন বাড়াইবার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলির যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা উচিত। সেজন্য প্রয়োজন শ্রমশক্তি। মানুষ নিজের উৎপাদন কৌশল ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া প্রাকৃতিক সম্পদগুলির প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিবার চেষ্টা করে। সুতরাং শ্রমিকের কর্মকুশলতা (skill) এবং কারিগরি জ্ঞান (Technical knowledge) উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। শুধু শারীরিকভাবে পটু হইলেই চলে না, শ্রমিকদের কারিগরি কর্মপ্রণালী সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে হয়। একজন দক্ষ শ্রমিক অপর একজন অপেক্ষাকৃত অদক্ষ শ্রমিক অপেক্ষা বেশী পরিমাণে অথবা ভালভাবে কোন জিনিস উৎপাদন করিতে পারে।

শ্রমশক্তি

কিন্তু, শুধু শ্রমশক্তি থাকিলেই চলে না, সেই শ্রমশক্তি যাহাতে স্বচ্ছন্দভাবে নিজের কাজ করিতে পারে, সেজন্য প্রয়োজন মূলধনের। মূলধন বলিতে শুধু বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় টাকাই বুঝায় না। মূলধন হইতেছে উৎপাদনের এমন একটি উপকরণ যাহা পূর্বেই উৎপাদিত হইয়াছে ("Produced means of production")। শ্রমিকদের পক্ষে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাই হইতেছে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করা; আবার উৎপাদনের উপকরণগুলির যাহারা মালিক, তাহাদেরও উচিত উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করা। এজন্য প্রয়োজন বিনিয়োগের জন্য টাকার ব্যবস্থা করা।

মূলধন বা যন্ত্রপাতি

শ্রমিকগণ যাহাতে ঠিকভাবে যন্ত্রপাতি ও জমির ব্যবহার করিতে পারে এবং উৎপাদন ব্যবস্থা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য একজন ব্যবস্থাপক (Enterepreneur or organiser) বা পরিচালক থাকা দরকার। ব্যবস্থাপকের কাজ হইতেছে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিচালনা করা; কতটা উৎপাদন করিতে হইবে অথবা কোন্ জিনিস উৎপাদন করিতে হইবে এবং উৎপাদিত দ্রব্যের কত দাম হইবে প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করিবার ভার থাকে ব্যবস্থাপকের উপর। ব্যবসায়ে অনেক প্রকার ঝুঁকি থাকে; ব্যবস্থাপক সেই ঝুঁকি বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা

জাতীয় উৎপাদনের উপরি-উক্ত উপকরণগুলি ছাড়াও আরও কতিপয় উপাদান আছে। শ্রমিকদের শুধু কর্মদক্ষতা থাকিলেই চলিবে না, তাহাদের কর্মস্পৃহাও (will to work) থাকা চাই। তাহা ছাড়া, উৎপাদন-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য শ্রমিক ও ব্যবস্থাপক উভয়েরই প্রগতিশীল মনোবৃত্তি থাকা চাই। নিত্য নূতন আবিষ্কৃত সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের দিকে উৎপাদকের একটি স্বাভাবিক আগ্রহ থাকা উচিত। উৎপাদন-কৌশল আয়ত্ত করিবার দিকেও গুরুত্ব অর্পণ করা উচিত; কারণ

শুধু যন্ত্রপাতি থাকিলেই চলে না, সেই যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিবার সঠিক কৌশল শ্রমিকদের আয়ত্ত করা উচিত। দেশের সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থাও জাতীয় আয় নিরূপণের অন্যতম উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। কোন দেশের আর্থিক কাঠামো সেই দেশের সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এই আর্থিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা।

গ্রামাঞ্চলে অনুন্নত আর্থিক কাঠামো থাকার ফলেই আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে উৎপাদনের স্তর খুব নীচু। আমাদের দেশ অনুন্নত সামাজিক ও আর্থিক কাঠামো থাকার ফলে কৃষি-উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে এবং তাহা আমাদের শিল্প-ব্যবস্থারও অন্যতম প্রতিবন্ধক দাঁড়াইয়াছে।

উৎপাদনের উপকরণ এবং তাহাদের আয় (Classification of Factors of Production and their earnings)—পূর্বেই বলা হইয়াছে, জাতীয় আয়ের উৎপাদন প্রধানত চারিটি উপকরণের উপর নির্ভর করিতে হয়। সাধারণত যে কোন জিনিস উৎপন্ন করিতে হইলে আমাদের চারিটি উপকরণের উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রথমটি হইতেছে **জমি** বা **ভূমি (Land)**। জমি একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। সব প্রাকৃতিক সম্পদই অর্থশাস্ত্রে ভূমি বা জমি হিসাবে পরিগণিত হয়। দ্বিতীয় উপকরণ হইতেছে **শ্রম (Labour)**। ভূমি ও শ্রম এই দুইটি হইতেছে উৎপাদনের মূল উপকরণ। শুধু ভূমি ও শ্রম থাকিলেই চলে না,—এই দুইটি উপকরণের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হওয়া চাই। এই সদ্ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন **মূলধনের (Capital)**। মূলধন একটি মূল উপকরণ নয়,—ইহা একটি উৎপাদিত উপকরণ। উপরি-উক্ত তিনটি উপকরণের মধ্যে প্রকৃত সংহতি বজায় রাখার জন্য বিশেষ **ব্যবস্থাপনার (Organisation)** দরকার। সুতরাং উৎপাদনের মোট উপকরণ হইতেছে চারিটি ; যথা,—ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা।

নিম্নলিখিত ভাবে ইহা দেখানো যাইতে পারে,—

জাতীয় আয়

↓

দেশের সামগ্রিক নীট উৎপাদন

জমি (Land)	শ্রম (Labour)	মূলধন (Capital)	ব্যবস্থাপনা (Organisation)

জাতীয় আয় বণ্টন করা হয় উৎপাদনের চারিটি উপকরণের মধ্যে। জমি, মূলধন, শ্রম ও ব্যবস্থাপনা—এই চারিটি উপকরণের মধ্যে জাতীয় আয় বণ্টিত হয়। জমির জন্য ইহার মালিক যে আয় উপার্জন করেন, তাহা হইতেছে খাজনা। মূলধনের মালিক

তাহার মূলধন ধার দিবার মূল্য হিসাবে সুদ উপার্জন করেন। শ্রমের মালিক শ্রমিক নিজেই, এবং শ্রমজনিত যে আয় উপার্জিত হয় তাহা হইতেছে মজুরি। ব্যবস্থাপক নিজের ব্যবস্থাপনার গুণে মুনাফা বা লাভ অর্জন করেন।

নিম্নের চিত্রে উপাদানের আয় (factor-earnings) দেখানো হইতেছে—



৫নং চিত্র

বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বণ্টিত হইবে, তাহা সংশ্লিষ্ট উপকরণের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। অধ্যাপক মার্শালের মতে কোন উপাদানের যোগান যদি স্থির ধরিয়া লওয়া যায়, তবে ইহার আয় নির্ভর করে ইহার জন্য উৎপাদকের চাহিদার উপর। উৎপাদনের উপাদানের জন্য চাহিদা নির্ভর করে সেই উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তির উপর। এই তত্ত্বানুযায়ী প্রত্যেক উপাদান ইহার প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্যের সমান মজুরি পাইবে। ধরা যাক্, কোন কারখানায় ১০ জন শ্রমিক কোন জিনিসের ২০ ইউনিট তৈয়ার করে। ইহার পর যদি ১১ জন শ্রমিক সেই কারখানায় কাজ করে, তবে উৎপাদন হয় ২২ ইউনিট। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন হইতেছে ২ ইউনিট। এই ইউনিটের যাহা দাম হইবে, তাহাই হইবে সেই শ্রমিকের মজুরি। মার্শালের এই তত্ত্বটি উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে এই ধারণার উপর ভিত্তিশীল। বাস্তবে এই তত্ত্ব অনুযায়ী উপাদানের মজুরি নির্ধারিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে কোন্ উপাদানের কত আয় হইবে, তাহা সংশ্লিষ্ট উপাদানের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। যদি শ্রমের যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশী হয়, তবে ইহার মজুরি বেশী হয়; যদি চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশী হয়, তবে আয় বা মজুরি কম হয়; সুদ নির্ধারণ করিবার সময় আমরা দেখি মূলধনের চাহিদা এবং যোগানের উপর সুদ নির্ভর করে। খাজনা নিরূপণের ক্ষেত্রেও জমির চাহিদা ও যোগানই খাজনা নিরূপণ করে।

জমি (Land)ঃ জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ হইতেছে উৎপাদনের একটি বিশিষ্ট উপাদান। জমি বলিতে সমুদয় প্রাকৃতিক সম্পদ বুঝায়। **যাহা প্রাকৃতিক দান এবং মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট নয়, তাহাই জমি।** জমি হইতেছে উৎপাদনের পক্ষে একটি আদিম উপকরণ (an original factor)।

জমির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Land)—উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে আমরা জমির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাই। (১) উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে চাষবাসের পক্ষে উপযোগী জমির পরিমাণ সমগ্র দেশে সীমাবদ্ধ (Supply of land is fixed)। মানুষ নিজের ইচ্ছায় মোট জমির পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। কিন্তু উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণগুলির যোগান সর্বদা সীমাবদ্ধ নয়। (২) জমির উৎপাদন খরচ নাই (Land has no cost of production)। জমি হইতেছে প্রকৃতির সম্পদ। মানুষ ইহা সৃষ্টি করে নাই। এই প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করিয়াই মানুষ ইহার সাহায্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করে। প্রাকৃতিক সম্পদগুলি—যেমন, জমির উর্বরতা, জলবায়ু প্রভৃতির উপর মানুষের হাত নাই। (৩) জমিকে স্থানান্তরিত করা যায় না (Land is immovable)। একটি জমি যতই উর্বরা অথবা যতই অনুর্বরা হউক না কেন, ইহাকে এক জায়গা হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা যায় না। তবে জমির মালিকানা-স্বত্ব হস্তান্তরিত করা যায়। জমির গতিশীলতা নাই। (৪) সমগ্র দেশের পক্ষে জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকিলে কোনও বিশেষ শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা খামারের পক্ষে জমির বিকল্প ব্যবহার আছে এবং সেইজন্য ইহার যোগান উক্ত প্রতিষ্ঠান বা খামারের কাছে পরিবর্তনশীল। জমির বিকল্প আয় (Transfer earnings) খাজনাকে প্রভাবিত করে। (৫) ভূমির উর্বরতা সর্বদা সমান নহে। জমির বিভিন্ন জাতীয় (heterogeneous) হইতে পারে। আমাদের দেশেই আমরা বিভিন্ন জাতীয় জমি দেখিতে পাই। পশ্চিমবঙ্গে জমি যত উর্বরা, রাজস্থানে জমি তত উর্বরা নয়। জমির অবস্থানের তারতম্য এবং জমির উৎপাদনী শক্তির তারতম্য খাজনা তত্ত্বকে বিশেষ প্রভাবিত করিয়াছে। (৬) জমির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান বিধি (Law of Diminishing Returns) বিশেষভাবে কার্যকর হয়। জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকার দরুন জমির মধ্যে যদি আমরা কোন পরিবর্তনীয় (variable) উপাদান প্রয়োগ করি, তবে যে হারে উৎপাদন-খরচ বাড়ে সেই হারে উৎপাদন বাড়ে না। তখনই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয়।

জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ

জমির উৎপাদন খরচ নাই

জমিকে স্থানান্তরিত করা যায় না

জমির বিকল্প আয় আছে এবং একটি বিশেষ শিল্পের পক্ষে ইহার যোগান সীমিত থাকে না

জমির বিভিন্ন জাতীয় হইতে পারে এবং ইহার উর্বরতা সর্বত্র সমান নাও হইতে পারে

জমি ও মূলধনের মধ্যে পার্থক্য—মূলধন ও জমির মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। মূলধন মানুষের পরিশ্রমে তৈয়ারী, কিন্তু, জমি একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। জমির যোগান সীমাবদ্ধ, কিন্তু মূলধনের যোগান দীর্ঘকালীন সময়ে পরিবর্তনশীল। অবশ্য স্বল্পকালে মূলধনের যোগান সাময়িক ভাবে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে। এই ধারণা হইতেই অধ্যাপক মার্শাল আধা-খাজনা (Quasi-rent) তত্ত্বটির অবতারণা করিয়াছেন।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Diminishing Returns)—এই নিয়মটি বিশেষভাবে কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করা হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে আমরা যত বেশী মূলধন অথবা শ্রমিক নিয়োগ করি, জমিতে উৎপাদন ঠিক সেই পরিমাণে বাড়ে না, অবশ্য যদি আমরা ধরিয়া লই যে ইতিমধ্যে কোন উপকরণেরই উৎপাদিকা-শক্তির পরিবর্তন হয় নাই। দ্বিগুণ পরিমাণ শ্রম এবং মূলধন দিয়া চাষ করিলে প্রথমে হয়ত উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বিগুণ হইতে পারে কিন্তু তিনগুণ অথবা চারগুণ শ্রম এবং মূলধন দিয়া চাষ করিলে উৎপাদনের তিনগুণ অথবা চারগুণ বৃদ্ধি হইবে না। একটি উদাহরণের সাহায্যে এই নিয়মটি বুঝানো যাইতে পারে।

ধরা যাক্, প্রতি বিঘা জমিতে নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিক নির্দিষ্ট পরিমাণে মূলধনসহ (যথা, লাঙ্গল, বীজ, সার প্রভৃতি) ধান উৎপাদনের প্রচেষ্টা চালাইতেছে, তখন নিম্নলিখিতভাবে উৎপাদনের পরিবর্তন হইতে পারে।

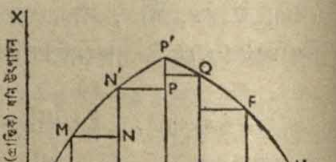
শ্রমিকের সংখ্যা (মূলধন সহ)	উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ (কুইন্টালে)	শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টালে)	শ্রমিক পিছু গড় উৎপাদন (কুইন্টালে)
১	২০	—	২০
২	৪৬	২৬	২৩
৩	৭২	২৬	২৪
৪	৯৬	২৪	২৪
৫	১১০	১৪	২২
৬	১২০	১০	২০
৭	১২৬	৬	১৮
৮	১২৮	২	১৬
৯	১২৬	—২	১৪

উপরের উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে, প্রথম দুইজন পর্যন্ত শ্রমিক নিযুক্ত হইলে মোট উৎপাদন, প্রান্তিক উৎপাদন এবং শ্রমিকপিছু গড় উৎপাদনের হার বাড়িতেছে। তৃতীয় শ্রমিক নিযুক্ত হইলে প্রান্তিক উৎপাদন স্থির থাকিতেছে। দুইজন পর্যন্ত শ্রমিক নিযুক্ত হইলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধি (Law of Increasing Returns) কার্যকর হইতেছে। দ্বিতীয় শ্রমিকের পর তৃতীয় শ্রমিক নিযুক্ত হইবার পর প্রান্তিক উৎপাদন স্থির আছে এবং গড় উৎপাদন সামান্য বাড়িয়াছে। চতুর্থ শ্রমিক নিযুক্ত হইবার পর হইতে প্রান্তিক উৎপাদনের হার ক্রমশঃ কমিতেছে। তৃতীয় শ্রমিকের পর চতুর্থ শ্রমিক নিযুক্ত হইলে গড় উৎপাদন স্থির থাকিলেও প্রান্তিক উৎপাদন কম

হইয়াছে। এইভাবে পর পর যতই শ্রমিক নিযুক্ত হইতেছে, প্রান্তিক উৎপাদন এবং উৎপাদন ততই কমিতেছে। ইহাই হইতেছে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Returns)। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে যখন কোন জিনিস উৎপাদন করিবার জন্য একাধিক উপকরণের যোগান বাড়াইয়া দেওয়া হয় অথচ একটি নির্দিষ্ট উপকরণ স্থির থাকে (এক্ষেত্রে জমি), তখন উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রথমে কিছু বাড়িলেও পরে কমিয়া যায়। উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে প্রতি ইউনিট উৎপাদন খরচ বাড়িতে থাকে। সেজন্য ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধি কার্যকর হইলে আমরা ক্রমবর্ধমান খরচ দেখিতে পাই।

নিম্নে প্রদত্ত চিত্রের সাহায্যে এই নিয়মটি বুঝানো যাইতে পারে।

এই চিত্রে OY রেখা দ্বারা শ্রমের পরিমাণ এবং OX রেখা দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ সূচিত হইতেছে। OA হইতে AB পরিমাণ শ্রম বাড়াইয়া অতিরিক্ত উৎপাদন হইতেছে NN´ পরিমাণ এবং মোট উৎপাদন হইতেছে BN´ পরিমাণ। আবার শ্রমের পরিমাণ OC পর্যন্ত বাড়াইলে অতিরিক্ত উৎপাদন হইতেছে PP´ পরিমাণ।



৬নং চিত্র

কিন্তু ইহার পর শ্রমিকের পরিমাণ আরও বাড়াইলে প্রান্তিক উৎপাদনের হার আরও কমিয়া যাইতেছে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি এই ধারণার উপর ভিত্তিশীল যে অন্যান্য অবস্থার কোন পরিবর্তন হইলে এই নিয়মটি না-ও কার্যকর হইতে পারে। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষের ব্যবস্থা করিলে উৎপাদন না কমিয়া হয়ত বাড়িয়া যাইতে পারে। যেমন, ট্র্যাক্টরের সাহায্যে চাষ করিলে কৃষি-ক্ষেত্রের উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি কৃষিক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য হয় এই কারণে যে জমির যোগান সীমাবদ্ধ। যখন উৎপাদনের কোন একটি উপাদানের যোগান অন্যান্য উপাদানগুলির তুলনায় সীমাবদ্ধ থাকে, তখন ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি কার্যকর হয়। কিন্তু এইজন্য যে এই নিয়মটি শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না, তাহা নহে। বিশেষ অবস্থায় সাময়িকভাবে শিল্পক্ষেত্রেও এই নিয়মটি কার্যকর হয়। ধরা যাক্, কোন শিল্পে হঠাৎ উৎপাদন বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, অথচ, প্রয়োজনীয় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নূতন যন্ত্রপাতি বসানো সম্ভবপর নয়, তখন পুরাতন যন্ত্রপাতির সাহায্যেই যদি অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়, তবে ক্রমহ্রাসমান উপাদনের নিয়মটি কার্যকর হইতে পারে। কিন্তু

ইহা একটি সাময়িক ব্যাপার মাত্র। প্রকৃতপক্ষে শিল্পক্ষেত্রে এই অবস্থা বরাবর থাকে না। সেইজন্য শিল্পক্ষেত্র হইতে কৃষিক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়।

মাছ ধরা এবং খনিজ সম্পদ আহরণেও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধি কার্যকর হইতে পারে। কয়লা উত্তোলনকারী যতই কয়লা খনির ভিতর যাইবে ততই উত্তোলনের খরচ এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তাবিধানের খরচ বাড়িয়া যাইবে। আবার মাছ ধরার জন্য কেহ যতই নদী অথবা সমুদ্রের গভীরে যাইবে ততই মাছ ধরার খরচ বাড়িয়া যাইবে।

পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম (Law of Variable Proportions)—আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণ শুধু ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মতে উৎপাদনের নিয়ম হইতেছে পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যদি কোন উপাদানের যোগান সীমিত থাকে, এবং ঐ উপাদানটির সহিত অন্যান্য উপাদান পরিবর্তিত করিয়া উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়, তবে উৎপাদন-ব্যবস্থা এমন একটি পর্যায়ে আসিবে যখন উৎপাদন-হার ক্রমেই কমিতে থাকিবে। উৎপাদনক্ষেত্রে কোন কোন উপাদানের যোগান সীমিত। সুতরাং কোন উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপাদন বাড়িবে কিনা অথবা বাড়িলেও কি অনুপাতে বাড়িবে তাহা যে উপাদানগুলিকে উৎপাদনে প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেইগুলির যোগান এবং উৎপাদনী-শক্তির উপর নির্ভর করে। কখনও হয়ত উৎপাদন-বৃদ্ধির হার খুব বেশী হইতে পারে। তখন ইহাকে আমরা **ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম** (Law of Increasing Returns) বলি। আবার কখনও হয়ত উৎপাদন-বৃদ্ধির হার সাময়িকভাবে স্থির থাকিতে পারে। তখন ইহাকে আমরা **অপরিবর্তিত উৎপাদন বৃদ্ধির নিয়ম** (Law of Constant Returns) বলি। এই ক্ষেত্রে যে হারে খরচের পরিমাণ বাড়ে সেই হারে উৎপাদনও বাড়ে। যদি উৎপাদন-বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমিতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে কোনও একটি উপাদানের পরিমাণ স্থির থাকার দরুন অন্য উপাদানের পরিমাণ বাড়াইবার সময় উৎপাদন-বৃদ্ধির অনুপাত কমিয়া যাইতেছে।

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটিকে পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মের একটি বিশেষ পর্যায় বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। যেহেতু সব উপাদানের যোগানই অল্প-বিস্তর সীমিত, সেজন্য শ্রম, মূলধন, সংগঠন ইত্যাদির ব্যবহার ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে এমন একটি সময় আসিবে যখন কোন-না-কোন উপাদান স্থির থাকিবে। সেই সময়ে ক্রমহ্রাসমান উপাদানের নিয়মটি কার্যকর হইবে। সুতরাং শুধু জমি নয়, উৎপাদনে যে কোন উপাদানের পরিমাণ যদি সাময়িকভাবে স্থির থাকে এবং সেই সময়ে অন্যান্য উপাদানগুলির পরিমাণ যদি স্থির না থাকে, তবেই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি কার্যকর হইবে। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি এই কারণেই উৎপাদনের সকল বিভাগে প্রযোজ্য।

এখানে আমরা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মের সহিত ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটির পার্থক্য দেখিতে পাই। ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটি মূলত নির্ভর করে উপাদানগুলির উৎপাদনী দক্ষতার (Productive efficiency) উপর। উপাদানের দক্ষতা বাড়িলেই যে উৎপাদন বাড়িবে, ইহা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটি অভিজ্ঞতা। এই ঘটনা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সর্বদাই স্বীকৃত। কিন্তু, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটির মূল কারণ হইল একটি উপাদানের সীমিত যোগান এবং অপর উপাদানগুলির পরিবর্তনীয় যোগান থাকিলে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমিয়া আসিবে ; তাহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মের সহিত ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মের পার্থক্য

জমির উৎপাদনী-শক্তি (Productivity of Land)—অনেকে মনে করেন জমির উৎপাদনী-শক্তি প্রকৃতিদত্ত দান। রিকার্ডো মনে করিতেন জমির একটি "আদিম ও অবিনশ্বর ক্ষমতা" (original and indestructible power) আছে। কিন্তু এই ধারণা ভুল। আদিম ক্ষমতা বলিতে কি বুঝায় তাহা স্পষ্ট নয়। মানুষ সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া, উৎকৃষ্ট সার ব্যবহার করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে জমির উর্বরতা বাড়াইতে থাকে। জমি কর্ষণ না করিলে কোন কিছু উৎপাদন করাও সম্ভবপর নহে। জমি মাত্রেই যে উর্বর হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আবার বর্তমান আণবিক যুগে কোন জমিকেই আমরা অবিনশ্বর বলিতে পারি না। হাইড্রোজেন বোমার সাহায্যে জমি নষ্ট করিয়া ফেলা অসম্ভব নহে। সুতরাং বিজ্ঞানের যুগে জমির আদিম ও অবিনশ্বর ক্ষমতা আছে, এই কথা বলা অবান্তর।

জমির উৎপাদনী-শক্তি একদিকে যেমন প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, অপরদিকে ইহা মানুষের প্রচেষ্টার উপরেও নির্ভর করে। একটি জমি হয়ত প্রকৃতির দানে বিশেষ উর্বরা হইতে পারে। কিন্তু মানুষ চেষ্টা করিয়াও ইহার উর্বরতা বাড়াইতে পারে। সব জমির উৎপাদনী-শক্তি সমান নয়। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়, কোন জমির বাড়তি উৎপাদনী-শক্তি মানুষের চেষ্টায় সম্ভবপর হয়, প্রকৃতির অযাচিত দানে নহে। জমির উর্বরতা বাড়াইয়া মানুষ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিতে পারে এবং সেই চেষ্টায় সফল হইতে পারে।

অনুন্নত দেশগুলিতে যেমন, ভারতে অনেক সময়ে আমরা অনেক পতিত বা অনাবাদী জমি দেখিতে পাই। জমি হইতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে এই অনাবাদী বা পতিত জমিগুলিতে চাষবাসের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং জমির উৎপাদনী-শক্তি বাড়াইবার সমস্যা প্রকৃতপক্ষে জমির অভাব অথবা ইহার উৎপাদনী-শক্তির অভাব নয়। প্রশ্ন হইল ইহার উৎপাদনী-শক্তি বাড়াইবার সমস্যা, এবং এইজন্য প্রয়োজন কর্মদক্ষ শ্রমশক্তি এবং উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের।

কিভাবে জমির উৎপাদনী-শক্তি বাড়ানো যায়

ভারতের মত দেশে জমির উৎপাদনী-শক্তি বাড়াইবার জন্য জমিতে উপযুক্ত

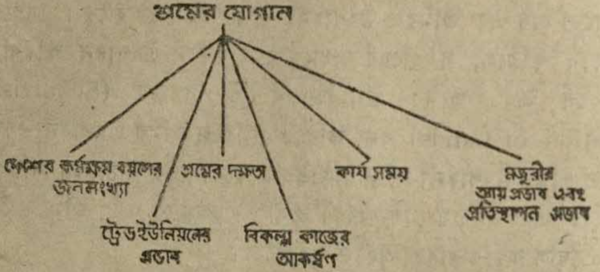
পরিমাণে সার-প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, পর্যাপ্ত পরিমাণে জলসেচের ব্যবস্থা করিতে পারিলেও জমির উৎপাদনী-শক্তি বাড়ানো যায়। তৃতীয়ত, একাধিক শস্য ফলানো এবং পালটি শস্য উৎপাদনের (rotation of crops) চালু করিলে ব্যবস্থা এবং সেই উদ্দেশ্যে উন্নতধরনের বীজ-সরবরাহের ব্যবস্থা রাখিতে পারিলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো যায় এবং জমিরও উৎপাদনী-শক্তি ইহাতে বাড়ে। সর্বশেষে, ভাল ট্র্যাক্টর দিয়া চাষ করিলে, সমবায়ের মাধ্যমে বৃহদায়তনে উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে এবং জমির উপবিভাজন ও বিখণ্ডন (Subdivision and Fragmentation of Lands) বন্ধ করিতে পারিলে জমির উৎপাদনী-শক্তি বাড়িয়া যায়। ভারতে জমির উৎপাদনী-শক্তি বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে জলসেচের ব্যবস্থা এবং সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং জমিতে উন্নতধরনের বীজ ও সার প্রয়োগ করার ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

জমির উৎপাদনী-শক্তি বাড়াইবার ব্যবস্থা

শ্রমিক সরবরাহের উপাদান (Factors governing supply of Labour) —অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী যাহারা বেতন অথবা মজুরির বিনিময়ে কাজ করে তাহারাই শ্রমিক; তবে সাধারণত শ্রমিক বলিতে যাহারা শুধু শারীরিক পরিশ্রম করে তাহাদেরই বুঝায়। শ্রমিক সরবরাহ অনেকগুলি উৎপাদনের উপর নির্ভর করে; যথা,—জনসংখ্যা, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান, শ্রমিদের উপর শ্রমিক-সংঘের (Trade Union) প্রভাব, শ্রমিকদের গতিশীলতা (Mobility) বা একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার প্রবণতা ইত্যাদি। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান মূলত শ্রমিকের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য যে সকল উপাদান শ্রমিক সরবরাহকে প্রভাবিত করে সেগুলি কোন-না-কোন ভাবে শ্রমিকের কর্মদক্ষতাকে প্রভাবিত করে অথবা শ্রমিকের কর্মদক্ষতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং শ্রমিক সরবরাহ মূলত শ্রমিকের সংখ্যা এবং শ্রমিকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু ইহা ছাড়াও শ্রমিক সরবরাহের অনেকগুলি কারণ আছে। মনে রাখিতে হইবে যে শ্রমিক সরবরাহ বলিতে শ্রমিকের সংখ্যা বুঝায় না, শ্রমিকগণ প্রকৃতপক্ষে কত ঘণ্টা কাজ করিতেছে তাহাই বুঝায়। অল্পসংখ্যক শ্রমিক যদি অনেকক্ষণ ধরিয়া কাজ করে, তবে বুঝিতে হইবে শ্রমিক সরবরাহ বেশী। আবার বহুসংখ্যক শ্রমিক যদি অল্পক্ষণ ধরিয়া কাজ করে তবে বুঝিতে হইবে শ্রমিক সরবরাহ বেশী নয়। শ্রমিক সরবরাহ নিম্নলিখিত উপাদানগুলির উপর নির্ভর করে। (১) দেশের কর্মক্ষম বয়সের জনসংখ্যা, (২) ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাব, (৩) বিকল্প কাজের জন্য শ্রমিকদের আকর্ষণ, (৪) কার্যসময় (Working hours) এবং (৫) মজুরি বৃদ্ধির আয়-প্রভাব (Income effect) ও প্রতিস্থাপন প্রভাব (Substitution effect)। প্রথমে মজুরী বাড়িলে কোন শ্রমিক হয়ত বেশী কাজ করিতে উৎসাহ বোধ করে। কিন্তু অবশেষে এমন একটি অবস্থা আসে যখন বেশী মজুরি পাইলেও শ্রমিকগণ আর কাজ

শ্রমিক সরবরাহের কারণ

করিতে চাহে না। ইহা হইতেছে মজুরি বৃদ্ধির আয়-প্রভাব। আবার এমন দেখা যায়, মজুরি বৃদ্ধি হইলে শ্রমিকগণ অধিক পরিমাণে বিশ্রাম লওয়া অপেক্ষা অধিক কাজ করাই পছন্দ করে। তখন শ্রমিক সরবরাহ বাড়িয়া যায়। ইহা হইতেছে মজুরি বৃদ্ধির প্রতিস্থাপন প্রভাব। শ্রমিক সরবরাহের উপাদানগুলি নিম্নের চিত্রে দেখানো হইয়াছে।



৭নং চিত্র

দক্ষ শ্রমিক হয়ত দুইজন সাধারণ শ্রমিকের সমান উৎপাদন করে। এক্ষেত্রে শ্রমিকের একজন সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকিলেও শ্রমিকের দক্ষতা বাড়িলে শ্রমিক সরবরাহ বাড়িবে।

শ্রমিকদের দক্ষতা (Efficiency of Labour)—শ্রমিকের দক্ষতা অনেকগুলি উপাদানের উপর নির্ভরশীল ; যেমন, জলবায়ু, শারীরিক পটুতা, সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, কাজের পরিবেশ, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক, শ্রমিকদের কাজ কামাই করার অভ্যাস, শ্রমিকের মজুরি এবং কাজের সময়, কাজের প্রকৃতি, চাকরীর নিরাপত্তা, শ্রমিকদের কাজ করিবার প্রবৃত্তি প্রভৃতি। এই উপাদানগুলি যখন শ্রমিকদের অনুকূল থাকে তখন তাহাদের দক্ষতা বাড়ে এবং যখন প্রতিকূল থাকে, তখন তাহাদের দক্ষতা কমে। যদি শ্রমিকগণ কারিগরি শিক্ষার সুযোগ পায়, মালিকগণ যদি শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ মিটাইয়া প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক রাখিতে সচেষ্ট হন, কাজের পরিবেশ যদি শ্রমিকদের পক্ষে অনুকূল হয় এবং শ্রমিকসংঘ যদি শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিবিধানের চেষ্টা করে তবে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বাড়ে। ভারতীয় শ্রমিকদের দক্ষতা কম হইবার মূল কারণ হইতেছে এই যে দক্ষতা নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলির অধিকাংশই ভারতের পক্ষে প্রতিকূল।

শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বাড়াইতে হইলে যথোপযুক্ত সরকারী উদ্যোগ ও কর্তৃত্বে এবং মালিকশ্রেণীর উপযুক্ত সহযোগিতায় নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা উচিত—(১) নিরক্ষরতা দূর করিবার এবং কারিগরি শিক্ষা প্রসার করিবার ব্যবস্থা করা যাহাতে শ্রমিকগণ সুশিক্ষিত হইয়া নিজেদের দক্ষতা বাড়াইতে পারে ; (২) শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত মজুরী প্রদানের ব্যবস্থা করা ; (৩) কাজের উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করা ;

(৪) সমাজবীমার ব্যবস্থা করিয়া শ্রমিকদের চাকররি নিরাপত্তা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দান এবং ভবিষ্যতে কর্মোন্নতির নিশ্চয়তা সৃষ্টি করিয়া শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বাড়াইবার চেষ্টা করা; (৫) শ্রমিকদের বাসস্থান ব্যবস্থার উন্নতি করা, (৬) শ্রমিকদের কাজে কামাই করিবার অভ্যাস দূর করিবার জন্য কঠোরভাবে শ্রমিক আইন কার্যকরী করা, (৭) শ্রমিকের বোনাস প্রদান এবং মুনাফার অংশ প্রদানের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন করিবার কাজে উৎসাহিত করা; (৮) শ্রমিকদের স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য প্রত্যেক কারখানায় ব্যায়ামাগার ও খেলাধূলার বন্দোবস্ত করা; (৯) শ্রমিক-সংঘগুলিকে আরও উন্নত করিয়া পারস্পরিক আপস-মীমাংসার মাধ্যমে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সব বিরোধের মীমাংসা করিয়া ফেলা এবং (১০) প্রাকৃতিক আবহাওয়া অনুযায়ী কারখানায় শ্রমিকদের কাজের সময়ের পরিবর্তন করা। উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হইলে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা অনেক বাড়িয়া যাইবে।

মূলধনের সংজ্ঞা (Definition of Capital)—ব্যবসায়-বাণিজ্যে মূলধন কথাটি বিশেষ প্রচলিত। মূলধন বলিতে আমরা সাধারণত বুঝি সেই টাকা যাহার সাহায্যে ব্যবসায় চালানো যায়। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে "মূলধন" কথাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গেলেই যে মূলধনের বৃদ্ধি হয় তাহা নহে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, ভারতবর্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে রকম ভাবে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছিল সেই অনুপাতে মূলধনের বৃদ্ধি হয় নাই। মূলধন বলিতে অপরদিকে আমরা যন্ত্রপাতি অথবা উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম বুঝি। অর্থশাস্ত্রে মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ বা "produced means of production" বলা হয়। মূলধন একটি মৌলিক (original) উৎপাদন নহে; এই উপাদানটিকে অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে উৎপাদিত করিতে হয়। মূলধন সরাসরি ভোগের কাজে ব্যবহৃত হয় না। মূলধনের সাহায্যে ভোগ-সামগ্রী উৎপাদিত হয়। আবার একই জিনিস কোন কোন ক্ষেত্রে মূলধন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভোগ-সামগ্রী রূপে বিবেচিত হইতে পারে। কয়লার সাহায্যে যখন বাড়িতে রান্নার কাজ করা হয় তখন ইহা একটি ভোগ-সামগ্রী। কিন্তু কয়লার সাহায্যে যখন একটি কারখানার চুল্লীকে কার্যকরী করা হয় এবং ইহার সাহায্যে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা হয়, তখন কয়লা মূলধনের পর্যায়ে পড়ে।

মূলধনের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

মূলধনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে চারিটি। যথা, (১) মূলধন অতীত শ্রমের ফল (result of past labour), (২) মূলধন সঞ্চয়ের ফল (result of saving), (৩) মূলধন উৎপাদনশীল (productive) এবং (৪) মূলধন সম্ভাব্য (prospective)। কোন সম্পদ মূলধনের পর্যায়ে পড়ে কিনা তাহা নির্ভর করে কি উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যবহৃত হইতেছে তাহার উপর; কোন ব্যক্তির দিক হইতে বিবেচনা করিলে যে সম্পদ হইতেই কোন-না-কোন ভাবে তাহার আয় অর্জিত হয়, সেই সম্পদকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে মূলধন বলা যাইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, মূলধন যদিও সম্পদ হিসাবে

বিবেচিত হইতে পারে, সম্পদ হইলেই যে ইহা মূলধন হিসাবে বিবেচিত হইবে তাহা নহে।

টাকা মূলধন কিনা

টাকার সাহায্যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভোগ-সামগ্রী ক্রয় করি ততক্ষণ পর্যন্ত টাকা উৎপাদনের কোন কাজে লাগে না। যখন টাকার সাহায্যে আমরা উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ (যথা শ্রমশক্তি, জমি ইত্যাদি) ক্রয় করি এবং ইহার সাহায্যে মূলধন-সামগ্রী ক্রয় করি, তখন ইহা মূলধন বৃদ্ধির সহায়ক হয়। কিন্তু এজন্য টাকাকে মূলধন বলা চলে না। টাকার সাহায্যে মূলধনের অভাব যদি মিটাইতে পারি, অর্থাৎ যে মূলধন ব্যবসায়ের জন্য দরকার, তাহা যদি অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায়, তবে সেই উদ্দেশ্যে আমাদের যে টাকার প্রয়োজন তাহাকে **আর্থিক মূলধন** (Money capital) অ্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

মূলধন ও ধনের পার্থক্য

মূলধন ও ধন (Capital and Wealth)—মূলধন ও ধনের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে, **সব মূলধন ধন, কিন্তু সব ধনই মূলধন নহে**। যে ধনসম্পদ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভাব পূরণের জন্য ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়, সেই ধন মূলধন নহে, কিন্তু ধনের যে অংশ পুনরুৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, সেই অংশকে মূলধন বলা চলে। সুতরাং কোন সম্পদ প্রকৃতই মূলধন কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে কি কাজে সম্পদটিকে ব্যবহার করা হইতেছে। ধরা যাক্, একটি বাড়িতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হইল—ইহা নিশ্চয়ই মূলধন নহে। কিন্তু, যদি সেই বাড়িতে কোন স্কুল প্রতিষ্ঠা না করিয়া একটি কারখানা স্থাপন করা হয়, তবে বাড়িটি মূলধন হিসাবে পরিগণিত হইবে। **মূলধন হইতেছে উৎপাদনের জন্য একটি উপকরণ** ("Capital is a produced means of production")।

মূলধন ও জমির মধ্যে পার্থক্য

মূলধন ও জমি (Capital and Land)—মূলধন ও জমির মধ্যে কতিপয় পার্থক্য আছে। তবে মূলধন যেমন একটি সম্পদ, জমিও সেই প্রকার একটি সম্পদ। মূলধন যেমন অন্যান্য জিনিস তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়, জমির সাহায্যেও আমরা অনুরূপ বিভিন্ন জিনিস তৈরি করি। মূলধনের ন্যায় জমিও ক্ষয়িষ্ণু। মূলধনের ব্যবহার চলিতে থাকিলে ইহার উৎপাদনী-শক্তি একদিন না একদিন কমিয়া আসে; সেই প্রকার জমিরও ব্যবহার চলিতে থাকিলে একদিন না একদিন ইহার উর্বরতা কমিয়া আসে। তবে জমিকে বারবার ব্যবহার করিলেও কোনদিনই ইহার উর্বরতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। কিন্তু মূলধন যদি বারবার ব্যবহার করা হয়, তবে ইহা হয়তো নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। জমি ও মূলধনের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। প্রথমত, জমি হইতেছে প্রকৃতির একটি দান, ইহা মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট নহে। কিন্তু মূলধন হইতেছে মানুষের সৃষ্ট একটি উপকরণ। দ্বিতীয়ত, সমগ্র দেশের দিক হইতে চিন্তা করিলে **জমির যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক** (Completely

inelastic) অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেই জমির সামগ্রিক যোগান বাড়ানো অথবা কমানো যায় না। কিন্তু **মূলধনের যোগান অপরিবর্তনীয় নহে**। মানুষ নিজের চেষ্টায় মূলধনের যোগান বাড়াইতে পারে। জমি ও মূলধনের মধ্যে এই পার্থক্য থাকার দরুন জমিকে উৎপাদনের একটি পৃথক উপকরণ হিসাবে ধরা হয়। অবশ্য যদিও আমরা সামগ্রিকভাবে জমির উৎপাদন বাড়াইতে পারি না, তবু উপযুক্ত জলসেচ ব্যবস্থা ও সার-প্রয়োগ প্রভৃতির সাহায্যে জমির উৎপাদনী-শক্তি বাড়ানো যায়। জমির এই বর্ধিত উৎপাদনী-শক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে মূলধন হিসাবে বিবেচিত হয়।

আবার, **মূলধন হইতেছে এমন একটি উপকরণ, যাহা স্থানান্তরযোগ্য**। কিন্তু জমি স্থানান্তরযোগ্য উপকরণ নয়। তবে জমির মালিকানা স্থানান্তরিত হইতে পারে। সর্বশেষে, মূলধন হইতে আমরা যে আয় পাই, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একপ্রকার (uniform); কিন্তু জমি হইতে প্রাপ্ত খাজনা সর্বদা একপ্রকার নয়। জমির প্রকারভেদে অথবা উৎপাদন খরচের তারতম্য ভেদে খাজনারও তারতম্য ঘটে।

বিভিন্ন ধরনের মূলধন (Different Types of Capital)—অনেক সময় মূলধনকে বাস্তব মূলধন (Concrete or Real Capital), আর্থিক মূলধন (Money Capital) এবং ঋণ মূলধন (Loan Capital) এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। কারখানার বাড়িঘর, উৎপাদনের কাজ চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতিকে **বাস্তব মূলধন** বলা হয়। এই মূলধনকে ব্যবসায়ী মূলধনও (Trade Capital) বলা চলে। টাকা-কড়িকে যখন মূলধন হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তখন ইহাকে **আর্থিক মূলধন** বলা হয়। শেয়ার, বণ্ড, সরকারী ঋণপত্র প্রভৃতি ব্যক্তির দিক হইতে **ঋণ মূলধন**; কিন্তু সমাজের দিক হইতে ইহা মূলধন নহে। মূলধনকে সাধারণত দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি হইতেছে স্থায়ী বা স্থাবর মূলধন (Fixed Capital) এবং অপরটি হইতেছে চলতি বা অস্থাবর মূলধন (Circulating Capital)। যে সামগ্রী বহুদিন ধরিয়া এবং বারে বারে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায়, সেই সামগ্রীকে **স্থায়ী বা স্থাবর মূলধন** বলা হয়। যেমন—চরকা, তাঁত, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্থায়ী মূলধন। আবার উৎপাদন-কাজে মাত্র একবার ব্যবহার করা চলে এই রকম সামগ্রীকে **চলতি বা অস্থাবর মূলধন** বলা হয়। যেমন—তুলা হইতে সূতা তৈয়ারী করা হইলে সূতার সাহায্যে কাপড় তৈরি করা হয়। সূতা তৈয়ারী হইয়া গেলে তুলার আর অস্তিত্ব থাকে না। সেই তুলাকে আমরা চলতি বা অস্থাবর মূলধন বলিতে পারি। কিন্তু সূতা কাটিবার যন্ত্রটি একটি স্থায়ী মূলধন। মূলধনের আর একটি প্রকারভেদ আছে,—তাহা অনুযায়ী যখন কোন যন্ত্রপাতি মাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর উৎপাদন-কাজে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহাকে বিশিষ্ট মূলধন (Specialised or Sunk Capital) বলা

বাস্তব মূলধন, আর্থিক মূলধন এবং ঋণ মূলধন

স্থাবর ও অস্থাবর মূলধন

হয়। যেমন—লৌহ তৈয়ারী করিবার কারখানায় যে চুল্লী ব্যবহৃত হয় তাহা অন্য কোন শিল্পে ব্যবহার করা সম্ভব নহে। আবার যে সকল সামগ্রী শুধু একটি বিশেষ শ্রেণীর উৎপাদন-কাজে ব্যবহৃত না হইয়া অনেকগুলি জিনিসের উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে সেই সামগ্রীগুলিকে নির্বিশেষ বা ভাসমান মূলধন (Unspecialised or Floating Capital) বলা হয়।

বিশেষ মূলধন ও নির্বিশেষ মূলধন

মূলধনকে ভোগকারীর মূলধন (Consumer's Capital) এবং উৎপাদকের মূলধন (Producer's Capital), এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। বাসস্থান, পোশাক প্রভৃতি হইতেছে ভোগকারীর মূলধন; উৎপাদনের সময় লোকে এই জিনিসগুলি ভোগ করিয়া থাকে। যন্ত্রপাতি, কলকব্জা এবং অন্যান্য সরঞ্জাম হইতেছে উৎপাদকের মূলধন। ব্যক্তিগত মালিকানায় যে মূলধন থাকে তাহাকে ব্যক্তিগত মূলধন (Private Capital) বলা হয়। যে মূলধন জনসাধারণের যৌথ বা সামগ্রিক মালিকানায় থাকে, তাহাকে **যৌথ মূলধন** (Collective Capital) বলা হয়। আবার যে মূলধন জাতীয় সম্পত্তি বা সমগ্র জাতির সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাকে আমরা **জাতীয় মূলধন** (National Capital) বলিতে পারি। সমগ্র ব্যক্তিগত ও যৌথ মূলধনের সমষ্টিকেও জাতীয় মূলধন (Aggregate National Capital) বলা হয়।

ব্যক্তিগত, যৌথ এবং জাতীয় মূলধন

মূলধনের কাজ (Functions of Capital)—আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূলধনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলধনের দুইটি বিশেষ গুণ আছে; একটি হইতেছে ইহার বর্তমান উৎপাদনী-শক্তি (Productivity) এবং অপরটি হইতেছে ইহার ভবিষ্যৎ উৎপাদনী-শক্তি। মূলধন বিনিয়োগ করিলে বিনিয়োগকারী শুধু বর্তমানের জন্যই নহে, ভবিষ্যতের জন্যও মুনাফার আশা করিয়া থাকে। চিরাচরিত উৎপাদন-প্রথার পরিবর্তে বর্তমানে উন্নতধরনের উৎপাদন-প্রথা চালু হইয়াছে। গরু এবং লাঙ্গলের দ্বারা চাষে যতটা ফসল উৎপন্ন হয়, ভারী ট্র্যাক্টরের সাহায্যে চাষ করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ফসল উৎপন্ন করা যাইতে পারে। সুতরাং মূলধনের প্রথম এবং প্রধান কাজ হইতেছে উৎপাদনের বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। আধুনিক কালে বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা চালু করিয়া দেশের শিল্পোন্নয়ন অর্জন করার মধ্যে মূলধনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অধিক পরিমাণে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে করিতে শ্রমিকদেরও উৎপাদনী-শক্তি বাড়িয়া যায়। ইহাতে শুধু যে বৃহদায়তনে উৎপাদন করা সম্ভবপর তাহাই নহে, সামগ্রিক ভাবে উৎপাদনী-শক্তিও ইহাতে বাড়িয়া যায়। মূলধনের সাহায্যে সূক্ষ্মতরভাবে শ্রমবিভাগ করা সম্ভবপর।

মূলধন উৎপাদন-বৃদ্ধির এবং শ্রমবিভাগের সহায়ক

অস্থাবর মূলধন বিভিন্ন শিল্পে কাঁচা মাল সরবরাহ করিয়া থাকে। দৈনন্দিন

জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস আমরা অস্থাবর মূলধন হইতে পাইয়া থাকি। মূলধনের আর একটি কাজ হইতেছে উৎপাদন-পদ্ধতিকে প্রভাবিত করা, দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বিভিন্ন অভাব পুরণ করিবার জন্য সরাসরিভাবে কোন জিনিস উৎপাদন করিবার কাজে আত্মনিয়োগ না করিয়া আমরা প্রথমে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি উৎপাদন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণে আত্মনিয়োগ করিতে পারি। তাহা ছাড়া, উৎপাদিত জিনিসগুলি বাজারে বিক্রয় হইতে অনেক সময় দেরী হয়। কিন্তু এই সময়ে শ্রমিকদের মজুরি প্রদান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় বন্ধ রাখা যায় না। এইজন্য উৎপাদন-কার্য সর্বদা চালাইয়া যাইতে হয়। ইহা সম্ভবপর হয় যদি প্রচুর পরিমাণে মূলধন ব্যবসায়ে খাটানো হয়। সুতরাং মূলধনের যোগান থাকিলে উৎপাদন-ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে।

মূলধন উৎপাদন-ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখে

মূলধনের আর একটি বিশেষ কাজ হইতেছে অনুন্নত দেশগুলির আর্থিক উন্নতি সাধনে সহায়তা করা। উদাহরণস্বরূপ ভারতবর্ষের কথা ধরা যাক্। ভারতের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। কৃষকদের আয় খুব অল্প, কারণ চিরাচরিত পদ্ধতি অনুযায়ী উৎপাদন-কাজ চালাইয়া যাওয়ায় তাহাদের উৎপাদন খুব অল্প হয়। আধুনিক ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করিলে তাহাদের উৎপাদন এবং আয় বাড়িতে পারে। সুতরাং, কৃষকদের হাতে মূলধনের পরিমাণ বাড়িলেই তাহার আয়ের বৃদ্ধি হইবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে। দেশের দ্রুত শিল্পোন্নতি দ্রুত মূলধন বৃদ্ধির হারের উপর নির্ভর করে। যদি উৎপাদকের হাতে মূলধন মজুত থাকে, তবে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের যোগান সহজলভ্য হয়। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় করিতে হইলেও মূলধনের দরকার।

অনুন্নত দেশে মূলধনের বিশেষ ভূমিকা

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান সরবরাহে মূলধন সহায়ক

মূলধন বৃদ্ধি (Growth of Capital) – মূলধন বৃদ্ধি মূলত সঞ্চয় বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। সঞ্চয় বলিতে শুধু টাকা জমানো বুঝায় না। সঞ্চয় বলিতে আমরা সমাজে উৎপাদনের উপকরণগুলিকে কিছু পরিমাণে ভোগের কবল হইতে মুক্ত করিয়া বিনিয়োগের কাজে এবং মূলধন-সৃষ্টির কাজে নিয়োগ করাও বুঝি। মূলধন-সৃষ্টি সম্ভব হয় তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে। প্রাথমিক পর্যায়ে মূলধন-সৃষ্টির জন্য সঞ্চয়ের সৃষ্টি করা আবশ্যক। সঞ্চয় বলিতে সাধারণ অর্থে বুঝায় ভোগের নিবৃত্তি। সঞ্চয়ের সৃষ্টি দুইটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল। একটি হইতেছে সঞ্চয়কারীর সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা (will to save) এবং অপরটি হইতেছে সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা (power to save)। সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি সাধারণত নিম্নলিখিত কারণের উপর নির্ভর করে—(১) ভবিষ্যতের সংস্থান করিবার জন্য সাবধানী এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করিতে

মূলধনের বৃদ্ধি নির্ভর করে সঞ্চয়-বৃদ্ধির উপর

চাহেন। অবশ্য যাহারা কৃপণ, তাহারা সব সময় কিছু টাকা জমাইয়া রাখিতে চাহে। (২) নিজের আপনজনের প্রতি স্নেহ-ভালবাসাও মানুষকে সঞ্চয় করিবার প্রেরণা দেয়। পারিবারিক স্নেহ, ভালবাসা ও দূরদর্শিতা মানুষকে নিজের আয় হইতে কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য অনুপ্রাণিত করে। (৩) ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের লেন দেনের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে, এই ধারণা হইতে লোকে সঞ্চয় করে। (৪) যাহারা ব্যবসায়ী তাহাদের কিছু টাকা সর্বদাই সঞ্চিত রাখিতে হয়—যাহাতে ভবিষ্যতে কোন লাভজনক ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ আসিলে টাকার অভাব না হয়। তাহা ছাড়া, ফাট্‌কা-কারবারীদেরও নিজেদের ফাট্‌কাব্যবসা চালাইয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা সর্বদা সঞ্চিত রাখিতে হয়। (৫) উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সমাজের সম্মান প্রতিপত্তি লাভের দুর্বার আকর্ষণ হইতেও লোকে টাকা সঞ্চয় করিতে চায়। সমাজ সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াও লোকে নিজের আয় হইতে কম করিয়া ব্যয় করে। (৬) সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা প্রধানত নির্ভর করে সঞ্চয়কারীর আয়ের উপর। আয় অর্জিত হইলে লোকে প্রথমেই একান্ত প্রয়োজনীয় ভোগ-সামগ্রীগুলি ক্রয় করে এবং ইহার পর কিছু টাকা সঞ্চয় করে। (৭) যদি জনসাধারণ নির্ভয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাংক, বীমা-কোম্পানি, শেয়ার প্রভৃতিতে টাকা জমা রাখিতে পারে, তবে তাহাদের সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি বাড়ে। (৮) যদি ব্যাংকের সুদের হার বাড়িয়া যায়, তবে আমানতকারীর সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিও বাড়িয়া যায়। (৯) কর্মস্থানে শ্রমিকগণের জন্য যদি বাধ্যতামূলকভাবে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়, তবে সঞ্চয়ের পরিমাণও বাড়ে। যদি দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ব্যাংক-ব্যবস্থার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব (stability) থাকে, তবে লোকের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিও বাড়িয়া যায়। অনেক সময় দেশের ব্যাংকগুলি সুদের হার বাড়াইয়া জনসাধারণকে অধিক সঞ্চয় করিতে প্রেরণা দেয়। সরকার ভোগের উপর কর ধার্য করিয়া (Tax on Consumption) সঞ্চয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে পারেন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ভোগের নিবৃত্তি এবং সঞ্চয়-বৃদ্ধির জন্য Turnover Tax ধার্য করা হইয়াছে।

সঞ্চয় করিবার বিভিন্ন প্রবৃত্তি

সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা নির্ভর করে আয়ের উপর। যাঁহারা বড়লোক তাঁহারা যে পরিমাণ সঞ্চয় করিতে পারেন, গরীব লোকেরা সেই পরিমাণ সঞ্চয় করিতে পারেন না। শ্রমিকেরা বেশী সঞ্চয় করিতে পারেন না, কারণ তাঁহাদের মজুরি-হার সাধারণত অল্প থাকে। যাঁহারা গরীব, তাঁহাদের ভোগ করিবার প্রবণতা (Propensity to Consume) বেশী থাকে; কারণ তাঁহাদের যে পরিমাণ অভাব তাহা দূর করিবার মত আর্থিক সঙ্গতি তাঁহাদের থাকে না। কিন্তু যাঁহারা বড়লোক তাঁহাদের সঞ্চয় করিবার প্রবণতাও বেশী, ক্ষমতাও বেশী। **মূলধন সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে সঞ্চয় সৃষ্টির** (Creation of Savings) কথা বলা হইয়াছে। **মূলধন সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রয়োজন দেশের**

সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা

সমুদয় সঞ্চয়ের একত্রীকরণ (Mobilisation of Savings) **করা বা সংহতি-সাধন করা। তৃতীয় পর্যায়ে এই সঞ্চয়কে বিনিয়োগ** (Investment of Savings) **করিতে হয়।** সঞ্চয়কে যখন বিনিয়োগ করা হয়, তখনও মূলধনের বৃদ্ধি ঘটে। অনুন্নত দেশগুলিতে যে প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থা দেখিতে পাই, তাহার সমাধান করিতে পারিলেও অনেক টাকা বাঁচিয়া যায় এবং ইহাতে সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হয়। মূলধনের বৃদ্ধিতে শুধু ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি নহে, সরকারী সঞ্চয়-বৃদ্ধিরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সরকারও অপ্রয়োজনীয় এবং অনুৎপাদনমূলক ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াইতে পারেন। তাহা ছাড়া সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিও "মুনাফাও নহে, ক্ষতিও নহে" এই নীতি ("No Profit, No Loss Principle") পরিত্যাগ করিয়া কিছু উদ্বৃত্ত রাখিবার চেষ্টা করিতে পারে। তাহা হইলে কিছু পরিমাণে মূলধনের বৃদ্ধি হইবে।

সরকারের দিক হইতেও সঞ্চয়-বৃদ্ধির দরকার

মূলধন-বৃদ্ধি কি কি উপাদানের উপর নির্ভরশীল, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে পরিষ্কার হইবে।

মূলধন বৃদ্ধির কারণ

(Factors governing the accumulation of Capital)

(১) সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা (Power to save)
↓
আয়ের উপর নির্ভরশীল

(২) সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা (Will to save)
↓
- (ক) ভবিষ্যতের সংস্থান করিবার সাধনা
- (খ) পারিবারিক স্নেহ, ভালবাসা
- (গ) প্রতিষ্ঠার লোভ
- (ঘ) সমাজ সেবার ইচ্ছা
- (ঙ) কৃপণসুলভ সঞ্চয়ের ইচ্ছা
- (চ) ব্যবসায় লেনদেন চালাইবার ইচ্ছা
- (ছ) ফাটকাকারবার করিবার ইচ্ছা

(৩) সঞ্চয়ের সুযোগ-সুবিধা (Opportunities to save)
↓
- (ক) সরকারের স্থায়িত্ব
- (খ) উন্নত ব্যাংকের ব্যবস্থা
- (গ) বীমা-ব্যবস্থার উন্নয়ন
- (ঘ) প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা
- (ঙ) ব্যয় ভোগের উপর কর

ভারতবর্ষে মূলধনের অভাব কেন?—ভারতবর্ষে আমরা মূলধনের অভাব দেখিতে পাই। কিন্তু সঞ্চয় করিবার পিছনে মানুষের মনে যে প্রবৃত্তি থাকে, ভারতীয়গণের মধ্যে যে সেই প্রবৃত্তির অভাব আছে, তাহা নহে। কিন্তু ভারতীয়গণের গড়পড়তা আয় খুবই অল্প। ইহাতে তাহাদের সঞ্চয় করিবার ক্ষমতাও বেশী থাকে না। ভারতের জনসাধারণ বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যেমন বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। ইহাতে তাহাদের সঞ্চয় করিবার মত অর্থ খুবই অল্প থাকে। দ্বিতীয়ত, আমাদের গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবসায় সম্প্রসারিত না হওয়াও মূলধনের অভাব হইবার অন্যতম কারণ। কারণ, উন্নতধরনের ব্যাংক-ব্যবসায় না থাকায় লোকে বেশী সঞ্চয় করিতে চাহে না। ভারতে শ্রমিকদের উৎপাদনী-শক্তি অল্প বলিয়া দেশে উৎপাদন কম হয়; ইহাতে গড়পড়তা আয়ের পরিমাণই যে শুধু অল্প হয় তাহা নহে মূলধন বিনিয়োগের পথেও ইহাতে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত কারণে ভারতে আমরা মূলধনের অভাব দেখিতে পাই।

উৎপাদনের সংগঠন (Organisation of Production)—আধুনিক যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্রমেই জটিল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু জটিল হইলেও উৎপাদন-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালনা করা যায় যদি ইহাতে শ্রম-বিভাগের (Division of Labour) ব্যবস্থা থাকে। উৎপাদনের কাজকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি অংশ পৃথক লোকের হাতে ছাড়িয়া দিলে সেই ব্যবস্থাকে শ্রম-বিভাগ বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাক্, বাটার জুতার দোকানে কতিপয় কর্মচারী আছেন যাঁহারা জুতা বিক্রয় করেন, আবার কতিপয় কর্মচারী আছেন যাঁহারা প্রচার-বিভাগে কাজ করেন, আবার কতিপয় কর্মচারী আছেন যাঁহারা জুতা তৈয়ারী করেন, সর্বশেষে কতিপয় কর্মচারী পরিশুদ্ধ চামড়া তৈয়ারী করা অথবা রং দেওয়ার বিভাগে কাজ করেন। এখানে আমরা শ্রম-বিভাগ দেখিতে পাই। বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল এই শ্রম-বিভাগ। উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রম-বিভাগ থাকিলে আমরা শ্রমিকদের বিভিন্ন কাজে বৈশিষ্ট্য (specialisation) দেখিতে পাই। শ্রম-বিভাগ আছে বলিয়াই বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় (exchange) হয়। একজন শ্রমিক হয়তো একটি জিনিস তৈয়ারী করিল, অপর একজন শ্রমিক হয়তো আর একটি জিনিস তৈয়ারী করিল। তখন দুইটি জিনিসের মধ্যে প্রয়োজন হইলে বিনিময় করা সম্ভবপর। শুধু তাহাই নহে, শ্রম-বিভাগে শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা (co-operation) বজায় থাকে।

শ্রম-বিভাগ (Division of Labour)—শ্রম-বিভাগ দুইপ্রকার হইতে পারে; যথা, **সহজ শ্রম-বিভাগ ব্যবস্থা ও জটিল শ্রম-বিভাগ ব্যবস্থা।** সহজ শ্রম-বিভাগকে আবার আমরা দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি; যথা, ব্যবসাগত ও বৃত্তিগত বিভাগ (division into trades and occupations) এবং এক একটি পদ্ধতির সম্পূর্ণ শ্রম-বিভাগ (division of labour into complete

processes)। যদি একটি মুচী নিজেই চামড়া পরিষ্কার করিয়া জুতা তৈয়ারী করে এবং নিজেই ইহা বাজারে বিক্রয় করে, তবে উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ শ্রম-বিভাগ পদ্ধতি দেখিতে পাই। কিন্তু যখন দেখিতে পাই, তাঁতী কাপড় বয়ন করে অথবা কুমার মাটির খেলনা তৈয়ারী করে, তখন ইহাকে আমরা বৃত্তিগত বা ব্যবসায়গত শ্রম-বিভাগ বলি। আর এক ধরনের শ্রম-বিভাগ আছে, ইহাকে আমরা আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগ (territorial division of labour) বলি। যেমন বাংলাদেশে পাট উৎপন্ন হয় এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের কালো মাটিতে তুলা উৎপন্ন হয়।

শ্রম-বিভাগের প্রকারভেদ

শ্রম-বিভাগের সুবিধা (Merits of Division of Labour)—শ্রম-বিভাগের প্রধান সুবিধা হইল ইহাতে জটিল বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্রমেই সহজ হইয়া যায়। কোন বড় কারখানায় যদি মাত্র একজন উদ্যোক্তা থাকিতেন তবে তাঁহার পক্ষে হয়ত এই কারখানায় সমুদয় কাজ ব্যক্তিগতভাবে দেখাশুনা করা সম্ভব হইত না এবং ইহাতে উৎপাদনের কাজ ব্যাহত হইত। কিন্তু, শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থা থাকিলে, যে কোন ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভবপর। শিল্পোন্নয়নের যুগে শ্রম-বিভাগের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

পরিচালনার সুবিধা

শ্রম-বিভাগের ফলস্বরূপ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। উৎপাদন-ব্যবস্থা যতই বৃহদায়তন হইবে শ্রম-বিভাগও তত বেশী হইবে। শ্রম-বিভাগের জন্য যে দুইটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন, তাহা হইতেছে, বাজারের বিস্তার এবং অব্যাহত উৎপাদন।

উৎপাদন-বৃদ্ধি

শ্রম-বিভাগের ফলে শ্রমিকগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বিশেষ নৈপুণ্য (Specialisation) অর্জন করিয়া থাকে—ইহাতে একদিকে যেমন উৎপাদন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ বাড়ে অপরদিকে সেই প্রকার উৎপাদিত সামগ্রীগুলিও উন্নত-ধরনের হয় এবং সেইজন্য সেইগুলি বিক্রয় করিবার সুযোগও যথেষ্ট বাড়িয়া যায়। শুধু কর্মনৈপুণ্যই নহে, শ্রম-বিভাগের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাও অনেক বাড়িয়া যায় এবং ইহাতে উৎপাদন-ব্যবস্থাও বিশেষ উন্নত হয়।

শ্রমিকদের কর্মকুশলতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি

শ্রম-বিভাগের ফলে বর্তমান যান্ত্রিক যুগের উৎপাদন-ব্যবস্থা অনেক সহজ হইয়া গিয়াছে। কোন জিনিস উৎপাদনে অনেক সময় বাঁচানো যায় যদি সেই উৎপাদন-ব্যবস্থায় যথোপযুক্ত শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থা করা যায়। কারণ, যদি উৎপাদনের বিশেষ অংশের জন্য কোন শ্রমিককে নিযুক্ত করা হয়, তাহার পক্ষে উৎপাদন-কৌশল আয়ত্ত করিতে বেশী সময় লাগে না। কিন্তু সেই শ্রমিককে যদি উৎপাদনের সমুদয় অংশের জন্য নিযুক্ত করা হয়, তবে তাহার পক্ষে উৎপাদন-কৌশল আয়ত্ত করিতে

উৎপাদন-ব্যবস্থা সহজ হইয়াছে

অনেক সময় লাগে। উৎপাদন-ব্যবস্থা সরল হইয়া গেলে নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনের এবং শিল্পোৎপাদন সম্বন্ধে নূতন গবেষণার পথও পরিষ্কার হয়।

শ্রম-বিভাগের অসুবিধা (Demerits of Division of Labour)—শ্রম-বিভাগের কতিপয় অসুবিধাও আছে। শ্রম-বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিক কাজের একটি বিশেষ অংশ লইয়া ব্যস্ত থাকে। ইহাতে কাজে একঘেয়েমি আসে এবং শ্রমিকের উৎপাদনী-শক্তি অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়। শ্রমিকদের যদি কাজে উৎসাহ কমিয়া আসে, তবে উৎপাদন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ অনেক কমিয়া যায়।

কাজে একঘেয়েমি

দ্বিতীয়ত, শ্রম-বিভাগের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্রমেই বৃহদায়তন হইয়া পড়ে। ইহাতে মালিকদের সহিত শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। তাহা ছাড়া, বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থায় স্বভাবতই নূতন ধরনের যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করিবার চেষ্টা মালিকশ্রেণীর থাকে, ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কাজের সময় অথবা বাসস্থানের ব্যবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। সর্বোপরি, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অভাবে শিল্প-বিরোধের পরিমাণও বাড়িয়া যায়; অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী ও মালিকশ্রেণীর মধ্যে বিরোধ লাগিয়াই থাকে।

শিল্প-বিরোধের সৃষ্টি

আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগের একটি প্রধান দোষ হইতেছে এই যে কোন প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য হয়ত জনসাধারণকে একটি বিশেষ অঞ্চলের উপর নির্ভর করিতে হয়। যদি দেশে যুদ্ধবিগ্রহ অথবা কোন প্রাকৃতিক কারণে অথবা অন্য কোন কারণে এই অঞ্চলে উৎপাদন হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়, তবে সমগ্র দেশকে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। তাহা ছাড়া, এই প্রকার শ্রম-বিভাগের ফলে একটি শিল্প যদি কখনও একটি বিশেষ স্থানেই উন্নত হয়, তখন সেই স্থানে এক শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য বিশেষ চাহিদা দেখা যায় এবং সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মজুরির বৈষম্য দেখা যায়।

আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগের অসুবিধা

শ্রম-বিভাগের সীমা—শ্রম-বিভাগের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে; তাহা নির্ভর করে বাজারের বিস্তারের উপর ("Division of Labour is limited by the ex ent of the market")। কি পরিমাণ শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থা একটি শিল্পে হইতে পারে, তাহা সেই শিল্পের উৎপাদন-ব্যবস্থার আয়তনের উপর নির্ভর করে; যেমন, বৃহদায়তন উৎপাদনে বেশী পরিমাণে শ্রম-বিভাগ হয় এবং ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনে কম পরিমাণে শ্রম-বিভাগ হয়। উৎপাদনে আয়তন আবার উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয় করিবার মত বাজার আছে কিনা তাহার উপর নির্ভর করে। ধরা যাক, একটি জিনিসের জন্য বাজারে খুব চাহিদা; উৎপাদক তখন ইহা বেশী করিয়া উৎপাদন করিবে, বেশী উৎপাদন করিতে গেলেই শ্রম-বিভাগও বেশী পরিমাণে হইবে। সেজন্যই বলা হয়, শ্রম-বিভাগ বাজারের বিস্তারের পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

বাজারের আয়তন দ্বারা শ্রম-বিভাগ সীমাবদ্ধ

Exercise

1. What is meant by 'Production' in Economics ? What are the different Factors of Production ?

(অর্থশাস্ত্রে উৎপাদন বলিতে কি কি বুঝায় ? উৎপাদনের উপাদানগুলি কি কি ?) (২০ পৃষ্ঠা ; ২২-২৩ পৃষ্ঠা)

2 What are the different factor-earnings ?

(উপাদানের আয় কি কি ?) (২৩ পৃষ্ঠা)

3. What are the broad factors governing national production ?

(জাতীয় উৎপাদন নিরূপণকারী উপাদানগুলি কি কি ?) (২১-২২ পৃষ্ঠা)

4. What is meant by 'Land' in Economics ? In what respect is it fundamentally different from other factors production ?

(অর্থশাস্ত্রে 'জমি' বলিতে কি বুঝায় ? কোন্ বিষয়ে উৎপাদনে অন্যান্য উপকরণের সহিত জমির পার্থক্য দেখা যায় ?) (২৪-২৫ পৃষ্ঠা)

5 Explain the law of Diminishing Returns. Is it applicable to (a) mines, (b) fisheries and (c) manufacturing industries ?

(ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটি ব্যাখ্যা কর। ইহা কি (ক) খনি, (খ) মাছের চাষ এবং (গ) শিল্পক্ষেত্রে প্রযোজ্য ?) (২৫-২৭ পৃষ্ঠা)

6. Write a note on the productivity of land.

(জমির উৎপাদনী-শক্তির উপর একটি টিপ্পনী লিখ।) (২৯-৩০ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the Law of Variable Proportions of Production.

(উৎপাদনে পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (২৭-২৯ পৃষ্ঠা)

8. Define 'Land' and show how its productivity can be increased. Illustrate your answer with reference to India.

(জমির সংজ্ঞা প্রদান কর এবং ইহার উৎপাদনী-শক্তি কিভাবে বাড়ানো যায় দেখাও। ভারতের উদাহরণ দিয়া বিষয়টি আলোচনা কর।) (২৪-২৫ পৃষ্ঠা ; ২৯-৩০ পৃষ্ঠা)

9. Define capital. Distinguish between (a) Wealth and Capital. (b) Fixed and Circulating Capital.

(মূলধনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। ধন এবং মূলধন, স্থায়ী মূলধন এবং চলিত মূলধনের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।) (৩২-৩৩ পৃষ্ঠা)

10. Discuss the functions of Capital in Production.

(উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূলধনের বিভিন্ন কাজ আলোচনা কর।) (৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা)

11. How does Capital originate ? Indicate the factors on which the growth of Capital depends.

(মূলধনের সৃষ্টি কিভাবে হয় ? মূলধনের বৃদ্ধি কি কি কারণের উপর নির্ভর করে বুঝাইয়া দাও।) (৩৬-৩৮ পৃষ্ঠা)

12. What do you mean by Division of Labour ? What are its different types ?

(শ্রম-বিভাগ বলিতে কি বুঝায় ? শ্রম-বিভাগ কত প্রকার আছে ?)

13. Discuss the advantages and disadvantages of Division of Labour.

(শ্রম-বিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।) (৩৯-৪১ পৃষ্ঠা)

14. "Division of Labour is limited by the extent of the market" —Discuss the statement.

(শ্রম-বিভাগ বাজারের আয়তন কর্তৃক সীমাবদ্ধ। এই উক্তিটি অলোচনা কর।) (৪১ পৃষ্ঠা)

15. Explain the factors governing the Supply of Labour. On what does the efficiency of Labour depend ? How can the efficiency of Labour be raised ?

(শ্রমের সরবরাহ নিরূপণকারী কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর। শ্রমিকের দক্ষতা কিসের উপর নির্ভর করে ? কিভাবে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ানো যায় ?) (৩০-৩১ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ অধ্যায় | উৎপাদনের উপাদানগুলির আয় (Factor—Earnings)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান (Factors of Production) সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি, এবং দেখিয়াছি বিভিন্ন উপাদানের আবার বিভিন্ন প্রকারের আয় (earning) আছে। যেমন, জমির আয় হইতেছে খাজনা, শ্রমের আয় হইতেছে মজুরি, মূলধনের আয় হইতেছে সুদ, উদ্যোক্তা বা সংগঠনের আয় হইতেছে লাভ। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা উপাদানের আয় সম্পর্কে একটি বিস্তৃত আলোচনা করিব।

খাজনা (Rent)

খাজনা তত্ত্ব (Theory of Rent)—সাধারণ অর্থে 'খাজনা' কথাটি আমরা যেভাবে ব্যবহার করি, অর্থশাস্ত্রে 'খাজনা' কথাটি সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ফ্রান্সের

ফিজিওক্র্যাট (Physiocrats) নামে অভিহিত অর্থবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে প্রকৃতির বদান্যতার জন্য (liberality of nature) খাজনার সৃষ্টি হয়। রিকার্ডো এই মতবাদের বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছিলেন যে প্রকৃতির বদান্যতা নহে, কৃপণতাই (niggardliness of nature) হইল খাজনার প্রকৃত কারণ। রিকার্ডোর (Ricardo) মতে খাজনা হইতেছে জমির আদিম এবং অবিনশ্বর ক্ষমতার মূল্য।[১]

রিকার্ডোর মতে জমির যোগান সর্বদাই সীমাবদ্ধ। শুধু তাহাই নহে, জমিতে শুধু একটি জিনিস উৎপাদিত হয়, এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম (Law of Diminishing Returns) কার্যকরী হয়। প্রয়োজনের তুলনায় জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলিয়াই খাজনার সৃষ্টি হয়। জমির যোগানের সীমাবদ্ধতা, বিভিন্ন জমির উৎপাদনী-শক্তির তারতম্য এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন নিয়মের কার্যকারিতার জন্যই খাজনার সৃষ্টি হয়।

খাজনা কিভাবে নিরূপিত হয় (How is Rent determined ?)—জমি হইতে কিভাবে খাজনা নিরূপণ করা হয় তাহা একটি উদাহরণের সাহায্যে ভালভাবে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাক্, একটি নূতন দেশ আবিষ্কৃত হইল। প্রথমে সেখানকার জনসাধারণ সর্বাপেক্ষা উর্বর জমিগুলিতে অর্থাৎ, প্রথম শ্রেণীর জমিগুলিতে কৃষিকাজ আরম্ভ করিবে। জনসংখ্যা ক্রমে যতই বাড়িতে থাকিবে, ততই অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিগুলিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিগুলিতে কৃষকগণ কৃষিকাজ আরম্ভ করিবে। তারপর জনসংখ্যা যদি আরও বাড়ে, তবে তৃতীয় শ্রেণীর জমিগুলিতেও কৃষিকাজ আরম্ভ হইবে। এইভাবে জনসংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর জমিতে কৃষিকাজ চলিতে থাকিলে দেখা যায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষা প্রথম শ্রেণীর জমিতে এবং তৃতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উৎপাদন বেশী হয়। এই বাড়তি উৎপাদনের মূল্যেই উৎকৃষ্ট জমির মালিকগণ খাজনা বাবদ পাইয়া থাকেন। ধরা যাক্, ৯০ টাকা খরচে প্রথম শ্রেণীর এক বিঘা জমিতে ২ কুইন্টল পাট হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর এক বিঘা জমিতে ১৫ কুইন্টল পাট হয়; তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে কুইন্টল প্রতি পাটের উৎপাদন খরচ হইতেছে সাড়ে চার টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে কুইন্টল প্রতি পাটের উৎপাদন খর হইতেছে ছয় টাকা। বাজারে কুইন্টল প্রতি পাটের দাম অন্তত ছয় টাক হইবে; কারণ তাহা না হইলে কেহ দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে চাষ করিবে না। বাজা দাম প্রান্তিক বিন্দুতেই (at the point of margin) স্থির হয়। এখানে দ্বিতী শ্রেণীর জমির প্রান্তিক জমি এবং প্রথম শ্রেণীর জমি উপ-প্রান্তিক জমি। দা প্রান্তিক খরচের সমান হয়, এবং এক্ষেত্রে প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচই প্রান্তি

১ "Rent is that portion of the produce of the earth which paid for the original and indestructible power of the soil."

খরচ। যদি পাটের দাম কুইন্টল প্রতি ছয় টাকা হয়, তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির জন্য জমির মালিক কোন খাজনা পাইবে না। কিন্তু কুইন্টল প্রতি দাম ছয় টাকা হওয়ায় প্রথম শ্রেণীর জমির ২০ কুইন্টল পাট ১২০ টাকায় বিক্রীত হইবে। সেইজন্য প্রথম শ্রেণীর জমির জন্য মালিক ৩০ টাকা (১২০—৯০=৩০ টাকা) খাজনা পাইবে। দেখা যাইতেছে, প্রথম শ্রেণীর জমি দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষা যতটা উৎকৃষ্ট, সেই উৎকৃষ্টতার জন্যই ইহা খাজনা লাভ করে। এইজন্যই বলা হয় খাজনা একটি পার্থক্যমূলক উদ্বৃত্ত ("a differential surplus")। এখানে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জমিটিকেই আমরা বলিতেছি কৃষির প্রান্তিক জমি (Land on the margin of cultivation)। এমনও হইতে পারে, যে জনসংখ্যা বাড়িলে কৃষকগণ একই জমিতে নিবিড়ভাবে কৃষিকাজ (intensive cultivation) করিতে পারে। কিন্তু এই নিবিড় চাষ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন নিয়মের দ্বারা শিক্ষিত। এই ক্ষেত্রে দেখা যাইবে, প্রথম মাত্রায় যত উৎপাদন হইতেছে, দ্বিতীয় মাত্রায় তত উৎপাদন হইতেছে না। ধরা যাক্, প্রথম মাত্রায় প্রদত্ত মূলধনের খরচ হইল ১০ টাকা, এবং সেই মাত্রায় জমি হইতে প্রাপ্ত উৎপাদিত সামগ্রীর দাম হইল ২০ টাকা। আবার, দ্বিতীয় মাত্রায় শ্রম ও মূলধনের খরচ যেখানে ১০ টাকা, উৎপাদিত সামগ্রীর দাম সেখানে ১৫ টাকা। সুতরাং প্রথম মাত্রায় কৃষকের উদ্বৃত্ত হইতেছে ১০ টাকা এবং দ্বিতীয় মাত্রায় কৃষকের উদ্বৃত্ত হইতেছে ৫ টাকা। সুতরাং সংশ্লিষ্ট জমিতে দুইটি মাত্রায় উৎপাদন কমিলে মোট খাজনার পরিমাণ হইবে ১৫ (=১০+৫) টাকা।

জমির বিকল্প আয় এবং খাজনা ও দামের সম্পর্ক (Transfer earning of land and the relation between Rent and price)—প্রান্তিক জমির জন্য কোন খাজনা দিতে হয় না। দাম প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচের সমান বলিয়া দাম খাজনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না। খাজনা নিরূপণ করিতে হইলে প্রথম শ্রেণীর জমির উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়-লব্ধ আয় (Returns) হইতে প্রান্তিক জমির মোট খরচ বাদ দিতে হয়। প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচ এক্ষেত্রে শুধু ফসলের দাম নিয়ন্ত্রণ করে, ইহার সহিত খাজনার কোন সম্পর্ক নাই। যদি দাম বাড়িয়া যায়, তবে প্রথম শ্রেণীর জমি প্রান্তিক জমির তুলনায় অধিক উদ্বৃত্ত লাভ করে এবং খাজনা বাড়িয়া যায়। রিকার্ডো বলিয়াছেন, দাম বাড়িলে খাজনা বাড়ে। কিন্তু, খাজনা বাড়িলে দাম বাড়ে, একথা বলা ঠিক নহে। (Rent is price-determined and not price-determining) খাজনা একটি উদ্বৃত্ত মাত্র, মোট আয় হইতে উৎপাদন খরচ বাদ হইলে এই উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই, ফসলের দাম বেশী বলিয়াই খাজনা বেশী, খাজনা বেশী বলিয়া ফসলের দাম বেশী নয়।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণের মতে জমির বিকল্প আয় (Transfer earning)

আছে বলিয়া খাজনার মধ্যে বিকল্প খরচ (Transfer cost) কিছু পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাক্, একটি জমিতে ধান ও পাট উভয়ই উৎপাদন করা যায়। জমির মালিক যদি ধান উৎপাদন করে তবে আয় হয় ৫০ টাকা, আর যদি পাট উৎপাদন করে, তবে আয় হয় ৪০ টাকা। এই অবস্থায় যদি কোন কৃষক পাট উৎপাদন করিবার জন্য এই জমিতে চাষ করিতে চায়, তবে জমির মালিককে ১০ টাকা দিয়া জমিটি চাষের জন্য আনিতে হইবে। কারণ, পাট উৎপাদন না করিয়া ধান উৎপাদন করিলে জমির মালিক আরও দশ টাকা বেশী পাইত। এই ১০ টাকা হইতেছে জমির পাট উৎপাদন হেতু জমির মালিকের বিকল্প আয় (Transfer earning) এবং কৃষকের বিকল্প খরচ (Transfer cost)। মোট আয় হইতে প্রান্তিক জমির এবং বিকল্প আয় বাদ দিলে প্রকৃত খাজনা (pure rent) নিরূপিত হয়। প্রান্তিক জমির জন্যও কৃষককে খাজনা দিতে হয়। এই খাজনা দেওয়া হয় জমির মালিককে। এই খাজনার পরিমাণ বিকল্প খরচ দ্বারা নিরূপিত হয় এবং সর্বশেষ জমি বা প্রান্তিক জমিকেও এই খাজনা প্রদান করিতে হয়। সুতরাং প্রান্তিক জমি কোনও খাজনা প্রদান করে না এবং ইহার খরচের সহিত খাজনার সম্পর্ক নাই, একথা ঠিক নহে।

বিকল্প আয়
(Transfer earning)

মজুরি (Wage)

মজুরির সংজ্ঞা—আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি (Definition of Wage,—Money wage and Real wages)—মজুরি হইতেছে উৎপাদনের জন্য শ্রমিক যে কাজ করে তাহার দাম ("Value of the service rendered by labour in production")। মজুরি অনেক ক্ষেত্রে কাজের সময় অনুযায়ী প্রদান করা হয়; ইহাকে সময়-মজুরি (Time wages) বলা হয়। আবার অনেক সময় কাজ অনুযায়ী মজুরি দেওয়া হয়; ইহাকে কর্মানুগ মজুরি (Piece wages) বলা হয়।

শ্রমিককে তাহার কাজের দাম বাবদ দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক যে মাহিনার টাকা দেওয়া হয় তাহাই আর্থিক মজুরি। অনেক সময় কাজের দাম টাকায় না দিয়া জিনিসপত্র বা কতিপয় প্রকৃত সুবিধার সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রদান করা হয়। শ্রমিক তাহার শ্রমের বিনিময়ে এই সুযোগ-সুবিধাগুলি অথবা জিনিসপত্র অথবা বিভিন্ন ধরনের কাজ (services) লাভ করেন। ইহাই তাহার প্রকৃত মজুরি (real wages)। এই জিনিসগুলি এবং সুযোগ-সুবিধাগুলিও শ্রমিক মজুরির অঙ্গ হিসাবেই মনে করে।

আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি
(Money wages and Real wages)

শ্রমিক কাজের বিনিময়ে সস্তা দরে খাদ্যশস্য পাইতে পারে, বাসস্থানের সুবিধা

পাইতে পারে এবং বিনামূল্যে সমাজবীমার সমুদয় সুবিধা পাইতে পারে। যে কাজে এই সুবিধাগুলি পাওয়া যায়, সেই কাজের জন্য আর্থিক মজুরি কম হইলেও প্রকৃত মজুরির পরিমাণ বেশী হয়। অনেক সময় অস্থায়ী কাজের জন্য হয়ত আর্থিক মজুরি বেশী থাকে; কিন্তু সেই প্রকার কাজের জন্য মজুরি অত্যন্ত কম। আবার যদি কোন কাজ স্থায়ী হয় অথচ সেই কাজের জন্য আর্থিক মজুরি কম হয়, তবে সেই কাজের জন্য প্রকৃত মজুরির পরিমাণ বেশী। অনেক সময় কোন কোন কাজে উপরি পাওনার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। যেমন, একজন লোক সকাল দশটা হইতে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত কোন অফিসে কাজ করিয়া হয়ত সন্ধ্যায় অন্য কোন অফিসে সেই ধরনের কাজ করিবার অনুমতি পাইতে পারে। তখন সেক্ষেত্রে আর্থিক মজুরি কম হইলেও শ্রমিক প্রকৃত মজুরি বেশী বলিয়াই মনে করে।

যে সকল কাজে বিপদের বা ঝুঁকির বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, সেই কাজগুলিতে সাধারণত আর্থিক মজুরি বেশী হয় এবং প্রকৃত মজুরি কম হয়। যেমন রেলওয়ে ইঞ্জিনের পরিচালকদের মাহিনা অনেক অফিসারের মাহিনা অপেক্ষাও বেশী হয়। কারণ, তাহাদের কাজে বিশেষ ঝুঁকি থাকে। আবার বিনা ভাড়ায় রেলে যাতায়াতের সুবিধা প্রকৃত মজুরির একটি অংশ।

প্রকৃত মজুরির পরিমাণ নিরূপণ করিতে হইলে দেশের মূল্যস্তর জানিতে হইবে। জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া গেলে প্রকৃত মজুরি কমিয়া যায়। প্রকৃত মজুরির সাহায্যে আমরা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান কিরূপ তাহা জানিতে পারি।

শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তি এবং মজুরি (Marginal productivity and wages—প্রান্তিক উৎপাদনের তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রমিকের মজুরি তাহার প্রান্তিক উৎপাদনের (Marginal product) মূল্যের সমান। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রমিকের যোগান নির্দিষ্ট থাকে, এবং শ্রমিকের জন্য চাহিদার উপর মজুরির হার নির্ভর করে। শ্রমিকের চাহিদা নির্ভর করে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনী-শক্তির (Marginal productivity) উপর। ধরা যাক্, দশ জন শ্রমিক কোন জিনিসের ২০ ইউনিট উৎপাদন করে। তারপর একজন অতিরিক্ত শ্রমিককে যদি কাজে নিয়োগ করা হয়, তবে এগার জন শ্রমিক ২২ ইউনিট উৎপাদন করে। এক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন হইতেছে দুই ইউনিট এবং দুই ইউনিটের মূল্যই ইহার শ্রমিকের মজুরি। যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের দাম তাহার মজুরি অপেক্ষা বেশী, ততক্ষণ পর্যন্ত মালিক অধিক পরিমাণে শ্রমিক নিয়োগ করিতে থাকিবে এবং উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিবে। যখন শ্রমিকের মজুরি তাহার প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্যের সমান হইবে, তখন উদ্যোক্তা আর শ্রমিক নিয়োগ করিবে না। এই তত্ত্বটি শ্রম ও মূলধনের পূর্ণ সচলতা (Perfect Mobility) স্বীকার করিয়া লয়। যদি কোন প্রতিষ্ঠান প্রচলিত মজুরি অপেক্ষা বেশী

প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্ব (Marginal productivity theory)

মজুরি শ্রমিকদের দেয় তবে শ্রমিকগণ তৎক্ষণাৎ যে প্রতিষ্ঠান কম মজুরি দেয় তাহা ছাড়িয়া বেশী মজুরি যে প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়, সেই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবে।

এই তত্ত্বটির সমালোচনা

আমরা এই তত্ত্বটির সমালোচনা করিতে পারি। এই তত্ত্বটিতে শ্রমিকের সরবরাহের দিকটি উপেক্ষা করা হইয়াছে। শ্রমিকের সরবরাহ নির্ভর করে জনসংখ্যা, বিকল্প কাজের মজুরি, জীবনযাত্রার মান এবং শ্রমিক-সংঘের উপর। এইগুলি সম্বন্ধে কোন আলোচনা প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্বে করা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন নিরূপণ করা খুব সহজ নহে। কারণ, যে উৎপাদনকে আমরা শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন বলি, তাহা শুধু শ্রমিকের দরুন উৎপাদিত হয় নাই, কিছু মূলধনের জন্য অথবা অন্য কোন উপকরণের জন্য উৎপাদিত হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য উপকরণগুলির উৎপাদনী-শক্তি জানা না থাকিলে শ্রমের উৎপাদনী-শক্তি নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়। তৃতীয়ত, এই তত্ত্বটি পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তিশীল ; কিন্তু শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা দেখা যায় না ; যদি দেখা যাইত তবে অসংখ্য শ্রমিকের সহিত আমরা অসংখ্য মালিক দেখিতে পাইতাম এবং তবে কোনও প্রকার বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইত না।

মজুরি ও জীবনযাত্রার মান (Wages and Standard of Living)—অনেকের মতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী মজুরির হার নির্ধারিত হয়। এই তত্ত্বের শ্রমের যোগানের দিকটাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী নিজের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য শ্রমিকের যে পরিমাণ টাকার দরকার তাহাই তাহাকে মজুরি বাবদ দেওয়া হয় নাই বলিয়া আমরা এই তত্ত্বটি গ্রহণ করিতে পারি না। আবার, জীবনযাত্রার মান পরোক্ষভাবে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনী-শক্তিকে প্রভাবিত করে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনী-শক্তি বাড়িয়া যাইতে পারে। ইহাতে শ্রমিকের মজুরি বাড়িয়া যায়। সেই দিক হইতে ইহা পরোক্ষভাবে শ্রমিকের চাহিদাকে প্রভাবিত করে। তাহা ছাড়া, জীবনযাত্রার মান যেমন মজুরিকে প্রভাবিত করে, সেই প্রকার জীবনযাত্রার মানও মজুরি কর্তৃক প্রভাবিত হয়। মজুরি বাড়িলে জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়।

জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব (Standard of living theory)

মজুরি নিরূপণের আধুনিক তত্ত্ব (Modern theory of determining Wages)—উপরি-উক্ত কোন মতবাদের সাহায্যেই আমরা শ্রমিকের মজুরি নিরূপণ করিতে পারি না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মজুরি হইতেছে এক ধরনের দাম। ইহা মূলত উৎপাদনের জন্য শ্রমিকের যে কাজ তাহার দাম। সুতরাং বিভিন্ন জিনিসের দাম নিরূপণ করিবার সময় আমরা যেমন চাহিদা ও যোগানের দিক বিবেচনা করি,

শ্রমিকের চাহিদা ও শ্রমের যোগান

সেই প্রকার মজুরি নির্ধারণেও আমরা শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান বিবেচনা করিব।

শ্রমের চাহিদা নির্ভর করে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনী-শক্তির উপর এবং শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে জনসংখ্যা, শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান, বিকল্প কাজে শ্রমিকের মজুরি এবং শ্রমিক-সংঘের উপর। এই উপাদানগুলির মধ্যে শ্রমিক-সংঘের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিক-সংঘ (Trade Union) যদি কোন শ্রমিককে কাজে যোগদান করিতে বারণ করে, তবে সেই শ্রমিক কাজে যোগদান করে না।

শ্রমিক-সংঘের ভূমিকা (Role of the trade Union)

শ্রমিকের যোগান কমাইয়া দিয়া শ্রমিক-সংঘ মালিকগণকে মজুরির হার বাড়াইতে বাধ্য করে। যদিও শ্রমিক-সংঘের পক্ষে দর কষাকষি করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তবুও শ্রমিক-সংঘ মজুরির হার নির্ধারণে একটি বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করে। মালিকগণ হয়ত এমন একটি সর্বোচ্চ মজুরি দিতে চাহে (ধরা যাক্ ৩ টাকা) যাহার বেশী আর তাহারা দিতে চাহে না। আবার শ্রমিকগণ হয়ত এমন একটি সর্বনিম্ন মজুরি দাবি করিতে পারে (ধরা যাক্ ৫ টাকা) যাহার কম তাহারা গ্রহণ করিতে চাহে না। তখন উভয়পক্ষের মধ্যে একটি দরকষাকষি (Bargaining) হয় এবং ইহার ফলে উভয়েরই দাবির মাঝামাঝি (ধরা যাক্, এক্ষেত্রে ৪ টাকা) একটি মজুরির হার নিরূপিত হয়। এই দরাদরি কখনও একজন মালিক এবং একজন শ্রমিকের মধ্যে হয় না। ইহা হয় শ্রমিক-সংঘ (Trade Union) এবং মালিক-সংঘের (Employers' Association) মধ্যে। মালিক-সংঘ মালিকগণের প্রতিনিধিত্ব করে এবং শ্রমিক-সংঘ শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে। এই দরকষাকষি সমষ্টিগতভাবে হয় বলিয়া ইহাকে সমষ্টিগত দরকষাকষি বা "Collective Bargaining" বলে। শ্রমিক-সংঘ বেশী শক্তিশালী হইলে মজুরি সর্বোচ্চ স্তরে অথবা উহার কাছাকাছি স্থির হয়। শ্রমিকের দিক হইতে মজুরির সর্বোচ্চ সীমা নির্ভর করে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের উপর। অপরপক্ষে যদি মালিক-সংঘ বেশী শক্তিশালী হয় তবে মজুরি মালিকগণের দিক হইতে সর্বনিম্ন স্তরে স্থির হইবে।

বিভিন্ন কাজে মজুরির তারতম্য (Differences in wages in different occupations)—আমরা বিভিন্ন কাজের জন্য মজুরি-হারের তারতম্য দেখিতে পাই। মজুরির এই তারতম্য নির্ভর করে কাজের প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিকতা এবং শ্রমিকের কর্মকুশলতার পার্থক্যের উপর। যে সকল শ্রমিক খুব কর্মক্ষম, তাহারা এই কর্মক্ষমতার জন্য আরও কর্মক্ষম শ্রমিকদের অপেক্ষা বেশী মজুরি পাইবে। দ্বিতীয়ত, কোন কাজের মধ্যে যদি বিপদের অথবা মারাত্মক রকমের ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই কাজের জন্য শ্রমিকের মজুরি বেশী হয়। যেমন এরোপ্লেনের পাইলটদের বেতন অনেক সরকারী অফিসারের বেতন অপেক্ষা বেশী।

তৃতীয়ত, শিক্ষালাভের খরচ যদি বেশী হয় তবে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকের মজুরিও

বেশী হয়। যেমন বিলাত হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া যাহারা আসে তাহারা এদেশে রোগী দেখিবার সময় বেশী ভিজিট লইয়া থাকে।

চতুর্থত, কাজের সাধারণ আকর্ষণ অনেক সময় মজুরির তারতম্য ঘটায়। একজন সাধারণ শ্রমিক যে মজুরি পায়, তাহা অপেক্ষা একজন মেথর একটু বেশী মজুরি পায়। এই তারতম্যের কারণ হইতেছে এই যে মেথরের কাজের জন্য লোকের আকর্ষণ নাই।

পঞ্চমত, চাকুরী যদি স্থায়ী এবং নিয়মিত হয় তবে মজুরির হার অপেক্ষাকৃত কম হয়। আবার অনিয়ন্ত্রিত এবং অস্থায়ী কাজে মজুরির হার বেশী হয়; কারণ, তাহা হইলে শ্রমিকগণ অস্থায়ী কাজের দিকে আকৃষ্ট হইবে।

ষষ্ঠত, দায়িত্বপূর্ণ কাজে মজুরির হার বেশী হয়। একজন সাধারণ কেরানী হয়ত কোন অফিসার অপেক্ষা অনেক বেশী পরিশ্রম করেন। তবুও অফিসারের বেতন বেশী। ইহার কারণ হইতেছে এই যে অফিসারের কাজ অনেক দায়িত্বপূর্ণ।

সপ্তমত, ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা থাকিলে শ্রমিকরা অল্প বেতনেও অনেক কাজ গ্রহণ করিয়া থাকে।

সর্বশেষে, ভৌগোলিক এবং আঞ্চলিক কারণেও মজুরি-হারের তারতম্য ঘটিয়া, থাকে। কোন অঞ্চলে হয়ত শ্রমের চাহিদা অপেক্ষা যোগান কম, তবে সেই অঞ্চলে মজুরি-হার বেশী হইবে। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে শিল্পোন্নয়ন হইবার ফলে শ্রমের চাহিদা খুব বেশী। কোন শ্রমিক এই দুইটি শহরে কাজ করিলে যে মজুরি পাইবে, গ্রামাঞ্চলে কাজ করিলে সে তাহা অপেক্ষা কম মজুরি পাইবে। কতিপয় বিশেষ কাজ আছে যেগুলির জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকের প্রয়োজন হয়; কারিগরি কর্মকুশলতা না থাকিলে এই কাজের জন্য শ্রমিককে নিযুক্ত করা হয় না। স্বভাবতই এই ধরনের কাজের জন্য শ্রমিকদের মজুরি-হার বেশী হয়।

সুদ (Interest)

'সুদ' কথাটির বিভিন্ন সংজ্ঞা আমরা দেখিতে পাই। সাধারণ অর্থে যখন কেহ টাকা ধার করে তখন এই ধার বাবদ তাহাকে একটি দাম দিতে হয়; সুদ হইতেছে এই দাম ("Interest is a price paid for loans")। কাহারও নিকট হইতে মূলধন লইয়া তাহা ব্যবহার করিলে যে দাম দিতে হয়, তাহাই সুদ। সুদ বলিতে আমরা মোট সুদ (Gross interest) এবং নীট সুদ (Net interest) এই দুই প্রকার সুদ বুঝি। এই দুইটির মধ্যে একটি পার্থক্য আছে।

স্থূল সুদ ও নীট সুদ (Gross Interest and Net Interest)—টাকা ধার দেওয়ার একটা ঝুঁকি সর্বদাই থাকে। যদি নির্দিষ্ট সময়ে খাতক ধার শোধ না করে অথবা টাকা আদায়ের জন্য যদি মহাজনকে অনেক তাগাদা দিতে হয়, তবে ধার দেওয়ার ব্যাপারে অনেক ঝামেলা থাকে। এই ঝামেলার জন্যই বিশেষত খাতক যদি খুব নির্ভরযোগ্য না হয়, তবেই মহাজন টাকা ধার দেওয়ার পর সুদ একটু বেশী

ধার্য করে। এই বেশী সুদ ধার্য করিবার আর একটি উদ্দেশ্য হইল ধারের কারবার বজায় রাখিবার জন্য মহাজনকে যে খরচ করিতে হয় এবং হিসাব রাখিতে হয় তাহার ব্যবস্থা করা। এই কারণগুলি বর্তমান না থাকিলে শুধু টাকা ধার দেওয়ার জন্যই মহাজন যে সর্বনিম্ন সুদ ধার্য করিত, তাহাই হইতেছে নীট সুদ (Net interest)। টাকা ধার দেওয়ার ব্যাপারে উপরে বর্ণিত ঝামেলা এবং অসুবিধাগুলি থাকার দরুন মহাজন সর্বনিম্ন সুদ অপেক্ষা বেশী যে সুদ ধার্য করে, তাহা লইয়া স্থূল সুদ (Gross interest) নিরূপিত হয়। সেজন্য মোট সুদের হার নীট সুদের হার অপেক্ষা বেশী থাকে।

সুদের হার কিভাবে নিরূপিত হয়? (How is the Rate of Interest Determined?)—সুদের হার নির্ধারিত হয় মূলধনের চাহিদা ও মূলধনের যোগানের দ্বারা অথবা ধার প্রদান করার যোগ্য যে তহবিল (Loanable fund) তাহার চাহিদা এবং যোগানের দ্বারা। টাকা প্রদান করা অথবা ধার দেওয়ার যে তহবিল তাহার মধ্যে যে শুধু মূলধন ধরা হয় তাহাই নহে, তাহার মধ্যে টাকাকড়িও অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে। কেইন্‌স্ বলিয়াছিলেন, সুদ মূলত টাকার চাহিদা ও টাকার যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু কেইন্‌স্ প্রদত্ত সুদের তত্ত্বটি অসম্পূর্ণ। সেইজন্য বর্তমানে সুদের হার নিরূপণ করিবার সময় আমরা ঋণপ্রদানযোগ্য মূলধনের চাহিদা এবং যোগানের উপর গুরুত্ব আরোপ করি।

মূলধনের চাহিদা থাকে তিন শ্রেণীর লোকের। মূলধনের জন্য সাধারণ লোকের যে চাহিদা থাকে, তাহা মোট চাহিদার একটি অংশ মাত্র। সরকার অনেক সময় মূলধন ধার করিতে চাহে। বিনিয়োগের কাজের জন্য যদি সরকার কখনও মূলধন দাবি করে, তবে তাহা অনেকাংশে সুদের হারের উপর নির্ভর করে। মূলধনের জন্য ব্যবসায়ীগণের চাহিদাই সুদ নিরূপণে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মূলধনের সাহায্যে তাহারা উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করে। সুতরাং, মূলধনের জন্য চাহিদা নির্ভর করে সুদ ও মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনী-শক্তির (Marginal productivity) উপর। ঋণপ্রদানযোগ্য মূলধনের যোগান নির্ভর করে সুদের উপর এবং ব্যাংকের আমানতের উপর। যখন মূলধনের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয়, তখনই সুদ নিরূপিত হয়।

মূলধনের চাহিদা ও যোগান যেরূপ সুদের হার নির্ধারণ করে, সেই প্রকার সুদের হারও মূলধনের চাহিদা ও যোগানকে প্রভাবিত করে। যদি সুদের হার বেশী হয়, তবে লোকে বেশী করিয়া ব্যাংকে টাকা জমা রাখে এবং তাহাতে মূলধনের যোগান বাড়িয়া যায়। আবার, সুদের হার বাড়িলে লোকে মূলধন কম করিয়া ধার করিতে চায়। দেখা যাইতেছে মূলধনের চাহিদা ও যোগান সুদের হারের পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে মূলধনের চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে যখন ইহারা পরস্পরের সমান হয়, তখন সুদের হার নিরূপিত হয়।

সুদের হারের তারতম্য (Differences in rates of interest)—সব রকম ঋণের জন্য সুদের হার সমান থাকে না।

প্রথমত, যদি যোগানের তুলনায় মূলধনের চাহিদা বাড়িয়া যায়, তবে লোকে বেশী সুদ দিয়াও মূলধন ধার করিতে চাহে এবং মহাজনও বেশী সুদে মূলধন ধার দেয়। আবার চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী থাকিলে সুদের হার কমিয়া যায়।

চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন

দ্বিতীয়ত, টাকা ধার দেওয়ার ঝুঁকির উপরেও সুদের হারের তারতম্য নির্ভর করে। খাতক যদি দূরে থাকে এবং খুব নির্ভরযোগ্য না হয়, তবে স্বভাবতই সুদের হার কিছু বেশী হয়। আবার খাতকের আর্থিক অবস্থা যদি ভাল না থাকে এবং নিয়মিত টাকা শোধ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবেও সুদের হার বেশী হয়। কারণ সেক্ষেত্রে মহাজন জানে যে সহজে টাকা ফেরৎ পাওয়া যাইবে না। খাতকের নিকট হইতে টাকা আদায় করার কাজে যদি ঝামেলার সম্ভাবনা থাকে তবে সুদের হারও বেশী হয়। অনেক সময় কোন জিনিস বন্ধক রাখিয়া খাতক টাকা ধার করে। যে জিনিস বন্ধক রাখা হয়, তাহার মূল্যের উপরেও সুদের হারের তারতম্য নির্ভর করে। যদি কেহ সোনার গহনা অথবা সরকারী ঋণপত্র জামানত রাখিয়া টাকা ধার করে, তবে মহাজন তাহার জন্য সুদের হার কিছু কম ধার্য করে। খাতক যদি বাজারের কোন সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান হয় তবে সেক্ষেত্রে অনেক সময় সুদের হার কিছু কম হয়।

ঝুঁকির উপর সুদের তারতম্য নির্ভরশীল

সর্বশেষে, স্বল্প-মেয়াদী ঋণ এবং দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের জন্যও সুদের হারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সাধারণত দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের জন্যও সুদের হার বেশী হয়। দীর্ঘকালের জন্য যখন মহাজন টাকা ধার দেয়, তখন তাহাকে অনেকদিনের জন্য টাকা হাতছাড়া করিতে হয়। ইহাতে নগদ টাকার জন্য তাহার পছন্দকে অনেক পরিমাণে ত্যাগ করিয়াই সে খাতককে টাকা ধার দেয়। কিন্তু, সর্বদাই যে দীর্ঘকালীন ঋণের জন্য সুদের হার বেশী হয়, তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে সুদের হার কত বেশী হইবে তাহা অনেক পরিমাণে ঋণগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির উপরেও নির্ভর করে। আবার, ঋণ প্রদান করিবার সময় মহাজন যে সিকিউরিটি পায় তাহা যদি এমন হয় যে সে ইচ্ছা করিলেই এই সিকিউরিটি বিক্রয় করিতে পারিবে, তবে সে নিজেও ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে, তবে সে অল্প সুদেও টাকা ধার দিতে পারে। স্বল্প-মেয়াদী ঋণের জন্য সাধারণত সুদের হার অল্প হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষে অথবা প্রতিষ্ঠান বিশেষে স্বল্প-মেয়াদী ঋণের জন্য দেয় সুদও বেশী হইতে পারে।

স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের জন্য সুদের তারতম্য

লাভ (Profit)

উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ হইতেছে সংগঠন (Organisation), এবং এই সংগঠনের কাজ করিবার দায়িত্ব হইতেছে উদ্যোক্তার (Entrepreneur)। উদ্যোক্তা

সুষ্ঠুভাবে উৎপাদনের জন্য যে পরিশ্রম করে তাহার পুরস্কার হইতেছে লাভ। উদ্যোক্তা জমি, শ্রমিক এবং মূলধনের সাহায্যে এবং নিজের কর্মকুশলতা ও সংগঠন শক্তি অনুযায়ী উৎপাদন করে। উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের ফলে প্রাপ্ত অর্থ হইতে উদ্যোক্তা ভূমির জন্য ইহার মালিককে খাজনা, শ্রমের জন্য শ্রমিককে মজুরি এবং মূলধনের জন্য ইহার মালিককে সুদ প্রদান করে। যাহার যাহা পাওনা তাহা সবকিছু মিটাইয়া দিয়া কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে সেই উদ্বৃত্ত উদ্যোক্তার লাভ। লাভের একটি সহজ সংজ্ঞা হইতেছে এই যে ইহা মোট খরচ অপেক্ষা মোট বিক্রয়লব্ধ আয় যত বেশী সেই পরিমাণের সমান।

লাভ কাহাকে বলে?

অর্থাৎ, লাভ = মোট বিক্রয়লব্ধ আয় − মোট খরচ

কিন্তু এইভাবে লাভের সংজ্ঞা দিলে অনেক কিছুই বলা হয় না। প্রকৃতপক্ষে লাভের সংজ্ঞা প্রদান করিবার জন্য প্রচেষ্টা অনেক হইয়াছে। সেইজন্য এই বিষয়ে অনেক তত্ত্বেরও অবতারণা হইয়াছে। 'লাভ' সম্বন্ধে অনেক সংজ্ঞা অর্থবিজ্ঞানীগণ দিয়াছেন। কোন কোন অর্থবিজ্ঞানীর মতে 'লাভ' হইতেছে উদ্যোগের পুরস্কার (reward of enterprise), কাহারও মতে লাভের সৃষ্টি হয় উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহন করিবার ক্ষমতা (risk-bearing capacity) হইতে, কাহারও মতে লাভের সৃষ্টি হয় বাজারে একচেটিয়ামূলক ব্যবসায়ের উপাদান হইতে ; আবার কাহারও মতে লাভের সৃষ্টি হয় গতিশীল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং উৎপাদন পদ্ধতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হইতে। সুতরাং 'লাভ' সম্বন্ধে একটি একক সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। আমরা শুধু এইটুকু বলিতে পারি, লাভ মোট খরচ অপেক্ষা মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের বাড়তি অংশ এবং তাহা হইতেছে উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা, সংগঠনী শক্তি, গতিশীল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ও উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন, একচেটিয়া বাজার ইত্যাদি কোন একটি অথবা একাধিক উপাদানের দরুন।

লাভের সংজ্ঞা প্রদান করা খুবই কঠিন

লাভের পরিমাণ দুইভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে,—একটি হইতেছে স্থূল লাভ (gross profit) এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে নীট লাভ (net profit)। স্থূল লাভের পরিমাণ হইতেই নীট লাভের পরিমাণ বাহির করিতে হয়।

স্থূল লাভ এবং নীট লাভ (Gross Profit and Net Profit)—উৎপাদন হইতে মোট যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা যদি উৎপাদকের মোট খরচ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে মোট খরচ হইতে এই টাকার পরিমাণ যত বেশী তাহাই অর্থশাস্ত্রে স্থূল লাভ (Gross profit) হিসাবে পরিগণিত হয়। এই মোট লাভ হইতে উদ্যোক্তার সরকারকে কর প্রদান, ব্যবসায়ের রিজার্ভ ফাণ্ডের জন্য কিছু টাকা সংরক্ষণ এবং শিল্পের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের জন্য কিছু টাকা সংরক্ষণ করার পর যে টাকা তাহার হাতে থাকে, তাহাই তাহার নীট লাভ (Net profit)।

লাভের উপাদান (Elements of Profit)—লাভের অনেক উপাদান আছে এবং এই বিভিন্ন উপাদানের উপর বিভিন্ন অর্থবিজ্ঞানী বিভিন্ন তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। উদ্যোক্তাকে লাভের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়। ইহাকে অনেক সময় উদ্যোগের পুরস্কার (Reward of enterprise) বলা হয়।

উদ্যোগের পুরস্কার

দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ের সব সময়েই কিছু ঝুঁকির (Risk) সম্ভাবনা থাকে। ভবিষ্যতে চাহিদার কিরূপ উঠানামা হইবে সেই সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিয়া ব্যবসায় বিনিয়োগ করিতে হয়। এই ঝুঁকির মধ্যে আবার কতিপয় ঝুঁকি আছে যেগুলির বিরুদ্ধে আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর। যেমন, মোটর গাড়ি বীমা (Motor Insurance) অথবা কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের বিরুদ্ধে বীমা (Fire Insurance) করা সম্ভবপর। যে সকল ঝুঁকির বিরুদ্ধে আগেই বীমা করা যায় না, সেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বেশী থাকিলে ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করিবার সাহস থাকা চাই। লাভ হইতেছে উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহন করিবার পুরস্কার। ব্যবসায়ে এই অনিশ্চয়তা অথবা ঝুঁকিই লাভের উৎস। যদি লাভের সম্ভাবনা না থাকিত, তবে কোন উদ্যোক্তাই ঝুঁকির ভার বহন করিতে রাজী হইত না।

ঝুঁকি-বহনের পুরস্কার

তৃতীয়ত, উদ্যোক্তার যদি বাজারে একচেটিয়া অধিকার (Monopoly power) থাকে, তবে সে তাহার উৎপাদনের খরচ অপেক্ষা দাম অনেক বেশী করিতে পারে। কোন কোন উদ্যোক্তা কতিপয় বিশেষ জিনিসের পেটেন্ট চকান্ত নিজস্ব রাখিতে পারে। সেইক্ষেত্রে তাহারা বাজারে একচেটিয়া কারবারের সুবিধা ভোগ করে এবং অতিরিক্ত লাভ করে। এই ধরনের লাভকে বলা হয় একচেটিয়া কারবারের লাভ বা অতিরিক্ত মুনাফা (Monopoly profit or Excess profit)।

বাজারে একচেটিয়া অধিকারের ফলে উদ্যোক্তাদের লাভ

চতুর্থত, বাজারে যদি একচেটিয়া কারবারের পরিবর্তে বিক্রেতাদের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে, তবে বিক্রেতাগণ উৎপাদনে স্বাভাবিক লাভ (Normal profit) করে। এই লাভের পরিমাণ উৎপাদন খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রথমত, অনেক সময় কতিপয় অভাবনীয় কারণে (যেমন, হঠাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে) জিনিসপত্রের দাম হঠাৎ বাড়িয়া যাইতে পারে। তাহাতে উৎপাদকগণ কিছু লাভ করিতে পারে। ইহাকে যুদ্ধকালীন মুনাফা (War-time profits) বা "Windfall profit" বলে।

অভাবনীয় কারণ

ষষ্ঠত, গতিশীল (Dynamic) সমাজে উৎপাদন পদ্ধতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হইতেছে। উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং ব্যবসায়ে বিনিয়োগের কাঠামোর পরিবর্তন হইলে অনেক সময় উৎপাদক কিছু মুনাফা অর্জন করে। আমেরিকার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ জে. বি. ক্লার্ক (J. B. Clark) দেখাইয়াছিলেন যে স্থায় সমাজে

(Stationary Society) জনসংখ্যা, উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদির কোন পরিবর্তন হয় না বলিয়া উৎপাদনে লাভ দেখা যায় না; যে মুহূর্তে সমাজে অর্থ নৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন আরম্ভ হয় সেই সময়ে লাভের সূচনা হয়। কখনও কখনও নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের (innovations) ফলে লাভের হার বাড়িয়া যাইতে পারে। বিশেষত যে উদ্যোক্তা সকলের আগে কোন নূতন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করিতে পারে, সে সর্বাপেক্ষা বেশী লাভ করে।

সমাজের পরিবর্তনশীল অর্থ নৈতিক কাঠামো

উপরে লাভের যে সকল উপাদান আলোচিত হইল, সেগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, লাভের কোন নির্দিষ্ট কারণ বা উপাদান নাই, অনেকগুলি উপাদানের বা কারণের ফলে লাভের সৃষ্টি হইতে পারে। যখন উৎপাদনের লাভের সৃষ্টি হয়, তখন সেই লাভের কারণ শুধু একটি নহে, অনেকগুলি উপাদান হইতে পারে; ইহা ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা, সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন, উদ্যোক্তার পরিশ্রম ইত্যাদি অনেকগুলি উপাদান হইতে পারে।

Exercise

1. Explain the Ricardian Theory of Rent. [H. S. 1962]
(রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি আলোচনা কর।) (৪২-৪৪ পৃষ্ঠা)

2. Why is it necessary to pay rent on land although land is a gift of nature ? [H. S. (H) 1963] (জমি প্রকৃতির দান হইলেও জমি ব্যবহারের দরুন খাজনা প্রদান করিতে হয় কেন ?) (৪২-৪৪ পৃষ্ঠা)

3. Distinguish between Money wages and Real wages. Indicate the main factors which determine the real wages. [H. S. (H) 1963]
(আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। প্রকৃত মজুরি যে উপাদানগুলির উপর নির্ভর করে সেগুলি আলোচনা কর।) (৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা)

4. Show how wages are determined. [H. S. (H) 1962]
(কিভাবে মজুরি নিরূপিত হয় দেখাও।) (৪৬-৪৮ পৃষ্ঠা)

5. Account for the differences in wage rates in different occupations. [H. S. Com. 1961] (বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন মজুরির হার কেন হয় আলোচনা কর।) (৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা)

6. State what do you understand by the "marginal product" of a factor. Explain the relation between marginal product of labour and wages. [H. S. (H) Compartmental 1963]
(উৎপাদনের প্রান্তিক উৎপাদন বলিতে কি বুঝায় ? শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সহিত মজুরির সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।)

[**সংকেত :** অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তন না হইলে (other things remaining constant) যখন কোন উৎপাদনের পরিমাণ একটু বাড়াইলে উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়, তখন সেই অতিরিক্ত উৎপাদনকে উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন (marginal product) বলা হয়।]

7. What do you mean by Interest ? Distinguish between Gross Interest and Net Interest. How is rate of interest determined ? [H. S. (H) 1961, H. S. (C) 1962] (সুদ বলিতে তুমি কি বুঝ ? স্থুল সুদ ও নীট সুদের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। সুদের হার কিভাবে নিরূপিত হয় ?) (৪৯-৫০ পৃষ্ঠা)

8. Account for the variation in the rates of interest borne by different types of loans. [H. S. (C) 1964] (বিভিন্ন ধরনের ঋণের জন্য সুদের তারতম্য কেন হয় তাহার কারণ ব্যাখ্যা কর।) (৫১-৫২ পৃষ্ঠা)

9. Define Profit and explain the different elements of Profit. [H. S. (H) 1967] (লাভের সংজ্ঞা প্রদান কর এবং লাভের বিভিন্ন উপাদান আলোচনা কর।) (৫১-৫২ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন ধরনের ফার্ম
(Classification of Firms)

শ্রম-বিভাগ এবং বৃহদায়তন উৎপাদনের উৎপাদন-ব্যবস্থার বিভিন্ন কাজের পরিধি ব্যাপকতর হয়। তখন বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে পূর্ণ সংহতি আনয়ন করিবার, উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়-মূল্য নির্ধারণ করিবার এবং সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট ফার্মের উৎপাদন-ব্যবস্থার মূল নীতি নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন হয়। ফার্মের এই কাজগুলি যিনি সম্পাদন করেন, তাঁহাকে **উদ্যোক্তা** বা **ব্যবস্থাপক** (Entrepreneur) বলা হয়।

উদ্যোক্তা কাহাকে বলে ?

উদ্যোক্তার কাজ (Functions of an Entrepreneur)—উদ্যোক্তার অনেক কাজ। ব্যবসায় আরম্ভ হইবার অনেক আগেই তাঁহাকে ব্যবসায়ের সব-রকম

সম্ভাব্য খরচ সম্পর্কে হিসাব তৈয়ারী করিতে হয় এবং কি আয়তনে উৎপাদন করিতে হইবে তাহা স্থির করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, শ্রমিক এবং জমি ইত্যাদি উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় এবং সেগুলির সদ্ব্যবহার করিতে হয়। জমির জন্য খাজনা, মূলধনের জন্য সুদ, শ্রমের জন্য মজুরি উদ্যোক্তাকেই নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হয়। তৃতীয়ত, উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হইতেছে ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করা। ব্যবসায় মাত্রেই লাভের আশার সহিত লোকসানেরও আশঙ্কা থাকে। যদি কোন ব্যবসায়ে লোকসান হয় তবে সেই লোকসানের সমুদয় ঝুঁকি উদ্যোক্তাকেই বহন করিতে হয়। সর্বশেষে, শিল্প-ব্যবস্থার এবং কোন শিল্পের উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করা অথবা নানাপ্রকার গবেষণামূলক কাজকর্মের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করা ইত্যাদিও উদ্যোক্তারই কাজ।

বর্তমানে ফার্মগুলি সাধারণত চার প্রকারের হয়; যথা—একমালিকী ব্যবসায় (Single ownership); অংশীদারী ব্যবসায় (Partnership business); যৌথ-মূলধনী ব্যবসায় (Joint-stock business) এবং সমবায়ী কারবার (Co-operative business)।

এক-মালিকানা ব্যবসায় (Single ownership)—যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শুধু একজনই মালিক, তাহাকে এক-মালিকানা ব্যবসায় বলে। ব্যবসায়ের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তিনিই উদ্যোক্তার কাজ করেন এবং ব্যবসায়ের সমুদয় ঝুঁকি ও দায়িত্ব বহন করেন। তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠানের মালিক বলিয়া নিজের মূলধন নিজেই খাটান। উৎপাদন কত পরিমাণে হইবে এবং উৎপাদিত সামগ্রী কি দামে বিক্রীত হইবে, তাহাও তিনিই স্থির করেন। ব্যবসায়ে যদি লাভ হয়, তবে তিনিই সম্পূর্ণ লাভের অধিকারী হইবেন, আর যদি ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়, তবে তাঁহাকেই সব ক্ষতির বোঝা বহন করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে মালিক নিজেই শ্রমিকের ভূমিকা অবলম্বন করেন; অবশ্য ইহা দেখা যায় তখনই যখন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটির আকার খুবই ছোট থাকে। এই ব্যবসায়ের একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে এখানে ব্যবসায়ের মালিকানা ও পরিচালনা একই ব্যক্তির হাতে থাকায় শিল্পের উৎপাদনী-শক্তি বাড়িয়া যায়। কিন্তু এক-মালিকানা ব্যবসায়ের প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে, এই প্রকার ব্যবসায়ে মূলধনের খুব অভাব হয়। দেশের ব্যাংক অথবা অন্যান্য আর্থিক সংস্থাগুলি এই প্রকার ব্যবসায়কে টাকা ধার প্রদান করিতে সর্বদা উৎসাহী হয় না। তাহা ছাড়া, উদ্যোক্তারও যে সব সময়েই ব্যবসায় বুদ্ধি থাকে, তাহা নহে। অনেক সময় কোন প্রতিষ্ঠানের মালিকদের দোষেই অনেক প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এজন্য আজকাল জনসাধারণ অংশীদারী ব্যবসায় এবং বিশেষত যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিতেছে।

এক-মালিকানা ব্যবসায় সুবিধা ও অসুবিধা

অংশীদারী ব্যবসায় (Partnership Business)—অংশীদারী ব্যবসায়ে কয়েকজন লোক মিলিতভাবে মূলধন সরবরাহ করে এবং ব্যবসায়ের সমুদয় ঝুঁকি বহন করে। উৎপাদনের পরিমাণ অথবা দাম নির্ধারণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ অংশীদারগণ নিজেরাই স্থির করে। এইপ্রকার ব্যবসায়ের প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে, ইহাতে এক-মালিকানা ব্যবসায়ের তুলনায় অধিক পরিমাণে মূলধন পাওয়া যায়। ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও লোকসানের দায়িত্বও শুধু একজনের থাকে না, ইহা কয়েকজন অংশীদারের মধ্যে তাঁহাদের অংশের পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টিত হয়। অংশীদারদের ব্যবসায়ে লাভ অথবা ক্ষতি হইতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়ে যাঁহারা অংশীদার তাঁহাদের দায় অসীম (Unlimited liabilities)। এই ব্যবসায়ে মালিকানা ও ব্যবসায় পরিচালনা একই ব্যক্তির হাতে অর্পিত হয় না বলিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থা অধিকতর দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয়। অনেক সময়ে হয়ত একজন অংশীদারের অনেক মূলধন আছে, অথচ পরিচালনাগত কর্মকুশলতা নাই। তখন তিনি এমন আর একজন অংশীদার স্থির করিলেন যাহার পরিচালনাগত কর্মকুশলতা আছে, অথবা ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন নাই। তখন উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াসে উৎপাদন-ব্যবস্থা দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে পারে। কিন্তু, এই ব্যবসায়ের প্রধান ত্রুটি হইতেছে ইহার অস্থায়িত্ব এবং ব্যবসায়ে অসীম দায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে এই যে, ব্যবসায়ের দাম অসীম বলিয়া অংশীদারগণ নিশ্চিন্ত মনে ব্যবসায় চালাইতে পারেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে ক্রমেই পারস্পরিক অবিশ্বাসের সূচনা দেখা যায়। তাহা ছাড়া, অনেক সময়ে একজন অংশীদারের ভুলের ফলে অন্য অংশীদারেয় ক্ষতি হইতে পারে।

অংশীদারী ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধা

যৌথ-মূলধনী ব্যবসায় (Joint-Stock Business)—আধুনিক কালে যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ প্রচলিত। বহু লোক কোন কোম্পানীর শেয়ার অথবা অংশপত্র কিনিয়া উক্ত কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডার হইতে পারেন। শেয়ার-হোল্ডারগণ নিজেদের মধ্য হইতে একটি পরিচালক-সভা বা Board of Directors নির্ধারিত করেন। এই পরিচালক-সভাই শেয়ার-হোল্ডারদের পক্ষ হইতে সমগ্র শিল্পটি পরিচালনা করেন এবং উদ্যোক্তার ব্যবসায়ের সমুদয় ঝুঁকির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের শেয়ার-হোল্ডারদের দায় সীমাবদ্ধ (Limited liabilities), অর্থাৎ, কোন শেয়ার-হোল্ডার যত টাকার শেয়ার কিনেন, শিল্পের তত অংশের ঋণের জন্য তাঁহাকে ঋণ বহন করিতে হয়।

যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে আমরা চার প্রকার মূলধন দেখিতে পাই। প্রথমত, এই ব্যবসায়টি শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে পরিমাণ টাকা তুলিয়া ব্যবসায় সুরু করিবার অনুমতি সরকারের নিকট হইতে লাভ করে, তাহাকে **অনুমোদিত মূলধন**

Authorised Capital) বলে। এই অনুমোদিত মূলধনের যে পরিমাণ মূল্যের শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বাজারে চালু করা হয়, তাহাকে **ইস্যু মূলধন** (Issue Capital) বলা হয়। এই ইস্যু মূলধনের যে পরিমাণ বাজারে বিক্রীত হয়, তাহাকে **বিলীকৃত মূলধন** (Subscribed Capital) বলা হয়। ক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত এই প্রকার শেয়ার যে পরিমাণ মূল্য প্রকৃতপক্ষে অংশীদারগণের নিকট হইতে আদায় করা হয়, তাহাকে **আদায়ীকৃত মূলধন** (Paid-up Capital) বলা হয়।

যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের চার প্রকার মূলধন

যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত দুইটি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করে। প্রথমত, শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যাহারা শেয়ার ক্রয় করিবে, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটির মালিক, এবং ব্যবসায়ের সমুদয় ঝুঁকি সীমাবদ্ধ পরিমাণে তাহাদেরই বহন করিতে হয়। যদি ব্যবসায়ে লাভ হয়, তবে বৎসরের শেষে তাঁহাদের শেয়ার অনুযায়ী তাঁহারা লভ্যাংশ (Dividend) পাইয়া থাকেন।

মূলধন সংগ্রহের উপায়

দ্বিতীয়ত, যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণপত্র বা বণ্ড (Bonds) বা ডিবেঞ্চার (Debentures) বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া থাকে। যাহারা ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র ক্রয় করে, তাহারা প্রতিষ্ঠানের মহাজন; তাহাদের নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করিতে হয়। যদি কোন বৎসর যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের লোকসান হয়, তবুও ইহাকে ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার ক্রেতাদের সুদ প্রদান করিতে হয়। এই ঋণপত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয় এবং এই সময় অতিক্রান্ত হইবার সময় ঋণ শোধ করা হয়।

যে সকল শেয়ার যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক বিক্রীত হয়, সেগুলি দুই প্রকারের, যথা,—সাধারণ (Ordinary) এবং অগ্রাধিকারমূলক শেয়ার (Preferential share)। অগ্রাধিকারমূলক শেয়ারের মালিকগণকে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জিত হইলে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। যদি কোন বৎসর ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কোন লাভ না হয়, তবে এই প্রকার শেয়ারের উপর কোন কিছুই দেওয়া হয় না। কিন্তু, যদি অগ্রাধিকারমূলক শেয়ারগুলি সঞ্চয়মূলক (Cumulative) হয়, তবে কোন বৎসর লভ্যাংশ প্রদান না করা হইলে পরবর্তী বৎসরে আগেকার বৎসরের পাওনা লভ্যাংশ দিতে হয়। আগে সঞ্চয়মূলক শেয়ারগুলির মালিকদের লভ্যাংশ প্রদান করিতে হয়। তাহাদের লভ্যাংশ প্রদান করিবার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করা যায়। যদি কোন বৎসর ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা অর্জিত হয়, তবেই সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারগণ কিছু লভ্যাংশ পাইবার আশা করিতে পারে।

দুই প্রকার শেয়ার; সঞ্চয়-মূলক এবং অগ্রাধিকার-মূলক শেয়ারের সুবিধা

যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of a Joint-Stock Company)—যৌথ-মূলধনী কারবারের কতিপয় সুবিধা আছে। প্রথমত, যৌথ মূলধনী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে মূলধন সংগ্রহ-করা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা কিছু সহজ। বর্তমানে কোন দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এজন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। কিন্তু, একমালিকানা কারবার অথবা অংশীদারী কারবারে প্রচুর পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। যৌথ-মূলধনী কারবারে প্রত্যেক শেয়ার-হোল্ডারের দায় সীমাবদ্ধ বলিয়া এক জনের দোষে অন্য এক জনকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। সেজন্য বড়লোকদের পক্ষে যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে নিরাপদে মূলধন বিনিয়োগ করা অথবা শেয়ার ক্রয় করা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়ত, যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে অন্য কারবার অপেক্ষা বেশী পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করা যায় বলিয়া বিনিয়োগের পরিমাণও অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। ইহাতে উৎপাদন-খরচ কমিয়া যায়। তৃতীয়ত, এইজাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বেশী মাহিনা প্রদান করিয়া কর্মকুশল কারিগর বা দক্ষ শ্রমিকদের নিয়োগ করা সম্ভব। ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণই যে বাড়ে তাহা নহে, উৎপাদিত সামগ্রীর মানও যথেষ্ট উন্নত হয়। সামগ্রিকভাবে ইহাতে শিল্পের উৎপাদনী-শক্তি (Productivity) বাড়ে। সর্বশেষে, যৌথ-মূলধনী কারবারে মূলধনের পরিমাণ অন্য কারবার অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদনের সমুদয় সুবিধা ভোগ করা সম্ভবপর। অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় যৌথ-মূলধনী কারবারের সাহায্যে নূতন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি এবং যন্ত্রপাতির আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে।

যৌথ-মূলধনী কারবারের সুবিধা

উপরি-উক্ত গুণগুলি থাকা সত্ত্বেও যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে আমরা কতিপয় ত্রুটি দেখিতে পাই। প্রথমত, একটি যৌথ-মূলধনী কারবারের অনেক শেয়ার-হোল্ডার থাকে। তাহাদের প্রত্যেকের পক্ষে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ-গ্রহণ করা সম্ভব নহে। যদি পরিচালক-সভার (Board of Directors) সদস্যগণ খুব সৎ-প্রকৃতির না হন, তবে শেয়ার-হোল্ডারদের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের ব্যবসায় সাধারণত বৃহদায়তনের হওয়ায় কারবারের প্রকৃত মালিক, অর্থাৎ, শেয়ার-হোল্ডার অথবা পরিচালক-সভার সদস্যগণের সহিত কর্মচারীদের প্রকৃত যোগাযোগ থাকে না। ইহাতে কর্মচারীদের পক্ষেও আন্তরিকভাবে কাজ চালাইয়া যাওয়া সব সময়ে সম্ভবপর হয় না। আমরা আজকাল শিল্প-বিরোধের প্রাচুর্য দেখিতে পাই; ইহার অন্যতম কারণ হইতেছে মালিক ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত যোগসূত্রের অভাব। কারবারের সাফল্যের জন্য বেতনভুক কর্মচারিগণ যে সর্বদাই আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করে, তাহা নহে।

যৌথ-মূলধন কারবারের অসুবিধা

সমবায় (Co-operation)—বর্তমানে আমরা আর এক ধরনের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই,—যাহা সমবায়ের নীতির উপর ভিত্তিশীল। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে যে সমস্ত ত্রুটি আমরা দেখিতে পাই, সেগুলি দূর করিবার পক্ষে সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠান খুবই উপযোগী। পারস্পরিক অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য যদি কয়েকজন লোক স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া যৌথ ব্যবস্থাপনায় সংঘবদ্ধ হয়, তবেই একটি সমবায়-সমিতি গঠিত হয়। সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরাই প্রতিষ্ঠানের মালিক, তাহারা নিজেরাই মূলধন, শ্রম, ভূমি প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহ করে এবং নিজেরা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের পরিচালনা করে। ব্যবসায়ে যে মুনাফা থাকে, তাহাতে সকলেরই অংশ থাকে। যদি কখনও লোকসান হয়, তবে সকলেই ইহার বোঝা বহন করে। সমবায়-সমিতি লিমিটেড কোম্পানি হইতে পারে। শেয়ার বাবদ দেয় টাকা ছাড়া সমিতির সদস্যগণকে পাওনাদারদের সেইক্ষেত্রে বেশী টাকা দিতে হয় না। তবে যৌথ-কারবারের উদ্দেশ্য হইতেছে সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা অর্জন করা, এবং সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য হইতেছে সকলের সমষ্টিগতভাবে অর্থনৈতিক কল্যাণ করা। কয়েকজন লোক স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হইলেই সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া সম্ভবপর। যখন কতিপয় লোক কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সাম্যের ভিত্তিতে নিজেদের ইচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন তাহারা সমবায় সমিতি (Co-operative Society) গঠন করিয়াছে বলা যায়। সমবায়ের কতিপয় মূলনীতি আছে। সেইগুলি হইতেছে একতা, সাম্য, সংহতি, নৈকট্য, মিতব্যয়িতা ইত্যাদি। যে সকল লোক স্বেচ্ছায় একত্রিত হইয়া সমবায় প্রতিষ্ঠান করে, তাদের মধ্যে একতা (Unity) ও সংহতি (Solidarity) বজায় থাকা চাই। তাহাদের পরস্পরের নিকটে বাস করা চাই এবং খরচ করার সময় তাহাদের খুব মিতব্যয়ী হওয়া চাই। সততাই সমবায়ের মূলভিত্তি। সমবায় সমিতিতে লোকে স্বেচ্ছায় যোগদান করে এবং যখন খুশী তখন ইহা ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে পারে। আমাদের দেশে দারিদ্র্যের পীড়ন হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্যই সাধারণত জনসাধারণ সমবায়-সমিতি গঠন করে। এজন্য সমবায়ের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হইয়া থাকিবার প্রবণতা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের মধ্যে বেশী দেখা যায়। সমবায়ের সকল সদস্যের মর্যাদা সমান। সমবায়-সমিতির সদস্যগণ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য কাজ করে।

সমবায়-সমিতির সংজ্ঞা

যৌথ-কারবারের সহিত সমবায়ের পার্থক্য

সমবায়ের নীতি

বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতি ঃ

সমবায়-সমিতি অনেক প্রকারের হইতে পারে। সমিতিগুলিকে প্রধানত **গ্রামীণ** (Rural) এবং **পৌর** (Urban)—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ভারতে গ্রামীণ সমবায়-সমিতিগুলি রাইফিজেন (Raiffeisen) নামক জার্মান সমবায়-নেতার

অনুসৃত নীতি অনুযায়ী গঠিত। গ্রামীণ সমিতিগুলি সাধারণত কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের সমিতির শেয়ারের মূল্য সাধারণত অল্প রাখা হয় যাহাতে দরিদ্র গ্রামবাসীগণ সহজেই এই সমিতিগুলির সদস্য হইতে পারে। এইগুলিতে সদস্যদের দায় সাধারণত অসীমাবদ্ধ থাকে এবং উৎপাদন-মূলক প্রচেষ্টায় সাহায্য করার জন্য এই সমিতিগুলি কাজ করে। পৌর-সমিতিগুলির অপর একজন জার্মান সমবায়ী নেতা স্থলজডেলিত্‌স-এর অনুসৃত নীতি অনুযায়ী পরিচালিত। যেমন, উৎপাদনের জন্য উৎপাদকগণ একটি সমবায়-সমিতি (Producers' Co-operative) এবং জিনিস ক্রয়ের জন্য ক্রেতাগণ একটি সমবায়-সমিতি (Consumers' Co-operative) গঠন করে। পৌর-সমিতিতে সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ থাকে ও শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগৃহীত হয়। বেতনভুক কর্মচারীদের সাহায্যে পৌর সমবায়-সমিতিগুলির কাজ চালানো হয়।

ভারতে মোটামুটিভাবে আমরা নিম্নলিখিত ধরনের সমবায় সমিতি দেখিতে পাই—

সমবায় আন্দোলন
↓

- সমবায় ঋণদান সমিতি
  - সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতি (Co-operative Agricultural Credit Society)
  - সমবায় অ-কৃষি ঋণদান সমিতি (Co-operative Non-agricultural Credit Society)
- ঋণদান ব্যতীত অন্যান্য সমবায় সমিতি
  - কৃষিগত (Agricultural) যেমন, বাজার-ব্যবস্থা ও ক্রেতা-বিক্রেতা সমবায় ইত্যাদি
  - অ-কৃষি (Non-agricultural) যেমন, গৃহ-নির্মাণ, শিল্প-সমবায় ইত্যাদি

সমবায়-সমিতিগুলি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয়। আবার, বহুমুখী উদ্দেশ্য লইয়াও সমবায়-সমিতি (Multi-purpose Co-operative Society) গঠিত হইতে পারে। সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি কৃষকদের আর্থিক সাহায্য করিয়া থাকে।

সমবায় উৎপাদন-সমিতিগুলি কৃষি ও এবং শিল্প উভয়ক্ষেত্রেই গঠিত হইতে পারে।

কৃষি ঃ কৃষিক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলন সম্প্রসারিত হইলে সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। জমির উপবিভাজন ও বিখণ্ডনের কুফলগুলি দূর করার জন্য সমবায়-খামার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সমবায়-খামারের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভবপর। সমবায়-সমিতির মাধ্যমে কৃষকগণ তাহাদের উৎপাদিত

সামগ্রী বিক্রয় করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। তাহাছাড়া, কাঁচামাল সরবরাহ, উৎপাদন-প্রচেষ্টার জন্য মূলধন সরবরাহ প্রভৃতি সমবায় সমিতির মাধ্যমেই সহজলভ্য হয়। কৃষিক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের সমবায়-সমিতি দেখিতে পাই। কৃষকদের ঋণদান করিবার জন্য সমবায় ঋণদান সমিতি (Co-operative Credit Societies), ঋণ ব্যতীত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য সমবায়-সমিতি (Co-operative Non-credit Society), উৎপাদন সমিতি, জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সমবায়-সমিতি (Co-operative Sales or Purchase Society, or Co-operative Marketing Society), সমবায়-ব্যাংক মূলক (Co-operative Bank), সমবায় গ্রামীণ সমিতি (Co-operative Rural Societies), শিল্প-সমবায় সমিতি (Industrial Co-operatives) ইত্যাদি বহু প্রকার সমবায় সমিতি গঠিত হইতে পারে।

ক্ষুদ্রশিল্প, ভোগ্যপণ্য ক্রয়, এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রচেষ্টা : কুটির-শিল্প বিশেষত হস্তচালিত তাঁত-শিল্প, চর্ম-শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায়-সমিতিগুলির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সমবায় বিক্রয়-সমিতির মাধ্যমে উৎপাদিত জিনিস বিক্রয় করা হইলে বিক্রেতাগণ নিজেদের জিনিসের জন্য ন্যায্য দাম পাইয়া থাকে। অনুরূপভাবে সমবায় ক্রয়-সমিতির মাধ্যমে জিনিসপত্র ক্রয় করিলে ক্রেতাগণও ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র ক্রয় করিতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উন্নয়নের পথে প্রধান সমস্যা হইতেছে মূলধনের স্বল্পতা। অ-কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতির মাধ্যম এই মূলধন পাওয়া সহজ হয়।

সমবায়-সমিতিগুলি হইতে আমরা অনেক উপকার লাভ করি। সমবায়-সমিতির মাধ্যমে কৃষির উন্নতি, কুটির-শিল্পের উন্নতি এবং কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভবপর। তাহা ছাড়া, বহুমুখী সমবায়-সমিতির (Multi-purpose Co-operative socities) সাহায্যে সামগ্রিক-ভাবে পল্লী-জীবনের পুনর্গঠন করা সম্ভবপর। ভারতবর্ষে সমবায় গ্রাম ব্যবস্থার (Co-operative Village Management) বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, সমবায় কৃষি-ব্যবস্থার (Co-operative Farming) প্রবর্তন করিয়া কৃষকদের এবং কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি করা যায়। সমবায় আন্দোলন সফল হইলে কৃষকদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থা দূর করার ব্যাপারে ঋণদান সমবায়-সমিতিগুলির গুরুত্ব খুবই বেশী। এককথায়, সমবায় আন্দোলনের উন্নতির মাধ্যমে অর্থ নৈতিক উন্নতির দৃঢ় বুনিয়াদ গঠন করা সম্ভবপর হয়।

সমবায়-সমিতিগুলির সুফল

সমবায় সমিতির প্রধান বৈশিষ্ট্য—সমবায় সমিতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য-গুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) সমিতির মালিকানা ব্যক্তিগতভাবে সদস্যদের হাতেই থাকে। কিন্তু সমিতির

ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যৌথভাবে সকলের। লাভের অংশ সকলেই পায়। (২) সমবায় সমিতির ক্রয় ও বিক্রয় ব্যবহার ক্ষেত্রে দালালের প্রয়োজন হয় না। উৎপাদিত সামগ্রী খোলাবাজারে বিক্রয় হয়। (৩) সদস্যগণ তাঁহাদের কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন। (৪) সংগঠনের কাজে সব সদস্যেরই দায়িত্ব থাকে। ইহার ক্রিয়াকলাপে সব সদস্যেরই সমান ভোটাধিকার থাকে। (৫) লাভের কিছু অংশ রিজার্ভ তহবিলের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। (৬) সমবায় সমিতি সর্বদাই স্বেচ্ছামূলক। কাহাকেও জোর করিয়া সমবায় সমিতির সদস্য করা হয় না। (৭) ইহা বিশেষ ব্যয়বহুল নহে। (৮) সমবায়ের মূল নীতিগুলির প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া সমিতিগুলি কাজ করে বলিয়া সদস্যদের নৈতিক উন্নতিসাধনের দিকে সমবায় সমিতির বিশেষ লক্ষ্য থাকে। যদি কোন অনগ্রসর দেশ কোন গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তবে সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা তাহার সহিত খুব ভালভাবে খাপ খাইবে।

একউদ্দেশ্য সাধক এবং বহুউদ্দেশ্য সাধক সমবায়-সমিতি (Single-purpose and Multi-purpose Co-operative Societies)—যখন একটি মাত্র উদ্দেশ্য লইয়া কোন সমবায়-সমিতি গঠিত হয় তখন ইহাকে একউদ্দেশ্য সাধক সমবায়-সমিতি (Single-purpose Co-operative society) বলা হয়; যেমন, সমবায় ঋণদান সমিতি, সমবায় ভোগ-সামগ্রী বিক্রয়করণ সমিতি প্রভৃতি। কিন্তু কতিপয় সমবায়-সমিতি আছে যেগুলি হইতেছে সর্বার্থ সাধক বা বহুউদ্দেশ্য সাধক (multi-purpose) সমিতি। যেমন, একই সমবায়-সমিতি একাধারে ঋণ সরবরাহ, বীজ ও সার সরবরাহ এবং উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়করণের ব্যবস্থা করিতে পারে। এইগুলি তখন একটির পরিবর্তে বহুউদ্দেশ্য সাধন করে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যে আমরা অনেক বহুউদ্দেশ্য সাধক সমবায়-সমিতি দেখিতে পাই। বর্তমানে ভারতে যে সেবা-সমবায়-সমিতিগুলি (Service Co-operatives) গঠিত হইয়াছে সেইগুলিকে আমরা বহুউদ্দেশ্য সাধক সমিতি আখ্যা দিতে পারি। গ্রামীণ জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বহুউদ্দেশ্য সাধক সমবায়-সমিতির গুরুত্ব খুবই বেশী। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে একক উদ্দেশ্য সাধক সমিতিগুলি বিশেষ কার্যকর হয়। যেমন, ফসল তোলার সময় কৃষকদের ঋণ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে।

সমবায়ের সুবিধা : সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন সুবিধা প্রতিভাত হয়, কৃষি, শিল্প, পণ্য সরবরাহ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে। গ্রামীণ সমবায়-সমিতির মাধ্যমে কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সমুদয় সাহায্য পাওয়া যায়। মূলধনের অভাব, ভাল বীজ ও সারের অভাব, কৃষিজাত সামগ্রীর ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের অসুবিধা প্রভৃতি দূর করা সম্ভব হয় সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব মানুষ নিজের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে। উৎপাদকগণ নিজেদের তৈরী জিনিসের প্রচার কাজ

চালাইবার প্রয়োজন ততটা অনুভব করে না যখন তাহারা সমবায়-সমিতির মাধ্যমে নিজেদের উৎপাদিত জিনিস বিক্রয় করা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় শিল্পক্ষেত্রে বা কৃষিক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না। কিন্তু সমবায়ের মাধ্যমে বক্তিগত মালিকানা বজায় রাখিয়া যৌথ-ব্যবস্থাপনায় কৃষির উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর। অনুরূপভাবে ক্ষুদ্রশিল্পে অর্থ সংস্থান ও উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়, ভোগ-সামগ্রীর সরবরাহ, জিনিসপত্র ক্রয় প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সমবায় আমাদের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সমবায়ের মাধ্যমে সকলেরই সমান অর্থ নৈতিক মর্যাদা লাভ করা। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উৎসাহের বিনাশ ঘটে না, এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে সামাজিক স্বার্থও সুরক্ষিত থাকে। ইহার ফলে জীবনযাত্রার মান সামগ্রিকভাবে উন্নত হয়।

সমবায়ের অসুবিধা ঃ কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলন বিশেষ উপযোগী হইলেও বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, যেখানে প্রচুর মূলধন ও বিরাট সংগঠনের প্রয়োজন হয়, সমবায়ের উপকারিতা খুবই সীমাবদ্ধ। বৃহৎ শিল্পগুলির ক্ষেত্রে সমবায় এখনও বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই। দ্বিতীয়ত, যদিও সমবায় ব্যবস্থায় সকলেই সমান অর্থ নৈতিক মর্যাদা লাভ করে, তবুও সমবায়-সমিতিগুলির পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সব সদস্যই সমান উপযুক্ত বা দক্ষ নহে। সব সদস্যেরই দক্ষতা যে সমান তাহা নহে ; অথচ সমবায় সমিতির সংগঠনে সব সদস্যেরই সমান ভূমিকা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে বহু সমবায় সমিতি ধ্বংস হইয়াছে।

তৃতীয়ত, সমবায়ের আদর্শ এবং মূল নীতি সব সদস্যই সর্বদা অনুধাবন করিতে পারে না। সমবায়ের আদর্শ অনুযায়ী প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু যখন কোন সদস্য এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে, তখন সমবায়-সমিতি বিশেষ সাফল্য অর্জন করিতে পারে না। ভারতে গ্রামবাসীদের অধিকাংশই শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত। নিরক্ষর ও অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের পক্ষে সর্বদা সমবায়ের আদর্শ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। তাহা ছাড়া, ক্ষেত্র বিশেষে গ্রাম্য দলাদলিও সমবায়-সমিতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সর্বোপরি আর্থিক অভাবে সমবায়-সমিতিগুলির পক্ষে সাফল্যের সঙ্গে কাজ চালাইয়া যাওয়া সর্বদা সম্ভব হয় না।

Exercise

1. Discuss the functions of an entrepreneur in a modern industrial organisation.

(আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থায় উদ্যোক্তার কাজগুলি আলোচনা কর।) (৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা)

2. Describe the different forms of Business Organisation.

(বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা কর।) (৫৬-৫৮ পৃষ্ঠা ; ৬০ পৃষ্ঠা)

3. What are the various ways in which a typical Joint Stock Company raises its capital ? (একটি যৌথ-মূলধনী কারবার কি কি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করে ?) (৫৮ পৃষ্ঠা)

4. Comment on the advantages and limitations of production by Joint Stock Companies. (যৌথ-মূলধনী কারবারের দ্বারা উৎপাদনের স্থবিধা ও অস্থবিধাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (৫৯ পৃষ্ঠা)

5. What do you mean by 'Co-operation' ? What are the different types of 'Co-operative Societies' ? ('সমবায়' বলিতে তুমি কি বুঝ ? কত প্রকার সমবায় সমিতি দেখিতে পাওয়া যায় ?) (৬০-৬১ পৃষ্ঠা)

6. Write notes on single purpose and multi-purpose Co-operative Societies. (একক উদ্দেশ্য সাধক এবং বহু উদ্দেশ্য সমবায় সমিতির উপর টীকা লিখ।) (৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the merits and demerits of Co-operation. (সমবায়ের স্থবিধা ও অস্থবিধা আলোচনা কর।) (৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা)

ষষ্ঠ অধ্যায় | বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন (Large-scale and Small-scale Production)

বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে শ্রম-বিভাগ এবং শিল্প-স্থানীয়করণ।[১]

শিল্প স্থানীয়করণ ও ইহার কারণ (Localisation of Industries and its Causes)—আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগের প্রভাবে অনেক সময় একটি শিল্প বিশেষ একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকে। ইহাকে শিল্পের স্থানীয়করণ বলে। যেমন, বোম্বাই ও আহমেদাবাদে বস্ত্রশিল্প, কলিকাতা ও ইহার আশেপাশে পাটশিল্প এবং উত্তরপ্রদেশে চিনিশিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

শিল্প স্থানীয়করণের কারণ (Causes of Localisation of Industries)—শিল্প স্থানীয়করণের কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হইতেছে কাঁচা মালের নিকটে শিল্পের অবস্থান (nearness to raw materials)। যেমন পূর্ববঙ্গে কাঁচা পাট বেশী করিয়া উৎপাদিত হইত বলিয়া কলিকাতার আশেপাশে পাটশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে জামসেদপুরের কাছাকাছি লোহা, কয়লা প্রভৃতি খনিজ সামগ্রী আছে বলিয়াই

১ শ্রম-বিভাগ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। (৩৮-৪০ পৃষ্ঠা)

সেখানে ইস্পাতের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। বোম্বাই রাজ্যে কাঁচা তুলা পাওয়া যায় বলিয়াই বোম্বাই ও আমেদাবাদে বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, কোন স্থানে একটি শিল্প কেন্দ্রীভূত হইবার আর একটি কারণ হইল শক্তি-সম্পদের উৎসের নিকট ইহার অবস্থান (nearness to sources of power)। পূর্বে জলশক্তির দ্বারা অনেক কারখানা চালিত হইত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলি হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত।

তৃতীয়ত, বাজারের নিকট অবস্থান (nearness to market) শিল্পের স্থানীয়করণের আর একটি কারণ। কলিকাতায় পাটশিল্পের প্রতিষ্ঠা পাটজাত দ্রব্যাদির বিরাট বাজার সৃষ্টি করিয়াছে। সাধারণত বড় বড় শহর, রেলওয়ে জংসন ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য কেন্দ্রীভূত হয়।

চতুর্থত, প্রচুর পরিমাণে শ্রমিকের যোগানও (supply of labour) শিল্পের স্থানীয়করণকে প্রভাবিত করে। দক্ষ কারিগর বা কর্মকুশল শ্রমিক ব্যতীত কোন শিল্পই উন্নত হইতে পারে না। যে স্থানে কর্মকুশল শ্রমিকের প্রচুর সরবরাহ থাকে, সেখানেই শিল্পপতিগণ নিজেদের শিল্পকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন।

পঞ্চমত, ভৌগোলিক কারণ, যেমন জলবায়ু, প্রাকৃতিক কারণে জমির উর্বরতা ইত্যাদিও শিল্পের স্থানীয়করণ প্রভাবিত করে। বাংলাদেশে অধিক পাটের উৎপাদন হওয়ার অন্যতম কারণ ইহার জলবায়ু এবং জমির গুণ এবং সেইজন্য পাটশিল্পে কাঁচামাল এখানে এত বেশী। সুতরাং পাটশিল্প যে বাংলাদেশেই (যেখানে কলিকাতার মত এত বড় শহর ও বিরাট বাজারের সম্ভাবনা আছে) কেন্দ্রীভূত হইবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই।

ষষ্ঠত, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাও শিল্প স্থানীয়করণকে প্রভাবিত করে। কলিকাতা যখন ভারতের রাজধানী ছিল, তখন বিভিন্ন শিল্প সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাহায্যের আশায় কলিকাতা ও ইহার আশেপাশে কেন্দ্রীভূত হইত।

শিল্পের স্থানীয়করণ সাধারণত বৃহদায়তন উৎপাদন এবং শ্রম-বিভাগের অন্যতম প্রভাব। যে সকল দেশ শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেইগুলিতেও আমরা শিল্পের স্থানীয়করণ দেখিতে পাই। আধুনিককালে আমরা শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের (Decentralisation of industries) দিকে একটি ঝোঁক দেখিতে পাই। ভারতবর্ষে গ্রামীণ ও কুটীরশিল্পগুলিকে বিকেন্দ্রিক করার চেষ্টা করা হইতেছে। শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ করিবার প্রধান কারণ হইতেছে শিল্প স্থানীয়করণের অপগুণগুলি প্রতিরোধ করার প্রয়াস। কিন্তু শিল্প স্থানীয়করণের কতিপয় গুণও আছে; আমরা এখন শিল্প স্থানীয়করণের গুণ ও অপগুণগুলি আলোচনা করিব।

শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ

শিল্প স্থানীয়করণের সুবিধা (Merits of Localisation of Industries)—শিল্প স্থানীয়করণের প্রধান গুণ হইতেছে এই যে একটি স্থানে শিল্প কেন্দ্রীভূত

হইলে সেখানকার উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী বিশেষ সুনাম অর্জন করে। যেমন, শান্তিপুরের ধুতি ও শাড়ী অথবা আহমেদাবাদ মিলগুলির কাপড় ক্রেতার নিকট বিশেষ আদরণীয় হয়। সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়িগুলি সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া সুনাম অর্জন করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, কোন একটি বিশেষ স্থানে শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে যে শুধু ইহার উৎপন্ন সামগ্রীর সুনাম হয় তাহা নহে, সেই স্থানে কর্মকুশল কারিগরও সহজলভ্য হয়। ভাল তাঁতী শান্তিপুরেই পাওয়া যায়। শিল্পের স্থানীয়করণ যখন হয়, তখন বিভিন্ন অঞ্চলের সুদক্ষ কারিগর ও শ্রমিকগণ সেই স্থানে কাজের আশায় একত্রিত হয়।

তৃতীয়ত, শিল্প স্থানীয়করণের ফলে শিল্পাঞ্চলে একটি শিল্প-পরিবেশের সৃষ্টি হয় যাহাতে শিল্প-কারিগরদের সন্তান-সন্ততিগণও সেই শিল্প-সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে প্রাথমিক জ্ঞান এবং অনেক সময় পারদর্শিতা অর্জন করে। শৈশব হইতেই ভবিষ্যতের কারিগরগণ সংশ্লিষ্ট শিল্প সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য আয়ত্ত করে এবং সেই কাজে উৎসাহী হয়।

চতুর্থত, শিল্পের স্থানীয়করণ হইলে শিল্পাঞ্চলে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও উত্তমরূপে গড়িয়া উঠে এবং সেই অঞ্চলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হয় ও অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়।

সর্বশেষে, শিল্পের স্থানীয়করণ হইলে শিল্পাঞ্চলের আশেপাশে অনেক পরিপূরক শিল্প (subsidiary industries) গড়িয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ, কলিকাতার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কলিকাতার আশেপাশে অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এইগুলির অধিকাংশই পরিপূরক শিল্প হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া, কোন শিল্পের বিশেষ সাহায্যে আসে এই প্রকার শিল্পগুলিও সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হয়।

শিল্প স্থানীয়করণের ত্রুটি—শিল্প স্থানীয়করণের প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে যদি কোন শিল্পের ব্যবসায়ে কখনও মন্দা দেখা দেয়, তখন সেই শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলেরই আর্থিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়। তখন অনেক লোক বেকার হইয়া যায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে যখন পশ্চিববঙ্গের পাটশিল্প বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তখন অনেক লোক বেকার হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের সময় শিল্পের একদেশতা দেশের নিরাপত্তার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। পশ্চিমবঙ্গেই পাটশিল্প কেন্দ্রীভূত; কিন্তু যুদ্ধের সময় যদি কলিকাতা শহর আক্রান্ত হয়, তবে দেশের পাটশিল্প বিরাট ক্ষতি ও দুর্গতির সম্মুখীন হইবে। কিন্তু শিল্পটি যদি পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীভূত না হইয়া সমগ্র দেশে বিকেন্দ্রীভূত হইত, তবে এই বিপদের সম্ভাবনা থাকিত না। দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য এবং শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য সমগ্র দেশ একটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত একটি শিল্পের উপর নির্ভর করিবে—অর্থনৈতিক বিবেচনার দিক হইতে ইহা সমর্থন-

যোগ্য নহে। সেইজন্যই আজকাল শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের (Decentralisation industries) দিকে একটি ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা (Advantages or Economies of Lar Scale Production)—বৃহদায়তন উৎপাদনের বিভিন্ন সুবিধাগুলিকে আ দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি ; যথা—**আভ্যন্তরীণ সুবিধা** ও ব্যয়-সং (Internal economies) এবং **বাহ্যিক সুবিধা** ও ব্যয়সংকোচ (Exter economies)। একটি বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠান যখন নিজের চেষ্টায় উৎপাদ উপকরণগুলি সদ্ব্যবহার করে তখন শিল্পে একদিকে যে উৎপাদন বাড়ে, অপরদিকে সেইপ্রকার উৎপাদনের খ কমিয়া যায়। বিশেষত উৎপাদনের কোন অবিভা উপকরণ (Indivisible factor of production) থাকি ইহা যতই ব্যবহার করা হইবে, ইহার খরচ ততই কমিয়া যাইবে। একটি উদাহ দিলে কথাটি পরিষ্কার হইবে। ধরা যাক্‌, একটি মেসিন হইতে আমরা কোন জিনি ২০টি ইউনিট পাইতে পারি, অর্থাৎ মেসিনটি কোন জিনিসের ২০টি ইউনিট উৎপা করিতে পারে। কিন্তু আমাদের যদি ১০টি ইউনিট জিনিসের প্রয়োজন হয়, ত আমরা মেসিনটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটি অংশ ব্যবহার করিতে পারি কারণ মেসিনটি অবিভাজ্য। সুতরাং দশ ইউনিট উৎপাদন করিবার প্রয়ো থাকিলেও আমাদের সম্পূর্ণ মেসিনটি ব্যবহার করিতে হইবে। যদি মেসিনটি ব্যব করিতে ২০ টাকা খরচ হয়, তবে দশ ইউনিট জিনিসের জন্য মেসিনটি ব্যবহার করি হইয়াছে বলিয়া প্রতি ইউনিটে ২ টাকা খরচ হইয়াছে। কিন্তু, যদি আমা ২০ ইউনিটের প্রয়োজন হইত, তবে আমরা এই মেসিনটির উৎপাদন-ক্ষমত সদ্ব্যবহার করিতে পারিতাম এবং ২০ টাকা খরচ করিয়া ২০ ইউনিট উৎপা করিতে পারিতাম। তাহাতে প্রতি ইউনিটে খরচ হই ১ টাকা। ইহা হইতেই অবিভাজ্য উপাদানের উৎপাদ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে যে খরচ কমিয়া যায় তাহা স্পষ্ট হইবে বৃহদায়তন উৎপাদনেই আমরা এই সুবিধা পাইয়া থাকি। কোন বিশেষ শি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহাকে আভ্যন্তরীণ সুবিধা (Internal economy) ব হয়। আমরা এইরূপ অন্যান্য আভ্যন্তরীণ সুবিধাগুলিরও বিচার করিয়া দেখি পারি।

বৃহদায়তন উৎপাদনের দুই প্রকার সুবিধা—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক

উৎপাদন-খরচ কমিয়া যায়

দ্বিতীয়ত, বৃহদায়তন উৎপাদনে কারখানাগুলি আয়তনে বড় হয়। কারখানাগুলি অনেক জিনিস উৎপাদন করে। সুত এই কারখানাগুলির পক্ষে বিভিন্ন উৎপাদিত জিনিে জন্য একসাথে বিজ্ঞাপন বা প্রচারের ব্যবস্থা করিলে প্র জিনিস অনুযায়ী খরচ অনেক কমিয়া যায়।

উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং কারখানার আয়তন বড় হয়

তৃতীয়ত, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সব সময়েই শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি অতি সহজেই পাইকারী হারে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে পারে এবং মূলধনের ব্যবস্থা করিতে পারে। ব্যাংকের নিকট হইতে যদি ঋণ গ্রহণ করিতে হয় তখনও ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ঋণগ্রহণযোগ্যতা (credit-worthiness) বেশী হয়। সরকার বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখে। ইহাতে বৃহৎ শিল্পগুলি নিজেদের চেষ্টায় সরকারের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানির লাইসেন্স আদায় ইত্যাদি—এই জাতীয় বিভিন্ন সুবিধা পাইয়া থাকে।

কাঁচামাল এবং মূলধন সহজলভ্য হয়

চতুর্থত, বৃহদায়তন উৎপাদনে শ্রম-বিভাগ নীতি (Principle of Division of Labour) কার্যকর করা সম্ভবপর হয়। সুতরাং শ্রম-বিভাগের যে সমস্ত সুবিধা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি, সেগুলির সবই আমরা বৃহদায়তন উৎপাদনে পাই। বিশেষত, কোন বিশেষ কাজে শ্রমিকদের বিশিষ্ট দক্ষতা (Specialisation) অর্জন করা ও শ্রমিকদের মধ্যে সহযোগিতার (Co-operation) ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্ভবপর হয়। ইহাতে শুধু উৎপাদনের বৃদ্ধি হয় না, উৎপাদনের খরচও কমিয়া যায়।

শ্রম-বিভাগ নীতি কার্যকর হয়

পঞ্চমত, বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে উপযুক্ত মাহিনা দিয়া এবং অন্যান্য ভাবে অর্থব্যয় করিয়া কারিগরি বিশেষজ্ঞ এবং সুদক্ষ শ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করা সম্ভবপর হয়। ইহাতে উৎপাদনের বৃদ্ধি হয়।

সুদক্ষ কারিগর পাওয়া যায়

ষষ্ঠত, বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে শ্রমিকদের জন্য অধিক পরিমাণে কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়। বৃহদায়তনের উৎপাদন হইলেই যে কেবল মেসিন প্রবর্তিত হইবে তাহা নহে। ভারতে চা-শিল্পে বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু, ইহাতে বেশী মেসিন প্রবর্তনের সুবিধা নাই, অথচ ইহাতে অনেক লোকের কাজের ব্যবস্থা হইয়াছে। কৃষিক্ষেত্রে যদি আমরা বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা চালু করি, তবে কৃষকদের আয় বাড়িবে, বেকার কৃষকদের কাজের ব্যবস্থা হইবে, পতিত জমির উদ্ধার হইবে, কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে এবং কাঁচামাল অথবা উৎপাদনের উপকরণ কম নষ্ট হইবে।

অধিকতর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়

সপ্তমত, বৃহদায়তন উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। বাটা কোম্পানির ন্যায় একটি বড় জুতা তৈয়ারীর কারখানার কথা ধরা যাক্। এখানে শ্রম-বিভাগ থাকায় উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন লোক কাজ করে (যেমন, কেহ

মেসিনের সাহায্যে চামড়া পরিষ্কার করে, কেহ সেই চামড়া মেসিন দিয়া সেলাই ক এবং আবার সেই চামড়ায় মেসিনের সাহায্যে রং ইত্যাদি) এবং প্রত্যেক পর্যায়ের কাজগুলির মধ্যে এ যোগসূত্র থাকে। ইহাতে কাজের সুবিধা হয় এবং উৎপা সামগ্রী অথবা উৎপাদনের জন্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অথবা উপকরণের অপচয় কম হ

উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে যোগসূত্র আছে

সর্বশেষে, বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে ইহার আশেপাশে অ পরিপূরক শিল্প (Subsidiary industry) গ উঠে। শুধু তাহাই নহে, শিল্পজাত দ্রব্যাদির অ অংশ (By-products) হইতে অন্যান্য জিনিস তৈয়ার করা সম্ভবপর হয়।

পরিপূরক শিল্প গড়িয়া উঠে

উপরের বৃহদায়তন উৎপাদনের আভ্যন্তরীণ সুবিধাগুলির কথা আলো হইল। বৃহদায়তন উৎপাদনের কতিপয় বাহ্যিক সুবিধাও (external economi আছে। সেগুলি একটি বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠান শুধু নিজের চেষ্টায় লাভ করি পারে। সমগ্রভাবে কোন শিল্পের (অথবা শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমষ্টির) উন্নতি হইলে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান সেই সুবিধা পা পারে, অথবা সমগ্রভাবে কোন শিল্প (অথবা শিল্প-প্রতি সমষ্টি) নিজের চেষ্টায় কতিপয় সুযোগ-সুবিধা অর্জন করিতে পারে এবং শি অন্তর্ভুক্ত যে কোন প্রতিষ্ঠান সেই সুযোগ-সুবিধাগুলি লাভ করিতে পারে। সুযোগ-সুবিধাগুলি কোন বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাহ্যিক (extern কারণ, এইগুলি ইহার নিজের চেষ্টায় অর্জিত হয় না। কিন্তু, সমগ্রভাবে শিল্পটির অথবা শিল্প-সমষ্টির পক্ষে ইহা আভ্যন্তরীণ। শিল্পের একদেশতা সম্বন্ধে আলো করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি যে একটি স্থানে কোন শিল্প কেন্দ্রীভূত হ সেই স্থানের সুনামের ভাগ সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠান পাইয়া থাকে। যেমন, শান্তিপু তাঁতী মাত্রই সুনিপুণ তাঁতী হিসাবে সুনামের অধিকারী হয়। তাহা ছাড়া, শি একদেশতার ফলস্বরূপ শিল্পাঞ্চলে অভিজ্ঞ শ্রমিকদের যোগান সর্বদাই বজায় থা তাহা ছাড়া, সমগ্র শিল্পটি চেষ্টা করিয়া যদি সরকারের নিকট হইতে কোনরূপ বি সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে পারে, তবে ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিও কোনরূপ চে না করিয়াও সেই সুবিধার অধিকারী হয়।

বিভিন্ন বাহ্যিক সুবিধা

বৃহদায়তন উৎপাদনের অসুবিধা (Diseconomies of Large-sca Production)—উৎপাদনের আয়তন আমরা যত খুশি বাড়াইতে পারি না উৎপাদনের অবিভাজ্য উপকরণগুলি ক্রমে ব্যবহৃত হই হইতে এমন-একটি পর্যায়ে আসিতে পারে যখন এইগুলি উৎপাদনী-শক্তি ক্রমেই কমিয়া যাইবে। তখন ব্যয়সঙ্কো না হইয়া ব্যয়-বৃদ্ধি হয়। বৃহদায়তন উৎপাদনে শিল্পগুলি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংহতি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু, উৎপাদনের আয়তন যদি ক্রমে

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি চূড়ান্তভাবে কার্যকর হইতে পারে

বৃহৎ হইতে থাকে, তখন উৎপাদকের পক্ষে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সে সংহতি বজায় রাখা সম্ভবপর নাও হইতে পারে।

শিল্প-বিরোধের সম্ভাবনা

দ্বিতীয়ত, বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে উৎপাদকের পক্ষে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের খুঁটিনাটি কাজ সম্বন্ধে অবহিত থাকা অথবা শ্রমিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা সম্ভবপর হয় না। ইহাতে শিল্প-মালিকদের সহিত শ্রমিকদের সম্বন্ধ অনেক ক্ষেত্রেই প্রীতিপূর্ণ হয় না। ইহাতে শিল্প-বিরোধের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

বাজারের আয়তন

তৃতীয়ত, বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা শ্রম বিভাগের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার শ্রম-বিভাগ বাজারের আয়তন দ্বারা সীমাবদ্ধ। উৎপাদন-ব্যবস্থা বৃহদায়তন করা উচিত হইবে কিনা তাহা মূলত উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য বাজারের চাহিদার উপর নির্ভর করে।

চতুর্থত, সূক্ষ্ম কারুকার্যসম্পন্ন জিনিস তৈয়ারী করিতে হইলে বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা হইতে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা অধিকতর উপযোগী। বাজারে এই ধরনের ক্রেতা থাকে, যাহারা সর্বদাই হস্তজাত জিনিসপত্র কিনিতে চাহে।

বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার উপরি-উক্ত সীমাগুলিকে আমরা ইহার অসুবিধা (Diseconomies) বলিতে পারি। আধুনিককালে সুদক্ষ কারিগরের অভাব, কাঁচামালের অভাব এবং মূলধনের অভাব থাকায় উৎপাদকগণ প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। বিশেষত অনুন্নত দেশগুলিতে শিল্প-বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা টিকিয়া থাকার কারণ (Causes of the survival of small-scale Production)—বৃহদায়তন উৎপাদনের অনেক সুবিধা আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু এইগুলি থাকা সত্ত্বেও আমরা ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা টিকিয়া থাকিতে দেখিতে পাই। ইহার প্রথম কারণ, বৃহদায়তন ব্যবস্থার যে শুধু কতিপয় সুবিধা আছে, তাহা নহে; ইহার কতিপয় অসুবিধাও আছে। একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে শুধু উৎপাদন খরচই বাড়িতে থাকে। বৃহদায়তন উৎপাদনের সীমা নির্ভর করে বাজারের বিস্তৃতির (extent of the market) উপর। বাজারের বিস্তৃতি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট জিনিসের চাহিদার উপর। অনেক জিনিস আছে যেগুলি বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপন্ন হয় না। সূক্ষ্ম কারুকার্য, হাতের তৈরী জিনিস, এইগুলিরও একটি চাহিদা আছে এবং সেই চাহিদা মিটাইতে হইলে বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা হইতে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থাই অধিকতর উপযোগী। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, খুব মিহি কাপড় হয়তো একটি মিল তৈয়ারী করিতে পারে। কিন্তু, ইহার উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং বিভিন্ন ধরনের নকশা তৈয়ারী করিয়া ইহাকে রুচি-সম্পন্ন করিয়া তোলা

একটি মিলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তখনই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রসারের পথে কতিপয় ভৌগোলিক বাধা (Geographical obstacles) এবং মনস্তাত্ত্বিক বাধা (Psychological obstacles) থাকে। যদি কোন জিনিস উৎপাদন করিবার জন্য দরকারী কাঁচামাল সমস্ত দেশে ছড়াইয়া থাকে অথবা ভোগকারীগণ বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া থাকে, তবে অনেক ক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়।

তৃতীয়ত, জিনিসপত্রের পৃথকীকরণ (Product differentiation) করিলে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান নিজের নিজের জিনিসগুলির বৈশিষ্ট্য বাড়াইবার চেষ্টা করে। তখনও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

ভারতে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের স্থান ও প্রয়োজনীয়তা (Place and Importance of Small and Cottage Industries in India—ভারতবর্ষ দ্রুত শিল্পোন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক অনুন্নত দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। জাতীয় আয় কমিটির বিবরণী হইতে ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে ১৯১০ কোটি টাকার দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল এবং এই শিল্পগুলিতে ১ কোটি ১৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইয়াছিল। কুটির-শিল্পে আমাদের মোট জনশক্তির একটি বিরাট অংশ কাজে নিযুক্ত। শুধু তাহাই নহে, গ্রামাঞ্চলে আমরা যে ঋতুগত বেকার অবস্থা (Seasonal unemployment) এবং প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থা (Disguised unemployment) দেখিতে পাই, সেগুলির সমাধানে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলিকে উন্নত করিতে হইলে বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না। সেদিক হইতে এই শিল্পগুলির উন্নতি করা খুবই সুবিধাজনক। মূলধনের অভাব আমাদের দেশে খুবই বেশী, আবার বেকার সমস্যার তীব্রতাও বেশী। এই দুইটি সমস্যা একসঙ্গে সমাধানের চেষ্টা করা যায় যদি কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে উন্নত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে এই শিল্পগুলি দেশের শিল্পোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির-শিল্পগুলিতে আমরা শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা দেখিতে পাই। ইহাতে দেশের সব অঞ্চল এই শিল্পগুলি হইতে উপকার লাভ করিতে পারে। সর্বশেষে, ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পগুলির উন্নতি হইলে দেশে আয় ও ধনের বৈষম্য অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। ধরা যাক্, একজন মিল-মালিক ১০ কোটি টাকা মূলধন লইয়া কয়েকটি চটকলের কাজ চালান, কিন্তু যদি এই ১০ কোটি টাকা ৫০ জন লোকের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত এবং তাহারা

প্রত্যেকেই যদি ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মারফত নিজেদের কাজ চালাইত, তবে সমাজের ধনের বৈষম্য কিছু কমিয়া যাইত। কেন না, ইহাতে মিল-মালিকদের মুনাফা কমিয়া যাইত। সর্বশেষে, সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত প্রসাধন সামগ্রী অথবা নিত্য-ব্যবহার্য সামগ্রী তৈয়ার করিতেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিবিধ সমস্যা (Different Problems of the Cottage and Small-scale Industries)—কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি বিশেষত আমাদের চোখে পড়ে:

(১) মূলধনের অভাব, বিশেষত, নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বর্তমান শিল্প-প্রচেষ্টাগুলিকে আরও সম্প্রসারিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, (২) কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা, (৩) যান্ত্রিক বৃহদায়তন শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা, (৪) উৎপাদন পদ্ধতির ত্রুটি, (৫) ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পজাত জিনিসের বিক্রয় বাজার সংগঠনের অভাব। এই সমস্যাগুলি কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়াছে। মূল সমস্যাটি হইতেছে আমাদের গ্রামীণ জীবনযাত্রার অনগ্রসরতা এবং খারাপ আর্থিক অবস্থা।

কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি করিবার উপায় (Recommendations for the improvement of the Cottage and Small industries)—ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে উন্নত করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে এই শিল্পগুলির উন্নতি করিতে পারি।—

(১) সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির কাজের পরিধি ব্যাপক করিয়া এই শিল্পগুলির আর্থিক সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। সমবায় ব্যাংকগুলিকে এই শিল্পগুলির মূলধন সরবরাহে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) আমাদের দেশে স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশনগুলিকে এই শিল্পগুলির মূলধন সরবরাহে আরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলি এবং সর্বভারতীয় জীবনবীমা কর্পোরেশনকেও এই শিল্পগুলির আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করিতে হইবে।

(৩) ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলিতে কিভাবে সীমাবদ্ধ পরিমাণে যন্ত্রপাতির প্রবর্তন এবং ইহার সদ্ব্যবহার করা যায় সেই বিষয়ে প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং তাহা সফল হইলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কারিগরিদের তাহা শিখাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সরকার মাঝে মাঝে শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে পারেন। তাহা ছাড়া অধিক সংখ্যক সমবায় বিক্রয়করণ সমিতি (Co-operative Marketing Society) স্থাপন করিতে হইবে।

(৪) সরকারের পক্ষ হইতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদির ভাল বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে এবং আধুনিক ক্রেতাদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী

যাহাতে উন্নত ধরনের বিভিন্ন জিনিস উৎপাদিত হয় সেজন্য কারিগরদের উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে যাহারা কাজ করে, তাহাদের কারিগরি কর্মকুশলতা বাড়াইবার জন্য বড় বড় শহর ও শিক্ষণ-কেন্দ্র (Training Centre) স্থাপন করিতে হইবে।

(৬) সর্বশেষে, যে সমুদয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ছোট ছোট মেসিন ব্যবহার করা হয়, সেগুলি যাহাতে সস্তা দরে বিদ্যুৎ পাইতে পারে, সেই ব্যবস্থা সরকারকে করিয়া দিতে হইবে।

ভারত সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্প সম্বন্ধে অবলম্বিত নীতি (Policy of the Government of India to the small and Cottage Industries)— ভারত সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্বন্ধে অবলম্বিত নীতি খুবই স্পষ্ট। ভারত সরকার আমাদের দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন চাহেন, এবং সেজন্য বড় বড় শিল্পের উপর যথেষ্ট গুরুত্বও প্রদান করা হইয়াছে ; কিন্তু এজন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি উপেক্ষিত হয় নাই। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভারত সরকার ৩০ কোটি টাকা এই শিল্পগুলির উন্নতির জন্য বরাদ্দ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে সরকার ছয়টি বোর্ড (Board) স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বোর্ডগুলি হইতেছে (১) সর্বভারতীয় তাঁত-শিল্প বোর্ড (All India Handloom Board), (২) সর্ব-ভারতীয় খাদি ও গ্রাম্য-শিল্প বোর্ড (All India Khadi and Village Industries Board), (৩) সর্ব-ভারতীয় হস্ত-শিল্প বোর্ড (All India Handicrafts Board) (৪) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (Small-scale Industries Board), (৫) সিল্ক বোর্ড (Silk Board) এবং (৬) নারিকেল-কাতা শিল্প বোর্ড (Coir Board)। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভারত সরকার ক্ষুদ্রায়তন এবং কুটির শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। সংশোধিত দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই শিল্পগুলির জন্য ১৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য ২৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায়ও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পগুলির উন্নতির জন্য সরকারের নিম্নলিখিত পাচটি কর্মসূচী আছে :—(১) উৎপাদনের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ (২) বৃহদায়তন শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতা যাহাতে আর না বাড়ে সে ব্যবস্থা অবলম্বন, (৩) বৃহদায়তন শিল্পের উপর উৎপাদন-শুল্ক বসানো, (৪) কাঁচামাল ও মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং (৫) গবেষণা ও শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয়সাধন।

বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলি যাহাতে প্রতিযোগী না হইয়া পরিপূরক হয়, সেদিকে সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। সরকার বিভিন্ন রাজ্যে স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশনের মারফত এবং জাতীয় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের

(National Small Industries Corporation) মারফত ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প-গুলিকে নানাভাবে সাহায্য করিবার (বিশেষত আর্থিক ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী প্রভৃতি চারিটি অঞ্চলে একটি করিয়া জাতীয় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সাহায্য প্রতিষ্ঠান (National Small Industries Institute) গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিও ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করিবে।

Exercise

1. What are the advantages and disadvantages of Large-Scale Production ? (বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা কি ?) (৬৮-৭১পৃষ্ঠা)

2. Distinguish between internal and external economies of Large-Scale Production. (বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুবিধাগুলির পার্থক্য আলোচনা কর।) [S. F. Compt., 1961] (৬৮-৭০ পৃষ্ঠা)

3. How is it that in spite of the economies of Large-Scale Production, the Small and Cottage Industries still survive ? (বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলি এখনও টিকিয়া আছে, ইহা কি করিয়া সম্ভব ?) (৭১-৭২ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the importance of the Small-Scale and Cottage Industries in the Indian economy. (ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।) (৭২-৭৩ পৃষ্ঠা)

5. What are the different problems of the Cottage and Small-scale Industries ? What measures would you recommend for the improvement of their condition ? (কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা কি কি ? এই শিল্পগুলির উন্নয়নের জন্য তুমি কি সুপারিশ প্রদান করিবে ? (৭৩-৭৫ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the policy of the Government of India towards the Small and Cottage Industries. (ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সম্পর্কে ভারত সরকার কর্তৃক অবলম্বিত নীতি আলোচনা কর) (৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা)

7 Examine the causes leading to the localisation of industries. Discuss its merits and demerits. (শিল্প স্থানীয়করণের কারণগুলি পরীক্ষা কর। ইহার সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।) (৬৫-৬৮ পৃষ্ঠা)

সপ্তম অধ্যায়

বাজার
(The Market)

আধুনিক অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল হইতেছে বাজার। বাজারের মাধ্যমে বিক্রেতা তাহার উৎপাদিত জিনিস বাজারে বিক্রয় করে এবং ক্রেতা তাহার চাহিদা অনুযায়ী জিনিস ক্রয় করে। মানুষ যখন একটি জিনিসের বিনিময়ে অপর একটি জিনিস পাইবার চেষ্টা করিল, তখন হইতেই বাজারের সৃষ্টি হয়। ক্রমে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বাজারেরও সম্প্রসারণ হইতে থাকে।

বাজার বলিতে কি বুঝায়? (What is a Market ?)—সাধারণ অর্থে বাজার বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি স্থান যেখানে অনেক দোকান থাকে এবং অনেক ক্রেতা-বিক্রেতা বিভিন্ন জিনিস কেনা-বেচা করে। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে 'বাজার' কথাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অর্থশাস্ত্রে বাজার বলিতে কোন জিনিসের বাজার বুঝায়, যেমন পাটের বাজার, সোনারূপার বাজার, শেয়ার বাজার, চায়ের বাজার ইত্যাদি। বাজার বলিতে বুঝায় কোন জিনিসের জন্য ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক। বিভিন্ন জিনিসের জন্য বিভিন্ন বাজার থাকে। বাজারে সংশ্লিষ্ট জিনিসের জন্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ই থাকা চাই। বিক্রেতা একটি দামে জিনিস বিক্রয় করিতে থাকে; ক্রেতা একটি দামে জিনিস ক্রয় করে। সুতরাং বাজারে একটি দাম থাকিবে এবং সেই দামে বিক্রেতা জিনিস বিক্রয় করিবে এবং ক্রেতা জিনিস ক্রয় করিবে। এই দামের মধ্যে সেই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটি সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

জারের উৎপাদন পৃথক পথক নিস

২। দাম

ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সহজ সম্পর্ক

একটি জিনিসের বাজার যে সর্বদা একটি নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে। একটি নির্দিষ্ট জিনিসের ক্রেতা পৃথিবীর নানা স্থানে অবস্থান করিতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লেনদেন কোন নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত নাও হইতে পারে। চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, টেলিফোন প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লেনদেন চলিতে পারে। আবার পণ্য ছাড়াও অন্যান্য সেবাকার্যের বাজার থাকিতে পারে। যেমন, শেয়ার বাজার, টাকার বাজার, শ্রমের বাজার, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার প্রভৃতি।

বাজার একটা নির্দিষ্ট স্থান নহে

বাজারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Markets)—বিভিন্নভাবে বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। পরিধি অনুযায়ী স্থানীয় (Local), আঞ্চলিক (Regional), জাতীয় (National) এবং আন্তর্জাতিক (International) হইতে পারে। একটি নির্দিষ্ট স্থানে যদি ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে লেনদেন বা ক্রয়-বিক্রয় চলিতে থাকে তবে ইহাকে স্থানীয় বাজার বলা যাইতে পারে। একটি অঞ্চলের মধ্যে যদি ক্রয়-বিক্রয় আবদ্ধ থাকে, তবে আমরা আঞ্চলিক বাজার দেখিতে পাই। এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলির ক্রয়-বিক্রয় সমগ্র দেশ জুড়িয়া চলে অথচ দেশের বাহিরে যায় না। সেই জিনিসগুলির বাজারকে জাতীয় বাজার বলা হইয়া থাকে। আবার এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলির চাহিদা সমগ্র পৃথিবীতে দেখা যায় এবং পৃথিবীর যে কোন স্থানে এই জিনিসগুলির লেনদেন বা ক্রয়-বিক্রয় চলিতে পারে, সেইসকল জিনিসের বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলা হয়; যেমন সোনার বাজার, পাটের বাজার, চায়ের বাজার প্রভৃতি হইতেছে আন্তর্জাতিক বাজার। সময়ের তারতম্য অনুযায়ী বাজারের শ্রেণী-বিভাগ হইতে পারে। অধ্যাপক মার্শাল সময়ের ভিত্তিতে চার প্রকার বাজারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; যথা, অতি স্বল্পকালীন বাজার (Very short-period market), স্বল্পকালীন বাজার (Short-period market), দীর্ঘকালীন বাজার (Long-period market), এবং অতি দীর্ঘকালীন বাজার (Very long-period market)। অতি স্বল্পকালীন বাজারে যোগান স্থির থাকে। অথবা অন্যভাবে বলিতে গেলে যদি বাজারে যোগানের পরিমাণ পরিবর্তন করা সম্ভবপর না হয়, তবে যতক্ষণ যোগান অপরিবর্তিত থাকিবে ততক্ষণ বাজারটিকে অতি স্বল্পকালীন বাজার বলা হয়। কোনও একদিন যদি বাজারে মাছের চাহিদা খুব বেশী থাকে, অথচ মাছের যোগান স্থির থাকে, তবে সেই দিনটিকে অতি স্বল্পকালীন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং বাজারটিকে অতি স্বল্পকালীন বাজার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই বাজারে যোগান স্থির থাকিলেও চাহিদা পরিবর্তিত হইতে পারে।

পরিধি অনুযায়ী বাজারের শ্রেণীবিভাগ—স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার

সময়ের তারতম্য অনুযায়ী বাজারের শ্রেণীবিভাগ

অতি স্বল্পকালীন বাজার

স্বল্পকালীন বাজারে যোগান স্থির থাকে না বটে, তবে চাহিদা যে হারে পরিবর্তিত হয়, যোগান সেই হারে পরিবর্তিত হয় না। স্বল্পকালীন বাজারে সময় এত বেশী নয় যে চাহিদার পরিবর্তন হইলে যোগান সর্বদাই সমান হারে পরিবর্তিত হইবে।

স্বল্পকালীন বাজার

দীর্ঘকালীন বাজারে চাহিদা পরিবর্তিত হইলে যোগানও পরিবর্তিত হয়। তবে চাহিদার পরিবর্তনের হার এবং যোগানের পরিবর্তনের হার সমান নাও হইতে পারে। অর্থাৎ যখন যেরূপ প্রয়োজন,

দীর্ঘকালীন বাজার

সেইভাবে উৎপাদক যোগানের পরিবর্তন করিবার যথেষ্ট সময় পায়। কিন্তু দীর্ঘকালের পরিধি যদি খুব বেশী হয় এবং উৎপাদক যদি যোগান পরিবর্তন করিবার এমন সময় পায় যে চাহিদা যতই বাড়িবে, যোগান ঠিক ততই বাড়িবে, তবে বাজারে চাহিদা ও যোগান সমান থাকিবে এবং মূল্যও স্থিতিশীল থাকিবে।

অতি দীর্ঘকালীন বাজার

বাজারের পরিধি (Extent of the market)—সব বাজারের পরিধি সমান নয়। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি, কোন বাজার স্থানীয়, জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক হইতে পারে। বাজারের আয়তন সাধারণত নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নির্ভরশীল।

প্রথমত, কোন্ জিনিসের বাজার কত হইবে তাহা সেই জিনিসের স্থায়িত্বের (durability) উপর নির্ভর করে। যে জিনিস যত স্থায়ী হইবে, সেই জিনিসের বাজারও তত ব্যাপক হইবে। ক্ষণভঙ্গুর জিনিসের বাজার বিশেষ সম্প্রসারিত হয় না। কারণ বাজার সম্প্রসারিত হইবার কালেই জিনিসটি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

স্থায়িত্ব

দ্বিতীয়ত, যে জিনিস যত সহজে এক জায়গা হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা চলে সেই জিনিসের বাজারের আয়তনও তত ব্যাপক হয়। উদাহরণ স্বরূপ হয়ত বলা যাইতে পারে, ইউরোপের প্রস্তুত কোন জিনিস যদি সহজেই ভারতে পাঠানো চলে, তাহা হইলে ভারতীয়দের চাহিদা অনুযায়ী ইউরোপের উৎপাদকের পক্ষে এই জিনিস পাঠানো সম্ভবপর হইবে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে জিনিসটির বাজারও সম্প্রসারিত হইবে। সহজে স্থানান্তরে প্রেরণের সুবিধা (portability) আছে বলিয়াই সোনার বাজার এত সম্প্রসারিত হইয়াছে। সিগারেটের বাজার বিশেষ সম্প্রসারিত হয়; কারণ এক স্থান হইতে অপর স্থানে এই জিনিসটি পাঠাইতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

…জে স্থানান্তরে প্রেরণ …রিবার সুবিধা

তৃতীয়ত, যে সকল জিনিসের সহজে চিনিয়া লইবার যোগ্যতা (cognizabilty) আছে, সেই সকল জিনিসের বাজারও বিশেষ বিস্তৃত হয়। এই জন্য সোনা, হীরা, মুক্তা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর বাজার, সরকারী ঋণপত্রের বাজার, কোম্পানী কাগজের বাজার প্রভৃতি বিশেষভাবে বিস্তৃত।

সহজে চিনিবার যোগ্যতা

সর্বশেষে, কোনও জিনিসের বিস্তৃত বাজারের প্রধান সর্ত হইল ইহার ব্যাপক চাহিদা (wide demand)। সোনার চাহিদা সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া দেখা যায়, সেইজন্য সোনার বাজার সমগ্র পৃথিবীতে সম্প্রসারিত। গমের চাহিদা পৃথিবীর সর্বত্র; সেই জন্য গমের বাজারও সমগ্র পৃথিবীতেই বিস্তৃত।

ব্যাপক চাহিদা

বাজার ও প্রতিযোগিতা (Market and competition)—বাজারে একাধিক বিক্রেতা থাকিলেই প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। প্রতিযোগিতার মাত্রা কখনও বেশী এবং কখনও কম হইতে পারে। প্রতিযোগিতার মাত্রা পরিপূর্ণ হইলেও আমরা দেখিতে পাই পূর্ণ প্রতিযোগিতা। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মাত্রা অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে; তখন ইহাকে বলা হয় অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে (perfectly competitive market) সর্তগুলি হইতেছে—

পূর্ণ প্রতিযোগিতার সর্ত

(১) দীর্ঘ সময়ে বহু সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা (অল্প সময়ের বিক্রেতার সংখ্যা সীমিত থাকিতে পারে; কিন্তু দীর্ঘকালে বিভিন্ন বিক্রেতা বা ফার্ম অবাধে প্রবেশ করিতে পারে) বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করে (Large number of buyers and sellers); দীর্ঘকালে ফার্মগুলি বাজারে অবাধে প্রবেশ (free entry of firms) করিয়া পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। (২) সব ক্রেতা এবং বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ের জিনিস সর্বদা একই প্রকার (Homogeneous commodity) থাকে। (৩) বাজারে শুধু একটি দাম থাকে। (৪) বাজার সম্বন্ধে সব ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পূর্ণ জ্ঞান (perfect knowledge) থাকে। (৫) বাজারে শিল্পগুলির মধ্যে উৎপাদনের উপকরণগুলির সম্পূর্ণ গতিশীলতা (perfect mobility of the factors) থাকে। উপাদানগুলির সম্পূর্ণ গতিশীলতা থাকে বলিয়াই উপাদানের বাজারেও একই দাম প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন, পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শ্রমের বাজারে সব শ্রমিকের একই মজুরি থাকে। (৬) বাজারে সব ক্রেতার চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক থাকে; একটি নির্দিষ্ট দামে কোন ক্রেতা যত খুশী জিনিস কিনিতে পারে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় (Imperfectly competitive market)

অপূর্ণ প্রতিযোগিতার সর্ত

স্বল্পকালে ফার্মের বা বিক্রেতার সংখ্যা সীমিত থাকিলেও দীর্ঘকাল বহুসংখ্যক বিক্রেতা থাকিতে পারে। কিন্তু এই ধরনের বাজারে চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক থাকে না এবং সব ক্রেতা ও বিক্রেতা একই ধরনের জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করে না। ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের বাজার সম্পর্কে জ্ঞানও সম্পূর্ণ নয় এবং উৎপাদনের উপাদানগুলির গতিশীলতারও অভাব দেখা যায়।

একচেটিয়া বাজার (Monopolistic Market)—একচেটিয়া বাজার বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি বাজার যেখানে মাত্র একজন বিক্রেতা থাকে। এই বিক্রেতা বাজারের কোন জিনিসের যোগান নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। বাজারে ক্রেতাদের চাহিদাও সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক থাকে না। একচেটিয়া কারবারী সাধারণত

একচেটিয়া কারবারের সর্ত

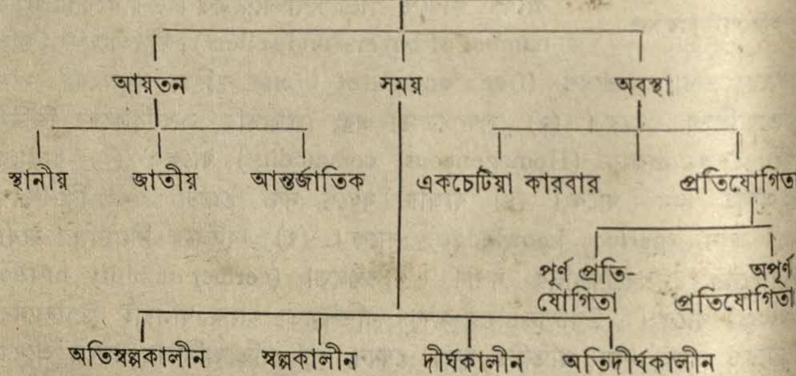
ক্রেতাদের নিকট হইতে বেশী দাম আদায় করিবার চেষ্টা করে। এই ধরনের বাজারে বিক্রেতা এমন পরিমাণ জিনিস বিক্রয় করিতে চাহে যাহা বিক্রী করিলে তাহার মুনাফা সর্বাধিক পরিমাণ হইতে পারে। একচেটিয়া বাজারে দামও সর্বদা স্থির থাকে না। ক্রেতাবিশেষে একচেটিয়া

কারবারী দামের তারতম্য (Price discrimination) করিতে পারে। সব ক্রেতা ও বিক্রেতা একই ধরনের জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করে না। এই ধরনের বাজারে উৎপাদনের উপাদানগুলিরও সম্পূর্ণ গতিশীলতা থাকে না।

অনেক সময় এমন বাজারও দেখা যায় যেখানে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া কারবারের সংমিশ্রণ হয়। এই ধরনের বাজারকে একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতা (Monopolistic Competition) বলা হয়।

নিম্নে বাজারের শ্রেণী-বিভাগ একটি তালিকার মাধ্যমে দেখানো হইল :

বাজারের শ্রেণীবিভাগ



Exercise

1. What is meant by a market in Economics? What are the factors governing the extent of the market? (অর্থশাস্ত্রে বাজার বলিতে কি বুঝায়? কি কি উপাদান বাজারের পরিধি নিয়ন্ত্রিত করে?) (৭৬ পৃষ্ঠা ; ৭৮ পৃষ্ঠা)

2. What is meant by perfectly competitive market and monopolistic market? (প্রতিযোগিতামূলক-বাজার এবং একচেটিয়ামূলক বাজার বলিতে কি বুঝায়?) (৭৯-৮০ পৃষ্ঠা)

3. Explain the different kinds of markets over different periods of time. (বিভিন্ন সময়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বাজার ব্যাখ্যা কর।) (৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা)

4. Write notes on : (a) very short period market, (b) short period market, (c) long period market and (d) very long period market. (টীকা লিখ : অতি স্বল্পকালীন বাজার, স্বল্পকালীন বাজার, দীর্ঘকালীন বাজার এবং অতি দীর্ঘকালীন বাজার।) (৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা)

অষ্টম অধ্যায়

দাম নির্ধারণের গোড়ার কথা—চাহিদা ও যোগানের ভূমিকা (Introduction to Price Determination—Role of Demand and Supply)

বিভিন্ন বাজারে কিভাবে দাম নির্ধারিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করিবার আগে আমরা বিনিময়ের সর্ত (conditions of exchange) ব্যাখ্যা করিব। বিনিময় হয় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে। সুতরাং ক্রেতার দিক হইতে কোন জিনিসের জন্য থাকিবে চাহিদা এবং বিক্রেতার দিক হইতে থাকিবে যোগান। চাহিদা ও যোগানের বিশ্লেষণও আমাদের করিতে হয়।

বিনিময়ের সর্ত (**Conditions of Exchange**)—মানুষের পক্ষে নিজের প্রয়োজনীয় সব জিনিস উৎপাদন করা সম্ভবপর নয়। আমি যে জিনিস উৎপাদন করি তাহা হয়ত অন্য একজনের নিকট প্রয়োজনীয় হইতে পারে। আবার অন্য একজন লোক যাহা উৎপাদন করে তাহা হয়ত আমার নিকট প্রয়োজনীয় হইতে পারে। আমার যাহা দরকার তাহা হয়ত আমি নিজে উৎপাদন নাও করিতে পারি। আবার একটা জিনিস আমার কাছে যতটা উপযোগী মনে হয়, অন্য একজনের কাছে তাহা হয়ত তত উপযোগী নয়। দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ (Marginal utility) বিভিন্ন ক্রেতার কাছে বিভিন্ন প্রকারের। কোন ক্রেতার নিজের কাছে যাহা নাই, তাহা যদি খুবই প্রয়োজনীয় হয়, তবে অন্য লোকের নিকট হইতে সে তাহা কোন কিছুর বিনিময়ে গ্রহণ করে। ধরা যাক্, আমার কাছে আঙুর আছে, অথচ কোন কমলালেবু নাই। আবার রামের কাছে কিছু কমলালেবু আছে, অথচ কোন আঙুর নাই। এখন রাম এবং আমি দুইজন পরস্পরের মধ্যে এই দুইটি জিনিস বিনিময় করিতে পারি। আমার কাছে যদি কমলালেবুর উপযোগ আঙুরের উপযোগ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে আমি আঙুরের বিনিময়ে কমলালেবু চাহিব। আবার, রামের নিকট যদি কমলালেবু অপেক্ষা আঙুরের উপযোগ বেশী হয়, তবে সে কমলালেবুর বিনিময়ে আঙুর পাইতে চাহিবে। উভয়ের নিকট কমলালেবু এবং আঙুরের প্রান্তিক উপযোগ পৃথক বলিয়া আমাদের মধ্যে এই দুইটি জিনিস বিনিময় করা সম্ভব এবং ইহাতে আমরা উভয়েই লাভবান হইব।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, কিভাবে এই বিনিময়-হার স্থির করা হয়। বিনিময়ের ফলে আমি কিছু কমলালেবু পাইব এবং আমার নিকট আঙুরের সংখ্যা কিছু কমিবে। ইহাতে আমার নিকট কমলালেবুর প্রান্তিক উপযোগ কিছু কমিবে এবং আঙুরের প্রান্তিক উপযোগ কিছু বাড়িবে। অপর পক্ষে, বিনিময়ের ফলে রামের নিকট আঙুরের সংখ্যা কিছু বাড়িবে এবং কমলালেবুর সংখ্যা কিছু কমিবে। ইহাতে রামের নিকট আঙুরের প্রান্তিক উপযোগ কিছু কমিবে এবং কমলালেবুর প্রান্তিক উপযোগ কিছু বাড়িবে। এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দুইজনের নিকট এই দুইটি জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ বিভিন্ন থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিনিময় চলিতে থাকিবে। আবার যতক্ষণ বিনিময় চলিতে থাকিবে, ততক্ষণ আমাদের নিকট এই দুইটি জিনিসের প্রান্তিক উপযোগের পার্থক্যও কমিতে থাকিবে। এইভাবে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হইবে যখন আমার নিকট এবং রামের নিকট কমলালেবু ও আঙুরের প্রান্তিক উপযোগ সমান হইয়া যাইবে। সেই অবস্থায় আর এই দুইটি জিনিসের মধ্যে বিনিময় হইবে না।

মূল্য ও দাম (Value and Price)—একটি জিনিসের বিনিময়ে, অন্য কোন জিনিসের যে পরিমাণ পাওয়া যায়, তাহাই প্রথম জিনিসটির মূল্য এবং সেই জিনিসের বিনিময়ে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে ইহার দাম।

মূল্য ও দামের মধ্যে পার্থক্য

প্রকৃতপক্ষে মূল্য ও দামের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না যদি মূল্যের পরিমাণ সর্বদাই অর্থের মাধ্যমে করা হয়। সুতরাং যখন আমরা টাকা দিয়া মূল্যের পরিমাপ করি, তখন ইহাকে দাম বলা হয়। মূল্য দুই প্রকার হইতে পারে,—বিনিময়-মূল্য (Value-in-exchange) এবং ব্যবহারিক মূল্য (Value-in-use)। অর্থশাস্ত্রে কোন জিনিসের বিনিময়-মূল্যই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

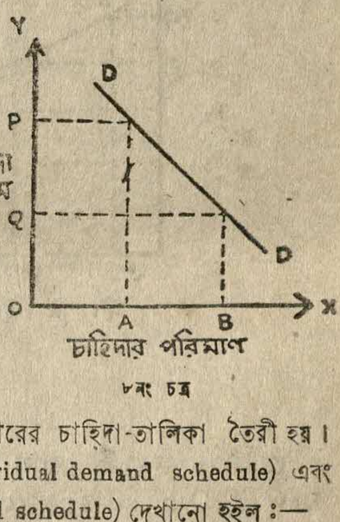
চাহিদা ও উপযোগ (Demand and Utility)—মানুষের অনেক অভাব এবং মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ আয়ের সাহায্যে সেই অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করে। ইহাকেই যে অর্থনৈতিক কাজ বলে তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। মানুষের অভাবের কোন শেষ নাই। সব মানুষই অভাব মোচনের জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে। সেজন্য মানুষ অনেক কিছু পাইতে চায়। আমার একটি বইয়ের দরকার, কিন্তু দরকার থাকিলেই আমি বইটি পাইতে পারি না; আমার বইটি কিনিবার ক্ষমতা থাকা চাই। যখন আমরা কোন জিনিস পাইতে চাই এবং সেই জিনিস কিনিবার ক্ষমতা আমাদের থাকে, তখনই এই আকাঙ্ক্ষাকে অর্থশাস্ত্রে চাহিদা (Demand) বলে। একটি জিনিস কিনিবার আকাঙ্ক্ষা এবং তাহা কিনিবার ক্ষমতা থাকিলেই (willingness to purchase a good backed by the purchasing power) সেই আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলা যায়। কপর্দকহীন ব্যক্তির মোটর গাড়ি কিনিবার ইচ্ছাকে চাহিদা বলা যায় না।

চাহিদা কাহাকে বলে?

চাহিদার নিয়ম (Law of Demand)—ক্রমহ্রাসমান উপযোগ নিয়মের সাহায্যে আমরা চাহিদার নিয়ম বুঝাইতে পারি। চাহিদার নিয়ম অনুযায়ী যখন একটি জিনিসের দাম কমিয়া যাইবে তখন ইহার চাহিদা বাড়িবে, অথবা যখন জিনিসটির

ম বাড়িয়া যাইবে তখন ইহার চাহিদা কমিবে। যখন কোন জিনিসের উপযোগ র কম থাকে, তখন ইহার দামও কম থাকে; আবার সেই সময়ে জিনিসটি ক্রয়ের রিমাণও বেশী হয়। তাহা হইতেই বুঝা যায়, উপযোগ কম হইলে দাম কম; এবং বেশী জিনিস ক্রয় হইলেই উপযোগ কম হয় বলিয়া যখন দাম কম থাকে, তখন ক্রীত জিনিসের পরিমাণও বেশী হয়। অপর পক্ষে যখন কোন জিনিসের উপযোগ বেশী হয়, তখন ইহার দামও বেশী হয়, আবার যখন ইহার উপযোগ বেশী হয়, তখন ইহার ক্রয়ের পরিমাণও ম হয়। অর্থাৎ দাম বেশী থাকিলে ক্রীত জিনিসের পরিমাণও কম হয়। এখানে ামরা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়ম এবং চাহিদার নিয়মের মধ্যে সম্পর্ক খিতে পাই। নিম্নের ৮ নং চিত্রের সাহায্যে চাহিদার নিয়মটি বুঝানো যাইতে ারে। এই চিত্রে OY এবং OX রেখা যথাক্রমে কোন জিনিসের দাম এবং াহিদার পরিমাণ বুঝাইতেছে। যখন কোন জিনিসের দাম OP, তখন ইহার জন্য চাহিদা ইতেছে OA; তখন দাম কমিয়া হইতেছে Q, তখন ইহার জন্য চাহিদা বাড়িয়া ইতেছে OB; এইভাবে জিনিসটির দাম যতই মিতে থাকিবে, জিনিসটির জন্য চাহিদা তই বাড়িবে। ইহাই চাহিদার নিয়ম।

**হ্রাসমান প্রান্তিক
যোগের নিয়ম
ং চাহিদার নিয়মের
ধ্য সম্পর্ক**



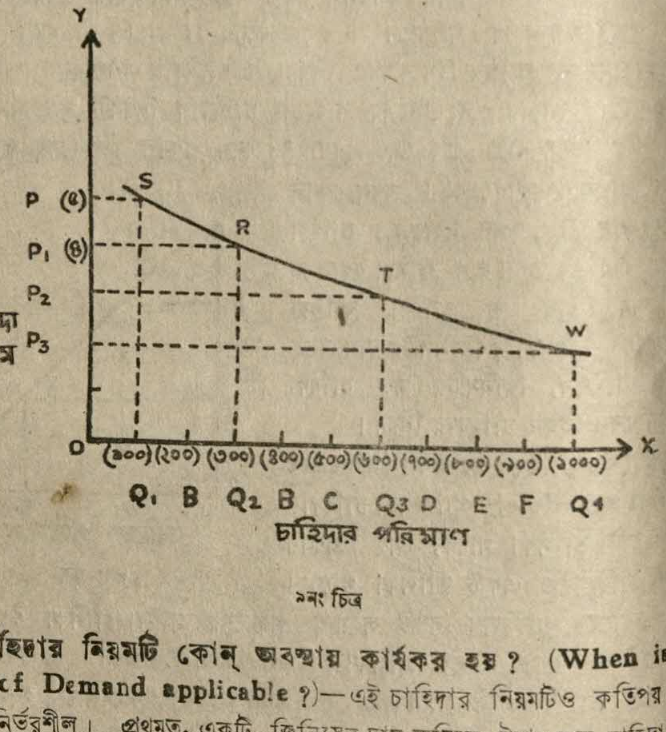
৮নং চিত্র

বাজারের চাহিদা তালিকা (Market emand schedule)—ব্যক্তিগত চাহিদার মন একটি তালিকা থাকে, সেই প্রকার জারের চাহিদারও একটি তালিকা থাকে। গ্র ক্রেতাদের চাহিদার সমষ্টি লইয়াই বাজারের চাহিদা-তালিকা তৈরী হয়। ম্নে একটি ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিকা (Individual demand schedule) এবং কটি বাজার চাহিদা-তালিকা (Market demand schedule) দেখানো হইল :—

ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিকা		**বাজারের চাহিদা-তালিকা**	
াম	চাহিদার পরিমাণ	দাম	চাহিদার পরিমাণ
টাকা	১ কিলো	৫ টাকা	১০০ কিলো
,,	৩ ,,	৪ ,,	৩০০ ,,
,,	৫ ,,	২ ,,	৬০০ ,,
,,	৮ ,,	২ ,,	১০০০ ,,

বাজারের চাহিদা-রেখাও ক্রমশই উপর দিক হইতে নীচের দিকে যায়। মার্শাল দত্ত চাহিদা-তত্ত্বের বিশ্লেষণ মূলত ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়মের উপর

নির্ভরশীল।' ধরা যাক্, কোন জিনিসের দাম যখন ৫ টাকা, তখন ইহার চাহি পরিমাণ ১০০ ইউনিট; যখন দাম কমিয়া ৪ টাকা হয়, তখন চাহিদার পরি বাড়িয়া হয় ৩০০ ইউনিট। ইহার পর দাম যতই কমিতে থাকে, চাহিদার পরি ততই বাড়িতে থাকে। নিম্নের ৯ নং চিত্রে যখন দাম হইতেছে OP_2 তখন চা হইতেছে ৬০০ ইউনিট এবং যখন দাম হইতেছে OP_3 তখন চাহিদা হইতেছে ১ ইউনিট। এইভাবে বাজারের চাহিদা-রেখা দেখানো হইয়াছে।



৯নং চিত্র

চাহিদার নিয়মটি কোন্ অবস্থায় কার্যকর হয়? (When is Law of Demand applicable?)—এই চাহিদার নিয়মটিও কতিপয় উপর নির্ভরশীল। প্রথমত, একটি জিনিসের দাম কমিলে ইহার জন্য চাহিদা বাড়িবে যখন অন্যান্য জিনিসের দাম অপরিবর্তিত থা চায়ের দাম কমিলে চায়ের জন্য চাহিদা বাড়িয়া যা যদি কফির দাম ইতিমধ্যে কমিয়া না যায়। আ

চাহিদার নিয়মও কতিপয় সর্তের উপর নির্ভরশীল

এখানে ধরিয়া লইতেছি যে ক্রেতার নিকট চা এবং কফি বিকল্প সামগ্রী। এ মার্শাল বিকল্প জিনিসের দামের প্রভাব (Substitution Effect) বিবেচনা ক নাই। দ্বিতীয়ত, এই নিয়ম আলোচনা করার সময় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে ক্রে আয় অপরিবর্তিত আছে। কারণ, ক্রেতার আয় যদি হঠাৎ বাড়িয়া যায় জিনিসের দাম বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও চাহিদা নাও কমিতে পারে। এখানে মা

য়-প্রভাব (Income Effect) বিবেচনা করেন নাই। তৃতীয়ত, এই নিয়ম ক্রেতাগণের রুচি, অভ্যাস, পছন্দ প্রভৃতি অপরিবর্তিত থাকে ধরিয়া লইয়াছে কজন লোক হয়ত চা কিনিতে পছন্দ করে এবং কফি কিনিতে পছন্দ করে না। ন্তু এই নিয়ম অনুযায়ী এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হইবে না যাহাতে ক্রেতার চায়ের ছন্দ নষ্ট হইয়া কফির জন্য নূতন পছন্দ হইতে পারে।

অন্যান্য জিনিস অপরিবর্তিত আছে ধরিয়া লইলেও (Other things remain onstant) আমরা আয় পরিবর্তনের প্রভাব (Income Effect), এবং বিকল্প জিনিসের দাম পরিবর্তনের প্রভাব (Substitution Effect) অবলম্বনে চাহিদার য়মটি বুঝাইতে পারি। নিম্নের উদাহরণে ইহা পরিষ্কার হইবে।

ধরা যাক, যখন একটি কমলালেবুর দাম ৮ পয়সা তখন একজন ক্রেতা একটি মলালেবু কিনিত; কিন্তু, যখন প্রতি কমলালেবুর দাম কমিয়া ৪ পয়সা হইল, খন সেই ক্রেতা একটি কমলালেবু কিনিয়া দেখিল তাহার ৪ পয়সা বাঁচিয়াছে। র্থাৎ তাহার আয় ৪ পয়সার পরিমাণ বাড়িয়াছে বলা যায়। তখন সে হয়ত আরও একটি কমলালেবু কিনিতে রাজী হইবে। ইহাকে আয় পরিবর্তনের প্রভাব বা Income Effect বলা হয়। আবার কমলালেবু কিনিবার সময় ক্রেতা হয়ত কিছু আঙুর কিনিত। কিন্তু এখন শুধু কমলালেবুর দামই কমিয়াছে, আঙুরের দাম কমে নাই। জন্য সে আঙুরের পরিবর্তে বেশী করিয়া কমলালেবু কিনিতেছে। ইহাকে প্রতিস্থাপন প্রভাব বা Substitution Effect বলে।

য়-প্রভাব এবং তিস্থাপন প্রভাব

চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম (Exception to the Law of Demand)— ই নিয়মেরও কতিপয় ব্যতিক্রম আছে। যখন জিনিসের দাম বাড়িয়া যায়, তখন হার জন্য চাহিদা নাও কমিতে পারে যদি ক্রেতা মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম আরও ড়িবে। সেই অবস্থায় দাম বাড়িলে চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে। আবার, দি ক্রেতা মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম খুব কমিবে তবে দাম সাময়িকভাবে কিছু মিলে চাহিদা নাও বাড়িতে পারে। যে সকল জিনিস খুবই দুর্লভ, সেই জিনিসগুলির দাম বাড়িলেও চাহিদা কমে না। যে সকল জিনিসের কোনও বিকল্প জিনিস নাই, অথচ যেগুলি দনন্দিন জীবনের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় সেগুলির ক্ষেত্রে দাম বাড়িলেও চাহিদা কমে না। যেমন, লবণের দাম বাড়িলেও চাহিদা কমে না।

হিদার নিয়মের ব্যতিক্রম

আবার এমন কতিপয় নিকৃষ্ট জিনিস (Inferior goods) আছে যেগুলির ক্ষেত্রে াম কমিয়া গেলেও চাহিদা বাড়ে না; যেমন বাজারে যদি মাছ পচা থাকে এবং ইজন্য যদি মাছের দাম কম থাকে, তবে দাম কম থাকা সত্ত্বেও চাহিদা বাড়িবে না। বিশেষে, কতিপয় জিনিস আছে যেগুলি ক্রয় করিয়া ক্রেতা নিজের ঐশ্বর্য জাহির করিতে চাহে (Snob appeal)। সেই জিনিসগুলির দাম যদি কম থাকে তবে

বড়মানুষী দেখাইবার জন্য ক্রেতা সেইগুলি কিনিতে চাহে না ; কিন্তু যদি দাম বে থাকে, তবে অন্যের নিকট নিজের ঐশ্বর্য প্রকাশ করিবার জন্য এবং বাহাদুরী আ করিবার জন্য ক্রেতা সেইগুলি ক্রয় করে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand)—দাম কমিলে চা বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদা কমে,—সোজা কথায় ইহাই চাহিদার নিয়ম। কি সর্বশেষে যে হারে দাম কমে, চাহিদা সেই অনুপাতে বাড়ে না, অথবা যে হ দাম বাড়ে, চাহিদা সেই অনুপাতে কমে না। দামের উঠানামা এবং চাহি নামাউঠার মধ্যে যে আনুপাতিক সম্বন্ধ তাহাকেই চাহিদার মূল্য-স্থিতিস্থাপক (Price Elasticity of Demand) বলে।

কোন কোন জিনিস আছে যেগুলির দাম বাড়িলেও চাহিদা বিশেষ কমে ন যেমন, চাউল, লবণ ইত্যাদি। বাঙালীর কাছে চাউলের চাহিদা এত বেশী দাম খুব বাড়িয়া গেলেও লোকে চাউল কিনিতে বাধ্য হয়। অবশ্য হিন্দুস্থা কাছে চাউলের চাহিদা বেশী নয় ; তাহাদের কাছে আটার চাহিদা বেশী। চাউ দাম বাড়িলে হিন্দুস্থানীদের কাছে চাউলের চাহিদা কমিয়া যাইবে। যখন কে জিনিসের দামের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও সেই অনুপাতে চাহিদার পরিবর্তন হয় অর্থাৎ, যে হারে দাম বাড়ে বা কমে, সেই হারে চাহিদা কমে না অথবা বাড়ে তখন সেই জিনিসের চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক বলা যায়। আবার যখন কে জিনিসের যে হারে দামের পরিবর্তন হয়, সেই হা চাহিদার পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ যে হারে দাম কমে অথ বাড়ে, সেই হারে চাহিদা বাড়ে অথবা কমে তখন চাহি স্থিতিস্থাপককে একক স্থিতিস্থাপক (Unit Elasticity) বলা হয়। যদি কে জিনিসের দামের সামান্য পরিবর্তন হইলেই চাহিদার পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ যে হা দাম কমিয়া যায়, চাহিদা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হারে বাড়িয়া যায়, তখন জিনিসের চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক (Elastic) বলা হয়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মাত্রার তারতম্য

যখন দামের উঠানামা হইলেও কোন জিনিসের চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে, ত সেই জিনিসের চাহিদাকে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (Perfectly inelastic) বলা চলে যদি দামের পরিবর্তনের সহিত কম হারে চাহিদার সামান্য পরিবর্তন হয়, তখন সে চাহিদাকে আপেক্ষিকভাবে অস্থিতিস্থাপক (Relatively inelastic) বলা চলে আবার কোন জিনিসের দামের সামান্য পরিবর্তন হইলে যদি চাহিদার বিরাট পরিবর্ত হয়, যেমন, দাম সামান্য কমিয়া গেলে চাহিদা অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায়, তবে সে জিনিসের চাহিদাকে সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক (Perfectly elastic) বলা যায়। যদি জিনিসের দাম সামান্য কমিয়া গেলে চাহিদা মোটামুটিভাবে, অর্থাৎ বর্ধিত হা বাড়িয়া যায় তবে সেই জিনিসের চাহিদাকে আপেক্ষিকভাবে স্থিতিস্থাপক (Relative elastic) বলা যায়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ (Measurement of the Elasticity of Demand)—দাম পরিবর্তনের সঙ্গে মোট খরচের পরিমাণ কিভাবে পরিবর্তিত হয়, তাহার সাহায্যে আমরা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করিতে পারি। যদি দাম কমিলে খরচের পরিমাণ বাড়িয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে চাহিদা স্থিতিস্থাপক। দাম কমিলে যদি খরচের পরিমাণ কমিয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। আবার যদি দামের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও মোট খরচের পরিমাণ স্থির থাকে, তবে বুঝিতে হইবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একক হইয়াছে। যখন দামের পরিবর্তনের ফলে খরচের পরিমাণ কমিয়া যায়, তখন চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে তাহা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাক্, একটি জিনিসের দাম যখন ৮ টাকা তখন কোন লোক হয়ত চারিটি ইউনিট কিনে; ইহার ফলে মোট খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২ টাকা। যদি জিনিসটির দাম কমিয়া ৪ টাকা হয় এবং তখন যদি লোকটি আট ইউনিট কিনে তবে মোট খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২ টাকা। এক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ অপরিবর্তিত আছে, সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা চাহিদার একক স্থিতিস্থাপকতা দেখিতে পাই। আবার, যখন জিনিসটির দাম ৮ টাকা হইতে কমিয়া ৪ টাকা হয়, তখন যদি লোকটি ১২ ইউনিট কিনে তবে মোট খরচের পরিমাণ বাড়িয়া ৪৮ টাকা হয়। এক্ষেত্রে চাহিদা স্থিতিস্থাপক। যখন জিনিসটির দাম ৮ টাকা হইতে কমিয়া ৪ টাকা হয়, তখন যদি লোকটি ৫ ইউনিট কিনে তবে মোট খরচের পরিমাণ কমিয়া দাঁড়ায় ২০ টাকা। এক্ষেত্রে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

পূর্বেই বলিয়াছি যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা হইতেছে:

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তনের হার}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তনের হার}}$$

ঐ সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি দাম শতকরা ১০ ভাগ কমে এবং চাহিদাও শতকরা ১০ ভাগ বাড়ে তবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সমানুপাতিক বা একক (Unity) হয় অর্থাৎ, $\frac{১০\%}{১০\%} = ১$। আবার, যদি দাম কমে শতকরা ৫ ভাগ এবং চাহিদা বাড়ে শতকরা ১০ ভাগ তবে চাহিদা আপেক্ষিকভাবে স্থিতিস্থাপক (Relatively elastic) অর্থাৎ, $\frac{১০\%}{৫\%} = ২$। কিন্তু, যদি এমন হয় যে দামের সামান্য পরিবর্তনে চাহিদা এত বাড়িয়া যায় যে ইহাকে সীমিত করা যায় না, অথবা যদি এমন হয় যে একটি নির্দিষ্ট দামে ক্রেতা যত খুশী জিনিস কিনিতে পারে তবে সেই ক্ষেত্রে চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক (Perfectly elastic)। আবার, যদি দাম কমে শতকরা ৫ ভাগ, অথচ চাহিদা বাড়ে শতকরা ৩ ভাগ, তবে চাহিদা আপেক্ষিকভাবে অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু, যদি এমন হয় যে দামের হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও চাহিদার কোনই পরিবর্তন হইতেছে না, তবে সেই ক্ষেত্রে চাহিদা সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক।

নিম্নের ১০নং চিত্রে আমরা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন মাত্রা দেখাইতে পারি। নিম্নের চিত্রে রেখাগুলি যথাক্রমে D_1, D_2, D_3, D_4 এবং D_5 রেখাগুলি যথাক্রমে চাহিদার সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপকতা, আপেক্ষিক স্থিতিস্থাপকতা, একক স্থিতিস্থাপকতা, আপেক্ষিক অস্থিতিস্থাপকতা এবং সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকতা বুঝাইতেছে।



১০নং চিত্র

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নিয়ন্ত্রণকারী কারণসমূহ (Factors Governing Elasticity of Demand)—চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা প্রধানত নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট জিনিসটির কোনও পরবর্তী (Substitute) বা বিকল্প জিনিস আছে কি না ইহার উপর। যে জিনিসের বিকল্প সামগ্রী যত বেশী সেই জিনিসের চাহিদাও তত বেশী স্থিতিস্থাপক। দ্বিতীয়ত, একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির চাহিদা সাধারণত অস্থিতিস্থাপক। লবণের কোনও বিকল্প সামগ্রী নাই এবং ইহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। সেজন্য লবণের জন্য আমাদের চাহিদা খুবই অস্থিতিস্থাপক। তৃতীয়ত, বিলাস সামগ্রীগুলির (Luxury goods) জন্য চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে হয়ত একটি মোটর গাড়ি অপরিহার্য নয়। কিন্তু, যদি মোটর গাড়ি সস্তা হইয়া যায়, তবে অনেকেই, যাঁহারা আগে মোটর গাড়ি কিনিবার কথা ভাবিতেন না, এখন মোটর গাড়ি কিনিতে চাহিবেন। আবার আমাদের কাছে যাহা বিলাস সামগ্রী, অন্য লোকের কাছে হয়ত তাহা খুবই প্রয়োজনীয়। সুতরাং আমার কাছে যে জিনিসের চাহিদা স্থিতিস্থাপক, অন্য লোকের কাছে সেই জিনিসের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইতে পারে। আমার কাছে মোটর গাড়ি বিলাস সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইলেও একজন চিকিৎসকের কাছে একটি মোটর গাড়ি প্রয়োজনীয় সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি কি উপাদানের উপর নির্ভর করে

কোন জিনিসের প্রচলিত দাম যদি খুব কম থাকে, তবে সেই জিনিসটির চাহিদা সাধারণত অপরিবর্তনীয় থাকে। আবার যদি কোন জিনিসের প্রচলিত দাম খুব বেশী থাকে তবে সেই জিনিসটির দামের সামান্য পরিবর্তন চাহিদাকে সাধারণত বিশেষভাবে প্রভাবিত করে না। তাহা ছাড়া, যে সমস্ত জিনিসের উপর আমরা আয়ের অতি সামান্য অংশই খরচ করিয়া থাকি, সেই জিনিসগুলির চাহিদা সাধারণত দামের পরিবর্তনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় না।

চাহিদার নিয়মে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে দাম বাড়িয়া গেলে চাহিদা বাড়িয়া যায়। কিন্তু কি পরিমাণ দাম কমিলে কি পরিমাণ চাহিদা বাড়িবে এবং কি পরিমাণ দাম বাড়িলে কি পরিমাণ চাহিদা কমিবে তাহা আমরা চাহিদার সূত্র হইতে জানিতে পারি না, তাহা আমাদের জানিতে হয় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নিয়ম হইতে। সেইজন্য চাহিদার নিয়ম অনুযায়ী দাম ও চাহিদা সম্পর্ক পরিমাণবাচক (quantitative) এবং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনুযায়ী দাম ও চাহিদার সম্পর্ককে গুণবাচক (qualitative) সম্পর্ক বলা হয়।

চাহিদার নিয়ম ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব (Importance of the concept of elasticity of demand)—চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তত্ত্বটি বাস্তবক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী হয়। দেশে যদি জিনিসপত্রের দাম পরিবর্তিত হয় তবে তাহা ক্রেতাদের চাহিদার উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাহা আমরা জিনিসগুলির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইতে জানিতে পারি। এইভাবে জিনিসপত্রের দামের পরিবর্তন হইতে আমরা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও একটি ধারণা করিতে পারি।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করিবার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি কাজে লাগে

দ্বিতীয়ত, সরকারের কর ধার্য করিবার নীতি নিরূপণ করিবার সময়েও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তত্ত্বটি কার্যকর হয়। কোন জিনিসের উপর কর ধার্য করা হইলে ইহা করদাতাগণের উপর করপ্রদান ব্যাপারে কিরূপ বোঝার (incidence of taxation) সৃষ্টি করিবে তাহা আমরা সংশ্লিষ্ট জিনিসটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইতে জানিতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলিতে পারি লবণের চাহিদা সর্বদাই অস্থিতিস্থাপক ; সুতরাং যদি লবণের উপর কর ধার্য করা হয় তবে ইহা করদাতাগণের উপর বোঝার সৃষ্টি করিবে। আবার কোন বিলাস সামগ্রীর চাহিদা হয়ত স্থিতিস্থাপক ; সুতরাং ইহার উপর কর ধার্য করা হইলে জনগণের উপর ইহা একটি বড় রকমের বোঝার সৃষ্টি করিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে কোন জিনিসের উপর কর ধার্য করিবার আগে সরকারকে দেখিতে হয় জিনিসটির জন্য লোকের চাহিদা স্থিতিস্থাপক কিনা।

কর ধার্য করিবার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি উপযোগী

তৃতীয়ত, একচেটিয়া ব্যবসায়ীগণের (monopolists) কোন জিনিস উৎপাদন এবং ইহার মূল্য নির্ধারণ করিবার ব্যাপারে এই তত্ত্বটি বিশেষ উপযোগী। যদি কোনও জিনিসের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়, তবে একচেটিয়া ব্যবসায়ী যতখুশী জিনিসের দাম বাড়াইতে পারে না। আবার যদি জিনিসটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে একচেটিয়া কারবার বিক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়াও বেশী দামে জিনিসটি বিক্রয় করিতে পারে এবং অধিক মুনাফা অর্জন করিতে পারে।

একচেটিয়া কারবারেও এই তত্ত্বটির ভূমিকা আছে

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটির কার্যকারিতা দেখা যায়। আমাদের দেশের কোনও জিনিসের জন্য (যেমন, পাট অথবা চা) যদি বিদেশীদের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তবে তাহারা সেই জিনিস বেশী করিয়া আমদানি করিবে, আমরাও সেই জিনিসটা বেশী করিয়া রপ্তানি করিতে পারিব। সুতরাং কোন দেশের বাণিজ্য-ব্যালান্স (Balance of trade) অনুকূল (favourable) থাকিবে কিনা তাহা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে আমাদের রপ্তানিযোগ্য জিনিসগুলির জন্য বিদেশীদের চাহিদার অস্থিতিস্থাপকতার উপর। আবার দুই দেশের মুদ্রার বিনিময়-হারও নির্ভর করে একটি দেশের মুদ্রার জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং সেই মুদ্রার যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই তত্ত্বটি খুবই উপযোগী

সর্বশেষে, শ্রমজীবীদের মজুরি নিরূপণ করিবার সময়েও এই তত্ত্বটির কার্যকারিতা দেখা যায়। যদি কোন একটি কাজের জন্য একজন বিশেষ পারদর্শী শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এবং যদি সেই শ্রমিকের জন্য মালিকের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তবে শ্রমিক মালিকের নিকট বেশী মজুরি আদায় করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে বাস্তবক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্বটির যথেষ্ট কার্যকারিতা আছে।

মজুরি নির্ধারণে এই তত্ত্বের ভূমিকা

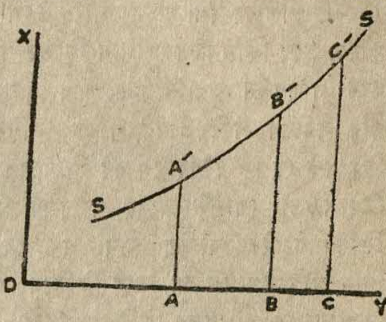
যোগানের নিয়ম (Law of Supply)—যোগানের নিয়ম অনুযায়ী কোন জিনিসের দাম বাড়িয়া গেলে জিনিসের যোগান বাড়িয়া যায় এবং দাম কমিয়া গেলে যোগান কমিয়া যায়। একটি যোগান-তালিকার সাহায্যে ইহা বুঝানো যাইতে পারে। নিম্নে একটি যোগান-তালিকা দেওয়া হইল :

জিনিসের দাম	জিনিসের যোগান
৮ টাকা	১০০ ইউনিট
৬ ,,	৮০ ,,
৫ ,,	৭০ ,,
৪ ,,	৬০ ,,

এই তালিকায় দেখানো যাইতেছে, কোন জিনিসের দাম যতই কমে যোগানও তত কমে, ইহাই যোগানের নিয়ম। পরপৃষ্ঠায় ১১নং চিত্রের সাহায্যে ইহা বুঝানো যাইতে পারে। এই চিত্রে OX রেখা দ্বারা কোন জিনিসের দাম এবং OY রেখার দ্বারা ইহার যোগান সূচিত হইতেছে। যখন জিনিসের দাম AA′, তখন জিনিসের যোগান হইতেছে OA ; যখন দাম বাড়িয়া যাইতেছে BB′, তখন যোগান বাড়িয়া হইতেছে OB ; আবার যখন দাম আরও বাড়িয়া CC′ হইতেছে, তখন যোগান আরও বাড়িয়া হইতেছে OC ; এইভাবে দাম বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটির যোগান বাড়িয়া যাইতেছে। বিকল্পভাবে বলা যাইতে পারে, দাম কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটির যোগান কমিয়া যায়। বিভিন্ন দামে বিক্রেতা কত পরিমাণ জিনিস বিক্রয়

করিতে চাহে, যোগান রেখা তাহাই বুঝাইয়া থাকে। যোগান রেখার তত্ত্বটি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্ম এবং শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়।

যোগানের দাম (Supply price)—প্রধানত উৎপাদন খরচ (cost of production), ব্যবসায়ীদের হাতে মজুত মাল এবং বিক্রেতাদের তাড়াতাড়ি কোন জিনিস বিক্রয় করিবার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যদি কোন জিনিস উৎপাদন করিবার খরচ অত্যধিক হয়, তবে যোগান দাম বেশী হইবে। আবার যদি বিক্রেতাগণ কোন জিনিস (যেমন, পুরাতন মাল) তাড়াতাড়ি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে চায়, তবে যোগান দাম কম হয়।



১১নং চিত্র

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Supply)—কোন জিনিসের দামের সামান্য পরিবর্তন হইলে যোগান যে হারে পরিবর্তিত হয় তাহাকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে। ধরা যাক্, কোন জিনিসের দাম যখন চার টাকা, তখন ইহার যোগানের পরিমাণ পঁচিশ ইউনিট, যখন জিনিসটির দাম বাড়িয়া আট টাকা হয়, তখন ইহার যোগানের পরিমাণ বাড়িয়া পঞ্চাশ ইউনিট হয়। এই ক্ষেত্রে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা একক। কিন্তু, দাম চার টাকা হইতে আট টাকা পর্যন্ত বাড়িয়া গেলে যদি যোগান পঁচিশ হইতে একশত ইউনিট পর্যন্ত বাড়িয়া যায়, তবে যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। আবার দাম বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও যদি জিনিসটির যোগান স্থির থাকে, তবে যোগান সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক (inelastic), এবং দাম যে হারে বাড়ে, যোগান যদি সেই হারে না বাড়ে তবে জিনিসটির যোগান আপেক্ষিকভাবে অস্থিতিস্থাপক (relatively inelastic)।

যে সকল জিনিসের উৎপাদন পদ্ধতি খুব নমনীয় (flexible), অর্থাৎ যে সকল জিনিসের উৎপাদন পদ্ধতির সহজেই পরিবর্তন করা যায়, সেই সকল জিনিসের যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। আবার যে জিনিসগুলি স্থায়ী, সেইগুলিরও যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। কারণ, যদি ঐই জিনিসগুলির দাম কমিয়া যায়, তবে বিক্রেতা সেইগুলিকে মজুত করিয়া রাখিতে পারে, এবং যদি জিনিসগুলির দাম বাড়িয়া যায়, তবে সে জিনিসগুলি বিক্রয় করিতে পারে। আবার যে সকল জিনিসের বাজার বহুদিকে প্রসারিত হয় সেই সকল জিনিসের যোগান স্থিতিস্থাপক হয়; যে বাজারে জিনিসগুলির দাম কমিয়া যায় বিক্রেতা সেই বাজারে জিনিসগুলি বিক্রয় না করিয়া অন্য বাজারে বিক্রয় করিতে পারে। তাহা ছাড়া, কোন জিনিস

যোগানের স্থিতিস্থাপকতার কারণ: উপাদানের যোগান, বাজার এবং সময়

উৎপাদন করিবার সময় যদি দেখা যায় যে জিনিসটির উৎপাদন যে হারে বাড়ে, উৎপাদন ব্যয় তাহা অপেক্ষা বেশী হারে বাড়ে, তবে জিনিসটির যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়। অনুরূপভাবে বলা যাইতে পারে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত যদি উৎপাদনের ব্যয় খুব না বাড়ে, তবে জিনিসটির যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। অল্প সময়ে যদি কোন জিনিসের যোগান পরিবর্তন করা না যায়, তবে সেই জিনিসের যোগান অস্থিতিস্থাপক থাকে ; আবার সময়ের পরিবর্তনের সহিত জিনিসটির যোগান বাড়াইতে পারিলে যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। দীর্ঘকালে সব জিনিসের যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা মূল্য-নির্ধারণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। যদি কোন জিনিসের চাহিদা বাড়িয়া যায়, অথচ সেই অনুপাতে যোগান না বাড়ে, অর্থাৎ যদি যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে জিনিসের দাম বাড়িয়া যায়। মজুরি নির্ধারণ করার সময় শ্রমিকের যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

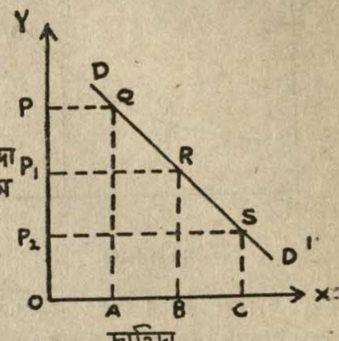
যোগানের পরিবর্তন (Changes in Supply)—(১) আবহাওয়া কিংবা জলবায়ুর পরিবর্তনে উৎপাদন প্রভাবিত হয় এবং কোন জিনিসের যোগান পরিবর্তিত হয়। এই ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তন না হইলেও যোগানের পরিবর্তন হইতে পারে। (২) কোন জিনিসের যোগান বাড়িবে না যদি জিনিসটি উৎপাদিত হইবামাত্র উৎপাদকগণ নিজেরাই ইহা ব্যবহার করেন। (৩) উৎপাদন পদ্ধতি যত উন্নত হয় তত উৎপাদিত সামগ্রীর যোগান বাড়ে। (৪) উৎপাদন খরচ বাড়িয়া গেলে কোন জিনিসের যোগান কমিয়া যায়। তবে যদি উৎপাদক মনে করেন যে উৎপাদন খরচ বেশী হইলেও জিনিসটি উৎপাদন করা চলে, কেন না ইহার জন্য বাজারে খুব বেশী চাহিদা আছে, তবে জিনিসটির যোগান কমিবে না।

চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য অথবা দাম নির্ধারণ (Equilibrium of Demand and Supply or price determination)—আমরা চাহিদা ও যোগানের নিয়ম আলোচনা করিয়াছি। ব্যক্তিগত চাহিদার সমষ্টি হইতেছে বাজারের চাহিদা এবং ব্যক্তিগত যোগানের সমষ্টি হইতেছে বাজারের যোগান। বাজারে যখন চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয় তখন ভারসাম্য অর্জিত হয় এবং দাম নির্ধারিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে যখন বাজারে দাম নির্ধারিত হয়, তখন চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয়। কোন জিনিসের জন্য ক্রেতাদের চাহিদা ইহার প্রান্তিক উপযোগের উপর নির্ভর করে। যখন দাম বেশী হয় তখন চাহিদা কম থাকে এবং যখন দাম কম হয় তখন চাহিদা বাড়ে। ক্রেতার চাহিদাকে আমরা একটি চাহিদা-তালিকায় সাজাইতে পারি। নিম্নে একটি বাজারের চাহিদা-তালিকা (Demand Schedule) দেওয়া হইল :—

দাম	চাহিদা
৫ টাকা	১০০০ ইউনিট
৪ ,,	১৫০০ ,,
৩ ,,	২২০০ ,,
১ ,,	২৯০০ ,,

নিম্নের ১২নং চিত্রে চাহিদার নিয়ম ও তালিকা দেখানো হইল :—

OX রেখা চাহিদার পরিমাণ এবং **OY** রেখা দ্বারা মূল্য সূচিত হইতেছে। যখন দাম OP, তখন চাহিদা হইতেছে OA ; যখন দাম OP_1 তখন চাহিদা হইতেছে OB ; যখন দাম হইতেছে OP_2 তখন চাহিদা হইতেছে OC। দেখা যাইতেছে দাম যতই কমিতেছে, চাহিদা ততই বাড়িতেছে। ইহাই চাহিদার নিয়ম এবং চাহিদার নিয়মের সাহায্যে একটি চাহিদা-তালিকা তৈয়ারী করা যায়। যদি OP পাঁচ টাকার সমান হয় তবে OA হইতেছে ১০০০ ইউনিট এবং যদি OP_1 চার টাকার সমান হয় তবে OB হইতেছে



১২নং চিত্র

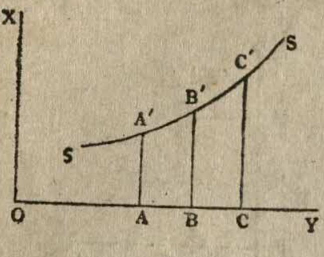
১৫০০ ইউনিট। এইভাবেই চাহিদা-তালিকা তৈয়ারী করা যায়। চাহিদা যে শুধু দামের উঠানামার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা নহে। ক্রেতার আয়ের উপরেও চাহিদা নির্ভরশীল। আয়ের হঠাৎ পরিবর্তন হইলে চাহিদারও হঠাৎ পরিবর্তন হইতে পারে।

অনুরূপভাবে আমরা একটি বাজারের যোগান-তালিকা (Supply Schedule) তৈয়ার করিতে পারি। যোগান-তালিকা যোগানের নিয়মের উপর ভিত্তিশীল। ব্যক্তিগত যোগান-তালিকার সমষ্টি হইতেছে বাজারের যোগান-তালিকা। যোগানের নিয়ম অনুযায়ী দাম বাড়িলে যোগান বাড়ে, দাম কমিলে যোগান কমে ; নিম্নে একটি যোগান-তালিকা দেওয়া হইল—

দাম	যোগান
৫ টাকা	৪০০০ ইউনিট
৪ ,,	৩৪০০ ,,
৩ ,,	২২০০ ,,
২ ,,	১৪০০ ,,

পরপৃষ্ঠার ১৩নং চিত্রে যোগানের নিয়ম ও যোগান-তালিকা দেখানো হইল। যখন AA´ দাম তখন যোগান হইতেছে OA ; যখন দাম হইতেছে BB তখন যোগান হইতেছে OB এবং যখন দাম হইতেছে CC´, তখন যোগান হইতেছে OC। ১৩নং চিত্রে যে যোগানের রেখা দেখানো হইয়াছে তাহা অনুযায়ী যদি AA´ তিন টাকার সমান হয়, তবে এক্ষেত্রে OA হইতেছে ২২০০ ইউনিট ; যদি BB´ চার টাকার সমান হয়, তবে OB হইতেছে ৩৪০০ ইউনিট এবং যদি CC´ পাঁচ টাকার

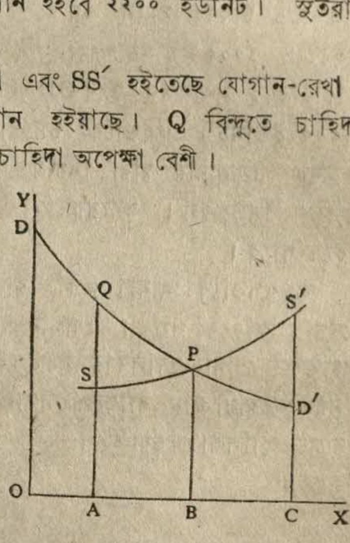
সমান হয় তবে OC হইতেছে ৪০০ ইউনিট। দেখা যাইতেছে দাম বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যোগান বাড়িয়া যাইতেছে। যোগান-দাম (Supply price) শুধু উৎপাদন খরচের উপরেই নির্ভর করে না। ব্যবসায়ীদের হাতে মজুত মাল এবং বিক্রেতাদের তাড়াতাড়ি কোন জিনিস বিক্রয় করিবার ইচ্ছার উপরেও যোগান-দাম নির্ভর করে। মূল্য নিরূপিত হইবে তথনই যখন চাহিদা যোগানের সমান হইবে। অর্থাৎ উপরি-উক্ত উদাহরণ অনুযায়ী যখন কোন জিনিসের দাম তিন টাকা হইবে তখন ইহার চাহিদা হইবে ২২০০ ইউনিট এবং যোগান হইবে ২২০০ ইউনিট। সুতরাং তিন টাকাই বাজার দাম হইবে।



১৩নং চিত্র

নিম্নের চিত্রে DD′ হইতেছে চাহিদা-রেখা এবং SS′ হইতেছে যোগান-রেখা। P বিন্দুতে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়াছে। Q বিন্দুতে চাহিদা যোগান অপেক্ষা বেশী এবং S′ বিন্দুতে যোগান চাহিদা অপেক্ষা বেশী।

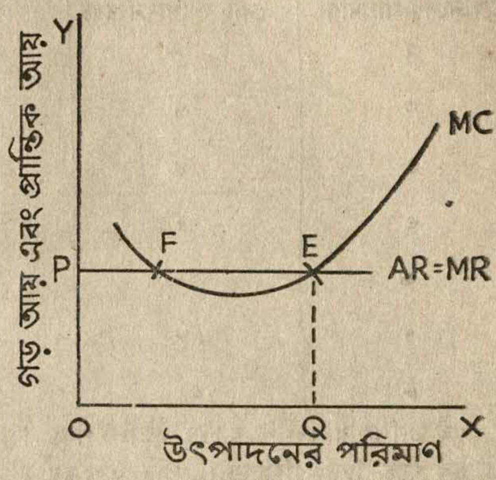
P বিন্দুতে ভারসাম্য (Equilibrium) অর্জিত হইয়াছে; কেন না, এই বিন্দুতে বাজারে জিনিসের চাহিদা ইহার যোগানের সমান হইয়াছে। সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের সমতা থাকিলেই বাজারে ভারসাম্য বজায় থাকে। যখন P বিন্দুতে চাহিদা-রেখা এবং যোগান-রেখা পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে, তখন OB হইতেছে যুগপৎ চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ।



১৪নং চিত্র

ফার্মের প্রান্তিক খরচ এবং প্রান্তিক আয়ের সাহায্যে ভারসাম্যের ব্যাখ্যা।
(Explanation of the equilibrium of the firm in terms of marginal cost and marginal revenue)—যখন কোন ফার্ম বা বিক্রেতা ভারসাম্য অর্জন করে, তখন সেই ফার্মের ক্ষেত্রে প্রান্তিক আয় এবং প্রান্তিক খরচ পরস্পরের সমান হয়। কোন জিনিসের যোগান ইহার উৎপাদন খরচের উপর নির্ভর করে। সুতরাং কোন জিনিসের যোগান অতিরিক্ত বাড়ানো হইবে কিনা তাহা প্রান্তিক উৎপাদন খরচের (Marginal cost of production) উপর নির্ভর করে। বর্তমান জিনিসগুলির উপর যদি অতিরিক্ত কোন ইউনিট উৎপাদন করা হয়, তবে সেই অতিরিক্ত ইউনিট উৎপাদন করিবার জন্য যে অতিরিক্ত খরচ হইবে, তাহাকেই

প্রান্তিক খরচ বলে, এবং প্রান্তিক উৎপাদন বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় তাহাকে প্রান্তিক আয় বলে। যখন বাজারের ভারসাম্য অর্জিত হয় তখন বাজারের সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক যোগানের সমান হয়। কিন্তু ফার্মের ক্ষেত্রে প্রান্তিক আয় এবং প্রান্তিক খরচের সমতা হইতেছে ভারসাম্যের প্রথম সর্ত। কিন্তু শুধু প্রান্তিক আয় এবং প্রান্তিক খরচের সমতাই ভারসাম্যের একমাত্র সর্ত নয়। ফার্মের ভারসাম্যের আরও একটা সর্ত হইতেছে এই যে প্রান্তিক খরচ-রেখা নীচের দিক হইতে আসিয়া প্রান্তিক আয়-রেখাকে ছেদ করিবে। পার্শ্বের চিত্রে OY রেখা দ্বারা গড় এবং প্রান্তিক আয় ধরা হইয়াছে; OP হইতেছে প্রান্তিক আয়।



১৫নং চিত্র

OX রেখা দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ ধরা হইয়াছে। এই চিত্রে প্রান্তিক খরচ-রেখা প্রান্তিক আয় রেখাকে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। F বিন্দুতে উপর হইতে আসিয়া প্রান্তিক খরচ রেখা প্রান্তিক আয় রেখাকে ছেদ করিয়াছে, এই ক্ষেত্রে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক পরিমাণ হয় নাই। এই ক্ষেত্রে শুধু ফার্মের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু E বিন্দুতে প্রান্তিক খরচ-রেখা নীচের দিক হইতে আসিয়া প্রান্তিক আয়-রেখাকে ছেদ করিয়াছে এবং এই বিন্দুতে ফার্মের সর্বাধিক মুনাফা অর্জিত হইয়াছে। OQ হইতেছে সর্বোচ্চ মুনাফা প্রদানকারী উৎপাদন। সুতরাং ভারসাম্যের সর্ত হইতেছে দুইটি; যথা, (১) প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের সমান হইবে, এবং (২) প্রান্তিক খরচ-রেখা নীচের দিক হইতে আসিয়া প্রান্তিক আয়-রেখাকে ছেদ করিবে।

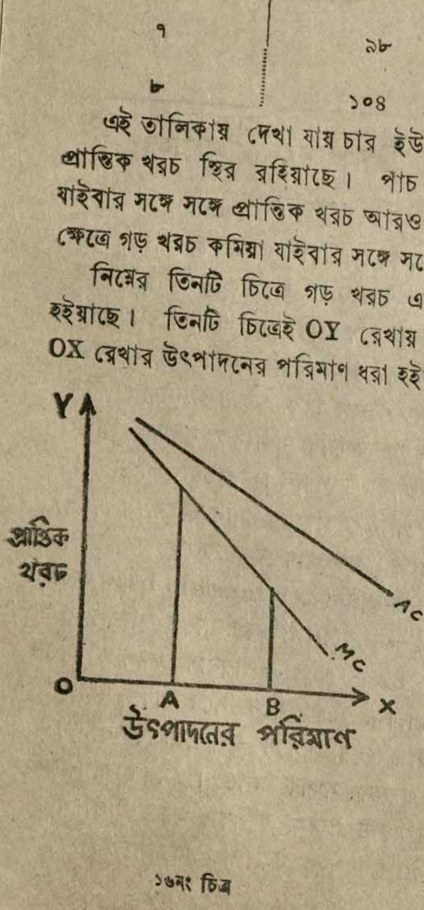
গড় খরচ এবং প্রান্তিক খরচের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Average Cost and Marginal Cost)—উৎপাদন বাড়িতে আরম্ভ করিলে গড় খরচের মধ্যে গড় স্থির খরচের (Average fixed cost)—পরিমাণ ক্রমশ কমিতে থাকে। কিন্তু, গড় পরিবর্তনীয় খরচ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে কমিতে থাকিলেও উৎপাদনগুলির যথোপযুক্ত ব্যবহার হইয়া গেলে ইহা ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। এই গড় খরচের সহিত প্রান্তিক খরচের সম্পর্ক আছে। যখন প্রান্তিক খরচ কম থাকে অর্থাৎ একটি অতিরিক্ত ইউনিট উৎপাদন করিবার খরচের পরিমাণ বেশী হয় না, তখন গড় খরচও কম হয়। প্রান্তিক খরচ যখন গড় খরচ অপেক্ষা কম

হয়, তখন উভয়েই কমিতে থাকে। কিন্তু গড় খরচ বাড়িতে থাকিলে প্রান্তিক খরচ আরও বেশী পরিমাণে বাড়িতে থাকে। আবার যদি গড় খরচ স্থির থাকে, তবে প্রান্তিক খরচও স্থির থাকে। নিম্নের তালিকায় তাহা বুঝা যাইবে।

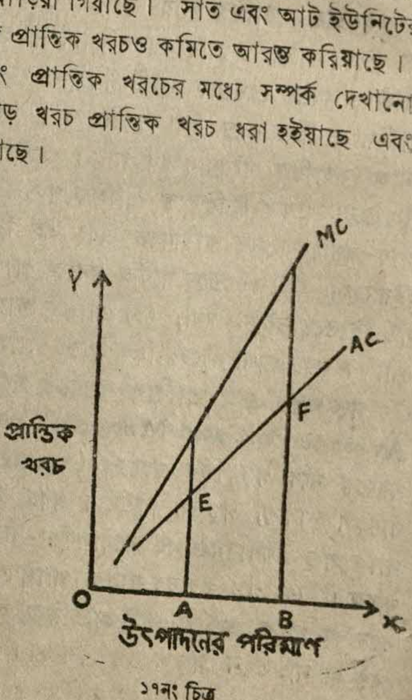
জিনিসের পরিমাণ	মোট উৎপাদন খরচ	গড় খরচ	প্রান্তিক খরচ
২	৪	২	—
৩	৬	২	২
৪	৮	২	২
৫	৪৫	৯	৩৭
৬	৯০	১৫	৪৫
৭	৯৮	১৪	৮
৮	১০৪	১৩	৬

এই তালিকায় দেখা যায় চার ইউনিট পর্যন্ত গড় খরচ স্থির করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক খরচ স্থির রহিয়াছে। পাঁচ এবং ছয় ইউনিটের ক্ষেত্রে গড় খরচ বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক খরচ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সাত এবং আট ইউনিটের ক্ষেত্রে গড় খরচ কমিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক খরচও কমিতে আরম্ভ করিয়াছে।

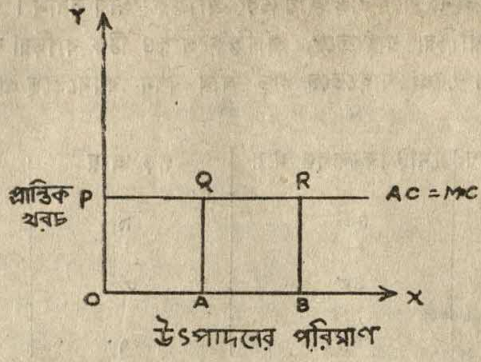
নিম্নের তিনটি চিত্রে গড় খরচ এবং প্রান্তিক খরচের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হইয়াছে। তিনটি চিত্রেই OY রেখায় গড় খরচ প্রান্তিক খরচ ধরা হইয়াছে এবং OX রেখায় উৎপাদনের পরিমাণ ধরা হইয়াছে।



১৬নং চিত্র



১৭নং চিত্র



১৮ নং চিত্র

উপরে যে তিনটি চিত্র দেওয়া হইল ইহাদের মধ্যে ১৬নং চিত্র দেখাইতেছে যে গড় খরচ কমিয়া গেলে প্রান্তিক খরচ কমিয়া যায়। ১৭নং চিত্রটি দেখাইতেছে যে গড় খরচ বাড়িয়া গেলে প্রান্তিক খরচ বাড়িয়া যায়। ১৮নং চিত্রটি দেখাইতেছে যে যদি গড় স্থির থাকে, তবে প্রান্তিক খরচও স্থির থাকে।

গড় আয় ও প্রান্তিক আয় এবং ইহাদের মধ্যে সম্পর্ক (Average Revenue and Marginal Revenue and the relationship between them)—গড় আয় বলিতে আমরা বুঝি মোট উৎপাদন এবং মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের অনুপাত। যদি কোন জিনিসের দশটি ইউনিট ত্রিশ টাকায় বিক্রী হয় তবে গড় আয় হইতেছে তিন টাকা। যখন কতিপয় ইউনিট বিক্রী করিবার পর একটি অতিরিক্ত ইউনিট বিক্রী করা হয়, তখন বিক্রয়লব্ধ আয় অতিরিক্ত যতটা বাড়িয়া যায়, ততটাই হইল প্রান্তিক আয়। গড় আয় যখন বাড়িয়া যায়, তখন প্রান্তিক আয়ও বাড়িয়া যায়। গড় আয় যখন কমিয়া যায় তখন প্রান্তিক আয় কমিয়া যায়, এবং যদি গড় আয় কখনও স্থির থাকে, তখন প্রান্তিক আয় স্থির থাকে। নিম্নলিখিত তালিকার সাহায্যে ইহা বুঝা যাইবে।

গড় আয় ও প্রান্তিক আয় কাহাকে বলে

জিনিসের পরিমাণ	মোট বিক্রয়লব্ধ আয়	গড় আয়	প্রান্তিক আয়
৫ ইউনিট	১০	২	—
৬ ”	১২	২	২
৭ ”	১৪	২	২
৮ ”	১৬	২	২
৯ ”	২৭	৩	১১
১০ ”	৪০	৪	১৩
১১ ”	৫৫	৫	১৫

এখানে ৮ ইউনিট পর্যন্ত গড় আয় এবং প্রান্তিক আয় সমান। ৯ ইউনিট হইতে যেই গড় আয় বাড়িয়া যাইতেছে, প্রান্তিক আয়ও ঠিক বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু নিম্নের উদাহরণে দেখা যাইতেছে গড় আয় যখন কমিতেছে প্রান্তিক আয়ও তখন কমিতেছে।

জিনিসের পরিমাণ	মোট বিক্রয়লব্ধ আয়	গড় আয়	প্রান্তিক আয়
৫	৪৫	৯	—
৬	৪৮	৮	৩
৭	৪৯	৭·	১

এখানে গড় আয় কমিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক আয়ও কমিয়া গিয়াছে।

Exercise

1. Explain the Law of Demand. Has this law any exception? (চাহিদার নিয়মটি বুঝাইয়া দাও। এই নিয়মের কি কোন ব্যতিক্রম আছে?) (৮২-৮৬ পৃষ্ঠা)

2. How is the Law of Demand related to the Law of Diminishing Marginal Utility? (চাহিদার নিয়ম কিভাবে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়মটির সহিত সংযুক্ত?) (৮২-৮৩ পৃষ্ঠা)

3. Explain the concept of Elasticity of Demand. How can you measure it? (চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তত্ত্বটি বুঝাইয়া দাও। তুমি কিভাবে ইহার পরিমাপ করিতে পার?) (৮৬-৮৮ পৃষ্ঠা)

4. On what factors does Elasticity of Demand depend? Give some examples of elastic and inelastic Goods. (চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি কি কারণের উপর নির্ভর করে? কতিপয় স্থিতিস্থাপক এবং অস্থিতিস্থাপক জিনিসের উদাহরণ দাও।) (৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা)

5. "Value is determined by the general relations of demand and supply."—Explain and illustrate. ('মূল্য চাহিদা ও যোগানের সম্পর্ক দ্বারা নিরূপিত হয়।'—একটি উদাহরণের সাহায্যে এই কথাটি বুঝাইয়া দাও।) (৯২-৯৪ পৃষ্ঠা)

6. Explain the equilibrium of a firm. (ফার্মের ভারসাম্য ব্যাখ্যা কর।) (৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the Law of Supply. What do you mean by Elasticity of Supply? What are the factors governing Elasticity of

Supply ? (যোগানের নিয়ম আলোচনা কর। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি বুঝ ? যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি কি উপাদানের উপর নির্ভর করে ?)

8. Discuss the utility of the concept of Elasticity of Demand. (চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্বটির উপকারিতা আলোচনা কর।) (৮৯-৯০ পৃষ্ঠা)

9. Write Notes on :—(a) Demand Schedule and Supply Schedule. (b) Elasticity of Supply.

[টীকা লিখ :—(ক) চাহিদা-তালিকা এবং যোগান-তালিকা, (খ) যোগানের স্থিতিস্থাপকতা।] (৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা ৯০-৯২ পৃষ্ঠা)

10. Discuss the relationship between (i) Average cost and Marginal cost, and (ii) Average Revenue and Marginal Revenue.

[(১) গড় খরচ ও প্রান্তিক খরচ এবং (২) গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।] (৯৫-৯৮ পৃষ্ঠা)

নবম অধ্যায়

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম নির্ধারণ (Price Determination in a Perfectly Competitive Market)

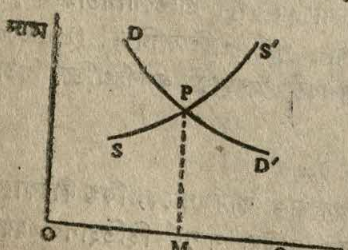
প্রতিযোগিতার দিক হইতে বিচার করিলে কোন বাজার সম্পূর্ণভাবে প্রতিযোগিতামূলক (Perfectly Competitive) অথবা অসম্পূর্ণভাবে প্রতিযোগিতা-মূলক (Imperfectly Competitive) হইতে পারে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হইতেছে একচেটিয়া কারবার পূর্ণ প্রতিযোগিতা (Perfect Competition) এবং একচেটিয়া কারবারের মধ্যবর্তী অবস্থাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা (Imperfect Competition) বলা হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে ?

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় (১) স্বল্পকালে অল্পসংখ্যক ফার্ম থাকে, কিন্তু দীর্ঘকালে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে ; ক্রেতাদের চাহিদা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় ; (৩) সকলেই একই জিনিস কেনাবেচা করে (Homogeneous Commodity) ; (৪) বাজারে শুধু একটি বাজার দর থাকে (only one market price), (৫) ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেরই বাজার দর সম্বন্ধে অথবা বাজার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে (perfect knowledge of the market) ; এবং (৬) উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলি সম্পূর্ণ সচল (perfect mobility of the Factors of Production) থাকে।

ফার্ম ও শিল্পের ভারসাম্য (Equilibrium of the Firm and the Industry)—পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন ফার্ম তখনই ভারসাম্য অর্জন করে যখন প্রান্তিক খরচ প্রান্তিক আয়ের সমান হয় এবং প্রান্তিক খরচ-রেখা নীচের দিক হইতে আসিয়া প্রান্তিক আয়-রেখাকে ছেদ করে। তখন ফার্মের সর্বাধিক পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হয়। একটি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সবগুলি ফার্মই যখন ভারসাম্য অর্জন করে এবং প্রতিটি ফার্মের ক্ষেত্রেই যখন দাম গড় খরচের সমান হয় (অর্থাৎ প্রতিটি ফার্মই স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে) তখন শিল্পটি ভারসাম্য অর্জন করে। এই অবস্থায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শিল্পটি ত্যাগ করিয়া যাইবার অথবা নূতন কোন ফার্মের পক্ষে শিল্পে প্রবেশ করিবার ঝোঁক থাকে না। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকাল সর্বাধিক মুনাফা (প্রান্তিক খরচ=প্রান্তিক আয়) এবং স্বাভাবিক মুনাফা (দাম=গড় খরচ) পরস্পর সমান হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কিভাবে দাম নিরূপিত হয়? (How is Price determined under Perfect Competition?)—পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে। চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয় তখন কিভাবে দাম নিরূপিত হয় তাহা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখিয়াছি। চাহিদার নিয়ম অনুযায়ী একটি চাহিদা-তালিকা (demand schedule) এবং যোগানের নিয়ম অনুযায়ী একটি যোগান-তালিকা (Supply schedule) গঠন করিলে দেখা যায় চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়াছে অথবা চাহিদা-রেখা যোগান-রেখাকে ছেদ করিয়াছে। তখন যে বিন্দুতে ইহারা পরস্পরকে ছেদ করিল সেই বিন্দুতে দাম নির্ধারিত হয়। নিম্নের চিত্রে P বিন্দুতে চাহিদা-রেখা (DD রেখা) এবং যোগান-রেখা (SS' রেখা) পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। সুতরাং P বিন্দুতেই দাম নির্ধারিত হইয়াছে এবং এই দামে OM হইতেছে যুগপৎ চাহিদার পরিমাণ ও যোগানের পরিমাণ।



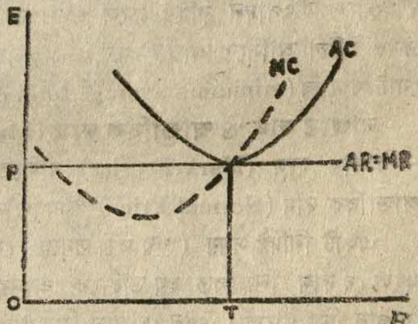
১৯ নং চিত্র

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন ফার্ম তখনই ভারসাম্য অর্জন করে যখন প্রান্তিক খরচ প্রান্তিক আয়ের সমান হয়। এই অবস্থায় ফার্মের মুনাফার পরিমাণও সর্বাধিক হয়।[১] বাজারে দাম সর্বদাই ফার্মের প্রান্তিক খরচ এবং প্রান্তিক আয়ের সমান থাকে। দাম ইহার বেশী হইতে পারে না; কারণ ফার্মগুলির মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতাই দামকে সর্বদা প্রান্তিক খরচের পর্যায়ে স্থির রাখিয়া দিবে; ইহার বেশী হইতে দিবে না। স্বল্পকালে ফার্মের সংখ্যা সীমাবদ্ধ

১ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

থাকে বলিয়া যে কোন ফার্মের পক্ষেই দামটিকে গড় খরচের উপর রাখা সম্ভবপর হয় এবং সেইজন্য কিছু অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল চলিতে পারে না। কারণ এই অতিরিক্ত মুনাফা বহুসংখ্যক ফার্মকে বাজারে প্রবেশ করিবার জন্য আকৃষ্ট করে এবং বাজারে ফার্মগুলির অবাধ প্রবেশের ফলে দীর্ঘকালে দাম গড় খরচের সমান হয়। দীর্ঘকালে দাম যে শুধু গড় খরচের সমান হয় তাহাই নহে; ইহা সর্বনিম্ন গড় খরচের সমান হয়। ফার্মগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে কোন ফার্মের পক্ষেই অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা সম্ভবপর নহে।

দীর্ঘ সময়ে দেখা যায় যে দাম একদিকে প্রান্তিক খরচের সমান আর অপরদিকে ইহা গড়পড়তা খরচের (average cost) সমান হয়। দাম যে শুধু গড়পড়তা খরচের সমান হয় তাহাই নহে, ইহা সর্বনিম্ন গড়পড়তা খরচের (minimum average cost) সমান হয়। তখনই ফার্মটিকে আমরা optimum firm বলি। অর্থাৎ ফার্মটি তখন এমন একটি পর্যায়ে আসে যে ইহা সর্বনিম্ন খরচে নির্দিষ্ট পরিমাণ জিনিস উৎপাদন করিতে পারে এবং ইহাই তাহার কাম্য উৎপাদন হয়। নিম্নের ২০নং চিত্রে একটি optimum firm-এর অবস্থা দেখানো হইল।



২০ নং চিত্র

এই চিত্রে দাম শুধু প্রান্তিক খরচের সমানই নহে। ইহা সর্বনিম্ন গড়পড়তা খরচেরও সমান। OT পরিমাণ জিনিসকে আমরা সর্বাপেক্ষা কাম্য পরিমাণ জিনিস বা optimum output বলি এবং ফার্মটিকে optimum firm বলি। এই অবস্থায় গড়পড়তা মোট খরচের মধ্যেই কিছু মুনাফা অন্তর্ভুক্ত থাকে। ইহাই স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit)। এই মুনাফা না থাকিলে কোন ফার্মই কিছু উৎপাদন করিত না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় একটি ফার্ম তখনই ভারসাম্য অর্জন করে যখন প্রান্তিক খরচ (Marginal Cost) প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের (Marginal Revenue) সমান হয়। বাজারের দামও প্রান্তিক খরচের সমান হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় সব অবস্থায়ই দাম প্রান্তিক খরচের সমান হয়। যদি দাম প্রান্তিক খরচের সমান না হইত, তবে ইহা প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী অথবা কম হইত,—কিন্তু তাহা অসম্ভব ছিল।

দাম ও প্রান্তিক খরচের মধ্যে সম্পর্ক

কারণ, দাম কোন অবস্থায়ই প্রান্তিক খরচের কম হইতে পারে না যেহেতু সেই অবস্থায় বিক্রেতার ক্ষতি হয়। আবার পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম প্রান্তিক খরচের বেশীও হইতে পারে না। কারণ প্রতিযোগী বিক্রেতাদের মধ্যে একজন না একজন দাম কমাইয়া প্রান্তিক

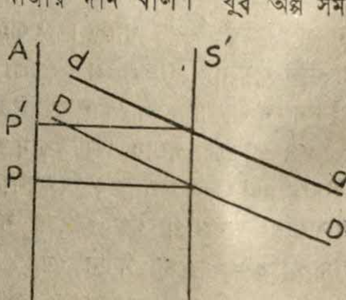
খরচের সমান দাম স্থির করিবে ; তাহা ছাড়া, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ক্রেতারাও জানে জিনিসটির প্রান্তিক খরচ কত। তাহারা কিছুতেই প্রান্তিক খরচের বেশী দাম দিবে না। তাহাদের চাহিদা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। সেইজন্য বাজারে যে দাম নির্ধারিত হইবে, সেই দামে তাহারা যত খুশী জিনিস কিনিতে পারে এবং বাজারে চূড়ান্তভাবে শুধু একটি মাত্রই দাম নিরূপিত হইবে এবং তাহাও বিক্রেতাদের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলেই স্থির হইবে। সেই দাম অল্প সময়ের জন্যই হোক্ আর দীর্ঘ সময়ের জন্যই হোক্ প্রান্তিক খরচের সমান হয়।

দাম ও গড়পড়তা খরচের মধ্যে সম্পর্ক

গড়পড়তা খরচের সঙ্গে দামের সম্পর্ক অল্প সময় এবং দীর্ঘ সময় এই দুইটি সময়ের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়। অল্প সময়ে যখন বাজারে ফার্মের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকে তখন বাজারের দাম সাধারণত গড়পড়তা পরিবর্তনীয় খরচ (average variable cost) অপেক্ষা বেশী হয়। ইহাতে প্রত্যেক ফার্মই কিছু না কিছু অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে। এই অতিরিক্ত মুনাফাই ধীরে ধীরে অন্যান্য ফার্মকে আকৃষ্ট করে এবং দীর্ঘকালে সবগুলি ফার্মের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে দাম গড়পড়তা খরচের সমান হয়। দীর্ঘকালে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গড়পড়তা স্থায়ী খরচও (average fixed cost) ক্রমশ উঠিয়া আসিতে আরম্ভ করে এবং চূড়ান্তভাবে প্রত্যেক ফার্মই সর্বনিম্ন গড়পড়তা মোট খরচের (minimum average total cost) সমান দাম স্থির করে।

বাজার দাম ও স্বাভাবিক দাম (Market Price and Normal Price) —বাজার দাম (Market price) বলিতে আমরা বুঝি অতি অল্পকালীন দাম। স্বাভাবিক দাম (Normal Price) স্বল্পকালীন হইতে পারে, দীর্ঘকালীনও হইতে পারে।

একটি নির্দিষ্ট সময় (খুব অল্প সময়ে) যোগান এবং চাহিদার পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে যে দাম নিরূপিত হয় তাহাকে আমরা বাজার দাম বলি। খুব অল্প সময়ে যোগান স্থির থাকে। এখন যোগান স্থির থাকে বলিয়া দাম নিরূপণ করার ক্ষেত্রে চাহিদাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। চাহিদা বাড়িলে দাম বাড়িয়া যায় এবং চাহিদা কমিলে দাম কমিয়া যায়। বাজার দাম হইতেছে খুব স্বল্পকালীন দাম। পার্শ্বের ২:নং (চিত্রে OS পরিমাণ যোগান স্থির থাকা কালে চাহিদা বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে দাম বাড়িয়া যাইতেছে। ইহাই বাজার দামের পরিবর্তন। সময় যত বাড়িতে থাকে, তত ধীরে ধীরে যোগানের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। সুতরাং অল্প সময়ে দাম নিরূপণ করিবার সময় যোগান স্থির থাকে বলিয়া এবং চাহিদা পরিবর্তনশীল থাকে বলিয়া চাহিদার প্রভাব

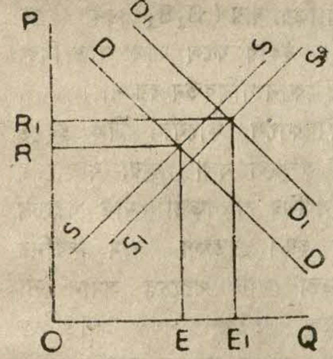


২১ নং চিত্র

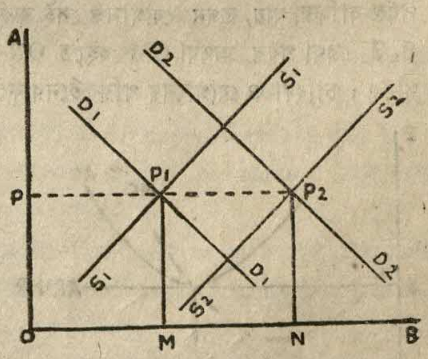
আপেক্ষিকভাবে বেশী হয়। কিন্তু অল্প সময়ে যদি যোগানের কিছু পরিবর্তন হয়, তখন চাহিদা ও যোগানের সাহায্যে যে দাম নিরূপিত হয়, তাহা হইতেছে স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম (short-run normal price)। দীর্ঘ সময়ে চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী যোগানেরও পরিবর্তন হয়, তখন চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে যে দাম নিরূপিত হয় তাহাই স্বাভাবিক দাম (long-run normal price)।

মূল্যতত্ত্বে সময়ের উপাদান

অধ্যাপক মার্শাল মূল্যতত্ত্বে সময়ের উপাদান (time element in the theory of value) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার মতে যতক্ষণ যোগান একদম স্থির থাকে অথচ চাহিদা পরিবর্তনশীল থাকে, সেই সময়টিকে আমরা খুব কম সময় (very short period) বলিতে পারি। আবার যখন দেখা যায়, যে হারে চাহিদার পরিবর্তন হয় সেই হারে যোগান পরিবর্তিত না হইয়া সামান্য পরিবর্তিত হয়, সেই সময়টিকে আমরা অল্প সময় (short period) বলিতে পারি। যখন চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যোগানও সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়, তখন সেই স ময়টিকে আমরা দীর্ঘ সময় (long period) বলিতে পারি। সাধারণত সময় যত অল্প হয়, তত দাম নিরূপণে যোগান অপেক্ষা চাহিদার গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে বেশী হয়, এবং সময় যত দীর্ঘ হয়, তত দাম নিরূপণে চাহিদা অপেক্ষা যোগানের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী হয়। খুব অল্প সময়ে কিভাবে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে দাম নিরূপিত হয়, তাহা ২১নং চিত্রে দেখানো হইয়াছে।



২২ নং চিত্র



২৩ নং চিত্র

বাজার দাম হইতেছে খুব স্বল্পকালীন দাম ; যোগান স্থির ও চাহিদার পরিবর্তন হয়

পূর্বপৃষ্ঠার ২১নং চিত্রে OS হইতেছে কোন জিনিসের নির্দিষ্ট যোগান। SS' হইতেছে যোগান রেখা, যখন চাহিদা হইতেছে DD' তখন চাহিদা রেখাও যোগান রেখার পারস্পরিক প্রভাবের, ফলে OP দাম নিরূপিত হইতেছে। আবার যখন চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং চাহিদা-রেখা হয় dd', তখন যোগান-রেখা ও চাহিদা-রেখার পারস্পরিক প্রভাবের ফলে দাম হইতেছে OP'। ইহা হইল খুব অল্প সময়ের দাম। যদি দেখা যায় চাহিদা বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে যোগান

বাড়িতেছে না, তখন দাম বেশী হইবে। আবার যোগান স্থির থাকা কালে যদি চাহিদা হঠাৎ কমিয়া যায়, তবে দামও কমিয়া যাইবে।

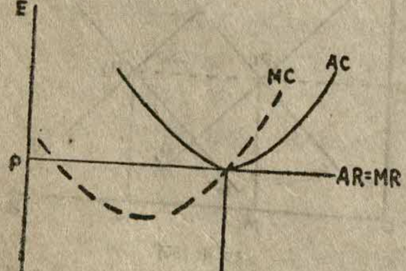
আবার, অল্প সময়ে (short run) যখন চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যোগান কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত হয়, তখন দাম কিভাবে নিরূপিত হয়, তাহা পূর্বপৃষ্ঠায় ২২নং এবং ২৩নং চিত্রে দেখানো হইয়াছে।

স্বল্পকালে চাহিদা পরিবর্তনশীল, যোগান অল্প পরিমাণ পরিবর্তনশীল।

২২নং চিত্রে যখন চাহিদা হইতেছে DD এবং যোগান-রেখা হইতেছে SS, তখন দাম হইতেছে OR ; কিন্তু চাহিদা যখন DD হইতে D_1D_1 রেখা পর্যন্ত বাড়িয়া গেল, তখন যোগানেরও পরিবর্তন হইল বটে (SS রেখা হইতে S_1S_1 রেখা), কিন্তু সেই অনুপাতে হইল না। যোগানের পরিমাণ বাড়িল OE হইতে OE_1 পর্যন্ত। ইহার ফলে দাম হইতেছে OR_1 ; দেখা যাইতেছে এক্ষেত্রেও দাম নিরূপণে যোগান অপেক্ষা চাহিদার আপেক্ষিক গুরুত্ব কিছু বেশী।

দীর্ঘকালে চাহিদা ও যোগান পরিবর্তনশীল

কিন্তু দীর্ঘকালে চাহিদার যেমন পরিবর্তন হয়, যোগানেরও সেইরূপ পরিবর্তন হয়। ইহার ফলে দাম নিরূপণে যোগানের গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে বাড়িয়া যায়—চাহিদা এবং যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে দাম নিরূপিত হয়। ২৩নং চিত্রে তাহাই দেখানো হইয়াছে। এই চিত্রে যখন চাহিদা D_1D_1 রেখা হইতে D_2D_2 রেখা পর্যন্ত বাড়িয়া যায়, তখন যোগানও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যায় (S_1S_1 রেখা হইতে S_2S_2 রেখা পর্যন্ত অথবা OM হইতে ON পর্যন্ত)। ইহার ফলে দাম স্বাভাবিক থাকে ; চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে দামের কোন পরিবর্তন হয় না।



২৪ নং চিত্র

দীর্ঘকালে ফার্মের দিক হইতে চিন্তা করিলে বলা যায়, বাজারের দাম সর্বনিম্ন গড়পড়তা মোট খরচের সমান হয়। যতক্ষণ দাম সর্বনিম্ন গড়পড়তা মোট খরচের সমান না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অতিরিক্ত মুনাফার লোভে অনেক ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিবে। এই প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ দাম সর্বনিম্ন গড়পড়তা মোট খরচের সমান হইবে। এই অবস্থায় প্রত্যেক ফার্মই স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit) অর্জন করে। দাম যখন খরচের সমান হয়, তখন কিছু মুনাফা খরচের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয় ; তখন এই মুনাফার পরিমাণ হইতেছে এমন যে তাহা না পাইলে

স্বাভাবিক মুনাফা

কোন ফার্মই উৎপাদন কাজে অগ্রসর হয় না। উৎপাদনের কাজে প্রত্যেক উদ্যোক্তাই অন্তত এমন কিছু মুনাফা অর্জন করিবে যাহা না পাইলে সে কোন কিছু উৎপাদনই করিবে না। ইহাই স্বাভাবিক মুনাফা। পূর্বপৃষ্ঠায় ২৪নং চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক বলিয়া গড় আয়-রেখা "পরিমাণ অক্ষের" (Quantity Axis) সমান্তরাল একটি সরলরেখা; প্রান্তিক আয়-রেখাও অনুরূপ। এই চিত্রে OP হইতেছে দাম এবং ইহা প্রান্তিক আয়, প্রান্তিক খরচ এবং গড় খরচের সমান। এক্ষেত্রে দাম শুধু যে গড় খরচের সমান তাহাই নহে, ইহা সর্বনিম্ন গড় খরচের সমান। এই দাম হইতেছে **দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম (long-run normal Price)** এবং OT হইতেছে কাম্য উৎপাদন (optimum-output)।

Exercise

1. Distinguish between Market Value and Normal Value. How is Market Value determined? (বাজার-দাম এবং স্বাভাবিক দামের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। বাজার-দাম কিভাবে নিরূপিত হয়?) (১০২-১০৩ পৃষ্ঠা)

2. What determines the short-period and the long-period values under Perfect Competition? (পূর্ণ প্রতিযোগিতায় স্বল্পকালীন দাম এবং দীর্ঘকালীন দাম কিভাবে নিরূপিত হয়?) (১০২-১০৫ পৃষ্ঠা)

3. What is Perfect Competition? How is value determined under Perfect Competition? (পূর্ণ প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে? পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কিভাবে মূল্য নিরূপিত হয়?) (৯৯-১০০ পৃষ্ঠা; ১০০-১০২ পৃষ্ঠা)

4 Explain the time element in the theory of value. (মূল্যতত্ত্বে সময়ের উপাদান বুঝাইয়া দাও।) (১০৩-১০৫ পৃষ্ঠা)

5. What is meant by a Perfectly Competitive market? Explain how the value of a commodity is determined in such a market. [H.S. (c) 1960] (সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলিতে কি বুঝায়? এইরূপ বাজারে জিনিসের দাম কিভাবে নিরূপিত হয় তাহা ব্যাখ্যা কর।) (৯৯-১০০ পৃষ্ঠা; ১০০-১০২ পৃষ্ঠা)

6. Explain how price is determined under Perfect Competition. (পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কিভাবে দাম নিরূপিত হয় তাহা ব্যাখ্যা কর।) (১০০-১০২ পৃষ্ঠা)

7. What are market prices? Why is demand more influential than supply in fixing market prices? [H. S. (H) Comp. 1960] (বাজার-দাম কাহাকে বলে? বাজার-দাম নির্ধারণে যোগান অপেক্ষা চাহিদার গুরুত্ব অধিক হয় কেন?) (১০২-১০৫ পৃষ্ঠা)

8. Distinguish between market price and normal price. Explain how market price of a commodity is determined. [H.S. (H) 1960] (বাজার-দাম ও স্বাভাবিক দামের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। কিভাবে বাজার-দাম নিরূপিত হয় তাহা ব্যাখ্যা কর।) (১০২-১০৩ পৃষ্ঠা)

9. What is the distinction between Market Value and Normal Value in economic theory? Explain how normal value of a thing is determined in a competitive market. (বাজার মূল্য ও স্বাভাবিক মূল্যের মধ্যে পার্থক্য কি তাহা দেখাও এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কিভাবে স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারিত হয় তাহা ব্যাখ্যা কর।) (১০২-১০৫ পৃষ্ঠা)

10. Show that the price of a product can neither be greater nor less than its cost, if competition is perfect. [H.S. (H). Comp. 1964] (পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে কোন জিনিসের দাম ইহার উৎপাদন খরচ হইতে বেশী বা কম হইতে পারে না, তাহা ব্যাখ্যা কর।) (১০০-১০২ পৃষ্ঠা)

11. "Price is equal to marginal utlity on the one hand and to marginal cost on the other."—Explain the statement. ("মূল্য একদিকে প্রান্তিক উপযোগ এবং অপরদিকে প্রান্তিক খরচের সমান।" এই উক্তিটি বুঝাইয়া দাও।) (১০১ পৃষ্ঠা)

দশম অধ্যায় | একচেটিয়া কারবারে দাম (Price under Monopoly)

একচেটিয়া বাজারে দাম নিরূপণ (Determination of price under monopoly)—একচেটিয়া বাজার বলিতে সাধারণত বুঝায় যে একজন অথবা অল্প কয়েকজন বিক্রেতা বাজারে কোন জিনিসের যোগান সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। যখন বাজারে মাত্র একজন বিক্রেতা থাকে তখন বাজারটিকে সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া বাজার (Pure Monopoly) বলা হয়। কিন্তু এই ধরনের বাজার কদাচিৎ দেখা যায়। একচেটিয়া কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে একচেটিয়া বিক্রেতা ইচ্ছামত যোগান বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারে। যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া কোনও একচেটিয়া সংঘ (monopoly combination) গঠন করে তখনও কোন জিনিসের যোগানের উপর সংশ্লিষ্ট সংঘের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। কোন অবস্থায়ই একচেটিয়া বাজারে

একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য

ফার্মগুলি অবাধে প্রবেশ করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া কারবারে কোন জিনিসের জন্য ক্রেতার চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক অথবা সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক থাকে না। তৃতীয়ত, একচেটিয়া বিক্রেতা সর্বদাই সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের চেষ্টা করিতে থাকে। শুধু সর্বোচ্চ মুনাফাই নহে, একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতা কিছু অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিবার চেষ্টাও করিয়া থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় সব বিক্রেতা সর্বোচ্চ মুনাফা পাইয়া থাকে; অর্থাৎ প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের সমান হয়। একচেটিয়া কারবারেও সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জিত হয় যখন প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের সমান হয়। আবার পূর্ণ প্রতিযোগিতায় চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক হয়, কিন্তু একচেটিয়া কারবারে চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক থাকে না। পূর্ণ প্রতিযোগিতার দাম প্রান্তিক খরচের সমান হয়; কিন্তু একচেটিয়া কারবারের দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী হয়।

একচেটিয়া কারবার এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্য

একচেটিয়া কারবারের মূল্য নিরূপণও চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে; তবে যোগান সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া বিক্রেতাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। চাহিদা মোটামুটিভাবে অস্থিতিস্থাপক বলিয়া একচেটিয়া বিক্রেতা যে দাম ধার্য করে তাহাই বাজারে দাম হয়। কিন্তু একচেটিয়া বিক্রেতা দাম ধার্য করিবার সময় ক্রেতাদের চাহিদাকে উপেক্ষা করিতে পারে না এবং নিয়ন্ত্রণও করিতে পারে না। একচেটিয়া বিক্রেতা নিজের ইচ্ছামত দাম বাড়াইতে পারে না। কারণ অতিরিক্তভাবে দাম বাড়াইয়া দিলে ক্রেতারা ঐ জিনিসটি নাও কিনিতে পারে এবং বিকল্প জিনিসের সন্ধান করিতে পারে। ইহাতে বাজারে একচেটিয়া বিক্রেতার আধিপত্য নষ্ট হইয়া যাইবে এবং লাভের পরিমাণও কমিয়া যাইবে। একচেটিয়া বাজারে যে দাম নিরূপিত হয়, তাহা প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী। একচেটিয়া বিক্রেতার দাম বাড়াইয়া দিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই সে যত খুশী দাম বাড়াইবে না; সে মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিবে কোন্ দামে কত বিক্রয় করিলে মোট লাভ কত হইবে। যে দামে লাভ সর্বাপেক্ষা বেশী হইবে, সেই দামেই একচেটিয়া বিক্রেতা তাহার জিনিস বেচিবে। নিম্নের উদাহরণের সাহায্যে ইহা পরিষ্কার হইবে:—

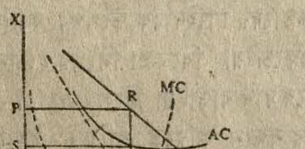
চাহিদার প্রভাব

একচেটিয়া কারবারে দাম নিরূপণ

প্রতি ইউনিটের দাম	বিক্রয়ের পরিমাণ	মোট প্রাপ্ত অর্থ	মোট খরচ	মোট মুনাফা
৫ টাকা	১০ ইউনিট	৫০ টাকা	৪০ টাকা	১০ টাকা
৬ ,,	৯ ,,	৫৪ ,,	৩৮ ,,	১৬ ,,
৭ ,,	৮ ,,	৫৬ ,,	৩২ ,,	২৪ ,,
৮ ,,	৬ ,,	৪৮ ,,	২৮ ,,	২০ ,,

এই উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে আট টাকা দাম হইলেই বিক্রেতার প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ সর্বাধিক হইবে না। যদি সাত টাকা দাম হয়, তবে এক্ষেত্রে বিক্রেতা সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ পাইতেছে। এখানে দাম যাহাই হোক্ না কেন, বিক্রয়লব্ধ মোট অর্থ হইতে মোট খরচের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা থাকিবে, তাহাই বিক্রেতার লাভ। এক্ষেত্রে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে মোট খরচের পরিমাণ বাদ দিলে বিক্রেতার লাভের পরিমাণ তখনই সর্বাধিক হইবে যখন দাম সাত টাকা। একচেটিয়া কারবারে চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক না হইবার দরুন গড় আয়-রেখা উপর হইতে নীচের দিকে যাইবে। ইহাতে প্রান্তিক আয়-রেখাও উপর হইতে নীচের দিকে যাইবে। যখন প্রান্তিক আয়-রেখা গড় আয়-রেখার নীচে থাকে তখন দাম প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশী থাকে। আবার প্রান্তিক আয় জিনিসটির প্রান্তিক উৎপাদন খরচের সমান। সুতরাং দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষাও বেশী। নিম্নের চিত্রে একচেটিয়া বিক্রেতা কিভাবে দাম নিরূপণ করে তাহাই নহে, একচেটিয়া কারবারী কিভাবে অতিরিক্ত মুনাফা (excess profit) অর্জন করে এবং দাম নিরূপণ করে তাহাও দেখানো হইল।

এই চিত্রে E বিন্দুতে একচেটিয়া বিক্রেতার ভারসাম্য (Equilibrium) অর্জিত হইয়াছে। এই বিন্দুতে বিক্রেতার প্রান্তিক আয় (marginal revenue) এবং প্রান্তিক খরচ (marginal cost) সমান। এবং তাহার লাভের পরিমাণও সর্বাধিক। বিক্রেতা OB পরিমাণ জিনিস বাজারে বিক্রয় করিবে। কিন্তু, একচেটিয়া বিক্রেতা যে দাম নিরূপণ করিবে, তাহা Q বিন্দুর উপর থাকিবে, অর্থাৎ আরও বেশী হইবে। বিক্রেতা দাম কি পরিমাণ বাড়াইবে তাহা ক্রেতাদের চাহিদা বিবেচনা করিয়া এবং সর্বাধিক পরিমাণ লাভ কোন্ দামে অর্জিত হইবে তাহা বিবেচনা করিয়া নিরূপিত হইবে। এক্ষেত্রে দাম হইবে BR; কারণ দাম যদি ইহা অপেক্ষা বেশী হয়, তবে ক্রেতাগণ আর জিনিসটি কিনিবে না। আবার দাম যদি ইহা অপেক্ষা কম হয় তবে বিক্রেতা আরও অধিক পরিমাণ লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে। AR রেখাটি ক্রেতাদের চাহিদা বুঝাইতেছে। R বিন্দুতে বিক্রেতা যে দাম নিরূপণ করিতেছে, তাহা ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী সর্বাধিক হইয়াছে। এখন দাম হইতে গড়পড়তা খরচ বাদ দিলে যাহা থাকিবে তাহাই বিক্রেতার অতিরিক্ত লাভ। এই চিত্রে BQ হইতেছে গড়পড়তা খরচ। BR দাম হইতে BQ খরচ বাদ দিলে যাহা থাকে, (অর্থাৎ PRQS আয়তন) তাহাই হইবে বিক্রেতার অতিরিক্ত লাভ।



২৫ নং চিত্র

একচেটিয়া বিক্রেতা যদিও কোন জিনিসের যোগান সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, তবুও সে ক্রেতাদের চাহিদাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। ক্রেতাদের চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রেতা সেই জিনিসটির দামেরও পরিবর্তন করে। যদি কখনও দেখা যায় চাহিদা স্থিতিস্থাপক (elastic), অর্থাৎ, কোন জিনিসের দাম সামান্য কমিয়া গেলে ইহার চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যায়, তখন একচেটিয়া বিক্রেতা জিনিসটির দাম কম রাখে। আবার যদি কখনও দেখা যায় যে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (inelastic), তবে একচেটিয়া বিক্রেতা দাম বেশী রাখে। কিন্তু দাম কত বেশী হইবে তাহা নির্ভর করে চাহিদা কত বেশী অস্থিতিস্থাপক তাহার উপর। যদি দাম খুব বেশী হইয়া গেলে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে তবে একচেটিয়া বিক্রেতা দাম বাড়াইবে না।

একচেটিয়া বাজারের দামের তারতম্য (Price discrimination in a monopoly market)—একচেটিয়া বাজারে অনেক সময় দামের তারতম্য দেখিতে পাই। অর্থাৎ, একচেটিয়া বিক্রেতা বাজারে জিনিসটির সমগ্র যোগান নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া সব ক্রেতার নিকট এক দামে জিনিস বিক্রয় করে না। সে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে বিভিন্ন দাম গ্রহণ করে। দামের এই তারতম্য অনেক সময় সংশ্লিষ্ট জিনিসের প্রকৃতির (nature of the commodity) জন্য হয়। এমন কতিপয় জিনিস আছে যেগুলির প্রতি ক্রেতার একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে এবং যে জিনিসগুলির দাম এই ধরনের অন্যান্য জিনিসের দাম অপেক্ষা বেশী হইলেও ক্রেতা কিনে। আবার দামের তারতম্য অনেক সময় ক্রেতার কতিপয় বৈশিষ্ট্যের জন্যও (Consumer's Peculiarities) হয়। অনেক ক্রেতা আছে যাহারা কোন জিনিস কিনিবার সময় দাম একটু বেশী দিতে হইলেও কিছু মনে করে না; বিক্রেতা যদি অন্যান্য ক্রেতার নিকট হইতে যে দাম নেয় তাহা অপেক্ষা তাহাদের নিকট হইতে বেশী দাম নেয়, তবুও তাহারা কিছু মনে করে না। ইহা ছাড়া, দামের তারতম্য অনেক সময় বাজারের দূরত্ব (distance) অথবা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার অসুবিধার (Frontier Barriers) জন্যও হয়।

দামের তারতম্যের অর্থ

দামের তারতম্য সাধারণত একচেটিয়া বাজারেই (monopoly) দেখা যায়। কিন্তু একচেটিয়া বাজার হইলেই যে দামের তারতম্য হইবে তাহা নহে। যদি একচেটিয়া বাজারে বিভিন্ন ক্রেতার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন ধরনের হয়, এবং একজন ক্রেতা সস্তায় একটি জিনিস কিনিয়া যদি একটু বেশী দামে আরেকজনের কাছে বিক্রয় না করিয়া ফেলে অর্থাৎ, যদি জিনিসটি পুনর্বিক্রয় (resale) না হয় তবে একচেটিয়া বাজারে দামের তারতম্য (Price discrimination) হওয়া সম্ভবপর। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় (Perfect Competition) দামের তারতম্য হয় না। কারণ পূর্ণ

দামের তারতম্য কখন হওয়া সম্ভবপর?

প্রতিযোগিতায় সব ক্রেতা জিনিসটির উৎপাদন খরচ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত। সেই ক্ষেত্রে সকলেরই চাহিদা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক ও তাহা সব ক্ষেত্রেই এক প্রকার এবং বাজারে শুধু একটিই দাম থাকে বলিয়া একজন বিক্রেতার পক্ষে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে বিভিন্ন দাম গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু, একচেটিয়া বাজারে যদি অল্প দামের বাজার হইতে বেশী দামের বাজারে সংশ্লিষ্ট জিনিসটির পুনর্বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবেই বিক্রেতার পক্ষে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে বিভিন্ন দাম লওয়া সম্ভবপর।

দামের তারতম্য করা কখন লাভজনক হয়

একচেটিয়া বিক্রেতার পক্ষে বিভিন্ন ক্রেতার মধ্যে দামের তারতম্য করা তখনই লাভজনক হয় যখন বাজারে ক্রেতাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হয়। যদি ক্রেতাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এক ধরনের হয়, তবে বিক্রেতার পক্ষে দামের তারতম্য করা লাভজনক হয় না। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ক্রেতা যেন বিক্রেতার জন্ম আলাদা আলাদা বাজারের সৃষ্টি করে যাহাতে একজন ক্রেতার নিকট হইতে যে দাম গ্রহণ করা হইবে তাহা অন্য একজন ক্রেতা না জানিতে পারে। যদি বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দাম গ্রহণ করার ব্যাপারে জানাজানি হইয়া যায়, তখনই দামের তারতম্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এবং জিনিসগুলি সস্তা দাম হইতে বেশী দামে পুনর্বিক্রয়ের সম্ভাবনা দেখা যায়।

একচেটিয়া কারবারের সীমা (Limits to monopoly)—একচেটিয়া কারবার সাধারণত বরাবর চলিতে পারে না। কারণ, একচেটিয়া বিক্রেতা যদি বরাবর ক্রেতাদের বেশী করিয়া শোষণ করিতে থাকে এবং বেশী করিয়া দাম চাহিতে থাকে, তবে বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতার আবির্ভাব হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যতক্ষণ কোন জিনিসের জন্য ক্রেতার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (Inelastic) থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত একচেটিয়া বিক্রেতার পক্ষে বেশী করিয়া দাম ধার্য করা সম্ভবপর। কিন্তু বেশী দাম দিয়া যদি বরাবরই একটি জিনিস কিনিতে হয়, তবে ক্রেতারাও চেষ্টা করিবে বিকল্প জিনিস সংগ্রহের জন্য। এইজন্য দাম নিরূপণের সময় একচেটিয়া বিক্রেতা সর্বদাই ক্রেতাদের চাহিদার দিকটাও বিবেচনা করিবে।

প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা

দ্বিতীয়ত, দাম অতিরিক্ত বেশী হইয়া গেলে সরকার এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে এবং জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। জনস্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্রকে তখন একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ করিয়া দাম কমাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। তৃতীয়ত, দাম অসম্ভবরূপে বাড়াইয়া দিলে একচেটিয়া বিক্রেতা বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারে। সর্বশেষে, জনমতের ভয়েও একচেটিয়া বিক্রেতা যত খুশী দাম বাড়াইতে পারে না।

প্রতিযোগিতামূলক বাজার দাম এবং একচেটিয়া কারবারের দামের

পার্থক্য—যদিও একচেটিয়া বিক্রেতা কোন জিনিসের দাম যত খুশী বাড়াইতে পারে না, তবুও একচেটিয়া বাজারে কোন জিনিসের দাম পূর্ণ প্রতিযোগিতায় বাজারের দাম অপেক্ষা বেশী থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন জিনিসের দাম সবসময়েই প্রান্তিক খরচের সমান হয়। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম এবং একচেটিয়া বাজারের দাম

শুধু তাহাই নহে, একচেটিয়া কারবারী দামটি গড় খরচ অপেক্ষা বেশী রাখিয়া অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে। তাহা ছাড়া, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে দাম যে শুধু প্রান্তিক খরচের সমান হয় তাহাই নহে, দাম গড়পড়তা মোট খরচেরও সমান হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় যেমন বিক্রেতার একমাত্র লক্ষ্য সর্বাধিক লাভ করা,—একচেটিয়া কারবারেও বিক্রেতার একমাত্র লক্ষ্য সর্বাধিক লাভ করা। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতা কতিপয় বিশেষ সুবিধা ভোগ করে বলিয়া (যেমন, যোগানের উপর নিয়ন্ত্রণ, ক্রেতার অস্থিতিস্থাপক চাহিদা ইত্যাদি) সে সর্বাধিক লাভ অর্জন করিয়াও অর্থাৎ প্রান্তিক খরচকে প্রান্তিক আয়ের সমান করিয়াও দামটি প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী রাখিতে পারে।

একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণ (Control of Monopoly)—একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রধান উপায় হইতেছে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ (state intervention) সম্প্রসারিত করা। প্রথমত, একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতাগণ অনেক সময় যে সকল অসৎ অসাধু উপায় অবলম্বন করে, সেইগুলি সরকার আইনের সাহায্যে বন্ধ করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র আইন করিয়া একদিকে দাম বাড়িয়া যাওয়া প্রতিরোধ করিতে পারে এবং অপরদিকে ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় জিনিস মজুত করিয়া রাখিয়া বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করার নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। সরকার একচেটিয়া বাজারের নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন জিনিসের সর্বোচ্চ দাম নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে।

তৃতীয়ত, সরকার অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর ধার্য করিতে পারে এবং এইভাবে একচেটিয়া কারবারীদের অধিক লাভ করিবার নীতি প্রতিরোধ করিতে পারে। আবার সরকার এই রকম আইন করিয়া দিতে পারে যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ হইয়া গেলে একচেটিয়া কারবারী আর দাম বাড়াইতে পারিবে না।

চতুর্থত, যে সকল শিল্প প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়িয়া যায় রাষ্ট্র ইহাদের উপর কর ধার্য করিয়া যে সকল শিল্প প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়িতেছে না সেইগুলির উপর করভার লাঘব করিতে পারে।

Exercise

1. What do you mean by Monopoly ? How is value determined under Monopoly ? [H. S. (H) Comp. 1961, 1962]

(একচেটিয়া কারবার বলিতে তুমি কি বুঝ? একচেটিয়া কারবারে কিভাবে মূল্য নিরূপিত হয়?) (১০৬-১০৯ পৃষ্ঠা)

2. What is discriminating Monopoly? When is it possible and profitable? What are its different varieties?

(তারতম্যমূলক একচেটিয়া কারবার কাহাকে বলে? ইহা কখন সম্ভবপর এবং লাভজনক? ইহা কত প্রকারের হইতে পারে?) (১০৯-১১০ পৃষ্ঠা)

3. What are the limits to the power of a monopolist?

(একচেটিয়া কারবারীর ক্ষমতা সীমা কি কি?) (১১০ পৃষ্ঠা)

4. Discuss whether a monopolist seller can charge any price that he likes. [H. S. (H). Comp. 1964]

(একচেটিয়া বিক্রেতা তাহার ইচ্ছামত কোন দাম ধার্য করিতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে লিখ।) (১০৯-১১০ পৃষ্ঠা)

5. How far does value depend upon cost of production? [H. S. (H). Comp. 1962]

(দাম কতটা উৎপাদন-খরচের উপর নির্ভর করে?)

[**ইঙ্গিত**: পূর্ণ প্রতিযোগিতায় স্বল্পকালীন দাম ও দীর্ঘকালীন দাম এবং একচেটিয়া কারবার ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতা অবলম্বনে এই প্রশ্নের উত্তর দাও।]

একাদশ অধ্যায় | টাকার কথা (Money)

টাকার প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান জগতে টাকা ছাড়া কোন প্রকার অর্থনৈতিক কাজ হয় না। এমন একদিন ছিল যখন মানুষ টাকা ছাড়াই জিনিসপত্রের বিনিময় করিত। উদাহরণের সাহায্যে তাহা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাক্, রাম নামক একটি ব্যক্তির একটি কলম দরকার, আর যদু নামক একটি ব্যক্তির একটি বইয়ের দরকার। যদি যদুর নিকট একটি কলম থাকে এবং রামের নিকট নির্দিষ্ট বইটি থাকে, তবে তাহারা দুইজন পরস্পরের মধ্যে তাহা বিনিময় করিতে পারে। কিন্তু এইভাবে দ্রব্য বিনিময়ে অসুবিধা দেখা যায়। প্রথমত, রাম

যে জিনিসটির পরিবর্তে অন্য কোন জিনিস পাইতে চায়, অপর কোন ব্যক্তিরও দ্বিতীয় জিনিসটির পরিবর্তে প্রথম জিনিসটির দরকার থাকা চাই। দ্বিতীয়ত, জিনিস দুইটির মূল্য সমান নাও হইতে পারে। সেক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মূল্যের মানে জিনিস দুইটির মূল্য পরিমাপ করা উচিত; অর্থাৎ বিনিময়ের একটি মাধ্যম (Medium) থাকা উচিত। তৃতীয়ত, একটি বিভাজ্য জিনিসের পরিবর্তে একটি অবিভাজ্য জিনিসের বিনিময় করিতে অসুবিধা হয়। যেমন ধর, একজন লোক একটি ঘোড়া কিনিতে চায়,—ইহার বদলে সে একটি ছুরি ছাড়িতে রাজী আছে। একটি ঘোড়ার মূল্য হয়ত ছুরিটির মূল্যের শতগুণ বেশী। সেক্ষেত্রে ঘোড়াটির শতাংশের এক ভাগ দিয়া ছুরিটি ক্রয় করা যায় না। দ্রব্য-বিনিময়ের এই অসুবিধাগুলি দূর করা যায় টাকার সাহায্যে। এইজন্য আধুনিক অর্থব্যবস্থায় টাকার গুরুত্ব খুবই বেশী। আমি একটি জিনিস বিক্রয় করিয়া যখন কিছু টাকা পাই, তখন সেই টাকার সাহায্যে আমি আমার প্রয়োজনীয় জিনিস কিনিয়া লইতে পারি। ইহার পর প্রশ্ন উঠে, টাকা কাহাকে বলে?

দ্রব্য বিনিময়ের অসুবিধাহেতু টাকার গুরুত্ব

টাকার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই; তবে টাকার বিভিন্ন কাজ বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহার একটি সংজ্ঞা তৈয়ারী করিতে পারি। অনেকে বলেন, টাকা বলিতে বুঝায় টাকা যাহা করে তাহাই ("Money is what money does")। কিন্তু, এই উদ্দেশ্যে টাকার কাজ বিশ্লেষণ করা দরকার। টাকা হইতেছে একটি সম্পদ যাহা সকলেই গ্রহণ করে এবং যাহার সাহায্যে আমরা জিনিসপত্র কেনা-বেচা ঋণ প্রদান ও পরিশোধের হিসাব-নিকাশ, ব্যবসায়ের লেনদেন, ইত্যাদি সবই করিতে পারি।

টাকার সংজ্ঞা

টাকার কাজ (Functions of Money)—টাকার কাজ সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি ছড়া আছে—

"Money is a matter of functions four,
A medium, a measure, a standard and a store."

অর্থাৎ টাকার মুখ্য কাজ চারিটি। অবশ্য এই চারিটি কাজ ছাড়াও টাকার অন্যান্য কাজ আছে। টাকার বিভিন্ন কাজ নিম্নে আলোচিত হইল।

প্রথমত, টাকা হইতেছে দ্রব্য-বিনিময়ের মাধ্যম (Medium of exchange)। দ্রব্য-বিনিময়ের বিভিন্ন অসুবিধাগুলি আলোচিত হইয়াছে। টাকার সাহায্যে আমরা এই অসুবিধাগুলি দূর করিতে পারি। যেমন, আমার যদি কোন জিনিসের প্রয়োজন হয়, তাহা আমি টাকার সাহায্যে কিনিতে পারি। বিক্রেতাও টাকার বিনিময়ে নিজের জিনিসটি হাতছাড়া করিতে পারে এবং এজন্য তাহাকে অন্য কোন জিনিসের সহিত সংশ্লিষ্ট জিনিসটি বিনিময় করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হয় না। টাকা সর্বদাই সকলে গ্রহণ করে। এইজন্য টাকার সাহায্যে কোন জিনিসের বিনিময় করিতে মোটেই অসুবিধা হয় না। যাহার একটি ঘোড়া আছে, সে ইহার বিনিময়ে একটি

গরু লইতে অস্বীকৃত হইতে পারে ; কিন্তু ইহার বিনিময়ে তাহার টাকা লইতে কোন আপত্তি থাকে না।

দ্বিতীয়ত, টাকার সাহায্যে কোন জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ, আমরা বলিতে পারি, পাইলট কলম অপেক্ষা পার্কার কলমের মূল্য বেশী। কারণ, পাইলট কলম কিনিবার জন্য যত টাকা খরচ করিতে হয়, পার্কার কলম কিনিবার জন্য তাহা অপেক্ষা বেশী টাকা খরচ করিতে হয়। সুতরাং টাকা হইতেছে কোন জিনিসের মূল্যের মাপকাঠি (Measure of value)।

তৃতীয়ত, টাকা ভবিষ্যৎ লেনদেনের মান (Standard of deferred payments) হিসাবে কাজ করে। ধরা যাক্, একজন লোক ১৯৫০ সালে ১০০ টাকা ধার করিয়াছে এবং ১৯৫৯ সালে ইহা শোধ দিতেছে। সুদ বাদ দিলে বর্তমানে ১০০ টাকা দিলেই ধার শোধ হইয়া যায়। কিন্তু ধরা যাক্ পাওনাদার দাবি করিল যে ১৯৫৯ সালের টাকার মান এক নহে, অথবা ১৯৫০ সালের ১০০ টাকা ১৯৫৯ সালের ১২৫ টাকার সমান, এবং সেজন্য দেনাদারকে ১২৫ টাকা শোধ দিতে হইবে। বাস্তবে যদি ইহা সত্য হয় তবুও ব্যবসায়ের লেনদেনে ইহা স্বীকৃত হইবে না। কারণ, টাকা ভবিষ্যতের লেনদেনের মান হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ দেনাদার টাকা ধার করিবার সময় যত টাকা ধার করিয়াছিল, দেনা শোধ দিবার সময় তত টাকাই শোধ দিবে।

চতুর্থত, টাকা সঞ্চিত মূল্যের ভাণ্ডার (Store of value) হিসাবেও কাজ করে। কেহ যদি টাকা সঞ্চয় করিতে চায়, তবে সে ইহা টাকার মাধ্যমেই করে।

টাকার সুবিধা

উপরি-উক্ত কাজগুলি ছাড়াও টাকার আরও কাজ আছে। টাকা দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। টাকার বিনিয়োগ হইলেই দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়। যেদিন হইতে দ্রব্য-বিনিময় প্রথার (Barter System) স্থানে টাকার সাহায্যে বিনিময়ের নিয়ম চালু হইয়াছে, সেদিন হইতেই সমাজের শ্রীবৃদ্ধি। অর্থনৈতিক জীবন প্রকৃতপক্ষে সেদিন হইতেই উন্নত হইতে আরম্ভ করে—শ্রম-বিভাগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও আরম্ভ হয়। টাকা খুব সহজেই একস্থান হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া যায়, এবং হিসাবপত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে টাকার সাহায্যে খুব সহজেই ব্যবসায়ের লেনদেন করা যায়। সুতরাং, বিনিময় কাজ এখন খুব সহজ হইয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন ধরনের টাকা (**Different Types of Money**)—টাকার অনেক রূপ আছে। প্রথমত, যে টাকা সরকার কর্তৃক টাকা হিসাবে বিবেচিত হয় অর্থাৎ, দেশের আইন অনুযায়ী যে টাকা সকলেরই গ্রহণযোগ্য, সেই টাকাকে বিহিত টাকা (Legal tender) বলে। বিহিত টাকা আবার দুই প্রকার হইতে পারে ; যথা—সসীম বিহিত টাকা (limited legal tender) এবং অসীম বিহিত টাকা (Unlimited legal tender)। অনেক সময় কোন মুদ্রা নির্দিষ্ট পরিমাণে বিহিত টাকা বলিয়া

বিবেচিত হয়। যদি এই পরিমাণের বেশী মুদ্রা কেহ গ্রহণ করিতে না চায়, তবে ইহা বে-আইনী হইবে না। ইংলণ্ডে চল্লিশটি শিলিং পর্যন্ত একজনকে একসঙ্গে প্রদান করা যাইতে পারে। যদি কেহ ৪৩টি শিলিং কোন লোককে দিতে চায় এবং গ্রহীতা যদি তাহা গ্রহণ করিতে না চায়, তবে তাহা বে-আইনী হইবে না। সে ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ শিলিং পাউণ্ডে পরিণত করিয়া লেনদেন করিতে হইবে।

অনেক সময় টাকাকড়ি প্রামাণিক টাকা (Standard money) এবং নিদর্শন টাকা (Token money), এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। প্রামাণিক টাকাই দেশের প্রধান বিনিময় মান। এই মুদ্রায় সব হিসাব করা হয়। ভারতের টাকা, ইংলণ্ডের পাউণ্ড, আমেরিকার ডলার ইত্যাদি প্রামাণিক টাকার উদাহরণ। প্রামাণিক টাকা সাধারণত সোনা অথবা রূপায় নির্মিত। ইহার লিখিত মূল্য (Face value) ধাতব মূল্যের সমান হয়। অর্থাৎ, ইহা গলাইয়া সোনা অথবা রূপা হিসাবে বিক্রয় করিলে আমরা ইহার লিখিত মূল্য অনুযায়ী সোনা অথবা রূপা পাইব। নিদর্শন টাকায় লিখিত মূল্য অপেক্ষা ধাতব মূল্য কম হয়। অর্থাৎ, এই টাকা গলাইয়া যে ধাতু পাওয়া যায়, তাহার দাম টাকার দাম অপেক্ষা কম। সরকারী আদেশেই লোকে এই টাকা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় বলিয়া ইহাকে অনেক সময় আদিষ্ট টাকা (Fiat money) বলা হয়।

আবার টাকা, কাগজী টাকা (Paper money) এবং ধাতব টাকা (Metallic money) এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। সরকার যে টাকা প্রচলন করেন, তাহা যখন সোনা বা রূপায় পরিবর্তনযোগ্য হয়, তখন সেই টাকাকে আমরা বলি পরিবর্তনযোগ্য কাগজী টাকা (Convertible paper currency) এবং যদি ইহা সোনা অথবা রূপায় পরিবর্তনযোগ্য না হয়, তবে ইহাকে অপরিবর্তনযোগ্য কাগজী টাকা (Inconvertible paper currency) বলে। কাগজী টাকা যখন সংরক্ষিত ধাতুর পরিমাণ হয়, তখন ইহাকে প্রতিভূ টাকা (Representative paper money) বলা হয়। যখন কোন বিশেষ টাকাকড়ি দিয়া শুধু হিসাবের কাজ করা হয়, তখন ইহাকে হিসাব-নিকাশের টাকা (money of account) বলে, এবং যখন হিসাব-নিকাশ ব্যতীত অন্যান্য কাজের জন্য টাকাকড়ি ব্যবহার করা হয়, তখন ইহাকে সঠিক বা প্রকৃত টাকাকড়ি (Actual money) বলা হয়। যখন বাজার মূল্যের স্থিরতা (Stability) বজায় রাখিবার জন্য সরকার কাগজী টাকার প্রচলন করেন, তখন ইহাকে পরিচালিত টাকা (Managed money) বলে।

মুদ্রা মান (Monetary Standards)—যখন কোন দেশে টাকার প্রতি এককের দাম কত হইবে, তাহা কোন ধাতু অথবা জিনিসের মাপে স্থির করিয়া দেওয়া হয় তখন সেই ধাতু অথবা জিনিসকে মুদ্রা-মান বলে। যেমন, স্বর্ণমান (Gold Standard), দ্বিধাতুমান (Bimetallism), এবং কাগজী মুদ্রা মান (Paper Currency Standard) ইত্যাদি। যদি কোন দেশের টাকাকড়ি একটি নির্দিষ্ট ধাতুর তৈয়ারী

হয় তবে ইহাকে এক-ধাতুমান (Monometallic Standard or Single Standard) বলা হয়। টাকাকড়ি যদি শুধু সোনা দিয়া তৈয়ার করা হয়, তবে ইহাকে স্বর্ণমান (Gold Standard) বলে; আর যদি ইহা রূপা দিয়া তৈয়ার করা হয়, তবে ইহাকে রৌপ্য মান (Silver Standard) বলে। দেশে স্বর্ণমান চালু থাকিলে প্রচলিত সোনার টাকা থাকিতে পারে অথবা কাগজী টাকাও থাকিতে পারে যদি সেই কাগজী টাকার হিসাবে সোনার মূল্য স্থির থাকে এবং জনসাধারণ সেই দামে অবাধে সোনা কেনা-বেচা করিতে পারে। দেশ হইতে সোনা বাহিরে যাওয়া অথবা বিদেশ হইতে দেশে সোনা আসায় কোন বাধা থাকিবে না। যদি দেশে সোনা এবং রূপা উভয় ধাতুর টাকাই প্রচলিত থাকে, তবে ইহাকে দ্বিধাতুমান (Bimetallic Standard) বলে। সেইক্ষেত্রে দুইটি ধাতু দিয়া তৈয়ারী উভয় মুদ্রাই অসীম বিহিত টাকা (Unlimited Legal Standard) হইবে এবং উভয় টাকার মূল্যই ইহাদের ধাতব মূল্যের সমান হইবে। বর্তমানে কোন দেশেই আমরা এই মুদ্রা-ব্যবস্থা দেখিতে পাই না; একশত বৎসর আগে অনেক দেশে এই মুদ্রা ব্যবস্থা চালু ছিল। যখন একদেশের মুদ্রামান অন্যদেশের মুদ্রামানের পরিমাণের সহিত আইনের মাধ্যমে যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তখন ইহাকে বিনিময় মান (Exchange Standard) বলা হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত একটি ভারতীয় টাকা বৃটিশ মুদ্রার এক শিলিং ছয় পেন্সের সমান, এই পরিমাপে আমাদের দেশে কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইহাকে বলা হইত স্টার্লিং বিনিময় মান (Sterling Exchange Standard)। যখন কাগজী টাকার পিছনে সম্পূর্ণভাবে সোনা এবং বৈদেশিক মুদ্রা, উভয়েরই রিজার্ভ রাখা হয় এবং সেই টাকার মূল্যের পরিমাপে অথবা রিজার্ভে সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাপে সোনার মূল্য স্থির রাখা হয়, তখন ইহাকে স্বর্ণবিনিময় মান (Gold Exchange Standard) বলা হয়।

এক-ধাতুমান

দ্বিধাতুমান

বিনিময় মান

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর অনেকগুলি জাতি একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে মিলিত হইয়া আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার (International Monetary Fund) গঠন করে। এই প্রতিষ্ঠানের একটি বিশেষ কাজ হইল, ইহার সদস্য দেশগুলি মুদ্রামানের পরস্পর বিনিময় হারের স্থিরতা (stability) বজায় রাখিবার জন্য স্বর্ণের সঙ্গে প্রত্যেক দেশের মুদ্রার বিনিময় মূল্য (par value) নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া।

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও মুদ্রামান

কাগজী টাকার সুবিধা ও অসুবিধা (Atvan.ages and disadvantages of the Currency Standarc)—আধুনিক কালে কাগজী টাকাই সব দেশে প্রচলিত। অবশ্য ধাতব মুদ্রা যে প্রচলিত নয়, তাহা নহে। ধাতব মুদ্রার

পাশাপাশি আমরা কাগজী টাকা দেখিতে পাই এবং যত দিন যাইতেছে, কাগজী টাকা অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে। ইহার কারণ হইতেছে এই যে ভাল টাকার সবগুলি লক্ষণ কাগজী টাকায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সহজে একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায়। বড় বড় লেনদেন করার পক্ষেও ইহা সুবিধাজনক। কাগজী টাকা প্রচলিত হইলে ধাতব টাকাকড়ি গণনা করিবার ঝামেলা ও সময়ের অপচয় হইতে রেহাই পাওয়া যায়।

কাগজী টাকার সুবিধা

দ্বিতীয়ত, ধাতব টাকা তৈয়ার করিতে সরকারের যত খরচ হয়, কাগজী টাকা তৈয়ার করিতে তাহা অপেক্ষা অনেক কম টাকা খরচ হয়। তৃতীয়ত, ধাতব টাকা প্রচলিত থাকিলে দেশে কোন নির্দিষ্ট ধাতু যে পরিমাণে আছে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে টাকা তৈয়ার করা সম্ভবপর নয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করিবার সময় প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয়। কাগজী টাকার সাহায্যে সেই অর্থের সংস্থান করা যাইতে পারে।

বিভিন্ন দেশের বাজেট অথবা অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় যখনই আর্থিক ঘাটতি হইয়াছে তখন সেই আর্থিক ঘাটতি দূর করার জন্য নূতন কাগজী টাকার সাহায্য লওয়া হইয়াছে। কাগজী টাকার সাহায্যে দেশের মুদ্রাব্যবস্থাকে স্থিতিস্থাপক (elastic) করা চলে। অর্থাৎ যখনই দেশে টাকার প্রয়োজন হইবে, তখনই টাকা সরবরাহ করা সম্ভবপর।

কিন্তু, এই ব্যবস্থার কতিপয় ত্রুটিও আছে। প্রথমত, ধাতব টাকার মূল্যের যেমন একটি নিশ্চয়তা (certainty). অথবা স্থিরতা (stability) আছে কাগজী টাকার তাহা নাই। হঠাৎ যদি টাকা বেশী ছাপানো হইয়া যায়, তবে ইহার মূল্য কমিয়া যায়। কিন্তু ধাতব টাকা যত খুশী তত সৃষ্টি করা যায় না। টাকার মূল্য কমিয়া যাইবার অর্থ হইল,

কাগজী টাকার অসুবিধা

আগে ১ টাকায় কোন জিনিস যত পরিমাণে কেনা যাইত, টাকার মূল্য কমিয়া গেলে ১ টাকায় তাহা অপেক্ষা কম জিনিস কেনা যাইবে, অর্থাৎ জিনিসের দাম বাড়িয়া যাইবে। এই অবস্থাকেই মুদ্রাস্ফীতি বলে। কাগজী টাকার ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা প্রবল থাকে। এইজন্য এই অবস্থায় টাকার মূল্যের স্থিরতা থাকে না। টাকার মূল্যের যদি স্থিরতা না থাকে, তবে দেশের সাধারণ মানুষকে অনেক দুর্গতির সম্মুখীন হইতে হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইয়া যায়। দ্বিতীয়ত, কাগজী টাকা-ব্যবস্থার আর একটি ত্রুটি হইতেছে এই যে ইহা বিদেশে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে। কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা লইতে কোন বিদেশী রাষ্ট্র আপত্তি করিবেন না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এইজন্য কাগজী টাকার গুরুত্ব কম। তৃতীয়ত, দেশে কাগজী টাকা প্রচলিত থাকিলে সরকার অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুদ্রা ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে; ইহার বিরুদ্ধে সহজে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা

যায় না। সর্বশেষে, বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিলে টাকার বহির্মূল্য কমিয়া যাইবার (devaluation) সম্ভাবনা থাকে বলিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতে পারে এবং দেশের ভিতর জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইতে পারে।

ব্যাংক কর্তৃক টাকার সৃষ্টি (Creation of Money by Banks)—

টাকার সৃষ্টিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব

আধুনিক অর্থ ব্যবস্থায় কাগজী টাকা ছাপাইবার অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। আইন নির্দিষ্ট উপায় অথবা সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই টাকা ছাপাইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা যাক। ভারতের এক টাকার নোট সরকার নিজেই ছাপাইয়া থাকেন। অবশিষ্ট টাকা ছাপাইবার দায়িত্ব হইতেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি ১১৫ কোটি টাকার মূল্যের সোনা এবং ৮৫% কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অথবা সোনা রিজার্ভ হিসাবে রাখে, তবে ইহা যত খুশী তত টাকা ছাপাইতে পারে। সরকারী নির্দেশে শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকই টাকার সৃষ্টি করিতে পারে, এই যুক্তি আংশিকভাবে সত্য হইলেও সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে।

ভারতে কাগজী টাকা সৃষ্টি করিবার উপায়

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থাও টাকাকড়ি সৃষ্টি করিয়া থাকে। সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলিও টাকাকড়ি সৃষ্টি করে এবং সেই টাকাকে বলা হয় ব্যাংক সৃষ্ট টাকাকড়ি (Bank money)। আধুনিক ব্যাংকগুলি যে ঋণ প্রদান করে তাহার প্রত্যেকটিই টাকার সৃষ্টি করে। এইজন্য বলা হয়, "Loans create deposits"। টাকাকড়ি সৃষ্টি করিবার এই পদ্ধতিটি আলোচনা করা যাক্, একটি লোক ব্যাংক হইতে ১০০০ টাকা ধার করিল। ব্যাংক লোকটিকে সম্পূর্ণ নগদ টাকা প্রদান করে না। ব্যাংক ঐ টাকা লোকটির নামে ব্যাংকের হিসাবে আমানত দেখায়। এই লোকটি যদি কোন চেকের (Cheque) সাহায্যে অন্য কোন লোককে কিছু টাকা প্রদান করে, তখন ব্যাংক প্রথম ব্যক্তির হিসাব হইতে চেক অনুযায়ী টাকা সরাইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির হিসাবে জমা রাখে। সবই কাগজপত্রে হইয়া যায়, নগদ টাকায় লেনদেন হয় না। যেহেতু লোকটি সম্পূর্ণ টাকা একসঙ্গে ব্যাংক হইতে তুলিয়া লয় না, সেইজন্য ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। অনুরূপভাবে ব্যাংক যদি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা অন্য কোন লোকের নিকট হইতে ঋণপত্র কিনে, তবে সেই লেনদেনও নগদ টাকায় হয় না। ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংকের হিসাবে পাওনার ঘরে সেই টাকা জমা দেখায়। ইহাতে ব্যাংকে মোট আমানতের পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

বাণিজ্যমূলক ব্যাংক ব্যবস্থা কর্তৃক টাকাকড়ি সৃষ্টি

এই ব্যবস্থার কতিপয় সীমা আছে। প্রথমত, প্রত্যেক ব্যাংককেই কিছু কিছু পরিমাণ নগদ টাকা সর্বদা হাতে রাখিয়া দিতে হয়। কারণ, আমানতকারী যে

কোন সময়েই টাকা তুলিতে চাহিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ের লেনদেন ব্যবসায়ীগণ যদি নগদ টাকায় লেনদেন করিতে অভ্যস্ত হয় এবং চেক (Cheque) প্রভৃতির সাহায্যে লেনদেন করিতে না চায়, তবে ব্যাংকের এভাবে আমানত সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টা সফল হয় না। তৃতীয়ত, প্রত্যেক ব্যাংককেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট কিছু রিজার্ভ রাখিতে হয়।

বাণিজ্যমূলক ব্যাংক কর্তৃক টাকাকড়ির সৃষ্টি করিবার সীমা

বাণিজ্যমূলক ব্যাংকের কাজ (Functions of a Commercial Bank)—সাধারণত ব্যাংক বলিতে বাণিজ্যমূলক (Commercial) ব্যাংককেই বুঝায়। এই জাতীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হইতেছে জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা জমা রাখা এবং সেই জমার জন্য সুদ প্রদান করা।

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলি জনসাধারণ এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেয়। ধার দেওয়া ব্যাংকের একটি ব্যবসায় এবং এইজন্য ইহা সুদ পায়। তাহা ছাড়া, টাকা ধার দেওয়ার মাধ্যমে ব্যাংক নূতন আমানতের সৃষ্টি করে। ব্যাংকে তিন প্রকার আমানত দেখা যায়; যথা, চলতি আমানত (Current Account Deposits), সঞ্চয়ী আমানত (Savings Deposits) এবং স্থায়ী আমানত (Fixed Deposits)। দীর্ঘদিনের কারবারের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে আমানতকারীগণ সব টাকা একসঙ্গে তুলিয়া লয় না সেইজন্য ব্যাংক সব টাকা জমা না রাখিয়া কিছু টাকা নিজের উদ্যোগে বিনিয়োগ করে।

তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলি দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য টাকা ধার দেয়। আমাদের দেশে স্টেট ব্যাংক কৃষির উন্নতির জন্য টাকা ধার দেয়।

চতুর্থত, বাট্টা দিয়া হুণ্ডি কিনিয়া লওয়া এবং বৈদেশিক হুণ্ডি অথবা মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করাও ব্যাংকের অন্যতম কাজ। বিদেশে আমদানি-রপ্তানির কাজ যাঁহারা করেন, তাঁহারা ব্যাংকের মারফৎ বৈদেশিক মুদ্রায় কেনা-বেচা করিতে পারেন।

পঞ্চমত, ব্যাংক নিজের মক্কেলের জন্য অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করে। অলংকার, গোপনীয় দলিল প্রভৃতি যাবতীয় মূল্যবান সামগ্রী ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত রাখা যায়। তাহা ছাড়া, শেয়ার কেনা-বেচা সম্বন্ধে মক্কেলগণ ব্যাংকের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজের মক্কেলের পক্ষে অছি (Trustee) হিসাবে কাজ করে।

ব্যাংক ব্যবস্থার উপকারিতা (Utility of the Banking System)—আধুনিককালে ব্যাংক ব্যবস্থার উপকারিতা অপরিসীম। ব্যাংকে টাকা সঞ্চিত রাখিয়া জনসাধারণ নিজেদের সঞ্চয়ের নিরাপত্তা বিধান করে। পূর্বে চোর-ডাকাতের উৎপীড়নে অনেক ক্ষেত্রেই জনগণ টাকা সঞ্চয় করিতে পারিত না। ব্যাংক যে শুধু সঞ্চিত টাকা নিরাপদে রাখে, তাহাই নহে, জনসাধারণকে

ব্যাংক ব্যবস্থায় অর্থের নিরাপত্তা বাড়ে, জনগণের সঞ্চয়ের স্পৃহা বাড়ে এবং লেনদেন সহজসাধ্য হয়

সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াইতেও ব্যাংক প্রণোদিত করে। যে দেশে ব্যাংক-ব্যবসায় খুব ভাল, সেই দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়ের স্পৃহাও (will to save) খুব বেশী। ব্যাংক প্রয়োজনের সময় ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে টাকা ধার দিয়া দেশের শিল্প-কাঠামোর ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিমাণও ইহাতে বাড়িয়া যায়। দূর দেশে টাকা আদান-প্রদান এবং ব্যবসায়ী লেনদেনের সমস্যার সহজ সমাধান ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে হইয়া যায়। যে দেশে ব্যাংক ব্যবস্থা ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই, সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও হয় নাই। সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয় ব্যাংকের মাধ্যমে, সঞ্চয়ের বিনিয়োগও ব্যাংকের মাধ্যমেই হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহেও ব্যাংকের একটি সক্রিয় ভূমিকা আছে। সরকারের সিকিউরিটি অথবা বণ্ড ক্রয় করিয়া—ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। আমাদের দেশের অনুন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যতম কারণ হইতেছে অনুন্নত ব্যাংক ব্যবস্থা।

বিভিন্ন ঋণপত্র (Credit Instruments)—ব্যাংক ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে চেক, হুণ্ডি প্রভৃতির সাহায্যে লেনদেন খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে।

ক্রেডিট (Credit)—অর্থশাস্ত্রে ক্রেডিট বলিতে আমরা সাধারণত বুঝি ভবিষ্যতে টাকা দিবার অঙ্গীকারের বিনিময়ে জিনিসপত্রের কেনাবেচা। ক্রেডিট কারবার নগদ কারবারের বিপরীত। নগদ কারবারে জিনিসপত্র কেনাবেচার সঙ্গে সঙ্গে দেনাপাওনা নগদ টাকায় মিটাইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু ক্রেডিট কারবারে দেনা-পাওনা নগদ টাকায় মিটাইয়া দেওয়া হয় না। সেই ক্ষেত্রে ক্রেতা কিছুদিন বাদে বিক্রেতাকে জিনিসপত্র বিক্রয়ের টাকা মিটাইয়া দিবে এই মর্মে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

ক্রেডিট কাহাকে বলে?

ক্রেডিট কারবারে ক্রেতা এবং বিক্রেতার পরস্পরের উপর আস্থাবান থাকা উচিত। সুতরাং ক্রেডিট কারবারে দুইটি বিশেষ উপাদান চোখে পড়ে; একটি হইতেছে, লেনদেনের বিপক্ষে নগদ টাকা প্রদান করিবার জন্য সময়ের ব্যবধান; অপরটি হইতেছে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক।

ক্রেডিট কারবারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক আস্থা থাকা দরকার

চেক (Cheque)—ব্যাংকে টাকা জমা রাখিলে আমানতকারী একটি চেক বই পায়। আমানতকারী যদি নিজের আমানত হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিজেকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিবার জন্য ব্যাংককে একটি লিখিত নির্দেশ দেয়, তখন সেই নির্দেশপত্রকে চেক বলা হয়। এই লিখিত নির্দেশপত্র দেওয়ার একটি নির্দিষ্ট ফর্ম চেক বইয়ে থাকে। চেক হইতেছে এক ধরনের ঋণপত্র। সুতরাং চেকের মাধ্যমে লেনদেন করিতে হইলে যে ব্যক্তি চেক প্রদান করিবে এবং যে ব্যক্তি চেক গ্রহণ করিবে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক থাকা চাই।

চেক কাহাকে বলে?

চেককে আমরা টাকা বলিয়া গণ্য করিতে পারি না যদিও টাকা এবং চেকের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য আছে। প্রথমত, টাকা সকলেই গ্রহণ করেন, কিন্তু চেক সকলেই গ্রহণ করিতে পারেন না। যাহার নামে চেক দেওয়া হয়, শুধু তিনিই চেক গ্রহণ করিতে পারেন।

চেক এবং টাকার মধ্যে পার্থক্য

দ্বিতীয়ত, টাকার অনেকবার হাত-বদল হইতে পারে। কিন্তু একখানি চেকের খুব কমই হাত-বদল হয়। তৃতীয়ত, কাহাকেও টাকা প্রদান করিলে দেনা-পাওনার শেষ হয়। কিন্তু চেক প্রদান করিলে দেনা-পাওনার শেষ হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত চেকটি ব্যাংকে ভাঙ্গানো না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত দেনা-পাওনা শেষ হয় না।

চেকের মাধ্যমে লেনদেনের অনেক সুবিধা আছে। চেকের মাধ্যমে লেনদেন করিলে অধিক পরিমাণে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, চেকের মাধ্যমে লেনদেন করা খুবই নিরাপদ। যদি কোন কারণে কাহারও কোন চেক হারাইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ ব্যাংককে তাহা জানাইলে লেনদেনটি বন্ধ করা যায়। কিন্তু টাকা হারাইয়া গেলে এই সুবিধা পাওয়া যায় না।

হুণ্ডি (Bill of Exchange)—হুণ্ডি হইতেছে একপ্রকার ঋণপত্র। বড় বড় খরিদ্দারগণ যখন জিনিসপত্র কিনে, তখন তাহারা প্রায়ই জিনিসপত্রের নগদ দাম না দিয়া ইহাদের উপর একটি ঋণপত্র দেয়। এই পত্রে লেখা থাকে যে জিনিসপত্রের বিক্রয় বাবদ পাওনা টাকা পত্রবাহককে কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হউক। এই প্রকার ঋণপত্রকে বিল বা হুণ্ডি বলে। যদি ক্রেতা এবং বিক্রেতা একই দেশের অধিবাসী হয় তবে এই ঋণপত্রকে দেশীয় বিল বা হুণ্ডি বলে। আর যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই দেশের অধিবাসী হয়, তবে সেই ঋণপত্রকে বৈদেশিক হুণ্ডি বলা হয়। বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হুণ্ডি পাঠাইবার পর, ক্রেতা যখন এই ঋণপত্র গ্রহণ করে তখন সেই নির্দিষ্ট টাকার জন্য ক্রেতা দায়ী থাকে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে বড় বড় লেনদেন করার পক্ষে হুণ্ডি খুবই প্রয়োজনীয়। এক দেশ হইতে অন্য দেশে হুণ্ডির মাধ্যমে লেনদেন করিলে খরচ খুবই কম হয়। ইহাতে নগদ টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হয় না।

হুণ্ডির বাজার দর হুণ্ডির মোট চাহিদা এবং যোগানের দ্বারা নিরূপিত হয়। ব্যবসায়ী হুণ্ডির চাহিদা থাকে তাহাদেরই যাহাদের বিদেশে টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হয়। আবার যাহারা বিদেশে জিনিস ক্রয় করিয়াছে তাহারা ক্রেতাদের উপর হুণ্ডি কাটে এবং ইহার বিনিময়ে নগদ টাকা চায়।

বিভিন্ন ঋণপত্রের সুবিধা (Merits of Credit Instruments)—ক্রেডিট কারবারে ক্রেতা ভবিষ্যতে বিক্রেতাকে নগদ টাকা দিবে এই মর্মে যে প্রতিজ্ঞা-পত্র করা হয় তাহাকে ঋণপত্র বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, চেক এবং ব্যবসায়ী হুণ্ডি (Bill of Exchange) প্রভৃতি ঋণপত্রের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বৈদেশিক বাণিজ্য ঋণপত্রের মাধ্যমে চলিতে থাকিলে অধিক পরিমাণে স্বর্ণমুদ্রার

প্রয়োজন হয় না। বড় বড় লেনদেনের ব্যাপারে যদি উভয়পক্ষের মধ্যে ঋণপত্রের মাধ্যমে ব্যবসার কাজ সম্পাদিত হয়, তবে যে পক্ষের কিছু টাকা নীট পাওনা থাকিবে, শুধু সেই পক্ষই কিছু পরিমাণে স্বর্ণমুদ্রা অথবা ডলার কিংবা পাউণ্ড পাইবে। এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় টাকা পয়সা পাঠানো খুবই অসুবিধাজনক এবং ব্যয়বহুল।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ (Functions of a Central Bank)—কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হইতেছে মুদ্রা প্রচলন করা এবং মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করা।

বাণিজ্যমূলক ব্যাংকের ব্যাংক

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ বাণিজ্যিমূলক ব্যাংকগুলির ব্যাংকার (Banker of Banks) হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলিকে নিজেদের চলতি আমানতের এবং স্থায়ী আমানতের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখিতে হয়।

সরকারের ব্যাংক

তৃতীয়ত, সরকারের ব্যাংক (Government's Bankers) হিসাবেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করিয়া থাকে। সরকারের টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা থাকে। সরকারের প্রয়োজনের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ধার দেয়। এই টাকা ধার দেওয়ার অর্থ হইতেছে নূতন নোট ছাপানো। সরকারের ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের (Debt services) ভার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতেই থাকে।

মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি

চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মোট মুদ্রা পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক (১) ইহার সুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধি (Bank rate changes) করে, (২) খোলা-বাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় (Open-market operations) করে, (৩) বাণিজ্যমূলক ব্যাংকের আমানত কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখিবার অনুপাতের হ্রাস-বৃদ্ধি (Variable reserve ratio) করে অথবা (৪) বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলিকে কোন বিশেষ ঋণ প্রদান সম্পর্কে নির্দেশ অথবা উপদেশ প্রদান করে। টাকার পরিমাণ যখন হঠাৎ বাড়িয়া যায়, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইহা কমাইবার জন্য বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলিকে টাকা ধার প্রদান করিবার ক্ষেত্রে সুদের হার বাড়াইয়া দেয়। ইহাতে দেশের বিনিয়োগ ব্যাহত হয় এবং মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইবার প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক-রেট কমাইয়া দেয়।

ব্যাংক রেট পরিবর্তন

সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়

মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দরকারবোধে খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় (Open Market Operations) করে। দেশে যখন মুদ্রার পরিমাণ বেশী থাকে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জনসাধারণ ও বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলির কাছে সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া ইহাদের হাতের বাড়তি টাকা নিজের হাতে লইয়া আসে। অনুরূপভাবে টাকার পরিমাণ কমিয়া গেলে তাহা বাড়াইবার জন্য সিকিউরিটি বিক্রয় বন্ধ করিয়া

সিকিউরিটি ক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয় যাহাতে জনসাধারণ ও বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলির হাতে অধিক টাকা আসে।

মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক আরও একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে তাহা হইতেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলির আমানতের যে অনুপাত (reserve ratio) জমা থাকে, দরকার হইলে সেই অনুপাতের হ্রাসবৃদ্ধি করা।

ব্যাংকের রিজার্ভ অনুপাতের পরিবর্তন

যখন মুদ্রার পরিমাণ কমাইবার দরকার হয়, তখন রিজার্ভ ব্যাংক এই আমানত হার বাড়াইয়া দেয়, এবং যখন মুদ্রার পরিমাণ কমাইবার দরকার হয়, তখন রিজার্ভ ব্যাংক এই আমানত হার কমাইয়া দেয়। সর্বশেষে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্বাচনমূলক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (selective method of credit control) প্রয়োগ করিয়া মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এই পদ্ধতি দুইটি উপায়ে প্রয়োগ করা হয়। প্রথমত, বাণিজ্যমূলক ব্যাংকের কোন খরিদ্দার যদি ব্যাংকের নিকট হইতে টাকা ধার করে, তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই রকম নিয়ম চালু করিতে পারে যে সেই খরিদ্দারকে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যমূলক ব্যাংকের নিকট মোট ধারের পরিমাণের একটি নির্দিষ্ট শতকরা অংশ জমা রাখিতে হইবে এবং সেই টাকা জমা হইবার পর সে টাকা লইবে; এই পদ্ধতিকে বলা হয় *regulation of margin requirement*. দ্বিতীয়ত, কতিপয় নির্বাচিত ভোগ-সামগ্রীর স্বপক্ষে বাণিজ্যমূলক ব্যাংক যাহাতে টাকা ধার না দেয়, সেই মর্মে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দেশ প্রদান করিতে পারে। বাণিজ্যমূলক ব্যাংক কত টাকা ধার প্রদান করিতে পারিবে তাহার পরিমাণ সীমিত করিয়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দেশ প্রদান করিতে পারে; তাহাকে *Credit rationing* বলা হয়।

নির্বাচনমূলক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

ধারের পরিমাণ সীমিত করা

পঞ্চমত, দেশীয় মুদ্রার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়-হার বজায় রাখিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য-ব্যবস্থার স্থিরতা বজায় রাখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকে।

বিনিময়ের হারের স্থিরতা বজায় রাখার দায়িত্ব

ষষ্ঠত, দেশীয় ব্যাংকের নিকট যদি কোন বাণিজ্য-ব্যাংক টাকা ধার চায়, তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাহা দেয়। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে শেষ পর্যায়ের কর্জদাতা (Lender of the last resort) বলা হয়।

শেষ পর্যায়ের কর্জদাতা হিসাবে কাজ করা

সপ্তমত, বিভিন্ন বাণিজ্যমূলক ব্যাংকের পরস্পরের মধ্যে যে লেনদেন হয় সেগুলির হিসাব-নিকাশ করিবার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্রহণ করে। তখন ইহাকে Clearing House বলে।

নিকাশী ঘর হিসাবে কাজ করে

ভারতের ব্যাংকিং ব্যবস্থার সংগঠন (Organisation of the Indian Banking System)

ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে আছে রিজার্ভ ব্যাংক। ইহার পর আমরা দেখিতে পাই ভারতের স্টেট ব্যাংক, রাষ্ট্রায়ত্ত চৌদ্দটি ব্যাংক, অন্যান্য বাণিজ্যমূলক ব্যাংক, দেশীয় ব্যাংক, ব্যবসায়ী, সমবায় ব্যাংক, বিনিময় ব্যাংক, জমি-বন্ধকী ব্যাংক ইত্যাদি। তাহা ছাড়া, শিল্পক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহ করিবার জন্য একটি শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক (Industrial Development Bank of India) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক এবং ইহার কাজ (Reserve Bank of India and its functions)—১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাংক বিধি অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংককে ১৯৩৫ সালে একটি বে-সরকারী ব্যাংকরূপে গঠন করা হয়। ১৯৪৮ সালে রিজার্ভ ব্যাংককে জাতীয়করণ করা হয়। রিজার্ভ ব্যাংকের দুইটি বিভাগ। নোট প্রচলন বিভাগ (Issue Department) এবং ব্যাংক বিষয়ক কার্য পরিচালনা বিভাগ (Banking Department)। প্রথম বিভাগটি নোট প্রচলনের জন্য দায়ী এবং দ্বিতীয় বিভাগটি ব্যাংক সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ পরিচালনা করে। কৃষি ঋণ সম্পর্কে গবেষণা, কৃষি ঋণদান ও এই সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যাবলী বিবেচনা করিবার জন্য ইহার একটি সতন্ত্র কৃষি ঋণদান বিভাগও আছে। রিজার্ভ ব্যাংক নিম্নলিখিত কাজগুলি করিয়া থাকে।

রিজার্ভ ব্যাংকের দুইটি বিভাগ

নোট প্রচলন (Note Issue)—১ টাকার নোট ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার রিজার্ভ ব্যাংকের রহিয়াছে। ১৯৫৭ সালের রিজার্ভ ব্যাংক সংশোধনী আইন অনুযায়ী ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ এবং ৮৫ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অথবা স্বর্ণের বিপক্ষে রিজার্ভ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নোট ছাপাইতে পারে।

নোট প্রচলনের পদ্ধতি

সরকারের ব্যাংক হিসাবে (Banker to the Central & State Governments) রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের ব্যাংক-রূপেও বিবিধ কার্যের সম্পাদন করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারের তহবিল রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট রক্ষিত হয়।

রিজার্ভ ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসাবে কাজ করে

তৃতীয়ত, ইহা দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ব্যাংক ও ঋণ নিয়ন্ত্রকরূপে কাজ করে (Banker's Bank and Controller of credit)। বাণিজ্যমূলক ব্যাংক-গুলিকে ইহাদের আমানতের একটি অংশ রিজার্ভ ব্যাংকে জমা রাখিতে হয়, এবং তাহাদের কার্যাবলীর একটি সাপ্তাহিক বিবরণী রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট পেশ করিতে হয়। বাণিজ্যমূলক ব্যাংকসমূহ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট অনুমোদিত সিকিউরিটির বিপক্ষে ঋণ পাইতে পারে। ইহা ব্যাংক-সমূহের নিকাশী প্রতিষ্ঠান (Clearing House) রূপেও কাজ করে।

বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলির ব্যাংক

চতুর্থত, রিজার্ভ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গে টাকার বিনিময়-হার রক্ষা করে।

পঞ্চমত, কৃষি ঋণ দানেও ইহা সাহায্য করে। এইজন্য ইহার একটি স্বতন্ত্র কৃষি ঋণ বিভাগ রহিয়াছে। এই বিভাগটি কৃষি ঋণ দানের ব্যবস্থার উন্নতির জন্য গবেষণা পরিচালনা করে। ইহা সমবায় আন্দোলনের সুষ্ঠু পরিচালনার সহায়তা করে এবং রাজ্য সমবায় ব্যাংকগুলিকে ঋণ প্রদানও করিয়া থাকে। রিজার্ভ ব্যাংক জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিতে পারে না।

কৃষিক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করার কাজ

স্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া (State Bank of India)—১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই পুরাতন ইম্পিরিয়্যাল ব্যাংককে জাতীয়করণ করিয়া তাহার সঙ্গে আরও আটটি তৎকালীন দেশীয় রাজ্যগুলির ব্যাংক একত্রিত করিয়া স্টেট ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়া গঠিত হয়। স্টেট ব্যাংক হইতেছে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যমূলক ব্যাংক। এই ব্যাংক অন্যান্য বাণিজ্যমূলক ব্যাংকের ন্যায় যথারীতি ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইলেও কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রে ইহার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। কৃষকদের প্রত্যক্ষভাবে এবং রাজ্য সমবায় ব্যাংক ও বিভিন্ন সমবায় ঋণদান সমিতিকে অর্থসাহায্য করার ক্ষেত্রে স্টেট ব্যাংক যথেষ্ট সাফল্য দেখাইয়াছে। তাহা ছাড়া কতিপয় পাইলট প্রজেক্টের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলিকে ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রেও স্টেট ব্যাংক যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছে। ১৯৬৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত স্টেট ব্যাংক ১২,৮২০টি ক্ষুদ্র শিল্প-ইউনিটকে মোট ৮৩·২ কোটি টাকা স্বল্পমেয়াদী ঋণ এবং ৩,১৩৫টি ক্ষুদ্র শিল্প-ইউনিটকে মোট ১৮·৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করে। ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণকে উৎপাদনমূলক প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার জন্য স্টেট ব্যাংক একটি উদার ঋণদান নীতি (Liberalised Credit Scheme) গ্রহণ করে।

ভারতে চৌদ্দটি ব্যাংকের জাতীয়করণ (Nationalisation of Fourteen Commercial Banks in India)—১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই ভারতের রাষ্ট্রপতির একটি অর্ডিন্যান্সের ফলে (পরে ইহা আইনে পরিণত হয়) ভারতের চৌদ্দটি ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। কিন্তু ১৯৭০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সুপ্রীম কোর্ট ব্যাংক জাতীয়করণ আইনটিকে কতিপয় ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য সংবিধান-বিরোধী বলিয়া বাতিল করিয়া দেয়। পুনরায় ১৯৭০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্সের ফলে চৌদ্দটি বাণিজ্যমূলক ব্যাংককে পুনরায় রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় এবং এই জাতীয়করণের দরুণ দেয় ক্ষতিপূরণ ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই হইতে দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। যে ১৪টি ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে সেগুলি হইতেছে— সেণ্ট্রাল ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া, ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, ব্যাংক অফ বরোদা, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, দেনা ব্যাংক, ইউনাটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া, সিণ্ডিকেট ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া, এলাহাবাদ ব্যাংক,

ইণ্ডিয়ান ব্যাংক, ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র এবং ইণ্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক। চৌদ্দটি ব্যাংকের জাতীয়করণের উদ্দেশ্য হইতেছে ব্যাংক ব্যবস্থাকে আরও বৃহত্তর সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উদ্দীপ্ত করা। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে সকল ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে, যেমন, কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প ও রপ্তানি বাণিজ্য, ব্যাংক ব্যবস্থাকে সেগুলির অনুবর্তী করাই ব্যাংক জাতীয়করণের প্রধান উদ্দেশ্য। আশা করা যায় চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্পদের একটি বড় অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি হইতে পাওয়া যাইবে, এবং এই ব্যাংকগুলি দেশের কৃষি ও শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে। ব্যাংক জাতীয়করণের পূর্বে ব্যাংকগুলি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের মাত্র শতকরা ২ ভাগ যাইত কৃষিক্ষেত্রে; ক্ষুদ্র শিল্পগুলিও ব্যাংক হইতে বেশী পরিমাণ ঋণ পাইত না। আশা করা যায় ব্যাংকগুলি এখন হইতে কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প এবং রপ্তানি-শিল্পগুলিকে উদার হস্তে ঋণদান করিবে। যে সকল ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকার কম, সেগুলিকে জাতীয়করণ হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের মোট পরিমাণ হইতে ৮৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ইহা নগদ টাকা অথবা সরকারী সিকিউরিটিতে (ব্যাংকগুলির ইচ্ছানুযায়ী) দেওয়া হইবে। বিভিন্ন ব্যাংক কত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত হইবার পূর্বে ব্যাংকগুলি দেশের গরীব, মধ্যবিত্ত বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া শুধু বড় বড় শিল্প, বড় ব্যবসায়, জোতদার-জমিদার এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থ বড় করিয়া দেখিত বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রায়ত্ত হইবার পর ব্যাংকগুলি আর মুষ্টিমেয় সম্পদশালীদের স্বার্থে ব্যবহৃত হইবে না; এখন সাধারণ মানুষ ব্যাংক ব্যবস্থার সুফল লাভ করিবে এবং দূর গ্রামাঞ্চলেও ব্যাংক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হইয়া দেশের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করিবে। স্টেট ব্যাংক এবং চৌদ্দটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ধরিলে দেশে মোট ব্যাংক আমানতের শতকরা ৮৫ ভাগ এখন রাষ্ট্রের অধীনে আসিয়াছে।

যাঁহারা ব্যাংক জাতীয়করণ সমর্থন করেন নাই, তাঁহাদের মতে এই ব্যবস্থায় বে-সরকারী শিল্প-উদ্যোগ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে এবং আমানতকারীগণ এতদিন যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাইতেন তাহা কমিয়া যাইবে। কিন্তু, এই আশঙ্কা অমূলক। কারণ, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি বে-সরকারী ক্ষেত্রেও শিল্পোন্নয়নের জন্য এবং কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ঋণ প্রদান করিবে। ব্যাংকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় আমানতকারীদের স্বার্থ আরও নিরাপদ থাকিবে। দেশকে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে চালিত করার পথে ব্যাংক জাতীয়করণ একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তবে অনেকে মনে করেন শুধু ১৪টি ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত না করিয়া দেশী-বিদেশী সবগুলি ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা উচিত ছিল।

Exercise

1. Mention the difficulties and inconveniences attending exchange by barter. Show how these difficulties are overcome by the introduction of money. (দ্রব্য-বিনিময় প্রথার অসুবিধাগুলি উল্লেখ কর। টাকাকড়ির সাহায্যে কিভাবে এই অসুবিধাগুলি দূর করা যায়।) (১১২-১১৩ পৃষ্ঠা)।

2. Discuss the functions of money (টাকার কাজগুলি আলোচনা কর।) (১১৩-১১৪ পৃষ্ঠা)।

3. Define the different types of money. (বিভিন্ন ধরনের টাকার সংজ্ঞা প্রদান কর।) (১১৪-১১৫ পৃষ্ঠা)।

4. Discuss the merits and demerits of the Paper Currency System. (কাগজী টাকা ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।) (১১৬-১১৮ পৃষ্ঠা)।

5. What do you mean by Monetary Standard? What is meant by Gold Standard, Bimetallic Standard. Exchange Standard and Paper Currency Standard? (মুদ্রামান বলিতে তুমি কি বুঝ? দ্বিধাতুমান, বিনিময় মান এবং কাগজী-মুদ্রা-মান বলিতে কি বুঝায়?) (১১৫-১১৬ পৃষ্ঠা)।

6. Disscuss the functions of a Commercial Bank. Discuss the utility of a good banking system. (বাণিজ্যমূলক ব্যাংকের বিভিন্ন কাজ আলোচনা কর। ভাল ব্যাংকিং ব্যবসায়ের উপকারিতা আলোচনা কর।) (১১৯-১২০ পৃষ্ঠা)।

7. "Loans create deposits."—Discuss the statement. ("ঋণ আমানতের সৃষ্টি করে।"—এই উক্তিটি আলোচনা কর।) (১১৮-১১৯ পৃষ্ঠা)।

8. Discuss the functions of a Central Bank. (কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন কাজ সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (১২২-১২৩ পৃষ্ঠা)।

9. Discuss the functions of the Reserve Bank of india. (রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার কার্যাবলী আলোচনা কর।) (১২৪-১২৫ পৃষ্ঠা)।

10. Write a note on the State Bank of India. (স্টেট ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়ার উপর একটি টীকা লিখ।) (১২৫ পৃষ্ঠা)।

11. Discuss the causes aud the significance of the nationalisation of Fourteen Commercial Banks in India. (ভারতের চৌদ্দটি ব্যাংকের জাতীয়করণ করার কারণ ও তাৎপর্য আলোচনা কর।) (১২৫-১২৭ পৃষ্ঠা)।

12. What is a cheque? Is cheque money? (চেক কাহাকে বলে? চেক কি টাকা) (১২০-১২১ পৃষ্ঠা)।

দ্বাদশ অধ্যায়

টাকাকড়ির মূল্য (Value of Money)

একটি টাকার বিনিময়ে আমরা যে পরিমাণ জিনিস পাই, তাহাই টাকার মূল্য সূচিত করে। যদি এক টাকায় অনেক জিনিস ক্রয় করা যায়, তবে টাকার মূল্য বাড়িয়া যায় এবং যদি এক টাকায় কম জিনিস ক্রয় করা যায় তবে টাকার মূল্য কমিয়া যায়। যখন এক টাকায় অনেক জিনিস কেনা যায়, তখন জিনিসপত্রের দাম কম থাকে, আবার যখন এক টাকায় কম জিনিস কেনা যায়, তখন জিনিসপত্রের দাম বেশী থাকে। সুতরাং টাকার মূল্য কম হইলে মূল্যস্তর (Price level) খুব উঁচু থাকে এবং টাকার মূল্য বেশী হইলে মূল্যস্তর নীচু থাকে।

টাকাকড়ির মূল্য মূল্যস্তরের বিপরীত

আমরা এখন দেখিব কিভাবে টাকার মূল্য নির্ধারণ করা যায়। অন্যান্য জিনিসের মূল্যের ন্যায় টাকার মূল্য ইহার চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে মানুষের টাকার চাহিদা স্থির থাকে। টাকার চাহিদা দেশের জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়ের মোট পরিমাণের উপর নির্ভরশীল।

টাকার মূল্য নির্ধারণ (Determination of the Value of Money)— অন্যান্য জিনিসের মূল্যের ন্যায় টাকার মূল্যও টাকার চাহিদা এবং যোগানের উপর নির্ভরশীল। আমাদের জিনিস কিনবার সময় টাকার দরকার হয়। সুতরাং দেশে কোন নির্দিষ্ট সময়ে টাকার চাহিদা কত পরিমাণ, তাহা দেশের মোট কেনাবেচার পরিমাণ হইতেই আমরা বুঝিতে পারি। কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রয় করিবার মত জিনিসের পরিমাণ স্থির থাকে ; সুতরাং ঐ সময়ের জন্য টাকার চাহিদাও স্থির থাকে। টাকার চাহিদা স্থির থাকাকালে যদি টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায়, তবেই জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবে, অথবা টাকার মূল্য কমিয়া যাইবে। আবার টাকার চাহিদা স্থির থাকা কালে যদি টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়, তবেই জিনিস-পত্রের দাম কমিয়া যাইবে অথবা টাকার মূল্য বাড়িয়া যাইবে।

টাকার যোগান বলিতে আমরা বুঝি দেশের প্রচলিত বা চালু টাকার মোট পরিমাণ। টাকার যোগানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা হইতেছে টাকার প্রচলন-বেগ (Velocity of Circulation)। ধরা যাক্, আমি একটি টাকা দিয়া একটি বই কিনিলাম। বই বিক্রেতা সেই টাকাটি পাইয়া একটি মাছ কিনিল। মাছওয়ালা আবার সেই টাকাটি লইয়া একটি কাপড় কিনিল। এইভাবে একই টাকার সাহায্যে দিনে তিনবার জিনিসপত্রের কেনাবেচা হইল। এখানে টাকার প্রচলন-বেগ হইতেছে তিনগুণ। অর্থাৎ, একই টাকা দিনে যতবার লোকের হাত বদলায়, তাহাই ইহার প্রচলন-বেগ। টাকার যোগান বলিতে আমরা শুধু টাকার পরিমাণই

বুঝি না, ইহার প্রচলন-বেগও বুঝি। সুতরাং টাকার মোট যোগান হইতেছে, টাকার পরিমাণ ও টাকার প্রচলন-বেগ। কোন নির্দিষ্ট সময়ে যদি বিক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ অথবা কেনাবেচার পরিমাণ (Volume of Transactions) স্থির থাকে, তবে মূল্যস্তর নিম্নোক্ত সমীকরণের সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়—

$$P=\frac{MV}{T} \text{ অর্থাৎ মূল্যস্তর} = \frac{\text{টাকার পরিমাণ} \times \text{টাকার প্রচলন-বেগ}}{\text{বিক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ}}$$

এখানে 'P' হইতেছে মূল্যস্তর। 'M' হইতেছে বাজারে চালু মুদ্রার পরিমাণ, 'V' হইতেছে বাজারে চালু মুদ্রার প্রচলন-বেগ, এবং 'T' হইতেছে বাজারে বিক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ। এই সমীকরণে 'T' এবং 'V', অর্থাৎ মোট বিক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ ও লেনদেন এবং টাকার প্রচলন-বেগ, এই দুইটি উপাদানকে স্থির ধরা হইয়াছে। এখন যদি টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হয়, মূল্যস্তরও সেই অনুপাতে বাড়িয়া যাইবে।

কিন্তু, বাজারে চালু টাকা ছাড়াও লোকে ঋণপত্র (Credit Instruments), হুণ্ডি ইত্যাদি ব্যাংক-টাকার (Bank Money) সাহায্যে জিনিসপত্র কেনাবেচা করে। আবার এই ঋণপত্রগুলিও লোকের হাত বদলায়, অর্থাৎ ইহাতেও প্রচলন-বেগ আছে। সুতরাং টাকার মোট যোগান বলিতে শুধু বাজারে চালু টাকা হিসাব করিলেই চলিবে না, ব্যাংকের সৃষ্ট টাকাও ধরিতে হইবে। সেজন্য অধ্যাপক ফিসার (Prof. Fisher) পূর্বোক্ত সমীকরণটিকে একটু বড় করিয়াছেন। যেমন,

$$P=\frac{MV+M^1V^1}{T}$$

এখানে 'M' বলিতে বুঝায় ব্যাংকের টাকা এবং 'V' বলিতে বুঝায় ইহার প্রচলন-বেগ। অবশ্য প্রচলন-বেগকেও স্থির ধরা হইয়াছে। সুতরাং, টাকার মোট যোগান বলিতে এখানে বাজারে চালু টাকা ও ব্যাংক-সৃষ্ট টাকা এবং ইহাদের উভয়েরই প্রচলন-বেগ ধরা হইয়াছে। মূল্যস্তর টাকার মোট যোগানের উঠা-নামার সহিত পরিবর্তিত হয়। টাকার চাহিদা একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্থির থাকিলে, যদি টাকার মোট যোগান বাড়িয়া যায়, তবে মূল্যস্তরও বাড়িয়া যাইবে; আর যদি টাকার মোট যোগান কমিয়া যায়, তবে মূল্যস্তরও কমিয়া যাইবে। ইহাই অর্থের পরিমাণতত্ত্ব (Quantity Theory of Money) হিসাবে পরিচিত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী টাকা ও মূল্যস্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে; অর্থাৎ টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গেলে মূল্যস্তর বাড়িয়া যায় এবং টাকার পরিমাণ কমিয়া গেলে মূল্যস্তর কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, টাকা এবং মূল্যস্তরের মধ্যে শুধু প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নয় ইহাদের মধ্যে একটি সমানুপাতিক সম্পর্কও আছে। অর্থাৎ, যে হারে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, সেই হারে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবে এবং যে হারে টাকার পরিমাণ কমিয়া যাইবে সেই হারে জিনিসপত্রের দাম কমিয়া যাইবে।

জিনিসপত্রের দাম বাড়িবার হেতু

টাকার পরিমাণ বাড়িলেই জিনিসপত্রের দাম কেন বাড়ে তাহা আমরা নিম্নলিখিতভাবে বুঝাইতে পারি—

টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি

↓

লোকের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি

↓

লোকের বিভিন্ন জিনিসের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি

↓

মূল্যবৃদ্ধি (যদি চাহিদা অনুযায়ী জিনিসপত্রের উৎপাদন না বাড়ে)

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব অনুযায়ী টাকার পরিমাণ বাড়িলে ভোগ-সামগ্রীর জন্য চাহিদা বাড়িতে পারে। কিন্তু, মোট বিক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ উপরি-উক্ত সমীকরণে ('T') স্থির থাকে বলিয়া উৎপাদন স্থির থাকে, এবং সেজন্য চাহিদা বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের দামও বাড়িয়া যায়, অর্থাৎ, টাকার মূল্য কমিয়া যায়।

অর্থের পরিমাণতত্ত্বের সমালোচনা (Criticisms of the Quantity Theory of Money)—অর্থের পরিমাণতত্ত্বটি কতিপয় ভুল ধারণার (wrong assumptions) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, টাকার চাহিদা শুধু জিনিসপত্রের কেনাবেচার পরিমাণের সাহায্যে বুঝা যায় না। বিনিয়োগ কাজের জন্য টাকার দরকার হইতে পারে; বিশেষত ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষেত্রে ফাটকা কারবার করে। সেজন্য তাহাদের কিছু না কিছু টাকার চাহিদা সর্বদাই থাকে। ফিসার এই দিকটি মোটেই বিবেচনা করেন নাই। দ্বিতীয়ত, সাধারণ মূল্যস্তর বলিতে ফিসার কী বুঝাইতে চাহেন, তাহাও পরিষ্কার হয় নাই। কারণ ভোগ-সামগ্রীর (consumption goods) মূল্যস্তর এবং মূলধন-সামগ্রীর (capital goods) মূল্যস্তর কতিপয় বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এই দুইটি মূল্যস্তর বিভিন্ন উপায়ে নির্ধারণ করা উচিত। একসঙ্গে মূল্যস্তর বলিতে ভোগ-সামগ্রীর মূল্যস্তর বুঝায় কিনা, তাহা পরিষ্কার হয় নাই। তৃতীয়ত, এই তত্ত্বে টাকার প্রচলন-বেগ, এবং বিক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ সর্বদা স্থির থাকে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই যুক্তিটি ভুল। কারণ, টাকার প্রচলন-বেগ এমন কতিপয় উপাদানের উপর নির্ভর করে যাহার কোনটিই স্থির থাকে না—যেমন, আয়, ব্যাংকের সুদের হার, লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছা, লাভের আশায় টাকা খরচ করিবার ইচ্ছা ইত্যাদি। সুতরাং টাকার প্রচলন-বেগ কখনই স্থির থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া, বিক্রীত সামগ্রীর মোট পরিমাণও কখনই স্থির থাকে না। গতিশীল পৃথিবীতে উৎপাদন কখনই স্থির থাকে না। দেশের অনেক সম্পদ অব্যবহৃত থাকিতে পারে এবং টাকার পরিমাণ বাড়িলেই সেই অব্যবহৃত সম্পদগুলি সদ্ব্যবহার করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

সেক্ষেত্রে মোট বিক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ স্থির থাকিতে পারে না। চতুর্থত, ফিসারের সমীকরণটিকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য (truism) বলা হয়। কারণ টাকার যোগান এবং টাকার চাহিদা (যেভাবে ইহার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে) সব অবস্থায়ই সমান হইতেছে। কিন্তু আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণ এই ধরনের সমীকরণের সাহায্যে মূল্যস্তরের হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় বলিয়া মনে করেন না।

ফিসারের তত্ত্বটি ততক্ষণই সত্য যতক্ষণ দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান (Full employment) থাকে। কিন্তু, বাস্তবে আমরা পূর্ণ কর্মসংস্থান দেখিতে পাই না। তাহা ছাড়া, যখন দেশে চূড়ান্ত পর্যায়ের মুদ্রাস্ফীতি বর্তমান থাকে, তখন টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া দিলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায়, এবং ফিসারের তত্ত্বটি কার্যকর হয়।

অর্থের পরিমাণতত্ত্বটি যে শুধু কতিপয় ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাই নহে। ইহার অন্যতম ত্রুটি হইতেছে এই যে লোকের আয়ের যে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণে একটি ভূমিকা আছে, তাহা এই তত্ত্বে স্বীকার করা হয় নাই। লোকের আয় বাড়িলেই চাহিদা বাড়ে এবং তাহাতে জিনিসের দাম বাড়ে। আবার টাকার পরিমাণ বাড়িলেই যে আয় বাড়ে, তাহা নহে।

বিনিয়োগের পরিবর্তন মূলত ব্যবসায়ের লাভের আশা অথবা নিরাশার পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে, টাকার যোগানের উপর নহে। আবার জিনিসপত্রের দাম বিনিয়োগের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ফিসার শুধু টাকার উপরেই গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন।

টাকার মূল্য-পরিবর্তন পরিমাপ করিবার উপায় (Method of measuring the changes in the Value of Money)—জিনিসপত্রের দামের পরিবর্তন হইলে, অর্থাৎ সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তন হইলে টাকার মূল্যের পরিবর্তন হয়। জিনিসপত্রের দাম যদি বাড়িয়া যায়, তবে টাকার মূল্য কমে এবং জিনিসপত্রের দাম যদি কমিয়া যায়, তবে টাকার মূল্য বাড়িয়া যায়। স্থতরাং আমাদের দেখা উচিত, জিনিসপত্রের দাম কি হারে উঠা-নামা করে। মূল্যস্তরের উঠা-নামার পরিমাণ করা যায় স্থচক-সংখ্যার (Index Number) দ্বারা। একটি বিশেষ বৎসরের মূল্যস্তরের সহিত অপর কোন বৎসরের মূল্যস্তরের তুলনা করিবার জন্য দুইটি বৎসরের মূল্যস্তরের স্থচক-সংখ্যা আমাদের জানিতে হয়। স্থচক-সংখ্যা তৈয়ার করিতে হইলে প্রথমে একটি বিশেষ বৎসরকে ভিত্তি (Base) হিসাবে ধরিতে হয়। বৎসরটি এমন হইতে হইবে যে ইহার যেন অর্থনৈতিক দিক হইতে গুরুত্ব থাকে। যেমন, ১৯৫১ সাল (এই বৎসর ভারতে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা আরম্ভ হয়) ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, কতিপয় সামগ্রী বাছাই করিতে হইবে যেগুলি সর্বদাই জনসাধারণ কেনাবেচা করে। আমরা এখানে ১৯৫১ সালের মূল্যস্তরকে ভিত্তি করিয়া ১৯৬০ সালের মূল্যস্তরের হিসাবে স্থচক-সংখ্যা তৈয়ার করিব। ধরা যাক্, আমরা চারিটি একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস বাছিয়া লইলাম, যেমন, চাল, ডাল, দুধ এবং চিনি। ধরা যাক্,

১৯৫০ সালের দাম ছিল মণপ্রতি ২০ টাকা, ডালের দাম ছিল মণপ্রতি ২৫ টাকা, দুধের দাম ছিল মণপ্রতি ৩০ টাকা এবং চিনির দাম ছিল মণপ্রতি ২৫ টাকা। এখন সূচক-সংখ্যা নিম্নোক্ত উপায়ে প্রস্তুত করা যায়—

১৯৫০ সাল	ক্রয়ের পরিমাণ	মোট অর্থব্যয়ের পরিমাণ
চাল প্রতি মণ ২০ টাকা	৫ মণ	২০ টাকা × ৫ = ১০০ টাকা
ডাল " " ২০ টাকা	৪ মণ	২০ টাকা × ৪ = ৮০ টাকা
দুধ " " ৩০ টাকা	৪ মণ	৩০ টাকা × ৪ = ১২০ টাকা
চিনি " " ২৫ টাকা	৪ মণ	২৫ টাকা × ৪ = ১০০ টাকা
		৪০০ টাকা

যোগফল ৪০০-কে চার দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল হয় ১০০। ১৯৫১ সালের অর্থাৎ, ভিত্তি বৎসরের (Base year) সূচক-সংখ্যা হইল ১০০। এখন ১৯৫৯ সালের মূল্যস্তর কিভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিব। ধরা যাক্, আমরা ১৯৫৯ সালেও চাল, ডাল, দুধ ও চিনি একই পরিমাণে কিনিতেছি; ইহাদের দামের পরিবর্তন হইয়াছে।

১৯৫৯ সাল	মোট অর্থব্যয়ের পরিমাণ
চাল প্রতি মণ ২৫ টাকা	২৫ টাকা × ৫ = ১২৫ টাকা
ডাল প্রতি মণ ৩০ টাকা	৩০ টাকা × ৪ = ১২০ টাকা
দুধ প্রতি মণ ৩২ টাকা	৩২ টাকা × ৪ = ১২৮ টাকা
চিনি প্রতি মণ ৩০ টাকা	৩০ টাকা × ৪ = ১২০ টাকা
	৪৯৩ টাকা

যোগফল ৪৯৩-কে চার দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল হয় ১২৩$\frac{১}{৪}$। অর্থাৎ ১৯৫৯ সালে ১৯৫১ সালের তুলনায় মূল্যস্তর শতকরা ২৩$\frac{১}{৪}$ ভাগ বাড়িয়াছে।

উপরে যেভাবে সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে, ইহাতে সব জিনিসকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সব জিনিসের গুরুত্ব সমান থাকে না। ধরা যাক্, চাউলের গুরুত্ব চিনির গুরুত্ব অপেক্ষা পাঁচ গুণ বেশী। সেই ক্ষেত্রে চাউলের দামকে পাঁচ দিয়া গুণ করিয়া এবং চিনির দামকে এক দিয়া গুণ করিয়া সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত করিতে হইবে। এইজাতীয় সূচক-সংখ্যাকে গুরুত্ব প্রদত্ত সূচক-সংখ্যা (Weighted Index Number) বলে।

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation)—মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেসন বলিতে লোকে সাধারণত জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি মনে করে। কিন্তু শুধু জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া গেলেই মুদ্রাস্ফীতি বলা চলে না। জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও যদি দেশের উৎপাদন বাড়িয়া যায় এবং অধিক পরিমাণে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, তবে ইহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা যায় না। আবার অনেক সময় এমন হয় যে শ্রমিকদের উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়া

মুদ্রাস্ফীতির অর্থ মূল্যবৃদ্ধি নয়

গিয়াছে এবং উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে উৎপাদনের খরচ কম হওয়া সত্ত্বেও যদি মূল্য কমিয়া না যায় এবং অপরিবর্তিত থাকে, তবে এই অবস্থাকে আমরা মুদ্রাস্ফীতি বলিতে পারি।

আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি দুইভাবে হইতে পারে। যদি সামগ্রিকভাবে চাহিদা মোট যোগান অপেক্ষা বেশী হয় এবং ইহার দরুন যদি জিনিস-পত্রের দাম বাড়িয়া যায়, তবে সেই মুদ্রাস্ফীতিকে চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Demand-Pull Inflation) বলা হয়। আবার যদি খরচের বৃদ্ধি হেতু জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায় তবে ইহাকে খরচবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Cost-Push Inflation) বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শ্রমিকদের মজুরী-হার বাড়িয়া গিয়াছে; ইহাতে তাহাদের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ যে অনুপাতে তাহাদের চাহিদা বাড়িয়াছে, সেই অনুপাতে জিনিসপত্রের যোগান বাড়ে নাই। ইহাতে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইতে পারে। আবার খরচ বাড়িয়া যাইবার দরুন কোন জিনিসের দাম বাড়িয়া যাইতে পারে।

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও খরচবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

যদি দেশে উৎপাদন বাড়াইবার মত সম্ভাবনা থাকে এবং সেক্ষেত্রে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যায়, তবে বর্ধিত মুদ্রা উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হইবে, এবং যাহারা বেকার বসিয়া আছে, তাহাদের কাজের ব্যবস্থা থাকিবে। উৎপাদন যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণনিয়োগ (Full employment) অবস্থা, অর্থাৎ সকলেরই কাজের ব্যবস্থা হইতে পারে এই রকম অবস্থা, আনয়ন না করিতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, এবং তখন আমরা ইহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলিতে পারি না। কিন্তু যখন মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যায়, তখন বর্ধিত মুদ্রা যদি উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক না হয়, তবে ইহা শুধু জিনিসপত্রের দাম বাড়াইয়া দিবে এবং দেশে ইনফ্লেসনের সৃষ্টি হইবে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এইভাবেই সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি হয়। পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় যখন মুদ্রার পরিমাণবৃদ্ধিই মূল্যবৃদ্ধির কারণ ঘটে, তখন ইহাকে মুদ্রা পরিমাণ হেতু মুদ্রাস্ফীতি (Money inflation) বলা হয়। বর্ধিত মুদ্রা লোকের ক্রয়শক্তি বাড়াইয়া দেয়; ক্রয়শক্তি বাড়িয়া গেলে জিনিসপত্রের জন্য চাহিদা বাড়ে। অথচ চাহিদা বাড়িয়া গেলেও উৎপাদন বাড়ে না। সেজন্যই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় মুদ্রাসংকোচন (Deflation) বা জিনিস-পত্রের মূল্যহ্রাস। মুদ্রাসংকোচনের সৃষ্টি হয় জনগণের আয় হ্রাস হেতু সক্রিয় চাহিদা কমিয়া যাইবার দরুন। মুদ্রাসংকোচনের সময় উৎপাদনের পরিমাণ, কর্মসংস্থানের সুবিধা (employment opportunities) এবং টাকা বিনিয়োগ করিবার ও ব্যয় করিবার স্পৃহা অর্থাৎ, লোকের চাহিদা কমিয়া যায়। ইহার ফলে জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস হয়।

ডিফ্লেসন বা মূল্যহ্রাস

মুদ্রাসংকোচনের সৃষ্টি হইলে জিনিসপত্রের দাম কমিয়া যায় বলিয়া যাহাদের আয় নির্দিষ্ট, তাহাদের খুব সুবিধা হয়; অপরপক্ষে ব্যবসায়ীদের খুব ক্ষতি হয়। ইহাতে দেশে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যায়, লোকের আয় কমিয়া যায় এবং বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়।

মুদ্রাসংকোচনের ফলাফল

মূল্যস্তরের উঠা-নামার ফলাফল (Effects of Rising and Falling Price-level)—আমরা দেখিয়াছি মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হইলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে এবং মুদ্রাসংকোচ হইলে জিনিসপত্রের দাম কমে। এখন আমরা এই দুইটি অবস্থার ফলাফল বিবেচনা করিব।

মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব আমরা দেখিতে পাই দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর। জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায় বলিয়া ব্যবসায়ীগণ খুব লাভবান হন। ইহাতে তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িলে বেকার লোকদেরও কাজের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই সুবিধার অন্য একটি দিক আছে। উৎপাদন বাড়িতে বাড়িতে এমন একটি অবস্থা আসিতে পারে যখন অতি-উৎপাদন (Over-production) হইয়া যাইবে; তখন হঠাৎ জিনিসপত্রের দাম কমিয়া যাইবে, কিছু পরিমাণ লোক বেকার হইয়া পড়িবে। এইভাবেই ডিফ্লেসনের সৃষ্টি হয়। সুতরাং উৎপাদন-বৃদ্ধি যদি পরিকল্পিত উপায়ে হয়, তবে সাধারণ মুদ্রাস্ফীতি (Moderate inflation) দেশের উৎপাদন-বৃদ্ধির সহায়ক হয়। কিন্তু, ইনফ্লেসনের দরুন ব্যবসায়ীগণ খুব লাভবান হইলেও যাহাদের আয় নির্দিষ্ট তাহারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ মুদ্রাস্ফীতির সময় জিনিস-পত্রের দাম বাড়িয়া যায় অথচ তাহাদের আয় বাড়ে না। পূর্বের মত জিনিসপত্র কেনা তাহাদের পক্ষে আর সম্ভবপর হয় না। শিক্ষক, কেরাণী, সরকারী চাকুরিয়া প্রভৃতি নির্দিষ্ট আয় উপার্জনকারীগণ মুদ্রাস্ফীতির ফলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। ইনফ্লেসনের আর একটি প্রভাব আমরা দেখিতে পাই পাওনাদার ও দেনাদারের সম্পর্কের উপর। ধরা যাক্, একজন লোক কোন মহাজনের নিকট হইতে এমন সময় ১০০ টাকা ধার করিল যখন ইহার মূল্য খুব বেশী, অর্থাৎ তখন জিনিসপত্রের দাম কম হওয়ায় ১০০ টাকায় অনেক জিনিস কেনা সম্ভবপর। কিন্তু যখন টাকাটা পাওনাদারকে ফেরৎ দেওয়া হইতেছে তখন ইহার মূল্য কম; অর্থাৎ তখন জিনিসপত্রের দাম বেশী হওয়ায় ১০০ টাকায় কম জিনিস কেনা সম্ভবপর। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মহাজন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। অপরপক্ষে টাকা ধার দেওয়ার সময় যদি মুদ্রাস্ফীতি থাকে এবং টাকা ফেরত পাওয়ার সময় যদি মুদ্রাসংকোচন হয়, মহাজন

মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল

মুদ্রাস্ফীতির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়

ব্যবসায়ীগণ লাভবান হয় এবং নির্দিষ্ট আয় উপার্জনকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়

দেনাদার ও পাওনাদারদের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন হয়

লাভবান হয় এবং দেনাদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেখা যাইতেছে, মুদ্রাস্ফীতি দেনাদার ও পাওনাদারের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন করে।

মুদ্রাস্ফীতি বৈদেশিক বাণিজ্যকেও প্রভাবিত করে। কোন দেশে যদি রপ্তানি দ্রব্যগুলির দাম বাড়িয়া যায় এবং তথাপি যদি বিদেশে এইগুলির খুব চাহিদা থাকে, তবে রপ্তানি হইতে আয় বাড়িবে। কিন্তু জিনিসের দাম বাড়িয়া যাইবার দরুন যদি বৈদেশিক চাহিদা কমিয়া যায়, তবে বাণিজ্য ব্যালান্স উন্নত হইবে না। আবার জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইবার জন্য যদি বিদেশ হইতে বিকল্প সামগ্রী আমদানি করিয়া অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করা হয়, তবে হয়ত বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যালান্সে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু এজন্য যে বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হইবেই তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। দেখিতে হইবে, দেশীয় জিনিসের তুলনায় বিদেশী জিনিস অপেক্ষাকৃত সস্তা কি না। তবেই দেশীয় জিনিসের দাম বাড়িলে বিদেশী জিনিসের আমদানি বাড়িবে। যে দেশে মুদ্রাস্ফীতির দরুন জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া গিয়াছে, সেই দেশের রপ্তানিযোগ্য জিনিসগুলির জন্য যদি বিদেশীদের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (inelastic) থাকে তবে মুদ্রাস্ফীতি সেই দেশের রপ্তানি হইতে আয় বাড়াইয়া দিবে। কিন্তু যদি সেই দেশের রপ্তানি সামগ্রীগুলির জন্য বিদেশীদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক (elastic) থাকে এবং যদি বিদেশীরা বেশী দাম দিয়া জিনিসগুলি কিনিতে না চায়, তবে মুদ্রাস্ফীতি সেই দেশের রপ্তানি-আয় কমাইয়া দিবে।

মুদ্রাস্ফীতির প্রতিকার (Remedies of Inflation)—মুদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধ করিতে হইলে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে জনসাধারণের ব্যয়ের স্পৃহা কমিয়া যায়। কারণ, চাহিদা কমিয়া গেলেই জিনিসপত্রের দাম কমিয়া যাইবে। বিনিয়োগের পরিমাণ যাহাতে আরও না বাড়ে সেজন্য জনগণের ব্যয়ের স্পৃহা বা ভোগের প্রবণতা কমাইলেই চলিবে না, বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা যাহাতে সহজলভ্য না হয়, সে ব্যবস্থাও করিতে হইবে। এজন্য সরকার দেশে নূতন কর স্থাপন এবং বর্তমান কর প্রদানের হার বাড়াইয়া দিতে পারে, দেশরক্ষা ব্যতীত অন্যান্য খরচের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে এবং জনসাধারণ, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলি হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সেই টাকা ব্যবসায়ে খাটানো বন্ধ করিতে পারে। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন ব্যাংক যাহাতে বেশী ধার না দেয় সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়াইতে পারে। সুদের হার বাড়িয়া গেলে জনসাধারণ যে শুধু কম টাকা ধার করিবে তাহা নয়। এই সুযোগে জনসাধারণ সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াইবারও চেষ্টা করিবে। অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য বাণিজ্যমূলক ব্যাংক এবং জনসাধারণের নিকট সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত টাকা আটক করিয়া রাখে। শুধু তাহাই নহে, কোন বিশেষ ধরনের ঋণ অথবা কোন বিশেষ জিনিস বন্ধকের বিপক্ষে বাণিজ্যমূলক ব্যাংকগুলি যাহাতে ঋণ প্রদান না করে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেজন্য ইহাদের আগেই নির্দেশ প্রদান করিয়া রাখিতে পারে। সরকার

অনেক ক্ষেত্রে মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু করিয়াই মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের চেষ্টা করিতে পারে।

Exercise

1. Explain why general prices rise and fall within a country.
[ইঙ্গিত: এই প্রশ্নের উত্তর অর্থের পরিমাণতত্ত্বটি অবলম্বন করিয়া লিখ।]
(১২৮-১৩০ পৃ:)

2. Discuss the relationship between the general price-level and the quantity of money. (সাধারণ মূল্যস্তর এবং টাকার পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।)
(১২৮-১৩১ পৃ:)

3. What do you mean by 'Inflation'? What are the effects of Inflation? (মুদ্রাস্ফীতি বলিতে তুমি কি বুঝ? মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কি কি?)
(১৩২-১৩৫ পৃ:)

4. Discuss the effects of the changes in the value of money.
(টাকার মূল্য পরিবর্তনের প্রভাব আলোচনা কর।) (১৩৪-১৩৫ পৃ:)
[ইঙ্গিত: টাকার মূল্য পরিবর্তনের ফলাফল বলিতে মূল্যস্তরের উঠা-নামার ফলাফল বুঝায়। কারণ, জিনিসপত্রের দাম বাড়িলে টাকার মূল্য কমে এবং জিনিস-পত্রের দাম কমিলে টাকার মূল্য বাড়ে। এই প্রশ্নের উত্তর লিখিবার সময় মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের ফলাফল লিখিতে হইবে।]

5. How can the changes in the value of money be measured?
(টাকার মূল্যের পরিবর্তন কিভাবে পরিমাপ করা যায়?) (১৩১-১৩২ পৃ:)
[ইঙ্গিত: এক বৎসরের তুলনায় অন্য বৎসরে টাকার মূল্য পরিবর্তনের পরিমাপ করিতে হইলে সূচক-সংখ্যা তৈয়ারী করিতে হয়। কিভাবে সূচক-সংখ্যা তৈয়ারী করিতে হয় লিখ।]

6. Write a note on the construction of Index number.
(সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত করিবার উপর একটি টীকা লিখ।) (১৩১-১৩২ পৃ:)

7. What do you mean by Deflation? What are its effects?
(মুদ্রা সংকোচন বলিতে তুমি কি বুঝ? ইহার কি কি প্রভাব?) (১৩৩-৩৪ পৃ:)

8. Discuss the remedies of Inflation.
(মুদ্রাস্ফীতির প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (১৩৫ পৃ:)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জাতীয় আয়
(National Income)

জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা (Definition of National Income)—দেশের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে কোন-না-কোন জিনিস বা সেবাস্রোতের (flow of goods or services) সৃষ্টি হয়। কোন ব্যক্তি কর্তৃক সৃষ্ট এই জিনিস অথবা সেবাস্রোত হইতেছে ব্যক্তির আয়। সমাজের সকল ব্যক্তির অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা হইতে যে সকল জিনিস বা সেবাস্রোতের সৃষ্টি হয়, সেগুলিকে আমরা সামগ্রিক আয় বলিয়া থাকি। এই আয় হইতেছে ব্যয়ের উৎস। মানুষের জীবনযাত্রা এই আয়ের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি সম্বন্ধে যাহা খাটে সামগ্রিকভাবে সমস্ত জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। সেইজন্য অর্থশাস্ত্রবিদগণ কোন দেশের বা সমাজের অর্থনৈতিক নীতি নিরূপণ করিবার জন্য প্রথমেই জাতীয় আয় নিরূপণ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। দেশের উৎপাদনস্তরের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আয়েরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

মার্শাল প্রদত্ত সংজ্ঞা

মার্শালের সংজ্ঞা অনুযায়ী দেশের শ্রম ও মূলধন প্রকৃতি প্রদত্ত সমুদয় সম্পদগুলির সাহায্যে এক বৎসরের নীট বস্তুগত এবং সেবাস্রোত যাহা সৃষ্টি করে তাহা জাতীয় আয়। মার্শাল জাতীয় আয়ের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে যত প্রকারের জিনিসপত্র এবং নানা ধরনের কাজ বা সেবাস্রোতের সৃষ্টি হয় তাহাদের মূল্য যোগ করিলে স্থূল জাতীয় উৎপাদনের (Gross National Product—G. N. P.) পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

স্থূল জাতীয় উৎপাদন G. N. P.

এই মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয় করিবার সময় আমাদের কয়েকটি জিনিস মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, একটি জিনিস যাহাতে দুইবার গণনা (double counting) করা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যেমন, একটি বই ছাপাইতে ৫ টাকা লাগিয়াছে এবং তাহা হিসাবে ধরা হইল। বইটির মলাট তৈয়ার করিতে আট আনার রং লাগিয়াছে। এই রং-এর দাম আবার আলাদা করিয়া হিসাবে ধরিলে ভুল হইবে। কারণ, বইয়ের মলাটে যে রং লাগিয়াছে তাহা বইয়ের দামের মধ্যেই ধরা হইয়াছে। বইয়ের দাম এবং রং-এর দাম আলাদা-ভাবে যোগ করিলে একই জিনিস (অর্থাৎ রং-এর দাম) দুইবার গণনা করা হইবে। দ্বিতীয়ত, আবার কোন জিনিস জাতীয় উৎপাদনের হিসাবে ধরিতে হইলে জিনিসটিকে একটি সম্পূর্ণ জিনিস (final product) হইতে হইবে। অসম্পূর্ণ জিনিসগুলি জাতীয় উৎপাদনের হিসাবে আসিবে না। তৃতীয়ত, উৎপন্ন জিনিসগুলি যদি বিক্রয় হইয়া যায়, তবে ইহাদের বাজার-মূল্য জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরিতে হইবে। আর যদি জিনিসগুলি বিক্রয় না হইয়া থাকে তবে ইহাদের উৎপাদন ব্যয় ধরিতে হইবে।

মোট জাতীয় উৎপাদন (G. N. P.) হইতে জিনিসপত্রের ক্ষয়ক্ষতি (depreciation) বাবদ ধার্য করা অর্থ বাদ দিলে আমরা নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product—N. N. P.) বাহির করিতে পারি। সব জিনিসেরই ব্যবহারজনিত ক্ষয়-ক্ষতি থাকে। প্রত্যেক শিল্পেই উৎপাদিত বিভিন্ন জিনিসের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য উৎপাদন খরচের মধ্যে কিছু টাকা ধরিয়া লওয়া হয়। মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে এই টাকা বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন নিরূপণ করা সম্ভবপর হয়। নীট জাতীয় উৎপাদন হইতে পরোক্ষ কর (Indirect taxation) বাদ দিলে জাতীয় আয় নিরূপিত হয়। এই নীট জাতীয় আয় উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বণ্টিত হয়। যেমন, জমির জন্য জমির মালিক খাজনা পায়, শ্রমের জন্য শ্রমিক মজুরী পায়, মূলধনের জন্য মূলধনের মালিক সুদ পায় এবং সংগঠনের জন্য উদ্যোক্তা মুনাফা পায়।

নীট জাতীয় উৎপাদন (N. N. P.)

জাতীয় আয়

অধ্যাপক পিগু (Prof. Pigou) সাধারণ মানদণ্ড হিসাবে অর্থের মাধ্যমে ("measuring rod of money") জাতীয় আয়ের হিসাব করিয়াছেন। অধ্যাপক পিগুর মতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (এক বৎসর) দেশে উৎপাদিত সমুদয় জিনিস ও সেবাস্রোতের আর্থিক মূল্য হিসাব করিয়া ইহা যোগ করিলেই মোট জাতীয় আয় (Gross National Income) পাওয়া যায়। ইহা হইতে মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতি বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ বাদ দিলে নীট জাতীয় আয় (Net National Income) পাওয়া যায়। জাতীয় আয় নিরূপণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানকালে সব দেশেরই অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রপ্তানি হইতে যে আয় হয়, তাহা জাতীয় আয়ের সহিত যোগ করিতে হয় এবং আমদানি বাবদ বিদেশে যে টাকা চলিয়া যায় তাহা বাদ দিতে হয়। রপ্তানি অথবা আমদানি ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদেশ হইতে আয় অর্জিত হইতে পারে এবং দেশ হইতে কিছু উপার্জিত অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতে পারে। জাতীয় আয় নির্ধারণকালে বিদেশ হইতে প্রাপ্ত আয় যোগ করিতে হইবে এবং বিদেশীগণ আমাদের দেশ হইতে যাহা আয় করে, তাহা বাদ দিতে হইবে।

অধ্যাপক পিগুর অভিমত

জাতীয় আয় নিরূপণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকা

জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income)—জাতীয় আয় পরিমাপের সাধারণত তিনটি পদ্ধতি আছে,—যথা, আয় সুমারি পদ্ধতি (Census of Income Method or Income-Received Method), উৎপাদন সুমারি পদ্ধতি (Census of Production Method) এবং ভোগ-সঞ্চয় সুমারি পদ্ধতি (Census of Consumption-Saving Method)।

আয়-সুমারি পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের সরকারী এবং বে-সরকারী সমুদয় কার্যরত

ব্যক্তিদের সমগ্র আয়ের পরিমাণ, উৎপাদনে নিযুক্ত জমির নীট খাজনা, শ্রমের নীট মজুরী ও মাহিনা, মূলধনের নীট স্থদ এবং সমুদয় উদ্যোক্তা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নীট লাভ ইত্যাদির সমষ্টি সংগ্রহ করিয়া জাতীয় আয় নিরূপিত হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় আয় পরিমাপ করিলে দেখিতে হইবে অর্থের বিনিময়ে উৎপাদন অথবা আয় বৃদ্ধি হইতেছে কিনা। শুধু অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হইয়া (Transfer Payments) কোন জিনিসের মালিকানার পরিবর্তন হইলে অথবা অনায়াসলভ্য কোন জিনিস লাভ করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়ে না। কোন ব্যক্তি যদি তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অর্থ পায়, অথবা কোনও আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে সাহায্য বাবদ কোন অর্থ পায়, তবে তাহা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। আবার, যদি কোনও উৎপাদক তাহার নিজস্ব মূলধন অথবা শ্রম (যাহার জন্য সে অর্থ মূল্য প্রদান করে না) অথবা অন্য কোন উপাদান প্রয়োগ করে তবে সেই সকল উপাদানের আয় জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে ধরা হইবে। যে সকল জিনিস বা সেবা বিনামূল্যে পাওয়া যায়, যেমন, বাড়ীতে মায়ের সেবা, সেগুলি কোন অর্থমূল্য সৃষ্টি করে না বলিয়া জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কিন্তু একই সেবা যদি কোন গৃহ-পরিচারিকা করে এবং তাহার জন্য যদি সে বেতন পায়, তবে তাহার সেই আয় জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। উৎপাদক যদি উৎপাদিত সামগ্রী নিজেই ভোগ করে অথবা অন্য কোন জিনিসের সহিত বিনিময় করে তবে ইহাকেও আয় গণ্য করিয়া (সেই সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ করিয়া) জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাতীয় আয় যদি আয়ের উৎস হইতে পরিমাপ করা হয় তবে আয়কর হিসাবে রাষ্ট্র যাহা গ্রহণ করে তাহা জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হয়। সমুদয় পরোক্ষ করও জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে বাদ দিতে হয়। নীট জাতীয় উৎপাদন (N.N.P.) হইতে পরোক্ষ কর বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা হইতেছে উৎপাদনের ব্যয়ের ভিত্তিতে জাতীয় আয় (National income at factor cost)।

আয়-সুমারি পদ্ধতি বৈশিষ্ট্য

উৎপাদন-সুমারি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

উৎপাদন সুমারি পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের মোট উৎপাদনের মূল্য যোগ করিয়া অথবা যে সকল দ্রব্য অর্থ দ্বারা বিনিময় করা হয় তাহাদের মূল্য যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করিবার সময় কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়। প্রথমত, কোন জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করিবার সময় ইহা যেন একাধিকবার গণনা করা (double counting) না হয়। দ্বিতীয়ত, বিদেশ হইতে প্রাপ্ত কোন প্রকার আয় জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং বিদেশে ঋণ পরিশোধ বাদ দিতে হইবে। তৃতীয়ত, যন্ত্রপাতির এবং বিভিন্ন মূলধন সামগ্রীর ক্ষয়-ক্ষতি (Depreciation) বাবদ বরাদ্দ অর্থ জাতীয় আয় হইতে বাদ দিতে হইবে। চতুর্থত, জাতীয় আয়ের হিসাব করিবার সময় মনে রাখিতে

হইবে যে কেবলমাত্র সর্বশেষ স্তরের উৎপাদিত জিনিসগুলির (final goods) মূল্যই যোগ করিতে হইবে। সর্বশেষে, রাষ্ট্র যে সকল সেবামূলক কাজ (Relief services) বিনামূল্যে জনসাধারণকে প্রদান করিয়া থাকে সেইগুলিকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কিনা, সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীগণ একমত নহেন। তবে এই সকল সেবামূলক কাজের ব্যয়ভার রাষ্ট্রকেই বহন করিতে হয়। সুতরাং, সেই ব্যয়ের মূল্য হিসাব করিয়া জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

ভোগ ও সঞ্চয় সুমারি পদ্ধতির হিসাব অনুযায়ী দেশের সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভোগ ও সঞ্চয় যোগ করিয়া জাতীয় আয় হিসাব হয়।

ভাগ ও সঞ্চয় সুমারি

ভোগ ও সঞ্চয় সুমারি পদ্ধতির হিসাব অনুযায়ী দেশের সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভোগ ও সঞ্চয় যোগ করিয়া জাতীয় আয় হিসাব করা হয়। সমাজের মোট আয় মোট ব্যয়ের সমান। জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আয়ের সম্পূর্ণ অথবা কিছু অংশ ভোগ-সামগ্রী কিনিবার জন্য খরচ করে এবং অবশিষ্ট সঞ্চয় করে; যাহা সঞ্চয় করা হয় তাহাই ভবিষ্যতে বিনিয়োগের কাজে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এই পদ্ধতি অনুযায়ী সমাজের মোট ভোগ ও সঞ্চয় অথবা বিনিয়োগ ব্যয় মোট জাতীয় আয়ের সমান। কিন্তু এই পদ্ধতির প্রয়োগ খুবই অল্প দেখা যায়।

জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা (Difficulties in the measurement of National Income)—জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার পথে কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা আছে। প্রথম অসুবিধা হইতেছে পরিসংখ্যানের (statistics) স্বল্পতা এবং তাহার উপর নির্ভর করার অসুবিধা। দেশের মধ্যে মোট কত শস্য উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের শিল্পসামগ্রী কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, এই সম্বন্ধে সঠিক তথ্য খুব কমই আছে। অনগ্রসর দেশগুলিতে এই সমস্যা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের মধ্যে যদি নিরক্ষরের সংখ্যা বেশী থাকে এবং আয়কর দিতে হয় না এমন লোকের সংখ্যা বেশী থাকে তবে জাতীয় আয়ের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যদি কৃষিজাত এবং শিল্পজাত উৎপাদন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে পরিচালিত হয় এবং সেইগুলি সংঘবদ্ধ না হয়, তবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়। চতুর্থত, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহাদের আয়-ব্যয় অথবা লাভ-ক্ষতির হিসাব রাখে না। ইহাতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা অসুবিধাজনক হয়। পঞ্চমত, যদি উৎপাদন ব্যবস্থা পারিবারিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে এবং যদি উৎপাদিত জিনিসগুলির অধিকাংশ প্রস্তুতকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত কিংবা জিনিসে জিনিসে বিনিময় (barter) হয়, তবে ঐ জিনিসগুলির মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না বলিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব আরও কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। ষষ্ঠত, অনেক সময় দেখা যায়, একই ব্যক্তি একাধিক উৎস হইতে আয় অর্জন করিয়া থাকে। জাতীয় আয়ের হিসাব তৈয়ার করিবার

সময় কোন্ ক্ষেত্র হইতে কি পরিমাণ আয় অর্জিত হইতেছে তাহার সঠিক হিসাব করা কঠিন হইয়া পড়ে। সপ্তমত, কোন জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করিবার সময় দুইবার গণনা করিয়া ফেলার (Double counting) সম্ভাবনাও জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার পক্ষে একটি প্রধান সমস্যা। অষ্টমত, যন্ত্রপাতির ও বিভিন্ন মূলধন সামগ্রীর ক্ষয়-ক্ষতি (Depreciation) বাবদ কত অর্থ বরাদ্দ করা উচিত এবং এই খাতে কত অর্থ মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে বাদ দিতে হইবে তাহাও জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। তাহা ছাড়া, যে সমস্ত সেবামূলক কাজের জন্য কোন বেতন দেওয়া হয় না (unpaid services) সেইগুলি জাতীয় আয় হইতে বাদ দিতে হয়। কোন ব্যক্তি যদি তাহার মহিলা প্রাইভেট সেক্রেটারীকে বেতন দিয়া থাকেন, তবে তাহা জাতীয় আয়ের অংশ হইবে; আবার যদি তিনি তাঁহার সেক্রেটারীকে বিবাহ করিয়া বসেন, তবে তাঁহাকে কাজের জন্য বেতন দিতে হইবে না এবং তাহা জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে না। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এই ছোটখাটো ঘটনাগুলিও জাতীয় আয়ের সঠিক হিসাব করিবার পথে সমস্যার সৃষ্টি করে। আবার অর্থের মূল্যও সর্বদা স্থির থাকে না, সেইজন্য জাতীয় আয়ের পরিমাপ অর্থের হিসাবে করিতে গেলে কখনই সঠিক হয় না। সর্বশেষে, জাতীয় আয়ের পরিমাপ করিবার সময় সরকারী আয়-ব্যয় আর একটি সমস্যার সৃষ্টি করে। আমেরিকান লেখক কুজনেটসের (Prof. Kuznets) মতে, যে সকল কর উপাদানগুলির আয়ের উপর ধার্য করা হয় এবং আয় হইতে দেওয়া হয়, শুধু সেই করলব্ধ রাজস্ব জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা হইবে। পরোক্ষ করগুলি জাতীয় আয়েব হিসাবে গণনা করা উচিত নয়। কিন্তু, কোন্ কর আয় হইতে দেওয়া হয় এবং কোন্‌টি হয় না, তাহা নির্ণয় করা অসুবিধাজনক। সাধারণত কোন লোকের মোট আয় যদি জাতীয় আয়ে ধরা হয়, তবে তাহার নিকট হইতে আয়করের দরুন প্রাপ্ত রাজস্ব জাতীয় আয়ে ধরা উচিত নয়। কারণ, এক্ষেত্রে একই আয়ের দুইবার গণনা (double counting) হয়। পরোক্ষ কর সর্বদাই জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে বাদ দেওয়া উচিত। সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রেও জাতীয় আয়ের হিসাব করিবার সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। যে সমস্ত সেবামূলক কাজ রাষ্ট্র করিয়া থাকে, সেইগুলির জন্য যে টাকা খরচ হয় তাহা জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা হইবে কিনা সে বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে সেবামূলক কাজের জন্য রাষ্ট্র যে টাকা খরচ করে উহাকে মূল্য হিসাবে ধরিয়া লইয়া জাতীয় হিসাব করা যাইতে পারে। জাতীয় আয়ের সঠিক পরিমাপ করিতে হইলে দেশের জনসংখ্যার পরিবর্তন, মূল্যস্তরের হ্রাস-বৃদ্ধি, বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদিও বিবেচনা করিতে হইবে।

জনপ্রতি জাতীয় আয় (Per capita National Income) জাতীয় আয়কে দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে আমরা জনপ্রতি আয় নির্ধারণ করিতে পারি; যদি কোন বৎসর জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায় অথচ,

সেই পরিমাণে জনসংখ্যা না বাড়ে, তবে জনপ্রতি জাতীয় আয় বাড়িয়া যায়। যদি জনপ্রতি জাতীয় আয় বাড়িতে থাকে এবং সেই পরিমাণে জিনিসপত্রের দাম না বাড়ে তবে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হইয়াছে বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৫৫ সালে ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ১০,৪৮০ কোটি টাকা এবং সেই বৎসর দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৮৩,০৯০ মিলিয়ন। সুতরাং সেই বৎসর জনপ্রতি জাতীয় আয় ছিল ২০৩৬ টাকা। জনপ্রতি জাতীয় আয় কম অথবা বেশী হইবার কারণ হইতেছে মোট জনসংখ্যা এবং জাতীয় আয়ের মধ্যে অনুপাতের পরিবর্তন। যদি কোন কারণে জনসংখ্যা বাড়িয়া যায় অথচ সেই অনুপাতে জাতীয় আয় না বাড়ে, অথবা যদি জনসংখ্যা স্থির থাকে, অথচ জাতীয় আয় কমিয়া যায় তবে উভয় ক্ষেত্রেই জনপ্রতি জাতীয় আয় কম হইবে। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম সেইজন্য ভারতে জনপ্রতি জাতীয় আয় কম। ১৯৬৭-৬৮ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে ১৯৬৮-৬৯ সালের জনপ্রতি জাতীয় আয় ছিল ৪৮১ টাকা।

জনপ্রতি জাতীয় আয় কম হয় কেন ?

অনেক সময় জাতীয় আয় বাড়িয়া গেলেও জনপ্রতি আয় নাও বাড়িতে পারে। কারণ, তখন জনসংখ্যা বাড়িয়া যাইতে পারে। আবার জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন দেশের বাড়তি জাতীয় আয় মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। সুতরাং মোট জাতীয় আয় জনসাধারণের মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হয়, তাহার উপরেও জনপ্রতি আয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। অনেক সময়ে হয়ত জনপ্রতি আয় বাড়িতে পারে, কিন্তু তখন দেশের প্রকৃতই কোন উন্নতি হইতেছে কিনা তাহা জানিতে হইলে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আমাদের জানিতে হইবে। বিভিন্ন দেশের জনপ্রতি আয় জানা থাকিলে সেই দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করা যাইতে পারে।

জাতীয় আয়ের বণ্টন—বর্তমান কালে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের অসম বণ্টন দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু উন্নত দেশগুলিই নহে, ভারতের মত অনগ্রসর দেশগুলিতেও আমরা জাতীয় আয়ের অসম বণ্টন দেখিতে পাই। জাতীয় আয় বণ্টন কতখানি অসম, তাহা সঠিকভাবে বলা সম্ভবপর নয়। পরিসংখ্যানের উপর আমাদের এ বিষয়ে নির্ভর করিতে হয়। তবে, সরকারের আয়কর বিভাগ হইতে মাঝে মাঝে এ বিষয়ে যে বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে আয়করের অসম বণ্টন সম্বন্ধে কিছু পরিমাণে ধারণা করা যায়।

জাতীয় আয়ের বণ্টন

জাতীয় আয় বণ্টন করা হয় উৎপাদনের চারিটি উপকরণের মধ্যে। জমি, মূলধন, শ্রম ও ব্যবস্থাপনা,—এই চারিটি উপকরণের মধ্যে জাতীয় আয় বণ্টিত হয় ;

জমির জন্য ইহার মালিক যাহা আয় করেন তাহা হইতেছে খাজনা; মূলধনের মালিক তাহার মূলধন ধার দিবার মূল্য হিসাবে সুদ উপার্জন করেন। শ্রমের মালিক শ্রমিক নিজেই এবং শ্রমজনিত যে আয় উপার্জিত হয় তাহা হইতেছে মজুরী। ব্যবস্থাপক নিজের ব্যবস্থাপনার গুণে মুনাফা বা লাভ অর্জন করেন। বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বণ্টিত হইবে, তাহা সংশ্লিষ্ট উপকরণের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে।

জীবনধারণের মান (Standard of Living)—জনপ্রতি আয় যদি অল্প হয়, তবে জীবনধারণের মান খুব উন্নত হইতে পারে না। জীবনধারণের মান নির্ভর করে মানুষের সাধারণ খাওয়া-পরা, বাসস্থান এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অভাব পূরণ করিবার সুযোগ-সুবিধার উপর। লোকের আয় বাড়িলে জীবনযাত্রার মানও অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়। জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে শ্রমিকদের কর্মকুশলতা বা উৎপাদন-দক্ষতা বাড়ে। তাহাতে দেশের উৎপাদনের পরিমাণও অনেক বাড়িয়া যায়। কারণ জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে শ্রমিকদের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করা এবং নিজেদের কর্মদক্ষতা অর্জন করা সম্ভবপর হয়। শুধু শ্রমিকদেরই নহে, দেশের উৎপাদন বাড়িয়া গেলে উৎপাদকের আয়ও বাড়িয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবনযাত্রার মান ও জাতীয় আয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

জাতীয় আয় নিরূপণের উপযোগিতা (Importance of the measurement of National Income)—জাতীয় আয় নিরূপণের অনেক উপযোগিতা আছে। প্রথমত, জাতীয় আয় কোন দেশের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণে সহায়তা করে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় আয় পরিমাপের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, কোন দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন উন্নতি করিতেছে কিনা। বিভিন্ন বৎসর জাতীয় আয়ের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি—দেশের শিল্পোৎপাদন, কৃষির উন্নতি এবং মূলধন-সৃষ্টি কি পরিমাণে হইয়াছে। তাহা ছাড়া, অর্থ-ব্যবস্থায় বাণিজ্য-চক্রের জন্য, মুদ্রাস্ফীতির চাপের জন্য, এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের জন্য দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে পরিবর্তন হয়, তাহা জাতীয় আয়ের পরিমাপের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি। তৃতীয়ত, আমরা যে কোন দুইটি দেশের জাতীয় আয় তুলনা করিয়া সেই দুই দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণের তুলনামূলক আলোচনা করিতে পারি।

চতুর্থত, জাতীয় আয় নিরূপণের সময় আমরা যে সকল তথ্য লই তাহা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ঠিক করিয়া লইতে পারি। জাতীয় আয় নিরূপণ করিবার পূর্বে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় হাত দেওয়া একরূপ অসম্ভব।

ভারতের জাতীয় আয় (National Income of India)—ভারতসরকার খুব অধুনাকাল ব্যতীত জাতীয় আয় নির্ধারণের কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। বিভিন্ন

সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি আপন চেষ্টায় যে সকল সংখ্যা নির্ণয় করেন, সেগুলি নির্ভরযোগ্য নয়। অতীতে কয়েকবার জাতীয় আয় নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। ১৮৬৭-৭০ সালে দাদাভাই নৌরজীর হিসাব অনুযায়ী ভারতের জনপ্রতি আয় ছিল ২০ টাকা। ১৯০০-১৪ সালে শাহ এবং খাম্বাটার হিসাব অনুযায়ী জনপ্রতি আয় ছিল ৩৬ টাকা। ১৯৩১-৩২ সালে ডক্টর ভি. কে. আর. ভি. রাওয়ের হিসাব অনুযায়ী ভারতের জনপ্রতি জাতীয় আয় ছিল ৬৫ টাকা। ১৯৪৯ সালে ভারতসরকারের অর্থদপ্তরে একটি জাতীয় আয়কেন্দ্র (National Income Unit) স্থাপন করেন এবং ইহার পরিচালনার জন্য জাতীয় আয় কমিটি নিযুক্ত করেন। জাতীয় আয় কমিটির গণনাই হইল আমাদের দেশের সর্বপ্রথম নির্ভরযোগ্য জাতীয় আয় গণনা। এই কমিটিতে ছিলেন অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ (সভাপতি), অধ্যাপক ডি. আর. গ্যাডগিল, এবং ডক্টর ভি. কে. আর ভি. রাও। এই কমিটির উপদেষ্টা ছিলেন তিন জন বিশেষজ্ঞ। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে এই কমিটি ইহার প্রথম বিবরণী প্রকাশ করেন।

অতীতে জাতীয় আয় নির্ধারণের প্রচেষ্টা

তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনা ও জাতীয় আয়—পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে ১৯৫০-৫১ সালের জাতীয় আয় যেখানে ছিল ১০,২৪০ কোটি টাকা, ১৯৫৫-৫৬ সালে তাহা হয় ১২,১৩০ কোটি টাকা, ১৯৬০-৬১ সালে তাহা হয় ১৪,৫০০ কোটি টাকা অর্থাৎ, ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৬০-৬১ সালে জাতীয় আয় শতকরা ৪২ ভাগ বাড়িয়াছিল। কিন্তু, মন্ত্রিসভা সেক্রেটারিয়েট বুলেটিন অনুযায়ী (১৮ই মার্চ, ১৯৬২) ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয় ছিল ১০,৪৮০ কোটি টাকা এবং ১৯৬০-৬১ সালে তাহা হইয়াছিল ১২,৬৯০ কোটি টাকা। আমরা পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব গ্রহণ করিব। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বাড়িয়াছিল শতকরা ২০.২ ভাগ এবং তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম চার বৎসরে জাতীয় আয় বাড়িয়াছিল শতকরা ১৪.৫ ভাগ। ১৯৬৪-৬৫ সালে জাতীয় আয় শতকরা ৫ ভাগ বাড়িয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় ১৯০০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে এবং ধরা হইয়াছে যে প্রতি বৎসর জাতীয় আয় অন্তত সাড়ে পাঁচ ভাগ বাড়িবে। ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যস্তর অনুযায়ী ভারতের জনপ্রতি আয় ১৯৬০-৬১ সালে দাঁড়াইয়াছিল ৩২৭.৩ টাকা; ১৯৬৮-৬৯ সালে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৪৯৩ টাকা।

ভারতের জাতীয় আয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইতেছে,—(১) ভারতের জনপ্রতি জাতীয় আয় পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির তুলনায় খুবই অল্প; (২) জনপ্রতি জাতীয় আয় ইদানীংকালে কিছু পরিমাণে বাড়িলেও জীবনযাত্রার মানের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না; (৩) অল্পসংখ্যক শিল্পপতি, ধনী সম্প্রদায় এবং জমিদারগণই জাতীয় আয়ের এক বিরাট অংশ উপভোগ করেন; (৪) কৃষিক্ষেত্র জাতীয় আয়ের অর্ধেক পূরণ করে; (৫) ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ

ভারতের জাতীয় আয়ের বৈশিষ্ট্য

ভারতের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার ইদানীংকাল পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আসিয়াছে; (৬) জাতীয় আয়ের শতকরা ৫৩ ভাগ খাদ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় করা হয়; এবং (৭) সরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদন বে-সরকারী ক্ষেত্র হইতে বেশী হইতেছে।

ভারতের জাতীয় আয় গঠনে বিভিন্ন উৎসের অবদান বিবেচনা করিলে দেখা যায় এখনও জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৮ ভাগ আসে কৃষিক্ষেত্র হইতে; বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির অবদান হইতেছে যথাক্রমে প্রায় শতকরা ৯ ভাগ এবং ১০ ভাগ। রেলওয়ে এবং যোগাযোগ বিভাগের অবদান হইতেছে প্রায় শতকরা ৩ ভাগ। ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতের জাতীয় আয় বাড়িয়াছে শতকরা ৯'৩ ভাগ এবং ইহা সম্ভব হইয়াছে কৃষিক্ষেত্রে আশাতিরিক্ত উৎপাদন-বৃদ্ধির দরুন।

১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৬৩-৬৪ সাল পর্যন্ত ভারতের জাতীয় আয়ের উৎস ছিল নিম্নরূপ।*

জাতীয় আয়ের উৎস

[১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে ১০০ কোটি টাকায়]

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪
কৃষি, পশুপালন, বনসম্পদ ও মৎস্য চাষ	৪৩'৪	৫০'২	৫৯'০	৫৯'১	৫৭'৯	৫১'৪
খনি, শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প	১৪'৮	১৭'৬	২১'৯	২২'১	২৩'০	২০'৪
বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ	১৬'৬	১৯'৭	২৪'৩	২৫'৪	২৬'৪	২৭'৭
অন্যান্য সেবাস্রোত	১৩'৯	১৭'৩	২৩'১	২৪ ৭	২৬'৬	২৮'৯
উৎপাদনের খরচের ভিত্তিতে নীট জাতীয় আয়	৮৮'৭	১০৪'৮	১২৭'৩	১৩০'৬	১৩৩'১	১৩৯'১

*Report on Currency and Finance 1964-65. P. 54.

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সরকারের বিভিন্ন রিপোর্ট জ্ঞাতব্য তথ্যের মধ্যে যথেষ্ট অমিল আছে। ইহার প্রধান কারণ, যে মূল্যস্তরের ভিত্তিতে হিসাব প্রণীত হয়, তাহা সর্বদা একপ্রকার থাকে না।

Exercise

1. How do you define and measure the national income of a country?
(কোন দেশের জাতীয় আয় কিভাবে পরিমাপ করা যায়?) (১৩৬-১৪০ পৃষ্ঠা)

2. Distinguish between Gross National Product and Net National Product. (১৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা)
(মোট জাতীয় উৎপাদনের এবং নীট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।)

3. Examine the utility of determining *Per capita* income.
(জনপ্রতি আয় নির্ধারণের সার্থকতা আলোচনা কর।) (১৪১-১৪২ পৃষ্ঠা)

4. Write a note on the National Income of India.
(ভারতের জাতীয় আয় সম্বন্ধে একটি টিপ্পনী লিখ।) (১৪৩-১৪৫ পৃষ্ঠা)

5. Write notes on:
(*a*) *Per capita income* and (b) Standard of living.
[সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :
(ক) জনপ্রতি আয়, (১৪১-১৪২ পৃষ্ঠা (খ) জীবনধারণের মান।] (১৪৩ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the difficulties involved in estimating National Income.
(জাতীয় আয় নিরূপণের অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (১৪০-১৪১ পৃষ্ঠা)

7. Write a note on the utility of estimating National Income.
জাতীয় আয় নিরূপণের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (১৪৩-১৪৪ পৃষ্ঠা)

চতুর্দশ অধ্যায়

অনগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং ইহার উন্নয়ন

(Economic Structure and the Requirements for Economic Development of an Under-developed Economy)

অনুন্নত দেশ কাহাকে বলে? অনুন্নত দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য

অনুন্নত দেশ বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি দেশ যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় মূলধন সৃষ্টির হার অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার কম। অনেক সময় একেবারে অনুন্নত দেশ (Undeveloped Economy) এবং অনগ্রসর দেশের (Underdeveloped Economy) মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়। অনগ্রসর দেশ এবং অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য একই প্রকার। যখন কোন দেশ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেও অর্থনৈতিক উন্নতির অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছে, তখন সেই দেশকে অনগ্রসর দেশ বলা যায়। অনুন্নত অবস্থা বলিতে আমরা এমনই একটি স্তর বুঝি যখন দেশের উন্নতি হয়ই না, বরং উন্নয়ন প্রচেষ্টার কোন সাড়াশব্দও অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো হইতে পাওয়া যায় না। একটি অনগ্রসর অথবা অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহার নিম্নলিখিত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাই—

প্রথমত, অনগ্রসর বা অনুন্নত দেশগুলির জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার খুবই বেশী। জন্মহারই যে শুধু বেশী তাহা নহে, এই দেশগুলিতে সাধারণত মৃত্যুহারও বেশী থাকে।

স্বল্প জাতীয় আয়

দ্বিতীয়ত, অনগ্রসর বা অনুন্নত দেশের জাতীয় আয় খুব অল্প থাকে। জাতীয় আয় অল্প হওয়ায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় অনুন্নত দেশগুলিতে জনপ্রতি আয় খুব অল্প থাকে। জনপ্রতি আয় অল্প থাকে বলিয়া জীবনযাত্রার মানও খুব নীচু হয়। বর্তমান মূল্যস্তরের ভিত্তিতে এখন ভারতে জনপ্রতি আয় প্রায় ৪৮১ টাকা।

কৃষির উপর অত্যধিক চাপ

তৃতীয়ত, অনগ্রসর দেশগুলির অর্থ নৈতিক কাঠামো (Economic structure) যে উন্নত দেশগুলির অর্থ নৈতিক কাঠামো হইতে পৃথক, তাহা দেখা যায় এই দেশগুলির কৃষিক্ষেত্রের উপর অত্যধিক চাপের মধ্যে। অনুন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যার অধিকাংশ কৃষিজীবী। এই দেশগুলিতে শিল্পোন্নয়ন বিশেষ দেখা যায় না।

বেকার সমস্যা

চতুর্থত, অনুন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয় এবং কর্মসংস্থানের তুলনায় শ্রমশক্তির পরিমাণ বেশী হওয়ায় বেকার সমস্যা দেখা যায়। বেকার সমস্যা আবার বিভিন্নরূপে দেখা যায়। ঋতুগত বেকার সমস্যা (Seasonal Unemployment), সংগঠনজনিত বেকার সমস্যা (Structural Unemployment), সংঘাতজনিত বেকার সমস্যা (Frictional Unemployment), কলাকৌশলজনিত বেকার সমস্যা (Technological Unemployment) এবং প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা (Disguised Unemployment) প্রভৃতি সমস্যা আমরা অনগ্রসর দেশগুলিতে দেখিতে পাই।

শ্রমিকদের কর্মকুশলতার অভাব

পঞ্চমত, শুধু বেকার সমস্যাই নহে, অনগ্রসর দেশগুলিতে কর্মে নিযুক্ত উপকরণ অথবা কাঁচা মালগুলিরও প্রকৃত সদ্ব্যবহার হয় না। যে বিপুল শ্রমশক্তি আমরা অনগ্রসর দেশগুলিতে দেখিতে পাই, ইহার কারিগরি কর্মকুশলতা অত্যন্ত অল্প। ভারতে আমরা বর্তমানে বেকার সমস্যা দেখিতে পাইতেছি! অথচ ভারতে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। শ্রমিকের কর্মকুশলতার অভাবে এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলির উপযুক্ত ব্যবহার হইতেছে না।

অনগ্রসর দেশগুলির অর্থ নৈতিক কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য (Main structural features of underdeveloped economies)—উন্নত দেশগুলির সহিত তুলনা করিলে অনগ্রসর দেশগুলির অর্থ নৈতিক কাঠামোর কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমরা দেখিতে পাই। সেইগুলি নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

অনগ্রসর দেশগুলি মূলত কৃষিপ্রধান

প্রথমত, অনগ্রসর দেশগুলি মূলত কৃষিপ্রধান। এই দেশগুলির অধিকাংশ লোকই গ্রামাঞ্চলে বাস করে এবং তাহাদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। ভারত, পাকিস্থান প্রভৃতি দেশের এই বৈশিষ্ট্য আমরা বিশেষভাবে দেখিতে পাই। শিল্পক্ষেত্রের উন্নতি এই দেশগুলিতে বেশী হয় নাই। যাহা কিছু উন্নতি তাহা বিশেষ কয়েকটি শিল্পে দেখিতে পাওয়া যায়,

যেমন, ভারতের শিল্পোন্নয়ন বেশী না হইলে পাট-শিল্প বিশেষ উন্নত হইয়াছে। কৃষি-ক্ষেত্রের তুলনায় শিল্পক্ষেত্রেও উন্নতি খুব কম হওয়ার কারণ শিল্পগুলির আর্থিক দুরবস্থা, কাঁচা মালের অভাব, সাংগঠনিক ত্রুটি, শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার অভাব ইত্যাদি। তাহা ছাড়া, কৃষিক্ষেত্রের কাঠামোও খুব উন্নত হয়। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির অভাব, শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতার অভাব, গ্রামাঞ্চলে বাড়তি শ্রমশক্তির দরুন প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা, অর্থের অভাব, ক্ষেতের ক্ষুদ্র আয়তন ইত্যাদি কারণে কৃষিক্ষেত্রের কাঠামোও বিশেষ উন্নত হয় নাই।

দ্বিতীয়ত, অনগ্রসর দেশগুলিতে অর্থ নৈতিক কাঠামোয় আমরা দুইটি বিশেষ অংশ দেখিতে পাই। একটি হইতেছে বড় বড় শহরের অপেক্ষাকৃত উন্নত অর্থ নৈতিক কাঠামো—যেখানে ভাল ভাল ব্যাংক, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বহু যৌথ কোম্পানী এবং বিদেশী কোম্পানী দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। অপর অংশ হইতেছে গ্রামাঞ্চলে—যেখানে দেশের অধিকাংশ লোক কোন রকমে জীবনধারণ করিতে প্রাণান্ত হয়। এই অঞ্চলকে "Subsistence Sector" বলা হয়। এই অঞ্চলের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় লোকে কোন রকমে জীবনধারণ করে মাত্র। গ্রাম-বাসীদের যাহা আয় তাহাতে তাহাদের ভরণপোষণের সমুদয় ব্যয় নির্বাহ হয় না।

অর্থ নৈতিক কাঠামোর দুইটি অংশ—একটি অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং অপরটি একেবারে অবনত

তৃতীয়ত, অনুন্নত অথবা অনগ্রসর দেশে মূলধন-সৃষ্টির হার (Rate of capital formation) অত্যন্ত অল্প। মূলধনের যোগান নির্ভর করে সঞ্চয়ের ক্ষমতা এবং সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর। উভয়ই আয়ের উপর নির্ভরশীল। অনুন্নত দেশে জাতীয় আয় অত্যন্ত অল্প বলিয়া লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতা অত্যন্ত অল্প। দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট দেশে সঞ্চয়ের ইচ্ছাও লোকের অল্প থাকে। তাহা ছাড়া, জাতীয় আয় এই দেশগুলিতে সমভাবে বণ্টিত হয় না বলিয়া মুষ্টিমেয় জনসাধারণ, যাহাদের হাতে জাতীয় আয় কেন্দ্রীভূত থাকে, সঞ্চয়-বৃদ্ধির কাজে ভূমিকা গ্রহণ করে না। স্বল্প সঞ্চয়ের পরিমাণ অনগ্রসর দেশগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মূলধন সৃষ্টির হার খুবই অল্প

চতুর্থত, অনগ্রসর দেশগুলিতে গ্রামাঞ্চলে আমরা এক ধরনের বেকার সমস্যা দেখিতে পাই, ইহাকে প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থা (Disguised unemploymen[illegible] বলে। ক্ষুদ্র জমিতে যতজন লোকের চাষ করা উচিত, জনসংখ্যার চাপে তাহা অ[illegible] বেশী লোক চাষ করে বলিয়া অতিরিক্ত শ্রমিকদের কাজ অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। অথচ তাহাদের যদি কৃষিক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিয়া শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ করা যায়, তবে কৃষির উৎপাদন কমিবে না, অথচ শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়িবে। এই অতিরিক্ত শ্রমিকগণও এক ধরনের বেকার; তাহারা বেকার ঠিক কাজের অভাবে নহে; কারণ কাজে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও শুধু তাহাদের কাজ অনাবশ্যক বলিয়াই তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে বেকার হিসাবে পরিগণিত হয়। এই প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থা ছাড়াও অনগ্রসর দেশে আমরা আর এক ধরনের অবস্থা দেখিতে পাই, ইহাকে ঋতুগত বেকার অবস্থা (Seasonal Unemployment) বলা হয়। কৃষকগণ

প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা

বৎসরের সব সময় কাজে লিপ্ত থাকে না, জমি হইতে একটি ফসল উঠাইবার পর অন্য একটি ফসল না হওয়া পর্যন্ত তাহারা কর্মহীন হইয়া বসিয়া থাকে; অথচ এমন কোন পার্শ্ববর্তী বা পরিপূরক কাজের ব্যবস্থা থাকে না যাহাতে তাহারা কাজ পাইতে পারে। তাহাদের এইভাবে বসিয়া থাকাকে ঋতুগত বেকার অবস্থা বলা হয়। তাহা ছাড়া, অনগ্রসর দেশে সংগঠনজনিত বেকার অবস্থা (Structural Unemployment), সংঘাতজনিত বেকার অবস্থা (Frictional Unemployment), কলাকৌশলের পরিবর্তনজনিত বেকার অবস্থা (Technological Unemployment) দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋতুগত বেকার অবস্থ

পঞ্চমত, অনগ্রসর দেশের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে শ্রমিকদের কারিগরি শিক্ষা-কেন্দ্রের বা কারিগরি বিদ্যালয়ের অভাবহেতু অনগ্রসর দেশের শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞানও অল্প থাকে। তাহা ছাড়া, কারিগরি বিশেষজ্ঞেরও বিশেষ অভাব অনগ্রসর দেশে দেখা যায়। শুধু যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করিলেই অনগ্রসর দেশকে উন্নত করা যায় না; সেই যন্ত্রপাতিগুলি যাহাতে শ্রমিকগণ ঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারে সেইজন্য তাহাদের কারিগরি কর্মকুশলতা বাড়ানো দরকার।

শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞানের অভাব

ষষ্ঠত, অনগ্রসর দেশগুলিতে এখনও চিরাচরিত উৎপাদন-পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থা চালিত হয়। অনুন্নত সেচ-ব্যবস্থা ও নিকৃষ্ট ধরনের সার ও বীজের সাহায্যে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করা হয় বলিয়া এই দেশগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণও অত্যন্ত অল্প।

অনুন্নত সেচ-অবস্থা এবং উৎপাদন পদ্ধতি

সপ্তমত, ভারতবর্ষে সাধারণ লোকের আয়ের অধিকাংশই খাদ্যশস্য-ক্রয়ে ব্যয়িত হয়। অন্যান্য অনগ্রসর দেশেও জাতীয় আয়ের অধিকাংশ ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ে খরচ করা হয়।

ভোগ-সামগ্রী জনিত ব্যয়ের আধিক্য

অষ্টমত, অনগ্রসর দেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই দেশগুলি হইতে সস্তা দরে বিভিন্ন কাঁচা-মাল বিদেশে চলিয়া যায় এবং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় ভোগ-সামগ্রী এই দেশে আসে। ইহাতে বাণিজ্যের অবস্থা প্রায়ই প্রতিকূল থাকে।

বৈদেশিক বাণিজ্যাবস্থা প্রায়ই প্রতিকূল থাকে

সর্বশেষে, অনগ্রসর দেশগুলিতে জনসাধারণের উপজীবিকার মধ্যেও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। জনসাধারণের উপজীবিকা সাধারণত তিন প্রকার; যথা কৃষিক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র এবং কারণিক অথবা শাসন-সংক্রান্ত (clerical or administrative)। প্রথমটিকে প্রাথমিক উপজীবিকা (Primary Occupation) বলা হয়। দ্বিতীয়টি হইতেছে মাধ্যমিক উপজীবিকা (Secondary Occupation) এবং তৃতীয়টি হইতেছে কারণিক উপজীবিকা (Tertiary Occupation)। অনগ্রসর দেশগুলিতে

উপজীবিকা বণ্টনে প্রাথমিক উপজীবিকার প্রাধান্য দেখা যায়

যেমন, ভারতের শিল্পোন্নয়ন বেশী না হইলে পাট-শিল্প বিশেষ উন্নত হইয়াছে। কৃষি-ক্ষেত্রের তুলনায় শিল্পক্ষেত্রেও উন্নতি খুব কম হওয়ার কারণ শিল্পগুলির আর্থিক দুরবস্থা, কাঁচা মালের অভাব, সাংগঠনিক ত্রুটি, শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার অভাব ইত্যাদি। তাহা ছাড়া, কৃষিক্ষেত্রের কাঠামোও খুব উন্নত হয়। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির অভাব, শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতার অভাব, গ্রামাঞ্চলে বাড়তি শ্রমশক্তির দরুন প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা, অর্থের অভাব, ক্ষেতের ক্ষুদ্র আয়তন ইত্যাদি কারণে কৃষিক্ষেত্রের কাঠামোও বিশেষ উন্নত হয় নাই।

দ্বিতীয়ত, অনগ্রসর দেশগুলিতে অর্থ নৈতিক কাঠামোয় আমরা দুইটি বিশেষ অংশ দেখিতে পাই। একটি হইতেছে বড় বড় শহরের অপেক্ষাকৃত উন্নত অর্থ নৈতিক কাঠামো—যেখানে ভাল ভাল ব্যাংক, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বহু যৌথ কোম্পানী এবং বিদেশী কোম্পানী দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। অপর অংশ হইতেছে গ্রামাঞ্চলে—যেখানে দেশের অধিকাংশ লোক কোন রকমে জীবনধারণ করিতে প্রাণান্ত হয়। এই অঞ্চলকে "Subsistence Sector" বলা হয়। এই অঞ্চলের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় লোকে কোন রকমে জীবনধারণ করে মাত্র। গ্রাম-বাসীদের যাহা আয় তাহাতে তাহাদের ভরণপোষণের সমুদয় ব্যয় নির্বাহ হয় না।

অর্থনৈতিক কাঠামোর দুইটি অংশ—একটি অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং অপরটি একেবারে অবনত

তৃতীয়ত, অনুন্নত অথবা অনগ্রসর দেশে মূলধন-সৃষ্টির হার (Rate of capital formation) অত্যন্ত অল্প। মূলধনের যোগান নির্ভর করে সঞ্চয়ের ক্ষমতা এবং সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর। উভয়ই আয়ের উপর নির্ভরশীল। অনুন্নত দেশে জাতীয় আয় অত্যন্ত অল্প বলিয়া লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতা অত্যন্ত অল্প। দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট দেশে সঞ্চয়ের ইচ্ছাও লোকের অল্প থাকে। তাহা ছাড়া, জাতীয় আয় এই দেশগুলিতে সমভাবে বণ্টিত হয় না বলিয়া মুষ্টিমেয় জনসাধারণ, যাহাদের হাতে জাতীয় আয় কেন্দ্রীভূত থাকে, সঞ্চয়-বৃদ্ধির কাজে ভূমিকা গ্রহণ করে না। স্বল্প সঞ্চয়ের পরিমাণ অনগ্রসর দেশগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মূলধন সৃষ্টির হার খুবই অল্প

চতুর্থত, অনগ্রসর দেশগুলিতে গ্রামাঞ্চলে আমরা এক ধরনের বেকার সমস্যা দেখিতে পাই, ইহাকে প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থা (Disguised unemploymen[illegible] বলে। ক্ষুদ্র জমিতে যতজন লোকের চাষ করা উচিত, জনসংখ্যার চাপে তাহা অ[illegible] বেশী লোক চাষ করে বলিয়া অতিরিক্ত শ্রমিকদের কাজ অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। অথচ তাহাদের যদি কৃষিক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিয়া শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ করা যায়, তবে কৃষির উৎপাদন কমিবে না, অথচ শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়িবে। এই অতিরিক্ত শ্রমিকগণও এক ধরনের বেকার; তাহারা বেকার ঠিক কাজের অভাবে নহে; কারণ কাজে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও শুধু তাহাদের কাজ অনাবশ্যক বলিয়াই তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে বেকার হিসাবে পরিগণিত হয়। এই প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থা ছাড়াও অনগ্রসর দেশে আমরা আর এক ধরনের অবস্থা দেখিতে পাই, ইহাকে ঋতুগত বেকার অবস্থা (Seasonal Unemployment) বলা হয়। কৃষকগণ

প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা

বৎসরের সব সময় কাজে লিপ্ত থাকে না, জমি হইতে একটি ফসল উঠাইবার পর অন্য একটি ফসল না হওয়া পর্যন্ত তাহারা কর্মহীন হইয়া বসিয়া থাকে; অথচ এমন কোন পার্শ্ববর্তী বা পরিপূরক কাজের ব্যবস্থা থাকে না যাহাতে তাহারা কাজ পাইতে পারে। তাহাদের এইভাবে বসিয়া থাকাকে ঋতুগত বেকার অবস্থা বলা হয়। তাহা ছাড়া, অনগ্রসর দেশে সংগঠনজনিত বেকার অবস্থা (Structural Unemployment), সংঘাতজনিত বেকার অবস্থা (Frictional Unemployment), কলাকৌশলের পরিবর্তনজনিত বেকার অবস্থা (Technological Unemployment) দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋতুগত বেকার অবস্থ

পঞ্চমত, অনগ্রসর দেশের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে শ্রমিকদের কারিগরি শিক্ষা-কেন্দ্রের বা কারিগরি বিদ্যালয়ের অভাবহেতু অনগ্রসর দেশের শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞানও অল্প থাকে। তাহা ছাড়া, কারিগরি বিশেষজ্ঞেরও বিশেষ অভাব অনগ্রসর দেশে দেখা যায়। শুধু যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করিলেই অনগ্রসর দেশকে উন্নত করা যায় না; সেই যন্ত্রপাতিগুলি যাহাতে শ্রমিকগণ ঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারে সেইজন্য তাহাদের কারিগরি কর্মকুশলতা বাড়ানো দরকার।

শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞানের অভাব

ষষ্ঠত, অনগ্রসর দেশগুলিতে এখনও চিরাচরিত উৎপাদন-পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থা চালিত হয়। অনুন্নত সেচ-ব্যবস্থা ও নিকৃষ্ট ধরনের সার ও বীজের সাহায্যে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করা হয় বলিয়া এই দেশগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণও অত্যন্ত অল্প।

অনুন্নত সেচ-অবস্থা এবং উৎপাদন পদ্ধতি

সপ্তমত, ভারতবর্ষে সাধারণ লোকের আয়ের অধিকাংশই খাদ্যশস্য-ক্রয়ে ব্যয়িত হয়। অন্যান্য অনগ্রসর দেশেও জাতীয় আয়ের অধিকাংশ ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ে খরচ করা হয়।

ভোগ-সামগ্রী জনিত ব্যয়ের আধিক্য

অষ্টমত, অনগ্রসর দেশগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই দেশগুলি হইতে সস্তা দরে বিভিন্ন কাঁচা-মাল বিদেশে চলিয়া যায় এবং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় ভোগ-সামগ্রী এই দেশে আসে। ইহাতে বাণিজ্যের অবস্থা প্রায়ই প্রতিকূল থাকে।

বৈদেশিক বাণিজ্যাবস্থা প্রায়ই প্রতিকূল থাকে

সর্বশেষে, অনগ্রসর দেশগুলিতে জনসাধারণের উপজীবিকার মধ্যেও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। জনসাধারণের উপজীবিকা সাধারণত তিন প্রকার; যথা কৃষিক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র এবং কারণিক অথবা শাসন-সংক্রান্ত (clerical or administrative)। প্রথমটিকে প্রাথমিক উপজীবিকা (Primary Occupation) বলা হয়। দ্বিতীয়টি হইতেছে মাধ্যমিক উপজীবিকা (Secondary Occupation) এবং তৃতীয়টি হইতেছে কারণিক উপজীবিকা (Tertiary Occupation)। অনগ্রসর দেশগুলিতে

উপজীবিকা বণ্টনে প্রাথমিক উপজীবিকার প্রাধান্য দেখা যায়

জনসাধারণের অধিকাংশই প্রাথমিক উপজীবিকার কাজ গ্রহণ করে। দেশে যতই অর্থ নৈতিক উন্নয়ন হয়, ততই শিল্পক্ষেত্রে অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে লোক বেশী করিয়া কাজ গ্রহণ করে।

অর্থ নৈতিক উন্নয়নের অর্থ

অনগ্রসর দেশে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপায় (Requirements for economic development of an underdeveloped country)—অর্থ নৈতিক উন্নয়ন বলিতে বোঝায় মূলধন গঠনের সুউচ্চহার (high rate of capital formation) এবং এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেশী হয়। ইহার ফলে দেশের প্রকৃত আয় (Real income) জনপ্রতি আয়ও বাড়িয়া যায় এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়। সেই সঙ্গে দেশে কর্মসংস্থানেরও ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়।

জাতীয় আয় বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ

অনগ্রসর দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রথমেই জাতীয় আয় বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। জাতীয় আয় বাড়াইতে হইলে দেশের শিল্পগুলিকে উন্নত করিতে হইবে। সুতরাং অনগ্রসর দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের প্রধান উপায় হইল দেশের দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পিত কর্মসূচী তৈয়ার করা। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন করিবার কর্মসূচী ভারতে গৃহীত হইয়াছে।

সঞ্চয়ের সৃষ্টি, সঞ্চয়ের একত্রীকরণ, সঞ্চয়ের বিনিয়োগ

ভারতের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় একদিকে মূলধন-প্রধান শিল্পগুলির উন্নয়ন এবং অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পগুলির উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু যাহাতে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হইতে পারে, সেজন্য শিল্প-শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতা বাড়াইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অধিক সংখ্যক কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত এবং বিদেশী কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। তাহা ছাড়া, দ্রুত শিল্পোন্নয়নের অর্থ হইল বেশী করিয়া মূলধন সৃষ্টির ব্যবস্থা করা। মূলধন-সৃষ্টি নির্ভর করে, (১) সঞ্চয়ের সৃষ্টি, (২) সঞ্চিত আর্থিক সম্পদের একত্রীকরণ বা সংহতিকরণ (Mobilisation of savings) এবং (৩) সঞ্চয়ের উপযুক্ত বিনিয়োগের উপর।

বিদেশের সহিত কারিগরি সহযোগিতা

দ্বিতীয়ত, অনগ্রসর দেশগুলির অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশী সাহায্য বা বিশ্ব-ব্যাংক (World Bank) প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে বিদেশী মূলধন গ্রহণে অনগ্রসর দেশের জনসাধারণের অনিচ্ছা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। শুধু আর্থিক সাহায্যই নহে, বিদেশ হইতে কারিগরি সহযোগিতাও (Technical co-operation) লাভ করা যাইতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে ভারত বিভিন্ন দেশের সহিত কারিগরি সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে।

তৃতীয়ত, অনগ্রসর দেশগুলির অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না

যদি বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত না হয়। প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা এবং ঋতুগত বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য পার্শ্ববর্তী উপজীবিকা হিসাবে কুটির ও গ্রামীণ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে উন্নত করা যাইতে পারে। প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থার মধ্যে মূলত কিছু পরিমাণ সঞ্চয় (Potential saving) নিহিত থাকে। যদি এই সমস্যার সমাধান করা যায়, তবে সঞ্চয়-সৃষ্টির কাজ অনেক পরিমাণে সফল হয়। ভারতে শ্রম-প্রধান ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পগুলি উন্নত হইলে কিছু পরিমাণে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে। তাহা ছাড়া, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ কাজের মাধ্যমেও গ্রামীণ বেকার সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা চলিতেছে।

বেকার সমস্যার সমাধান

অর্থনৈতিক উন্নয়নের গোড়ার কথা হইতেছে জনপ্রিয় জাতীয় আয় বাড়ানো। এই উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন জাতীয় আয় বাড়াইতে হইবে, অপরদিকে সেই প্রকারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাইতে হইবে। উপরের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি উৎপাদন-বৃদ্ধির সমস্যা মূলত মূলধন-সৃষ্টির সমস্যা। মূলধন-সৃষ্টি প্রধানত নির্ভর করে সঞ্চয়ের সৃষ্টি, সঞ্চয় সংগ্রহকরণ বা একত্রীকরণ এবং সঞ্চয়ের বিনিয়োগের উপর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের হার বাড়াইতে হইবে; সঞ্চয় বাড়াইলেই বিনিয়োগের হার বাড়ানো সম্ভবপর। সেইজন্য অধ্যাপক লুইসের (Prof. Lewis) মতে অনগ্রসর দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল সমস্যা হইতেছে কিভাবে সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫ অথবা ৬ শতাংশ হইতে ১৫ অথবা ২০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো যায়। এই সঙ্গে আমরা ইহাও বলিতে পারি যে অনগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা হইল কিভাবে দেশকে শতকরা ৮০ ভাগ কৃষিজীবী হইতে শতকরা ১৫ ভাগ কৃষিজীবীতে রূপান্তরিত করা যায়। সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িলে ইহার সদ্ব্যবহার বা উপযুক্ত বিনিয়োগের প্রশ্ন উঠে। এই উদ্দেশ্যে অনগ্রসর দেশগুলির বিদেশী কারিগরি বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় মূলধন বা যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হয়। এইজন্য অনগ্রসর দেশগুলির সর্বদাই কিছু বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতে হয়। বিদেশী মুদ্রা অর্জনের উপায় হইতেছে দেশের যে সমস্ত জিনিসের জন্য বিদেশে ভাল চাহিদা আছে, সেগুলির উৎপাদন বাড়াইয়া রপ্তানির ব্যবস্থা করা। তাহা ছাড়া, বৈদেশিক ঋণের সাহায্যেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো যাইতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল সমস্যা

ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় যথেষ্ট পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায়ও প্রাথমিক পর্যায়ে ৮০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছিল। পরে অবশ্য বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রাথমিক ভাবে ২২০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ প্রায় ৩,২০০ কোটি টাকার উপর হইয়াছিল।

বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় Aid India Club হইতে ৫,৪৭১ মিলিয়ন ডলার ঋণ পাওয়া গিয়াছিল। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় ২৫১৪ কোটি টাকার পরিমাণ নীট বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

পরিবার পরিকল্পনা

কিন্তু গড় উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ ফলপ্রসূ নাও হইতে পারে যদি সেই সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রিত করা না হয়। ভারতে পরিকল্পনা কমিশন পরিবার পরিকল্পনার (Family Planning) নীতি কার্যকর করিবার জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করিয়াছেন। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো যায়, তবে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জনপ্রতি আয় বাড়িয়া যাইবে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ও সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে।

সমাজসেবার ব্যবস্থা কল্যাণ-রাষ্ট্রের গঠন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলিতে শুধু গুরুভার শিল্পগুলির উন্নয়ন বা যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা স্থাপন বুঝায় না। সমাজসেবার ব্যবস্থা না থাকিলে এবং সামাজিক কল্যাণ (Social Welfare) বৃদ্ধির প্রচেষ্টা না থাকিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিরর্থক হইয়া পড়ে। দেশে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র (Welfare State) প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে জাতীয় আয়ের অসম বণ্টন কমাইতে হইবে, উপযুক্ত শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ ও জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া জাতীয় উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের নাগরিক জীবনের সমুদয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে হইবে। এই ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হইলে সামাজিক মূলধনের (Social Capital) পরিমাণ বাড়িবে এবং একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইবে। এই কাজে সরকারী হস্তক্ষেপের খুবই প্রয়োজন এবং সেইজন্যই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আর্থিক চাহিদা (Financial requirements) মিটাইবার সময় সরকারকে জনসাধারণের উপর কর ধার্য করিতে হয় অথবা জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে হয়। তাহা ছাড়া, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে নূতন টাকা ছাপাইয়াও এই কাজে অগ্রণী হইতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থান (Financing of Economic Development)—অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রধান প্রয়োজন হইতেছে আর্থিক সঙ্গতির। দেশে যদি মূলধন-সৃষ্টির হার না বাড়ে এবং যদি উন্নয়নমূলক কাজগুলিকে সফল করিবার মত প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ না করা যায়, তবে উন্নয়নমূলক কাজগুলি সফল হয় না। সুতরাং যে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থার উপর। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই টাকা কোথা হইতে আসিবে?

কর ধার্য

প্রথমত, সরকার জনগণের উপর বেশী করিয়া কর ধার্য করিয়া রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইতে পারে এবং দেশরক্ষা ব্যতীত অন্যান্য খাতে ব্যয়-সংকোচন নীতি অবলম্বন করিতে পারে। ইহাতে যে রাজস্ব বৃদ্ধি হয় তাহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে লাগানো যাইতে পারে। কর ব্যবস্থা

অন্যান্য উপায়েও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হয়। সঞ্চয় বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ, অবাঞ্ছিত ভোগ নিয়ন্ত্রণ এবং আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইয়া কর ব্যবস্থা অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করে।

সরকারের ঋণ সংগ্রহ

দ্বিতীয়ত, সরকার দেশের কতিপয় আভ্যন্তরীণ উৎস হইতে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে। সাধারণত, ব্যাংকে অথবা জনসাধারণের নিকট হইতে এই ঋণ সংগ্রহ করা হয়।

ঘাটতি অর্থসংস্থান

তৃতীয়ত, বাজেটে ঘাটতি করিয়া অর্থাৎ সরকারের আয় অপেক্ষা খরচের পরিমাণ বেশী বাড়াইয়া দিয়া পরিকল্পনার আর্থিক সঙ্গতি বাড়ানো যাইতে পারে। বাজেটে ঘাটতি দূর করিবার জন্য অনেক নূতন কাগজী নোট ছাপানো হয়; কেন্দ্রীয় ব্যাংক নূতন কাগজী নোট ছাপাইয়া সরকারকে ধার হিসাবে দেয়। এই ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি হইল এই যে মুদ্রার সরবরাহ বাড়িলে ইহা জনগণের ক্রয়শক্তি ও চাহিদা বাড়াইয়া দেয়; ইহার ফলে দেশের উৎপাদনও বাড়িয়া যায়। অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায় হইল মূলধনের স্বল্পতা এবং শ্রমিকদের কর্মকুশলতার অভাব। প্রকৃতপক্ষে অনগ্রসর দেশগুলিতে নূতন কাগজী নোট ছাপাইলে কিছু-না-কিছু মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়, ইহার ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায়। ভারতের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ৯৪৮ কোটি টাকার ঘাটতি অর্থসংস্থান করা হইয়াছিল এবং তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ১১৫০ কোটি টাকা (যদিও বরাদ্দ ছিল ৫৫০ কোটি টাকা) ঘাটতি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অবশ্য চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় আপাতত ঘাটতি অর্থসংস্থানের কোন কার্যসূচী গৃহীত হয় নাই।

বৈদেশিক সাহায্য

চতুর্থত, বিদেশ হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিয়াও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির অর্থসংস্থান করা হয়। ভারতের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায়ও ২,২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করার কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছিল; প্রকৃতপক্ষে ৩,২০০ কোটি টাকার বেশী বৈদেশিক সাহায্য গৃহীত হইয়াছিল।

উপরে বর্ণিত চারিটি উৎস ছাড়াও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে হইলে অন্যভাবে চেষ্টা করা যাইতে পারে। দেশের সমুদয় সঞ্চিত অর্থকে একত্রীকরণ করিয়া ইহাকে বিনিয়োগ করা উচিত। অনগ্রসর দেশের গ্রামাঞ্চলে যে প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা আছে তাহার সমাধান করিতে পারিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কিছু বাড়িবে। তাহা ছাড়া, রেলওয়ে হইতে উদ্বৃত্ত, সরকারী কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা, সরকারী কারবারের উদ্বৃত্ত ইত্যাদির সংহতি করিয়াও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের আর্থিক সংস্থান করা যায়।

ভারতের অর্থ নৈতিক অনগ্রসরতার স্বরূপ (Nature of the economic underdevelopment of the Indian Economy)—ভারতকে বর্তমানে আমরা একেবারে অনগ্রসর (Underdeveloped) দেশরূপে অভিহিত না করিয়া উন্নতিশীল (developing) দেশ বলিতে পারি। উন্নতিশীল দেশের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আমরা কিছু

পরিমাণে এখন ভারতীয় অর্থনীতিতে দেখিতে পাই। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই বেশী। কিন্তু, বর্তমানে কিছু পরিমাণে মূলধন সৃষ্টির (capital formation) কাজ ভারতে আরম্ভ হইয়াছে। অনগ্রসর দেশে আমরা জনসম্পদ এবং অর্থ নৈতিক সম্পদের তুলনায় মূলধন-সৃষ্টির হার অল্প দেখিতে পাই। ভারতের প্রকৃত অর্থ নৈতিক উন্নয়ন হইতে যদিও অনেক দেরী, তবুও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রস্তুত হইবার পর হইতেই দেশ শিল্পায়নের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে।

উন্নতিশীল দেশের বৈশিষ্ট্য ও ভারত

কিন্তু, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে ধীর পদক্ষেপে ভারত অগ্রসর হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে ভারত এখনও মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। এখনও ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৬৮ জনেরও বেশী জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। যদিও ভারত কৃষিপ্রধান দেশ তবুও আমরা দেখিতে পাই যে কৃষির অবস্থা এই দেশে এখনও অনুন্নত। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির অভাব, শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতার অভাব, গ্রামাঞ্চলে বাড়তি শ্রমশক্তির দরুন প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা, অর্থের অভাব, কৃষি-জোতের ক্ষুদ্র আয়তন ইত্যাদি কারণে কৃষিক্ষেত্রের কাঠামোও বিশেষ উন্নত হয় নাই। ভারতে এখনও চিরাচরিত উৎপাদন পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থা চালিত হয়। অনুন্নত সেচ ব্যবস্থা ও নিকৃষ্ট ধরনের বীজের সাহায্যে চাষ আবাদের ব্যবস্থা করা হয় বলিয়া এই দেশগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প।

ভারত মূলত কৃষিপ্রধান

অনুন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা

দ্বিতীয়ত, অনগ্রসর দেশে আমরা গ্রামীণ বেকার-সমস্যা (Rural Unemployment) এবং পূর্ণনিয়োগের অভাব (Unemployment) দেখিতে পাই। উন্নতিশীল দেশ পূর্ণনিয়োগ অর্জন করিবার জন্য অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে চেষ্টা করে। ভারতেও আমরা দেখিতে পাই গ্রামীণ বেকার সমস্যা এবং পূর্ণ নিয়োগের অভাব। ভারতেও গৃহীত হইয়াছে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের একটি পরিকল্পিত কার্যসূচী।

বেকার সমস্যা

অনগ্রসর দেশে আমরা অর্থ নৈতিক কাঠামোর দুইটি অংশ দেখিতে পাই। একটি হইতেছে Subsistence sector—যেখানে দেশের অধিকাংশ লোক কোনরকমে জীবন ধারণ করিতে পারে। অপরটি হইতেছে বড় বড় শহরের অপেক্ষাকৃত উন্নত অর্থ নৈতিক কাঠামো—যেখানে ব্যাংকিং, ইনসিওরেন্স ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থ নৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। ভারতেও আমরা অনুরূপ দুইটি অর্থ নৈতিক কাঠামো দেখিতে পাই।

তৃতীয়ত, ভারতর অর্থ নৈতিক উন্নয়নের অন্যতম সমস্যা হইতেছে শ্রমিকদের উপযুক্ত পরিমাণ কর্মকুশলতা (technical know-how) বাড়ানো এবং নৈপুণ্যসৃষ্টি (skill-formation) করা। নৈপুণ্যসৃষ্টি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান অঙ্গ। যদি শ্রমিকদের নৈপুণ্যের অভাব থাকে তাহাতে মূলধন সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হইতে পারে। কিন্তু, প্রধান সমস্যা হইতেছে, আমাদের দেশের মূলধন-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রতি আয়

(per capita income) বাড়ানো। এই সমস্যার সমাধানের অন্যতম উপায়, উন্নয়নের গোড়ার দিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়িতে না দেওয়া। ভারতে পরিবার সীমিতায়নের (Family planning) কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছে যাহাতে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের গতি গোড়ার দিকেই ব্যাহত না হয়। উন্নতিশীল দেশগুলি সাধারণত কৃষি-ব্যবস্থা হইতে শিল্পায়নের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হয়। ভারতে শতকরা প্রায় ৬৮ জনের বেশী কৃষিজীবী, সেইজন্য কৃষি-ব্যবস্থার উপর তৃতীয় পরিকল্পনায় অনেক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল ; কিন্তু শিল্পায়নের উপর বর্তমানে আরও বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। অর্থ নৈতিক অনগ্রসরতার নাগপাশ হইতে মুক্তিকামী ভারতীয় অর্থ নীতিতে আমরা একদিকে দেখিতে পাই গুরুভার এবং মূল শিল্পের (heavy and basic industries) উন্নতির প্রয়াস, অপরদিকে দেখিতে পাই ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পের উন্নতির প্রয়াস। প্রথমটি অপরিহার্য দ্রুত অর্থ-নৈতিক প্রগতির জন্য ; দ্বিতীয়টি অপরিহার্য বেকার সমস্যা দূর করিবার জন্য। প্রথমটি হইতেছে মূল-প্রধান (Capital-intensive) ; দ্বিতীয়টি হইতেছে শ্রম-প্রধান (Labour-intensive)।

শিল্পোন্নয়নের প্রয়াস

চতুর্থত, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই দেশ হইতে সস্তা দরে বিভিন্ন কাঁচামাল বিদেশে চলিয়া যায় এবং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় ভোগ-সামগ্রী, বিশেষত খাদ্য-সামগ্রী এবং যন্ত্রপাতি বেশী মাত্রায় এই দেশে আসে। ইহাতে বাণিজ্যের অবস্থা প্রায়ই প্রতিকূল থাকে।

কাঁচামাল রপ্তানি এবং যন্ত্রপাতি ও খাদ্য-সামগ্রীর আমদানি

পঞ্চমত, তিন প্রকারের উপজীবিকার মধ্যে ভারতে প্রাথমিক উপজীবিকার প্রাধান্য দেখা যায়। তিন প্রকার উপজীবিকা হইতেছে (১) কৃষিক্ষেত্র, (২) শিল্পক্ষেত্র (৩) ব্যাংক, ইন্সিওরেন্স, কারণিক অথবা শাসনকার্য সংক্রান্ত। প্রথমটিকে প্রাথমিক উপজীবিকা (Primary occupation), দ্বিতীয়টিকে মাধ্যমিক উপজীবিকা (Secondary occupation) এবং তৃতীয়টিকে কারণিক উপজীবিকা (Tertiary occupation) বলা হয়। ভারতে যে প্রাথমিক উপজীবিকার প্রাধান্য দেখা যায়, তাহাই অর্থ নৈতিক অনগ্রসরতা সূচিত করে।

প্রাথমিক উপজীবিকার প্রাধান্য

ষষ্ঠত, ভারতের জাতীয় আয় খুবই অল্প, সঞ্চয়ের হারও খুব অল্প। সুতরাং, মূলধন-সৃষ্টির হার (rate of capital formation) এই দেশে খুব অল্প। সেইজন্য অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতে জাতীয় আয় ও মূলধন-সৃষ্টির হার বাড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে। ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন-প্রচেষ্টা একটি নিজস্ব ধারায় চলিতেছে। তাহা হইতেছে, "গণতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা"র (democratic economic planning) সাহায্যে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করা। শুধু তাহাই নহে, ভারত বর্তমানে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism) প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার ভূমিকা

নীতি অনুযায়ী প্রগতির অর্থ—ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধি নয়, সামাজিক মুনাফা বৃদ্ধি। তাহা ছাড়া, মূলধন-সৃষ্টির হার ও জাতীয় আয় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গীণভাবে দেশকে একটি কল্যাণ-রাষ্ট্রে (Welfare State) পরিণত করাই এই নীতির বৈশিষ্ট্য।

সপ্তমত, অনগ্রসর দেশে জীবনযাত্রার মান বিশেষ উন্নত থাকে না; কিন্তু অগ্রসর-মান দেশগুলি চেষ্টা করে জীবনযাত্রার মান উন্নত করিয়া দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করিতে। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলেই উৎপাদনী শক্তি (Productive capacity) বাড়ে এবং তাহাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হয়। জীবনযাত্রার মান উন্নত নহে বলিয়াই ভারতীয় শ্রমিকদের কর্মকুশলতার বিশেষ অভাব। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিয়া সমাজে প্রত্যেকেরই সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠা করা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিরও প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ভারত ইহা রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

শ্রমিকের উৎপাদনী শক্তির স্বল্পতা

সর্বশেষে, ভারতের নিজস্ব আর্থিক সম্পদের স্বল্পতা থাকার দরুন তাহাকে অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। তবে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বাড়াইবার জন্য দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের চেষ্টা ভারত করিতেছে। মূলধন-সৃষ্টির সমস্যা মূলত সঞ্চয় বৃদ্ধির (growth of savings) সমস্যা। সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য কিছু-না-কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা হইতেছে ভোগ হ্রাস (restriction of consumption) করা। ভারতেও আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধির চেষ্টা পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। বিশেষত ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে তাহার কিছুটা সমাধান করিবার জন্য ভারতের সঞ্চয় বৃদ্ধি করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হইতেছে।

বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা

অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজন স্বীকৃত। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপযোগিতা স্বীকার করে না। ধনতন্ত্রে অর্থনৈতিক প্রগতি নির্ভর করে বেসরকারী উদ্যোগের উপর। কিন্তু, ভারতে মিশ্র অর্থনীতির (Mixed Economy) মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা চলিতেছে। এই মিশ্র অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যেই "গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার" নীতি ভারত গ্রহণ করিয়াছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

Exercise

1. What do you mean by an underdeveloped economy? In what sense is India an underdeveloped economy? (H. S. 1962)

(অনগ্রসর দেশ বলিতে কি বুঝায়? কি অর্থে ভারত একটি অনগ্রসর দেশ?) (১৪৬-১৫০ পৃষ্ঠা।)

[**ইঙ্গিত:** প্রথমে অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর এবং বল যে ভারতে এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটিই বর্তমান। যেমন ভারতের জাতীয় আয় ও জনপ্রতি আয় অল্প, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও মৃত্যুর হার বেশী, শিল্পোন্নয়নের অভাব কৃষিক্ষেত্রের উপর অত্যধিক চাপ, শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতার অভাব', বেকার সমস্যা ইত্যাদি দেখা যায়।]

2. What are the principal features of an underdeveloped economy? Illustrate your answer with special reference to India. (H. S. 1960, 1962)

(ভারতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া একটি অনগ্রসর দেশের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।) (১৪৬-৫০ পৃষ্ঠা)

3. Write a note on the nature of economic underdevelopment of India.

(ভারতের অর্থ নৈতিক অনগ্রসরতার স্বরূপের উপর একটি টীকা লিখ।) (১৫৩-১৫৬ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the fundamental problems of economic development of an underdeveloped economy.

(একটি অনগ্রসর দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের মূল সমস্যা আলোচনা কর।) (১৪১-১৫০ পৃষ্ঠা)

5. Write a brief essay on the requirements for economic development of an underdeveloped economy.

(একটি অনগ্রসর দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় উপাদান সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখ।) (১৫০-৫২ পৃষ্ঠা)

6. What is meant by "economic development"? State the principal requirements for development of an underdeveloped country like India. (H. S. 1961)

(অর্থ নৈতিক উন্নয়ন বলিতে কি বুঝ? অনগ্রসর দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি বর্ণনা কর।) (১৫০-৫২ পৃষ্ঠা)

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সহিত জড়িত বিভিন্ন সমস্যা

(Different Problems Connected with Economic Planning in India)

ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইতেছে খাদ্য-সমস্যা। তাহা ছাড়া রহিয়াছে বেকার-সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা সংকট। এই সমস্যাগুলির সহিত প্রাথমিক পরিচিতির পর আমরা পরিকল্পনাগুলি অনুশীলন করিব।

খাদ্য-সমস্যা (Food Problem)—খাদ্য-সমস্যা আমাদের জাতীয় সমস্যাগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান। এই সমস্যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। খাদ্য-

শস্যের দাম দিনের পর দিন যেভাবে বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে আমাদের অর্থ নৈতিক জীবন খুবই সংকটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন—আমাদের দেশে খাদ্য-সংকট বর্তমানে তীব্ররূপ ধারণ করিয়াছে। তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনা খাদ্য-সমস্যার কোনও সমাধান করিতে পারে নাই; এবং তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষ বৎসরে খাদ্য-সংকট সর্বাপেক্ষা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। বিগত তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কিরূপ বাড়িয়াছে তাহা নিম্নের তালিকায়* দেখানো হইল:—

সাল	**খাদ্যশস্যের উৎপাদন** (মিলিয়ন টন)
১৯৫০-৫১	৫৪·৯
১৯৫৫-৫৬	৬৮·৮
১৯৫৯-৬১	৮১·০
১৯৬১-৬২	৮১·০
১৯৬২-৬৩	৭৮·৪
১৯৬৩-৬৪	৮০·২
১৯৬৪-৬৫	৮৯·০
১৯৬৫-৬৬	৭২·৩
১৯৬৬-৬৭	৭৬·০
১৯৬৭-৬৮	৯৫·০
১৯৬৮-৬৯	৯৪·০
১৯৬৯-৭০	১০০·০ (অনুমিত)

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন লক্ষ্য ছাড়াইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষ বৎসরেও খাদ্যশস্যের উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন খুবই কমিয়া যায়। তৃতীয় পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে খাদ্যশস্যের রেকর্ড-উৎপাদন হইলেও পঞ্চম বৎসরে ইহার পরিণাম শোচনীয়ভাবে কমিয়া গিয়াছে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সামগ্রিকভাবেই কৃষির উৎপাদন কম হইয়াছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৯৫ মিলিয়ন টন হইয়াছিল। ১৯৬৮-৬৯ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হইয়াছে ৯৪ মিলিয়ন টন। ১৯৬৯-৭০ সালে উৎপাদন ১০০ মিলিয়ন টন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহা হইতেছে ভারতের সর্বকালীন রেকর্ড উৎপাদন। গত তিন বৎসর যাবৎ ভারতে সবুজ বিপ্লবের (Green Revolution) সূচনা হইয়াছে।

খাদ্যসমস্যার দুইটি দিক আছে; একটি হইতেছে খাদ্যশস্যের ঘাটতি এবং অপরটি হইতেছে খাদ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি। উভয় দিক হইতেই সমস্যার বিবেচনা করিতে হইবে।

খাদ্য-সমস্যার কারণ—তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সামগ্রিকভাবে যে কৃষি উৎপাদন খুব কম হইয়াছে এবং এইজন্য যে সাম্প্রতিক খাদ্যসংকট খুব তীব্র আকার

* Reports on Currency and Finance, 1965-66, 1966-67, 1967-68.

ধারণ করিয়াছে. সেই সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় প্রধানত তিনটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, মন্দ আবহাওয়া, প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং উন্নতধরনের বীজ, সার ও কৃষি-যন্ত্রপাতি বন্টনের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা।

খাদ্যশস্যের স্বল্পতার কারণ (Causes of the shortage of food)

আমাদের খাদ্য-সমস্যার মূল কারণ হইল, যে পরিমাণে দেশের জনসংখ্যা বাড়িতেছে, সেই পরিমাণে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়িতেছে না। ১৯৪১-৫১ দশকে ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছিল প্রায় শতকরা ১৩.৪ ভাগ, কিন্তু খাদ্যোৎপাদন বাড়িয়াছে মাত্র শতকরা ৩.২ ভাগ। ১৯৫১-৬১ দশকেও জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেক কম বাড়িয়াছে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় শেষ বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশাপ্রদ হয় নাই।

দ্বিতীয়ত, দেশ-বিভাগের দরুন আমাদের খাদ্য-সমস্যা আরও প্রকট হইয়াছে। কারণ, অধিকাংশ উদ্বৃত্ত শস্য-উৎপাদনকারী অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, উদ্বাস্তু সমস্যা খাদ্য-সমস্যাকে তীব্রতর করিয়াছে। তৃতীয়ত, সাম্প্রতিক খাদ্যসংকটের অন্যতম কারণ, খাদ্য-সামগ্রী মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক মজুত করিয়া ফাটকাবাজি করিয়াছে। চতুর্থত. দেশের কোন কোন স্থানে অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি হওয়ায় খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি সর্বত্র সমানভাবে হয় নাই। ইদানীং কয়েক বৎসর যাবৎ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেকক্ষেত্রেই খাদ্যসংকট সৃষ্টি করিয়াছে। পঞ্চমত, আমাদের দেশে গত দশ বৎসরে মৃত্যুহার কিছু কমিয়াছে এবং জনসাধারণের গড়পড়তা আয়ু ৩২ হইতে ৪২ বৎসর হইয়াছে। অথচ সেই পরিমাণে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে নাই। তাহাতে চাহিদা অনুযায়ী যোগানের কমতি হইয়াছে। ষষ্ঠত, দেশ শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকগণ পূর্বে যেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন করিত, এখন সেখানে শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করে। ইহাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেক কমিয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে ভারত কাঁচাপাটের উৎপাদনে ক্রমেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার অন্যতম কারণ, পূর্বে যে সকল জমিতে শুধু খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইত, ইহার অনেকগুলিতেই বর্তমানে এই বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদিত হয়।

খাদ্য-সামগ্রীর সাম্প্রতিক দাম বাড়িবার কারণ (Causes of the Recent rise in Prices of Foodgrains)—খাদ্যশস্যের সাম্প্রতিক দাম বাড়িয়া যাইবার কারণগুলি নিম্নে আলোচিত হইল :—

(১) বন্যা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসলের অনেক ক্ষতি হইয়াছে এবং তাহাতে খাদ্য-সামগ্রীর দাম বাড়িয়াছে।

(২) ১৯৫৪-৫৫ সাল হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্যের ঘাটতি ক্রমেই বাড়িতেছে। যে হারে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িতেছে, খাদ্যশস্যের জন্য চাহিদা তাহা অপেক্ষা বেশী হারে বাড়িতেছে। ভারতের জনসংখ্যা যে হারে বাড়িতেছে, খাদ্যসরবরাহ সেই হারে বাড়িতেছে না, ইহার ফলে খাদ্য-সামগ্রীর দাম বাড়িয়া যাইতেছে।

(৩) উন্নতিশীল অর্থনীতিতে পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য উন্নয়নমূলক খরচের পরিমাণ বাড়িয়াছে। তাহাতে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়াছে এবং জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বাড়িয়াছে। কিন্তু ক্রয়শক্তির বৃদ্ধিহেতু জনসাধারণের ভোগ সামগ্রীর জন্য চাহিদা যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, সেই সামগ্রীগুলির যোগান তত বাড়ে নাই। তাহাতে সাধারণ ভোগ-সামগ্রীর মূল্য বাড়িয়াছে।

(৪) ফাটকা কারবারী, আড়তদার এবং চোরাকারবারীগণ কর্তৃক খাদ্য-সামগ্রী সঞ্চিত করিয়া রাখাই খাদ্য-সামগ্রীর সাম্প্রতিক দাম বাড়িবার প্রধান কারণ। আড়তদার এবং ফাটকা কারবারীগণের ক্রিয়াকলাপ আরও উৎসাহ পাইয়াছে বাণিজ্য-মূলক ব্যাংকগুলি কর্তৃক খাদ্য-সামগ্রীর উপর ঋণ দাদন দেওয়ার ফলে। ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ খাদ্য-সামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দিয়াছে।

(৫) সীমান্তবর্তী এলাকায় উপযুক্ত কড়া-পাহারার ব্যবস্থা না থাকায় অনেক চোরাকারবারী খাদ্য-সামগ্রী পূর্ববঙ্গে বে-আইনীভাবে চালান দিয়াছে। ইহাতেও খাদ্য-সামগ্রীর কৃত্রিম অভাব সৃষ্ট হইয়াছে।

(৬) কোন কোন দেশে মুদ্রাস্ফীতির দরুন বিদেশ হইতে আমদানিকৃত খাদ্য-সামগ্রীর জন্য ভারতসরকারকে বেশী দাম দিতে হইতেছে এবং ইহাতেও দেশের ভিতরে খাদ্য-সামগ্রীর দাম বাড়িয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, খাদ্য-সামগ্রীর মাধ্যমে বিদেশ হইতে ভারতসরকার যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য প্রদেয় সুদের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় সরকার দেশের ভিতর রেশনিং-এর অন্তর্ভুক্ত খাদ্য-সামগ্রীর দাম বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন।

(৭) উন্নত ধরনের বীজ-সরবরাহে, সার-সরবরাহে এবং কীটঘ্ন ঔষধ ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যান্য দ্রব্যাদি বণ্টন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ১৯৬৫-৬৬ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কম হইবার অন্যতম কারণ। ইহাতেও খাদ্য সামগ্রীর দাম বাড়িয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত কারণগুলি ছাড়াও সরকার উপযুক্তভাবে খাদ্যশস্য মজুত নিয়ামক ব্যবস্থা (Buffer-stock Scheme) চালু করিতে না পারায় খাদ্য-সামগ্রীর দাম বাড়িয়াছে। সীমান্ত এলাকায় ইতিপূর্বে অনেক ক্ষেত্রেই খাদ্যশস্যের চোরাচালান হইয়াছে।

সরকারের খাদ্যনীতি (Food Policy of the Government)—খাদ্যসমস্যার সমাধানের জন্য ভারতসরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় খাদ্যনীতি—প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা গৃহীত হইবার দুই বৎসর আগে সরকার স্থির করিয়াছিলেন যে, সর্বপ্রকার চেষ্টা দ্বারা খাদ্যশস্য উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করিয়া ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসের পর খাদ্যশস্য আমদানি বন্ধ করিয়া দিবেন। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে খাদ্য

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় খাদ্যনীতি

আমদানি বন্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই। অতঃপর সরকার ঠিক করেন ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সাধারণভা[illegible] আমদানি করা যাইবে। ঐ তারিখের পরে শুধুমাত্র তিন[illegible]ণে খাদ্য আমদানি করা যাইবে বলিয়া সরকার ঘোষণা করেন :—(ক) কেন্দ্রীয় রিজার্ভ

সৃষ্টি করিবার জন্য, (খ) গুরুতর বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য এবং (গ) নগদ শস্যের (cash crop) জমি পরিবর্তনের প্রয়োজনে। তাহা ছাড়া, অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য সরকার চেষ্টা করিতে থাকেন। এইজন্য অধিক জমিতে চাষ (extensive cultivation) এবং বর্তমান জমিগুলিতেই অধিকতর চাষ (intensive cultivation) করিবার পরিকল্পনা যাহাতে কৃষকগণ গ্রহণ করে, সেইজন্য সরকারের পক্ষ হইতে প্রচার কার্য চালানো হয়।

খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য ১৯৫১ সালে সরকার ত্রিবিধ কার্যসূচী প্রণয়ন করিয়াছিলেন, স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় সরকারের প্রস্তাব ছিল, (ক) উন্নতধরনের বীজ উৎপাদন এবং বণ্টন, (খ) জমিতে রাসায়নিক সার এবং কাঁচা সার, ব্যবহার (গ) চারা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা, (ঘ) বর্তমান জলসেচ-ব্যবস্থার আরও ব্যাপক ব্যবহার। মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনায় সরকারের প্রস্তাব ছিল বিশ্ব-ব্যাংকের (Word Bank) নিকট প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্যে আমেরিকা হইতে ৩৭২টি ভারী ট্র্যাক্টর আমদানি করিয়া পতিত জমি উদ্ধার করা এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় প্রস্তাব ছিল বিভিন্ন সেচ-পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া, বন্যা নিরোধ করিবার এবং আরও অধিক জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার প্রস্তাবকে বাস্তবে পরিণত করা। কোন পরিকল্পনাই প্রস্তাবিত সময়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা খাদ্যনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ—

(১) ভারতসরকার ১৯৫৭ সালে অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্য সংশোধনী আইন প্রণয়ন করিয়া খাদ্য-সামগ্রী লইয়া মজুতদারী ব্যবসায় এবং চোরাকারবার প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। (২) ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেটে ভারতসরকার ২৫ কোটি টাকা দিয়া Food Subsidy Fund গঠন করেন। (৩) বিভিন্ন রাজ্যসরকার খাদ্য-সামগ্রী যাহাতে ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করা যায়, সেজন্য অনেক ন্যায্যমূল্যের দোকান (Fair Price Shop) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। (৪) ১৯৪৭ সালে রিজার্ভ ব্যাংক বিভিন্ন বাণিজ্যমূলক ব্যাংককে খাদ্যশস্যের বিপক্ষে আর ঋণ প্রদান না করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। (৫) খাদ্য-সমস্যাকে দ্রুত আয়ত্তাধীন করিবার জন্য এবং আঞ্চলিকভাবে দেশের মোট চাহিদা মিটাইবার জন্য সরকার সমগ্র দেশকে কয়কটি অঞ্চলে (Zone) বিভক্ত করেন। আঞ্চলিক ভিত্তিতেই বিভিন্ন রাজ্যসরকার এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। (৬) ভারতসরকারকে আগামী আরও কয়েক বৎসর খাদ্য-সামগ্রী আমদানি করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ভারতসরকার আমেরিকার সহিত খাদ্যক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। (৭) সরকার ২ মিলিয়ন টন খাদ্য কেন্দ্রীয় রিজার্ভ রাখিয়া খাদ্যশস্য-মজুত-নিয়ামক ব্যবস্থা (Buffer-stock Scheme) চালু করিয়াছেন। খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য ১৯৫৭ সালে ভারতসরকার শ্রীঅশোক মেহ্‌তার সভাপতিত্বে একটি খাদ্য-অনুসন্ধান কমিটি (Foodgrains Enquiry

Committee) গঠন করেন। এই কমিটির অধিকাংশ সুপারিশগুলি অনুযায়ীই ভারতসরকারের বর্তমান খাদ্যনীতি অনুসৃত হইতেছে। (৮) ১৯৫৯ সালে ভারতসরকার খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের (State Trading in Foodgrains) প্রবর্তন করেন। (৯) খাদ্য সামগ্রী লইয়া ফাটকা কারবার বন্ধ করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া বিভিন্ন বাণিজ্যমূলক ব্যাংককে খাদ্য-সামগ্রীর উপর ঋণ প্রদান না করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় খাদ্যনীতির বৈশিষ্ট্য হইয়াছিল নিম্নরূপ— সরকার সমগ্র দেশে রেশনিং প্রথা চালু করিয়াছিলেন। শিল্পাঞ্চলে পূর্ণ রেশন এবং গ্রামাঞ্চলে ও ছোট ছোট শহরে অর্ধ-রেশনিং ব্যবস্থা (Modified Rationing) চালু করা হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে যে আন্তঃ-জেলা এবং আন্তঃ-থানা কর্ডনের প্রথা চালু করা হইয়াছিল, তাহাতে খাদ্যসমস্যার এবং খাদ্যশস্যের বর্ধিত দাম নিয়ন্ত্রণ করিবার সমস্যার সমাধান হয় নাই। তাহা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গে কৃষি-উৎপাদনের উপর "লেভি" (Levy) ধার্য করিবার নিয়ম চালু করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকার খাদ্যশস্যের সুষম বণ্টন করিতে সমর্থ হন নাই। খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা রাষ্ট্র করিতেছে।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভারতসরকারের খাদ্যনীতির বৈশিষ্ট্য হইতেছে নিম্নরূপ :—

(১) মূল্যাবনতি প্রতিরোধের জন্য খাদ্যশস্য ক্রয়; কৃষককে ন্যায্যমূল্য প্রদান করিয়া চাষে উৎসাহদানই হইবে ইহার উদ্দেশ্য; (২) পণ্যমূল্য-বৃদ্ধি প্রতিরোধ; (৩) রাজ্যে রাজ্যে পণ্যমূল্যের দামে অত্যধিক অসঙ্গতি প্রতিরোধ; (৪) প্রচুর গম ও চাউলের মজুত-ভাণ্ডার সৃষ্টি; (৫) খাদ্যব্যবসায়ীদের ফাটকাবাজি বন্ধ করিবার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন; (৬) বৃহদায়তন শহরে মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা; (৭) দেশের খাদ্যশস্যের চলাচলের উপর আরোপিত বাধানিষেধ ধীরে. ধীরে শ্লথ করা; উপরোক্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য খাদ্য-ব্যবসার উপর প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপ করা হইবে। আশা করা যায়, ইহাতে খাদ্যশস্যের মূল্যের স্থিতিসাধন করা সম্ভবপর হইবে। খাদ্যসমস্যার মোকাবিলা করিবার জন্য, খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য, খাদ্য শস্যের সর্বোচ্চ দাম নির্ধারিত করিবার জন্য এবং খাদ্যশস্যের সুষম বণ্টন করিবার জন্য ভারতসরকার সম্প্রতি ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (Food Corporation of India) গঠন করিয়াছেন। সরকার ফুড কর্পোরেশনের মাধ্যমেই খাদ্যসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। এই কর্পোরেশন প্রত্যক্ষভাবে চালকলগুলির নিকট হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। ভারতের ১৭টি রাজ্যের মধ্যে ১৪টি রাজ্যেই ফুড কর্পোরেশনের মাধ্যমে খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয়।

আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য খাদ্যনীতি

খাদ্য-সমস্যার সমাধানের উপায় (Remedies of the Food Problem)—খাদ্যসমস্যার সমাধানের জন্য সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, সেগুলি যাহাতে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। খাদ্যসমস্যার সমাধানের দুইটি দিক বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রথমত, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইবার এবং ইহার দাম কমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনকে আরও জোরদার করিতে হইবে। খাদ্যশস্যের বাধ্যতামূলক সংগ্রহ এবং কঠোর মূল্যনিয়ন্ত্রণ-নীতি অনুসরণ করিয়া দাম কমাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, খাদ্য-সামগ্রীর চাহিদা এখন যে পরিমাণ আছে, তাহা যাহাতে আর না বাড়ে, সেই চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জনসংখ্যার বৃদ্ধি যাহাতে আর না হয়, সেই চেষ্টা করিতে হইবে। খাদ্য-সামগ্রী ব্যবহারেও জনসাধারণের মধ্যে রুচির কিছু পরিবর্তন করা উচিত। সবরকম খাদ্য-সামগ্রী গ্রহণ করিতে যাহাতে জনসাধারণ অভ্যস্ত হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন আরও বাড়াইবার জন্য সরকারের উচিত পতিত জমিগুলিকে আবাদযোগ্য করিয়া খাদ্যশস্যের চাষ করা। তাহা ছাড়া, প্রতি একর জমিতে যাহাতে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যায়, সেইজন্য সরকারের দিক হইতে ভাল বীজ ও সার সরবরাহের ব্যবস্থা করা উচিত। কীট-পোকা যাহাতে খাদ্যশস্য নষ্ট না করিতে পারে, সেইজন্য উপযুক্ত ঔষধ সরকারকে সরবরাহ করিতে হইবে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন উপযুক্ত বৃষ্টিপাতের উপর একান্ত নির্ভরশীল। কিন্তু বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার উপর মানুষের হাত নাই। সেইজন্য জলসেচ-ব্যবস্থার সুবিধা যাহাতে সুদূর গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীগণও পাইতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। জলসেচ এবং জল নিকাশের ব্যবস্থাকে উন্নত করার দায়িত্ব সরকারের সেচ-দপ্তরকে আরও সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। মিশ্রচাষ ব্যবস্থা (Mixed Farming) চালু করিয়া এবং দ্বি-শস্য-উৎপাদক জমির (Double Crop Area) পরিমাণ বাড়াইয়া অধিক খাদ্যোৎপাদনের চেষ্টা করা যাইতে পারে।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা (Importance of increasing the Production of foodgrains)—ভারতের মত একটি অনগ্রসর দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইবার একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। প্রথমত, কৃষিপ্রধান দেশ ভারতের খাদ্যসমস্যার আশু সমাধানের প্রয়োজন। ইহা সম্ভবপর হইলে খাদ্য-সামগ্রীর দাম কমিবে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িলে খাদ্য-সামগ্রী লইয়া ফাটকা-কারবার ও চোরাকারবার বন্ধ হইবে; তাহাতে খাদ্য-সামগ্রীর যে কৃত্রিম অভাব আমরা বর্তমানে দেখিতে পাই, তাহা অনেকাংশে দূর হইবে। দ্বিতীয়ত, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িলে আমাদিগকে খাদ্য আমদানি কম করিতে হইবে এবং এমন কি খাদ্য আমদানি বন্ধও হইয়া যাইতে পারে। তাহাতে আমাদের দেশ হইতে খাদ্য আমদানি হেতু যে বৈদেশিক মুদ্রা বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা বাঁচিবে। আমরা সেই বৈদেশিক মুদ্রা দেশের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করিতে পারি।

তৃতীয়ত, যে সকল দেশ হইতে আমরা বর্তমানে খাদ্য আমদানি করি সেই সকল দেশ হইতে যদি খাদ্য আমদানির পরিমাণ কমিয়া যায়, তবে খাদ্য সামগ্রীর পরিবর্তে আমরা সেই দেশগুলি হইতে অন্যান্য সামগ্রী বিশেষত শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করিতে পারি। ইহা হইল খাদ্য আমদানির পরিবর্তে অন্যান্য প্রয়োজনায় আমদানি। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িলেই ইহা সম্ভবপর।

চতুর্থত, দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িয়া গেলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, উদ্বাস্তু আগমন, জনসংখ্যার চাপ প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যায় দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইবে না

সর্বশেষে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িয়া গেলে ইহা মজুত করিয়া রাখা হয়, যাহাতে প্রয়োজনের সময় আমাদের খাদ্যের অভাবে কষ্ট না পাইতে হয় অথবা খাদ্য আমদানি না করিতে হয়।

ভারতের জলসেচ ব্যবস্থা (Irrigation System in India) :

বর্তমান অবস্থা—ভারত-বিভাগের ফলে সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের বৃহৎ অংশ পাকিস্তানে চলিয়া যাওয়ায় ভারতের সেচ-ব্যবস্থায় যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। এই অঞ্চলগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে সেচ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। ভারত-বিভাগের ফলে সেচ-ব্যবস্থার অধীন মোট আবাদি জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮০ লক্ষ একর। ইহার ফলে ভারতে খাদ্য উৎপাদনের উপর বিশেষ চাপ পড়ে। বর্তমান সেচ ব্যবস্থাধীন জমিগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা চলে—

বিভিন্ন ধরনের জল সেচ-ব্যবস্থা

প্রথমত, যে সমস্ত জমিতে খালের সাহায্যে সেচ-কাজ করা হয় ; দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত জমিতে কূপের সাহায্যে সেচ-কাজ করা হয় এবং তৃতীয়ত, যে সমস্ত জমিতে পুষ্করিণীর সাহায্যে সেচ-কাজ করা হয়। প্রধানত, খাল, কূপ, পুষ্করিণী, নলকূপ প্রভৃতির সাহায্যে ক্ষুদ্র জলসেচের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। বৃহদায়তন জলসেচ ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন নদী উপত্যকা পরিকল্পনা এখানে হইয়াছে।

জলসেচের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Irrigation)—ভারত প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির উপর সামগ্রিক জাতীয় উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির পথে অন্যতম প্রধান বাধা হইতেছে অপর্যাপ্ত জলসরবরাহ। কারণ ভারতের অধিকাংশ জমি শুষ্ক এবং পর্যাপ্ত জলসরবরাহ না করিতে পারিলে প্রচুর ফসল উৎপাদন করা অসম্ভব। ভারতবর্ষে চাষ-আবাদ বহু পরিমাণে বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পশ্চিম ভারতের এক বিরাট অংশের বারিপাত একান্ত অপ্রচুর এবং যে অংশে সাধারণত বারিপাত হয়, সেখানেও চাষের জন্য প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করিতে হয়। আবার এই সমস্ত অঞ্চলে যদি অধিক বারিপাত হয় তাহা হইলে জল বাহির করিয়া দিবারও বিশেষ কোন সুবন্দোবস্ত নাই। অথচ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে প্রতি বৎসরই পতিত জমি

উদ্ধার করা এবং কর্ষিত জমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া যাইতেছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পতিত জমিকে চাষযোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য, জমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াইবার জন্য এবং কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা দূর করিবার জন্য ভারতবর্ষে পর্যাপ্ত জলসেচ-ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় বর্তমানে যে পরিমাণ সুসংগঠিত জলসেচ-ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা নিতান্তই নগণ্য।

তবে আশার কথা এই যে, প্রথম তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনায় জলসেচ-ব্যবস্থাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং ছোট ছোট পরিকল্পনার অনেকগুলি ইতিমধ্যেই কার্যকরী হইয়া উঠিয়াছে এবং বৃহৎ পরিকল্পনাগুলির কাজে যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে।

পাঁচসালা পরিকল্পনা ও জলসেচ (Irrigation in the Five-Year Plans)—প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় ১৫৩টি পরিকল্পনায় (Project) কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনা, ভাকরা-নাঙ্গল (Bhakra-Nangal) পরিকল্পনা, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা, মহানদী পরিকল্পনা প্রভৃতি পরিকল্পনাগুলি প্রসিদ্ধ। ভাকরা বাঁধ পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বাঁধ। ভাকরা-নাঙ্গল পরিকল্পনার অন্তর্গত নাঙ্গল হাইডেল খাল, নাঙ্গল বাঁধ এবং পাঞ্জাবে ভাকরা খাল খননের কাজ শেষ হইয়াছে। ভাকরা-নাঙ্গল পরিকল্পনা হইতে ৩৬ লক্ষ একর জমি জলসেচের সুবিধা পাইতেছে এবং ইহা হইতে ৬ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে। ইহা ছাড়াও অসংখ্য ছোট ছোট পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। অনেকগুলিতে কাজ শেষ হইয়াছে, অনেকগুলিতে কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় জলসেচ

ভারতে বর্তমানে নিম্নলিখিত জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বোম্বাইতে টাটা জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনায় প্রায় ২১ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। এখান হইতে বিভিন্ন মিলে, সুবার্বন রেলওয়েতে এবং সমগ্র বোম্বাই শহরে বিদ্যুৎ-সরবরাহ করা হয়। মাদ্রাজ পাইকারী জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প নীলগিরি পর্বত-নিঃসৃত স্রোতরাশির সদ্ব্যবহার করিয়াছে। মিণ্টর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা এবং পাপনাসামের (Papanasam) কারখানা কিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। পাঞ্জাবের মণ্ডি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-প্রকল্পে বিয়াসের অন্তর্গত বরফাবৃত উল নদীর সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে। মহীশূর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে নদী-উপত্যকা পরিকল্পনাকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হইয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে তুঙ্গভদ্রা উপত্যকা পরিকল্পনা, বিহারে কুশী উপত্যকা পরিকল্পনা, রাজস্থানে চম্বল পরিকল্পনা, উত্তরপ্রদেশে রাইহান্দ বাঁধ পরিকল্পনা, মহারাষ্ট্রে কয়না পরিকল্পনা, মহীশূরে কৃষ্ণা পরিকল্পনা এবং গুজরাটে কাকড়াপাড়া পরিকল্পনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দামোদর পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসূচী কার্যকরী হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার কাজও শেষ হইয়াছে, ইহার ফলেও বিরাট এলাকায় জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। উড়িষ্যার মহানদী পরিকল্পনা বা হীরাকুঁদ বাঁধ পরিকল্পনা —গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসাবে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। হীরাকুঁদ পরিকল্পনায় হীরাকুঁদ টিকরাপাড়া এবং নারাজ নামক তিনটি স্থানে বাঁধ সৃষ্টি করা হইয়াছে। হীরাকুঁদ হইতে ৬.৭২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ১.২৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাইতেছে। বর্তমানে ৬টি বহুমুখী পরিকল্পনা, ১০১টি একক সেচ পরিকল্পনা এবং ৪৩টি বিদ্যুৎ-উৎপাদন পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। প্রতি পরিকল্পনায় ১০ কোটি টাকার মতো ব্যয় হইয়াছে এইরূপ পরিকল্পনার সংখ্যা হইতেছে ১২টি।

বিভিন্ন পাঁচসালা পরিকল্পনায় জলসেচ

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বৃহদাকার জলসেচ-ব্যবস্থার আওতায় আসিয়াছিল অতিরিক্ত ১২ মিলিয়ন একর জমি। ইহার মধ্যে ৯ মিলিয়ন একর জমি জলসেচের সুবিধা পাইয়াছিল প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায়। যে সকল সেচ-পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলি হইতে এবং অবশিষ্ট ৩ মিলিয়ন একর জমি জলসেচের সুবিধা পাইবে নূতন সেচ পরিকল্পনাগুলি হইতে। কূপ, পুষ্করিণী, খাল প্রভৃতি ক্ষুদ্রায়তন জলসেচ-ব্যবস্থার আওতায় আসিয়াছিল অতিরিক্ত ৯ মিলিয়ন একর জমি। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ১৮৮টি নূতন জলসেচ পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়া হইয়াছিল। এই সেচ পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইবে আশা করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় জলসেচ এবং বন্যানিয়ন্ত্রণে খরচ হইয়াছিল ৪৫৮ কোটি টাকা এবং বৈদ্যুতিক শক্তি খাতে খরচ হইয়াছিল ৪৪০ কোটি টাকা। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় জলসেচ খাতে ৬৪৮ কোটি টাকা খরচ করা হইয়াছিল। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় জলসেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ খাতে ৯৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects)—পল্লী-জীবনের সর্বতোমুখী উন্নতিসাধন করার জন্য সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর চালু করা হয়। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হইতেছে: (১) পল্লীবাসীগণের মধ্যে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী বিস্তৃত করা এবং পল্লীর নানাবিধ উন্নতি করা; (২) পল্লীবাসীগণকে সমবায়মূলক কর্মব্যবস্থায় অভ্যস্ত করিয়া তোলা; (৩) অধিক উৎপাদন, বিশেষত কৃষিক্ষেত্রে এবং (৪) অধিক কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করা। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি প্রথম অবস্থায় মূল পরিকল্পনা (Basic Project) এবং বিমিশ্র পরিকল্পনা (Composite Projects) এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। মূল পরিকল্পনাগুলি কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন বিশেষত খাদ্যশস্যের উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য এবং বিমিশ্র পরিকল্পনাগুলি গ্রামীণ শিল্পগুলির উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ

করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমবায়, পরিবহন-ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতির জন্য কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে। সাধারণভাবে প্রতিটি পরিকল্পনায় ৩০০ গ্রাম, ২ লক্ষ লোক, ৫০০ বর্গমাইল অঞ্চল এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার একর কৃষি-ভূমি থাকে। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জন্য একজন প্রশাসক (Project Administrator) আছেন; তাঁহার অধীনে প্রতিটি প্রজেক্টে একজন অফিসার (Project Executive Officer) আছেন। তাহা ছাড়া, প্রতি ব্লকে আছেন একজন ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার (Block Development Officer) এবং তাঁহার অধীনে আছেন কয়েকজন গ্রামসেবক।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় সরকার নূতন সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। নূতন সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা "গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ" (Democratic Decentralisation) নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির তিনটি স্তর ছিল, যথা,—জাতীয়



সম্প্রসারণ সেবা, সমাজ-উন্নয়ন এবং গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানের প্রগাঢ় উন্নয়ন। কিন্তু নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচ বৎসরের জন্য দুইটি স্তর করা হইয়াছিল এবং খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, নূতন সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামসেবকগণকে একই শিক্ষা-কেন্দ্রে কারিগরি শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী একপ্রকার হয়।

তৃতীয়ত, ব্লক-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। প্রতি পাঁচ হইতে দশটি গ্রামের জন্য একজন গ্রামসেবক থাকেন।

গ্রামসেবককে তাঁহার কাজে নিযুক্ত হইবার পূর্বে উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ৩,৮০০টি জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক (National Extension Block) করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১,১২০টি সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনায় রূপান্তরিত হইবার কথা ছিল। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কাজ সমাপ্ত হইবে আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা এখনও সমাপ্ত হয় নাই। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অন্যান্য সমস্যা—খাদ্য-সমস্যা এবং কৃষি-সমস্যা ছাড়া ভারত বর্তমানে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে সেইগুলি হইতেছে **বেকার সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা,** এবং **বৈদেশিক মুদ্রা সংকট**। বেকার সমস্যার তীব্রতা দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে ১২ মিলিয়ন লোক বেকার ছিল। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে ২৪ মিলিয়ন লোক বেকার থাকিবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই বেকার সমস্যার তীব্রতা বেশী দেখা যায়। উচ্চ জন্মহার হেতু শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি, অথচ সেই অনুপাতে কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকের কম সরবরাহ, কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব, ভ্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থায় ভারসাম্যের অভাব, শ্রমিক ছাঁটাই, শ্রমিকের পরিবর্তে মেসিনের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াইবার ব্যবস্থা গ্রহণ, নূতন মেসিন প্রবর্তন করিয়া বিভিন্ন শিল্পকে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা প্রভৃতি হইতেছে বেকার সমস্যার মূল কারণ। উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়া আমরা দেখিতে পাই প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থা (Disguised Unemployment) যাহার পরিণতি হইতে কৃষিক্ষেত্রে বর্ধিত জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পগুলি উন্নত করিয়া এবং শিল্পক্ষেত্রে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া সরকার এই সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছেন।*

বেকার সমস্যা

মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশের মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা নষ্ট হইয়াছে এবং ইহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। সরকারের ঘাটতি বাজেট হেতু অতিরিক্ত মুদ্রার সৃষ্টি, লোকের আয় কিছু পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় চাহিদা বৃদ্ধি অথচ সেই অনুপাতে জিনিসপত্রের স্বল্প যোগান, উৎপাদন খরচের বৃদ্ধি এবং আমদানি খরচের বৃদ্ধি, মুনাফাখোর ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক একান্ত আবশ্যকীয় পণ্যাদির কৃত্রিম সঞ্চয় প্রভৃতি হইতেছে বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ।

মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা

* ভারতের বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে অবলম্বিত ব্যবস্থা যথাক্রমে ১৯৫-১৯৬ পৃষ্ঠা এবং ১৯২ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

রপ্তানির অনুপাতে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি, আমদানি খরচের বৃদ্ধি, অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য মূলধন সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি আমদানি, সাময়িকভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে উদার আমদানি নীতি, রপ্তানি ও আমদানি পরিকল্পনায় ভারসাম্যের অভাব এবং অতিরিক্ত পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করাই হইতেছে বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের মূল কারণ।

বৈদেশিক মুদ্রা সংকট

Exercise

1. Write a note on the various types of irrigation work in India and indicate their econmic importance.
(ভারতের বিভিন্ন ধরনের জলসেচ-ব্যবস্থার উপর টীপ্পনী লিখ এবং ইহার অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দাও।) (১৬৪-১৬৫ পৃষ্ঠা)

2. D scuss the irrigation system in India's Five-Year Plan.
(ভারতের পাঁচসালা পরিকল্পনায় জলসেচ-ব্যবস্থা আলোচনা কর।) (১৬৫ ৬৬ পৃষ্ঠা)

3. Write a short note on the present food-problem of India. (S. F. 1962)
(ভারতের বর্তমান খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা দাও।) (১৫৭-১৬০ পৃষ্ঠা)

4. Explain the importance of increasing the production of foodgrains in India. (ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।) (১৬৩-৬৪ পৃঃ) (S F. 1964)

5. Suggest measures to increase the food production of India. (S. F. 1961)
(ভারতের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত তাহা বল।) (৬৩ পৃঃ)

6. Account for the recent rise in prices of foodgrains in India.
(ভারতের খাদ্যশস্যের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির কারণগুলি আলোচনা কর।) (১৫৯-৬০ পৃঃ)

7. Critically discuss the food policy of the Government of India.
(ভারতসরকারের খাদ্যনীতি সম্পর্কে আলোচনা কর এবং ইহার সমালোচনা কর।) (১৬০-১৬২ পৃঃ)

8. Write a note on Community Development Projects.
(সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর একটি টিকা লিখ।) (১৬৬-৬৮ পৃষ্ঠা)

9. Describe the irrigation system of India, and give a brief account of the progress of irrigation in India during the period. (ভারতের জলসেচ-ব্যবস্থা বর্ণনা কর এবং পরিকল্পনাকালে ইহার অগ্রগতি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও।) (১৬৪-৬৬ পৃঃ)

10. Write a note on various problems faced by India in course of her planning. (পরিকল্পনাকালে ভারত যে কতিপয় সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে সেইগুলির উপর টীকা লিখ।) (১৫৭-৫৯ পৃঃ ; ১৬৮-১৬৯ পৃঃ)

ষোড়শ অধ্যায়

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning in India)

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আমরা কখনও বে-সরকারী অর্থনীতিতে (Private Economy) দেখিতে পাই না। ছোটই হোক আর বড়ই হোক, সব কাজেই পরিকল্পনার গুরুত্ব স্বীকার করা হয় সেই দেশগুলিতে যেগুলি সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর ভারতে মিশ্র অর্থনীতি গৃহীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বর্তমানে ভারতসরকার সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় নবীন-ভারত গঠনে ব্রতী হইয়াছেন। দেশের সমস্ত সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া তাহা সমাজ-কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতে হইলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই যে শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা আজ প্রত্যেক প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই (আমেরিকা ব্যতীত) কিছু-না-কিছু স্বীকার করা হইয়াছে। রাশিয়ায় সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বর্তমানে আমরা রাশিয়ায় যে সুস্থ এবং উন্নত জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখিতে পাই, তাহা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফল। প্রকৃত কল্যাণ-রাষ্ট্র (Welfare State) প্রতিষ্ঠায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অবদান অপরিসীম। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পূর্বে রাশিয়া ছিল এক অনুন্নত দেশ। দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক সঙ্গতি সুসংহত করিয়া শিল্পায়ন এবং অন্যান্য দিকে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্যই ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার স্বরূপ (Nature of the First Five-Year Plan)—পরিকল্পনাটির দুইটি অংশ আছে,—একটি **সরকারী ক্ষেত্র** এবং অপরটি **বে-সরকারী ক্ষেত্র**। সরকারী ক্ষেত্রে মোট খরচের পরিমাণ প্রথমে ধরা হইয়াছিল, ২,০৬৯ কোটি টাকা, পরে ইহাকে বাড়াইয়া করা হয় ২,৩৭৮ কোটি টাকা; ইহাই সর্বশেষ হিসাব।

এই টাকা নিম্নলিখিতভাবে বরাদ্দ করা হইয়াছিল :—

	টাকার পরিমাণ	শতাংশ
(১) কৃষিক্ষেত্র ও গ্রাম উন্নয়ন	৩৫৪ কোটি টাকা	১৪.৯
(২) সেচ ও বিদ্যুৎ	৬৪৭ " "	২৭.২
(৩) শিল্প ও খনি	১৮৮ " "	৭.৯
(৪) পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৭১ " "	২৪.০
(৫) সমাজসেবা	৫৩২ " "	২২.৫
(৬) বিবিধ	৮৬ " "	৩.৫
	২,৩৭৮ কোটি টাকা	১০০.০

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি খাদ্য এবং জলসেচের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাহার কারণ হইতেছে, যখন প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়, তখন দেশ খাদ্য-সমস্যায় বিশেষ জর্জরিত ছিল। কৃষি এবং খাদ্য উৎপাদনের উপর গুরুত্ব প্রদান করিবার কারণ ছিল প্রধানত দুইটি। প্রথমত, দেশের খাদ্য-সমস্যার সমাধানের আশু প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে যাহাতে দেশ দ্রুত শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হইতে পারে, সেইজন্য প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনাতেই কাঁচামালের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া তাহার প্রস্তুতি করার প্রয়োজন ছিল। মোট খরচের এক-চতুর্থাংশ বরাদ্দ করা হইয়াছিল কৃষির উন্নতির জন্য। জলসেচের জন্যও মোট খরচের এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় করা হইয়াছিল। কৃষি-কর্মসূচীতে আমদানির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা কমাইবার জন্য বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হয়। তাহা ছাড়া, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় একটি সুনির্দিষ্ট মূল্যনীতি (Price Policy) এবং সুনির্দিষ্ট খাদ্যনীতি অনুসরণ করিবার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা (Rationing), খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ (Procurement) এবং ন্যূনতম আমদানি,—এইগুলিকে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার সুদৃঢ় খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভিত্তি করা হইয়াছিল। প্রথম-পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects) এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার (National Extension Service) প্রবর্তন। পরিকল্পনাগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়, যথা—মূল পরিকল্পনা (Basic Projects) এবং বিমিশ্র পরিকল্পনা (Composite Projects)। প্রতিটি পরিকল্পনায় ৩০০ গ্রাম, ২ লক্ষ লোক, ৫০০ বর্গমাইল অঞ্চল এবং ১.৫ লক্ষ একর কৃষিভূমি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি পরিকল্পনা আবার তিনটি উন্নয়ন ব্লকে (Development Block) বিভক্ত হয়। ১০০টি গ্রাম লইয়া একটি উন্নয়ন ব্লক গঠন করা হয়। কৃষির উন্নতির জন্য সরকারের ভূমিনীতিরও (Land Policy) সংস্কার করা হয়। জমির উর্ধ্বতন সীমা নির্ধারণ করা, জমিদারি প্রথার বিলোপ করা এবং ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বণ্টন করাই সরকারের ভূমিনীতির লক্ষ্য স্থির করা হয়।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় গৃহীত নীতি—কৃষির উপর গুরুত্ব প্রদান

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ভূমিনীতি

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার অগ্রগতি (Progress in the First Five-Year Plan)—ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কোন কোন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিলে ইহার কিছু কিছু ত্রুটিও ছিল। যেখানে জাতীয় আয় বাড়িবার কথা শতকরা ১১ ভাগ, সেখানে তাহা হইয়াছিল শতকরা ১৮ ভাগ। প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ২.৯৮ ভাগ এবং পাটের উৎপাদন শতকরা ১৮ ভাগ বাড়িয়াছিল। ১৯৪০-৫০ সালের কৃষি

উৎপাদনী সূচী যদি ১০০ ধরা যায়, তবে ১৯৫০-৫১ সালে ইহা ছিল ৯৬ এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহা হইয়াছিল ১১৫। অনুরূপভাবে ১৯৪৬ সালে শিল্পোৎপাদনের সূচীসংখ্যা ১০০ ধরিলে ইহা ১৯৫৩-৫৪ সালে হইয়াছিল ১৩৭ এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ইহা হইয়াছিল ১৪৮; সুতরাং শিল্পক্ষেত্রেও বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য (Main Features of the Second Five-Year Plan)—দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার চারিটি উদ্দেশ্য ছিল। যথা—(ক) জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি (অন্তত শতকরা ২৫ ভাগ) করা; (খ) গুরুতর শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিয়া দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথ সুগম করা; (গ) ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা; (ঘ) আয় ও ধনের অসাম্য কমাইয়া দিয়া অর্থনৈতিক শক্তির আরও সমবণ্টন করা। প্রাথমিকভাবে সরকারী ক্ষেত্রে মোট খরচ ৪,৮০০ কোটি টাকা এবং বে-সরকারী ক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ ২,৪০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল। কৃষিক্ষেত্রকে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় মোটেই উপেক্ষা করা হয় নাই এবং এজন্য ৫৬৮ কোটি টাকার সংস্থান করা হইয়াছিল। সেচ ও বিদ্যুৎ, শিল্প ও খনি এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য যথাক্রমে ৯১৩ কোটি টাকা, ৮৯০ কোটি টাকা এবং ১,৩৮৫ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য প্রাথমিকভাবে ২০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, সমাজ-কল্যাণের জন্য খরচ ধরা হইয়াছিল ৯৪৫ কোটি টাকা। বিবিধ তালিকায় ৯৯ কোটি টাকা খরচ হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল।

পরে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রাথমিক বরাদ্দগুলির পরিবর্তন করা হইয়াছিল।

নীচে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার সংশোধিত বরাদ্দ দেওয়া হইল :—

	প্রাথমিক বরাদ্দ (কোটি টাকা)	শতকরা হিসাব	সংশোধিত বরাদ্দ (কোটি টাকা)	শতকরা হিসাব
১। কৃষি ও সমাজ-উন্নয়ন	৫৬৮	১১·৮	৫৬৮	১১·৮
২। জলসেচ ও শক্তি	৯১৩	১৯·০	৮৬০	১৮·২
৩। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন	২০০			
৪। গুরুভার শিল্প ও খনিজ সামগ্রী	৬৯০			
(৩+৪)	৮৯০	১৮·৫	১০৮০	২১·৬
৫। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	১,৩৮৫	২৮·৯	১,৩৪৫	২৮·৭
৬। সমাজসেবা	৯৪৫	১৯·৭	৮৬৩	১৮·০
৭। বিবিধ	৯৯	২·১	৮৪	১·৭
	৪,৮০০	১০০·০	৪,৮০০	১০০·০

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক বরাদ্দে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ ও আর্থিক সম্পদের মধ্যে যে ভারসাম্যের অভাব দেখিতেছিলাম সে সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন পরে অবহিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়ত, সংশোধিত দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের উপর আরও বেশী গুরুত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বরাদ্দ কমাইয়া গুরুভার শিল্পের বরাদ্দ আরও বাড়ানো হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বে-সরকারী ক্ষেত্রে ২,৪০০ কোটি টাকা খরচ করিবার কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছিল। ইহা নিম্নোক্ত উপায়ে খরচ করার কথা ছিল—

বে-সরকারী ক্ষেত্রের কর্মসূচী

বড় শিল্প ও খনিজ দ্রব্য উৎপাদন	... ৫৭৫	কোটি টাকা
কৃষি ও কুটির-শিল্প ...	... ৩০০	" "
চা, কফি প্রভৃতি শিল্প, বিদ্যুৎ ও রেলওয়ে ব্যতীত অন্যান্য যানবাহন	... ১২৫	" "
গৃহনির্মাণ ...	.. ১,০০০	" "
মজুদ মাল বাবদ ...	... ৪০০	" "
	২,৪০০	" "

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থসংস্থান (Financing of the Second Five-Year Plan)—দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রাথমিকভাবে যে ৪৮০০ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছিল, তাহা পাওয়া যাইবার কথা ছিল নিম্নলিখিত উৎস হইতে—

করলব্ধ অর্থ—৮০০ কোটি টাকা; সরকারী ঋণ ও ক্ষুদ্র সঞ্চয়—১,২০০ কোটি টাকা। রেলওয়ে উদ্বৃত্ত— ৫০ কোটি টাকা; প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও অন্যান্য আমানত—২৫০ কোটি টাকা; বৈদেশিক সাহায্য—৮০০ কোটি টাকা; নোট চালু করিয়া—১,২০০ কোটি টাকা; অন্যান্যভাবে অর্জিত—৪০০ কোটি টাকা; মোট—৪,৮০০ কোটি টাকা।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council) সংশোধিত বরাদ্দে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মোট বরাদ্দকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম পর্যায়ে খরচ ধরা হইয়াছিল ৪,৫০০ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে খরচ ধরা হইয়াছিল ৩০০ কোটি টাকা।

পরিকল্পনার 'সার ভাগ' স্থানীয় কাজগুলি (Core of the Plan) অর্থাৎ যে সকল কাজ ইতিমধ্যেই অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল এবং যেগুলি পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য একান্ত অপরিহার্য ছিল, সেইগুলিকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। পরিকল্পনার অন্তর্গত অন্যান্য কাজগুলি দ্বিতীয় ভাগে ধরা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের কার্যসূচী পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ঘাটতি অর্থসংস্থানের (Deficit financing) উপর সমগ্র পরিকল্পনাটির আর্থিক

সঙ্গতির শতকরা ২৫ ভাগের জন্য নির্ভর করা হইয়াছিল। ঘাটতি অর্থসংস্থানের ফলে দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে, জনসাধারণের ক্রয়শক্তি ও চাহিদা বাড়ে এবং ইহাতে দেশের উৎপাদনও বাড়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু, এজন্য যে জিনিসের প্রধান প্রয়োজন, তাহা হইতেছে দেশে যথেষ্ট পরিমাণে মূলধনের যোগান, এবং শ্রমিকদের উৎপাদন-শক্তি। কিন্তু আমাদের দেশে এই উৎপাদনগুলির কোনটিই নাই। সেজন্য আমাদের দেশে ঘাটতি অর্থসংস্থান নীতি সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নাই। ইহাই উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে জিনিসপত্রের দাম-বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে। অধ্যাপক ক্যালডর (Kaldor) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশের ঘাটতি অর্থসংস্থানের বোঝা ৭৫০ কোটি টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়।

ঘাটতি অর্থসংস্থান

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যাহাতে দেশের করব্যবস্থা হইতে আরও অধিক পরিমাণে রাজস্ব সংগৃহীত হয় সেইজন্য অধ্যাপক ক্যালডর কতিপয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ক্যালডরের মতে বড়লোকের উপর শুধু আয়কর বসাইলে বা বাড়াইলে চলিবে না। তাঁহার মতে আয়করের সর্বাধিক হার শতকরা ৪৫ ভাগ করা হোক এবং সেইসঙ্গে ব্যয়কর (Expenditure tax), দানকর (Gift tax), মূলধন মুনাফা কর (Capital gains tax), সম্পদ কর (Wealth tax) প্রভৃতি ধার্য করা হোক। ভারতসরকার ক্যালডরের সুপারিশ অনুযায়ী ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ কমান নাই। তাহা ছাড়া, আয়করের সর্বোচ্চ হারও শতকরা ৪৫ ভাগ পর্যন্ত কমানো হয় নাই।

অধ্যাপক ক্যালডরের কর-প্রস্তাব

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতা (Achievements and Failures of Second Five-Year Plan)—দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নাই, তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য দেখা গিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কৃষি-উৎপাদন কিছু পরিমাণে বাড়িয়াছিল। ১৯৪৯-৫০ সালের কৃষি-উৎপাদনের সূচকসংখ্যা ১০০ ধরিলে সকল প্রকার পণ্য, খাদ্য এবং অন্যান্য শস্যের উৎপাদন দাঁড়াইয়াছিল নিম্নরূপ :—

কৃষি-উৎপাদনের সূচকসংখ্যা ১৯৪৯-৫০ = ১০০

	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৮-৫৯	১৯৬০-৬১
সকল প্রকার পণ্য	১১৬.১	১৩০.০	১৩৫.০
খাদ্যশস্য	১১৫.৩	১৩০.০	১৩১.০
অন্যান্য শস্য	১২০.১	১২৬.০	১৪৩.০

চিনি এবং তৈলবীজের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ে নাই। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশেষ সাফল্য দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে ২০০০ উন্নয়ন ব্লকের মাধ্যমে প্রায় ১৯৪ মিলিয়ন লোক সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতার মধ্যে আসিয়াছিল। আশা করা যায় ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে ভারতের সমগ্র

সাফল্য

গ্রামাঞ্চলে সম্পূর্ণভাবে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সুবিধা প্রাপ্ত হইবে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার আংশিক সাফল্যের অপর একটি নিদর্শন হইয়াছে সমবায় কৃষিব্যবস্থার (co-operative farming) প্রবর্তন। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বাড়িয়াছিল শতকরা ২০ ভাগ, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা আরম্ভ হইবার সময় দেশে মোট সেচ জমির পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ১৫ লক্ষ একর; ১৯৬০-৬১ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭ কোটি একর। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল তিনটি ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার গোড়ায় ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ টন, পরিকল্পনার শেষে ইহা বাড়িয়া হইয়াছিল ৪৫ লক্ষ টন। তাহা ছাড়া, শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য অর্থব্যয়ের পরিমাণ ১৯৫২ সালের ১১ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ১৯৫৮ সালের শেষে ৭৯ কোটি টাকা হয়। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পেরও কিছু উন্নতি দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় পরিবর্তিত হইয়াছে।

কিন্তু দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কোন কোন ক্ষেত্রে দেশের উন্নতি হইলেও এই পরিকল্পনার তিনটি প্রধান ব্যর্থতা আমাদের চোখে পড়ে। সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যর্থতা দেখা যায় বেকার সমস্যার তীব্রতায় এবং জিনিসপত্রের দামের উর্ধ্বগতিতে। সরকারী হিসাবে দেখা যায়, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা আরম্ভ হইবার সময় শহরাঞ্চলে বেকারের সংখ্যা যেখানে ছিল ২৫ লক্ষ, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে তাহা বাড়িয়া হইয়াছিল ৪৫ লক্ষ। দ্বিতীয়ত, জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনার শেষে পাইকারী মূল্যের সূচীসংখ্যা দাঁড়ায় ৯৯·২। দুই বৎসর পর ইহা বাড়িয়া হইয়া যায় ০৮·১। ১৯৫৯-৬০ সালের শেষে ইহা হয় ১১৮·৬; তাহা ছাড়া, ১৯৫৮-৫৯ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭৩ মিলিয়ন টন হইলেও খাদ্যশস্যের দাম মোটেই কমে নাই। তৃতীয়ত, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের তীব্রতা ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও বিশেষ উন্নত হয় নাই এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যারও সমাধান হয় নাই। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার ব্যর্থতা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে ইহা কতিপয় ভুল তথ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল।

ব্যর্থতা

সমালোচনা—দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা আর্থিক সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ভুল হিসাবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইজন্যই আমরা বর্তমান তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলাম, যথা—(১) বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট, (২) মুদ্রাস্ফীতি এবং (৩) বেকার সমস্যা। বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের হিসাবে আমাদের যে ঘাটতি, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তাহা দূর করা যায় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার একান্ত প্রয়োজনীয় ভোগ-সামগ্রীগুলি বিশেষত খাদ্যশস্যের দাম দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া, দ্বিতীয় পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্য ছিল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু বেকার সমস্যার তীব্রতা দিনের পর দিন বাড়িয়াই গিয়াছিল। জনগণের

জীবনযাত্রার মানও খুব উন্নত হয় নাই। এই সমস্যাগুলি আমরা কিছু পরিমাণে এড়াইতে পারিতাম, যদি পরিকল্পনাটি আর একটু ছোট হইত।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা আলোচিত হইল তাহা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, পরিকল্পনাটি কতিপয় অসম্পূর্ণ এবং ভুল তথ্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মধ্যে তুলনা (Comparison between the First and the Second Five-Year Plan—বাহ্যিক কাঠামোর দিক হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই; কিন্তু পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী, নীতি এবং পরিবেশের দিক হইতে দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ যখন আরম্ভ হয়, তখন দেশ খাদ্য-সমস্যায় জর্জরিত ছিল; তাহা ছাড়া, দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের বিশেষ অভাব ছিল। সেইজন্য প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি, জলসেচ এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। তাহা ছাড়া, শিল্প অর্থনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কাঁচামালের উৎপাদনও বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় একদিকে গুরুভার শিল্প এবং অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনায় শিল্প-ক্ষেত্রে যেখানে বরাদ্দ ছিল মোট ব্যয়ের শতকরা ৭.৯ ভাগ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেখানে খরচ করা হইয়াছিল মোট ব্যয়ের শতকরা ২৪ ভাগ। কিন্তু সেইজন্য দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রকে একেবারে উপেক্ষা করা হয় নাই। প্রথম পাঁচসালা পরি-কল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বেসরকারী ক্ষেত্র অপেক্ষা সরকারী ক্ষেত্রেও গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়, কিন্তু দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিয়াছিল এবং জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি, দ্রুত শিল্পোন্নয়ন অথচ ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইয়া দেওয়া প্রভৃতি উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা চলিতেছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা ও প্রথম পাঁচসালা পবিকল্পনাদ্বয়ের উদ্দেশ্যগুলি পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থানের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার কর্মসূচী প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা হইতে অনেক বেশী সাহসিক ছিল।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য (Features of the Third Five-Year Plan)—ভারতের তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে আলোচনা করা হইতেছে:—

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল পাঁচটি। প্রথমত, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রতি বৎসর শতকরা পাঁচভাগ জাতীয় আয় বাড়াইতে হইবে এবং বিনিয়োগের এমন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে যাহাতে দেশের এই অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার বজায় থাকে। দ্বিতীয়ত, খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করিতে হইবে এবং বিভিন্ন শিল্প ও রপ্তানির চাহিদা মিটাইবার জন্য কৃষির উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। তৃতীয়ত,

ইস্পাত, জ্বালানী এবং বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি মৌলিক শিল্পের সম্প্রসারণ করিতে হইবে যাহাতে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে শিল্পোন্নয়নের সমুদয় চাহিদা দেশের নিজস্ব সম্পদ হইতেই মিটিতে পারে। চতুর্থত, দেশের জন সম্পদ (manpower resources) যতটুকু সম্ভবপর সদ্ব্যবহার করিতে হইবে এবং কর্মসংস্থানের ব্যাপক সম্প্রসারণ করিতে হইবে। সর্বশেষে, আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইয়া দিতে হইবে এবং দেশের অর্থ নৈতিক সম্পদের সমবণ্টন করিতে হইবে।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার লক্ষ্য

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় স্বনির্ভরশীল উন্নয়ন (Self-sustaining growth) অর্জন করা যাইতে পারে এই রকম একটি পরিকল্পনা নীতি অনুসরণ করিবার কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছিল। স্বনির্ভরশীলতার অর্থ হইতেছে এই যে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের (investment) পরিমাণ এমনভাবে বাড়াইতে হইবে যেন জাতীয় আয়ের ক্রমবৃদ্ধি হইতে থাকে। এই উদ্দেশ্যেই দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিতে হইবে। স্বনির্ভরশীল উন্নয়ন অর্জন করিবার জন্য শিল্প ও কৃষির সুষম উন্নয়ন (balanced development) অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যে একদিকে হইবে মৌলিক এবং গুরুভার শিল্পের উন্নয়ন এবং অপরদিকে হইবে কৃষির উন্নয়ন; কিন্তু এইজন্য ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির-শিল্প উপেক্ষিত হইবে না।

পরিকল্পনা পদ্ধতি (Planning technique)

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ৭৫০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা অপেক্ষা তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বিনিয়োগের হার শতকরা ৫১ ভাগ বাড়িয়াছিল। মোট বিনিয়োগের হার শতকরা ২৩ ভাগ নির্দিষ্ট ছিল কৃষি, জলসেচ, সমাজ উন্নয়ন এবং সমবায়ের জন্য শতকরা ১৭ ভাগ নির্দিষ্ট ছিল সমাজ সেবার জন্য; সরকারী ক্ষেত্রের মোট বরাদ্দের শতকরা ৫৭ ভাগ নির্দিষ্ট ছিল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প, খনিজ সামগ্রী, শক্তি, পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ এবং চলতি খরচ সহ মোট ৭৫০০ কোটি টাকা নিম্নোক্ত উপায়ে বণ্টিত হইবার কথা ছিল।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ

	(কোটি টাকায়)	শতকরা অংশ
কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা	১০৬৮	১৪
বড় ও মাঝারি জল সেচ	৬৫০	৯
বিদ্যুৎ	১০১২	১৩
ক্ষুদ্র ও পল্লীশিল্প	২৬৪	৩
শিল্প ও খনিজ	১৫২০	২১
পরিবহন ও যোগাযোগ	১৪৮৬	২০
সমাজ সেবা	১৩০০	১৭.২
স্থাবর সম্পত্তি	২০০	২.৮
মোট ব্যয়—	৭৫০০	১০০.০০

এই টাকার সংস্থান হইবার কথা ছিল নিম্নোক্ত উপায়ে :—চলতি রাজস্বের উদ্বৃত্ত; (অতিরিক্ত কর বাদে) ৫৫০ কোটি টাকা; রেলওয়ে হইতে ১০০ কোটি টাকা; অন্যান্য সরকারী উদ্যোগে উদ্বৃত্ত ৪৫০ কোটি টাকা; জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত ঋণ ৮০০ কোটি টাকা; ক্ষুদ্র সঞ্চয় ৬০০ কোটি টাকা; প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ২৬৫ কোটি টাকা; ইস্পাত সমীকরণ তহবিল ১০৫ কোটি টাকা; বিবিধ মূলধনী আয়বাবদ উদ্বৃত্ত ১৭৭ কোটি টাকা; অতিরিক্ত কর ও সরকারী উদ্যোগ বাবদ উদ্বৃত্ত ১,৭১০ কোটি টাকা; বৈদেশিক সাহায্য ধরা হইয়াছিল ২,২০০ কোটি টাকা এবং ঘাটতি ব্যয় ৫৫০ কোটি টাকা। কিন্তু সর্বশেষ হিসাবে জানা যায় তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট খরচের পরিমাণ হইয়াছিল প্রকৃতপক্ষে ৮৬৩০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মধ্যে তুলনা (Comparison between the Second and the Third Five-Year Plans)—তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার লক্ষ্য মোটামুটি ভাবে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অনুরূপ। তবে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় যেমন প্রকৃতপক্ষে বাৎসরিক শতকরা চার ভাগ জাতীয় আয় বাড়িয়াছিল, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সেখানে জাতীয় আয় প্রতি বৎসর শতকরা পাঁচভাগ বাড়িবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় যেখানে জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগ বিনিয়োগ করা হইয়াছিল, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সেখানে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৪ ভাগ বিনিয়োগ করা হইয়াছিল। কৃষি, জলসেচ, সমাজ উন্নয়ন এবং সমবায় খাতে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় মোট খরচের শতকরা ২১ ভাগ বরাদ্দ করা হইয়াছিল; তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় তাহা হইয়াছে শতকরা ২৩ ভাগ। অপরপক্ষে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প, খনিজসামগ্রী, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় মোট খরচের শতকরা ৬০ ভাগ খরচ করা হইয়াছিল; তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় তাহা হইয়াছিল মোট খরচের শতকরা ৫৭ ভাগ। অবশ্য পরিমাণের দিক হইতে বিবেচনা করিলে মোট খরচের পরিমাণ তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বেশী হইয়াছিল। অনুরূপভাবে সেখানে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সমাজসেবা খাতে মোট খরচের শতকরা ১৮·৭ ভাগ বরাদ্দ করা হইয়াছিল, সেখানে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় মোট খরচের শতকরা ১৭·২ ভাগ বরাদ্দ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যেখানে ইহা ছিল ৮৬০ কোটি টাকা সেখানে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় এইখাতে খরচের পরিমাণ হইতেছে ১২৫০ কোটি টাকা। বাজেটে ঘাটতি করিয়া অর্থসংস্থানের পরিমাণ দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছিল ১২০০ কোটি টাকা (পরে ইহা কমাইয়া করা হয় ৯৪৮ কোটি টাকা); কিন্তু তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ইহা হইয়াছিল প্রথমে ৫৫০ কোটি টাকা এবং পরে চূড়ান্তভাবে ১১৫০ কোটি টাকা। অপরপক্ষে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা হইয়াছিল ৮০০ কোটি টাকা, পরে ইহা প্রায় ১১০০ কোটি টাকা হয়; কিন্তু, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায়

বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ২২০০ কোটি টাকা। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি, জলসেচ এবং সমাজ উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা অপেক্ষা বেশী দেওয়া হইয়াছিল।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অগ্রগতির সর্বশেষ বিবরণী (Latest Report of the Third Five-Year Plan)—তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রতি বৎসর জাতীয় আয় শতকরা পাঁচভাগ বাড়িবে বলিয়া কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় জাতীয় আয় গড়ে বাড়িয়াছে শতকরা বাৎসরিক ২.৫ ভাগ হারে। ১৯৫৫-৬৬ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে ১৯৬৪-৬৫ সালে মাথা পিছু আয় ছিল ৪৪৭ টাকা। ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেট বক্তৃতায় তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরী তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অগ্রগতির যে চিত্র দিয়াছিলেন তাহাও খুব নৈরাশ্যজনক।

শিল্পক্ষেত্রে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অগ্রগতি অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক; উৎপাদন লক্ষ্য হইতে ইহা অনেক পিছনে রহিয়াছিল। ইহার কারণস্বরূপ আংশিকভাবে কাঁচা-মালের অভাব এবং আংশিকভাবে বিদ্যুৎশক্তি, পরিবহন, কয়লা, ইস্পাত ইত্যাদির অভাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় গড়ে শিল্পোৎপাদন শতকরা ৭ ভাগ বাড়িয়াছিল। ১৯৬৪ সাল হইতে শিল্পোৎপাদনের হার কমিয়া গিয়াছিল।

খাদ্য সংকট

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসর হইতে খাদ্যসংকট খুব তীব্র হয়, পঞ্চম বৎসর ইহা খুবই তীব্র হইয়াছিল। যদিও ১৯৬৪-৬৫ সালে ৮৯ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইয়াছিল তবুও সমস্যার সমাধান হয় নাই। ১৯৬৫-৬৬ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হইয়াছিল মাত্র ৭২ মিলিয়ন টন; অথচ সেই বৎসরে উৎপাদন লক্ষ্য ছিল ৯২ মিলিয়ন টন। ১৯৫২-৫৩ সালের সাধারণ মূল্যসূচী ১০০ ধরিলে ১৯৬৩ সালের ৩১শে অক্টোবর ইহা ছিল ১৩৬ এবং ১৯৬৪ সালের ২৩শে জানুয়ারী ইহা ছিল ১২৭ এবং ১৯৬৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ইহা হইয়াছিল ১৬৯।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মোট ব্যয় ৭,৫০০ কোটি টাকা হইতে বেশী হইয়াছিল। সর্বশেষ হিসাবে জানা যায়, ইহা প্রায় ৮,৬৩০ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছিল। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ঘাটতি অর্থসংস্থান ধরা হইয়াছিল ৫৫০ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১,১৫০ কোটি টাকা।

মূল্যস্তর বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা

জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাওয়ায়, ইহা প্রতিরোধ করিবার জন্য ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া ব্যাংকের সুদের হার শতকরা চার ভাগ হইতে সাড়ে চার ভাগ পর্যন্ত বাড়াইয়াছিল। ১৯৬৩ সালের ২৭শে এপ্রিল মজুত চিনির বিরুদ্ধে ব্যাংকগুলি ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে শতকরা ৪৫ ভাগ margin requirement রাখার ব্যবস্থা রিজার্ভ ব্যাংক করিয়াছিল! ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাংক রেট শতকরা ৫ ভাগ এবং ১৯৬৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী শতকরা ৬ ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

১৯৬৩ সালের ৩০শে অক্টোবর রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ

প্রদান করার প্রথা আরও কঠিন করা হয়। কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সালের প্রথম দিকে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতির অবস্থা খুব শোচনীয় হইয়াছিল। ১৯৬২ সালের ৮ই জুন তারিখে ভারতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র ১০০ কোটি টাকা। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৯৫ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়িয়া যায়। ১৯৬৩-৬৪ সালে ভারতের বৈদেশিক লেনদেন ব্যালান্স অবস্থার সাময়িক উন্নতি হইয়াছিল। পি. এল. ৪৮০ সহ ভারতবর্ষ তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার ১,৫৭৫ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য লাভ করে। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রায় রিজার্ভের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়। ১৯৬৫ সালের জুন মাসে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৮০ কোটি টাকায় নামিয়া আসে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতি

১৯৬৩ সালের ১০ই জানুয়ারি তারিখে চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্যকরী করেন। বেআইনীভাবে স্বর্ণ সঞ্চয় এবং চোরা চালান বন্ধ করা এবং দেশের প্রতিরক্ষার জন্য স্বর্ণ সম্পদের সংহতি-করণই (mobilisation) এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল। আন্তর্জাতিক দামের ভিত্তিতে ভারতে বর্তমানে খাঁটি স্বর্ণের দাম প্রতি আউন্স ৬২ টাকা ৭৫ পয়সা সরকার ধার্য করিয়া দিয়াছেন। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় অস্ত্রশস্ত্র আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। সেইজন্য স্বর্ণসম্পদ সংহতিকরণ ছাড়া সরকারের গত্যন্তর নাই। কিন্তু, এই নীতি কতটা সফল হইয়াছে সেই সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ নীতি

কর্মসংস্থান নীতির ক্ষেত্রে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য কিছুই হয় নাই। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ১৪ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছিল কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৯০ লক্ষ হইতে ১ কোটি লোক বেকার থাকিয়া গিয়াছিল।

কর্মসংস্থান নীতি

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সরকারীক্ষেত্রে যে ৭৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করিবার কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে, তাহা কার্যকর হয় নাই। কারণ, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় যত টাকাই বরাদ্দ থাকুক না কেন, প্রকৃত খরচের পরিমাণ ৮৫৭৭'২ কোটি টাকা অনুমিত হইয়াছিল।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাটি যে কতিপয় ভুল তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ হইতেছে খাদ্য-সমস্যা এবং মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা। তৃতীয় পরিকল্পনায় চূড়ান্তভাবে ১১৫০ কোটি টাকায় ঘাটতি অর্থসংস্থান করা হয়।

Exercise

1. Give a review of India's First Five-year Plan.
(ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার একটি বিবরণী দাও।) (১৬৯-১৭১ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the features of the Second Five-year plan and add a note on its success and failures.

(দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর এবং ইহার সাফল্য ও ব্যর্থতার উপর একটি টীকা লিখ।) (১৭২-১৭৬ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the features of India's Third Five-year Plan and add a note on its latest report.

(ভারতের তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর এবং ইহার সর্বশেষ বিবরণীর উপর একটি টীকা লিখ।) (১৭৬ ৭৮ পৃষ্ঠা ; ১৭৯-১৮০ পৃষ্ঠা)

সপ্তদশ অধ্যায় | চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা (The Fourth Five-Year Plan)

১৯৬৬ সালের ২৯শে আগস্ট তারিখে ভারত সরকার চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং ইহাতে মোট ২৩,৭৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন নূতন করিয়া চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে। আশা করা হইয়াছিল, ১৯৬৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে নূতন চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা আরম্ভ হইবে। ইতিমধ্যে ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য তিনটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

পূর্বতন খসড়া চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা বাতিল করার কারণগুলি হইতেছে (১) এতবড় পরিকল্পনার অর্থসংস্থান করিবার মত আর্থিক সঙ্গতি সরকারের ছিল না। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ভারতীয় মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস করিবার পরেও রপ্তানির পরিমাণ আশানুরূপ বাড়ে নাই। বৈদেশিক মুদ্রার প্রচণ্ড ঘাটতি দেখা গিয়াছিল। (২) পূর্বতন খসড়া চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনাটি বর্জন করিবার আরেকটি কারণ ছিল এই যে ইহাতে বৈদেশিক সাহায্য পাইবার ব্যাপারে একটি অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে আশা করা হইয়াছিল তাহা পাইবার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ ছিল। (৩) পূর্বতন খসড়া চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনাটি বর্জন করিবার আরেকটি কারণ ছিল এই যে ইহার অতিকায় আকৃতি অনেককেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। পরিকল্পনার আকার শুধু বড় করিলেই চলে না। ইহা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে কার্যকর হইতে পারে, সেজন্য পরিকল্পনাটিকে বাস্তবসম্মত করা চাই। পর পর দুই বৎসর অজন্মা ও খরার জন্য খাদ্যসংকট তীব্ররূপ ধারণ করে। ইহার ফলে নূতন করিয়া চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রতি পদক্ষেপ সম্পর্কে চিন্তা করা হয়।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য (Features of the Fourth Five-Year Plan)—চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধ্যাপক গ্যাডগিল তাঁহার প্রতিবেদনে বলিয়াছেন যে (১) আত্ম-নির্ভরশীলতার দিকে অগ্রসর হওয়া,

(২) উন্নয়নের সুফল যাহাতে সমানভাবে বন্টিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়নের ব্যবস্থা করা, এবং (৩) স্থিতিশীলতা সহ উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়া। বিদেশী সাহায্যের উপর বরাবর নির্ভর করিয়া থাকা অর্থনৈতিক সুস্থতার লক্ষণ নয়; বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভরশীলতা যাহাতে অর্জন করা যায় সেজন্য রপ্তানির পরিমাণ শতকরা ৭ ভাগ হারে বাড়াইবার কর্মসূচী চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় গৃহীত হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় জাতীয় আয় শতকরা ৫.৫ ভাগ, কৃষি উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ এবং শিল্পোৎপাদন শতকরা ৮ ভাগ বাড়াইবার কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে।

১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে খসড়া চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা কার্যকর হয়। খসড়া চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার মোট ব্যয়-বরাদ্দ ছিল ২৪,৩৯৮ কোটি টাকা। তাহার মধ্যে সরকারী উদ্যোগে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ১৪,৩৯৮ কোটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগে ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ১০,০০০ কোটি টাকা। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ সম্প্রতি অনুমোদিত হইয়াছে। চূড়ান্ত চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় সামগ্রিক বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ২৪,৮৫৫ কোটি টাকা; খসড়া পরিকল্পনায় যে বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা ৪৫৭ কোটি টাকা বেশী। খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী খাতে যে ১৪,৩৯৮ কোটি টাকার বরাদ্দ ছিল, তাহা বাড়াইয়া বর্তমানে করা হইয়াছে ১৫,৮৭৯ কোটি টাকা। বেসরকারী খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১০,০০০ কোটি টাকা হইতে কমাইয়া করা হইয়াছে ৮,৯৭৬ কোটি টাকা। সরকারী খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ যা বাড়ানো হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৫১৭ কোটি খরচ হইবে রাজ্য সরকারের অধীন উদ্যোগগুলিতে এবং অবশিষ্ট ৯৬৪ কোটি টাকা খরচ হইবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন উদ্যোগগুলিতে। রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে মোট বরাদ্দ ৫১৭ কোটি টাকা বাড়িয়া যাওয়ায় মোট খরচের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৬৫৮৩ কোটি টাকা।

প্রাথমিক পর্যায়ে খসড়া চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ১৪,৩৯৮ কোটি টাকা নিম্নোক্তভাবে বণ্টন করা হইয়াছিল:—কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ—২২১৭ কোটি টাকা; জলসেচ এবং বন্যা-নিয়ন্ত্রণ—৯৬৪ কোটি টাকা; বৈদ্যুতিক শক্তি—২০৮৫ কোটি টাকা; গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্প ২৯৫ কোটি টাকা; পরিবহন ও যোগাযোগ—৩১৭৩ কোটি টাকা; শিল্প ও খনিজ সামগ্রী—৩০৯০ কোটি টাকা; শিক্ষা—৮০২ কোটি টাকা; বৈজ্ঞানিক গবেষণা—১৩৪ কোটি টাকা; স্বাস্থ্য—৪৩৭ কোটি টাকা; পরিবার পরিকল্পনা—৩০০ কোটি টাকা; জল সরবরাহ এবং নিকাশ ব্যবস্থা– ৩৩৯ কোটি টাকা; গৃহনির্মাণ এবং শহর ও আঞ্চলিক উন্নয়ন—১৭১ কোটি টাকা; অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ—১৩৪ কোটি টাকা; সমাজ কল্যাণ, শ্রম কল্যাণ এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ—৭৪ কোটি টাকা এবং অন্যান্য কর্মসূচী বাবদ ১৮৩ কোটি টাকা।

চূড়ান্ত চতুর্থ পাঁচসালা কল্পনায় যে অতিরিক্ত প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে আছে বোকারো ইস্পাত প্রকল্পের সম্প্রসারণ, আসামে দ্বিতীয় তৈল শোধনাগার স্থাপন, ইস্পাত প্রকল্পগুলির ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতার সম্প্রসারণ, স্কুটার নির্মাণ প্রকল্প, দ্বিতীয় কেব্‌ল্ কারখানা স্থাপন এবং কয়লা, অ্যালুমিনিয়ম, তামা, নিকেল প্রভৃতি খনিজ সম্পদের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।

চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে কৃষির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৯৫ মিলিয়ন টন এবং ৯৪ মিলিয়ন টন। চতুর্থ পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন লক্ষ্য করা হইয়াছে ১২০ মিলিয়ন টন। পাটের উৎপাদন ১৯৬৮-৬৯ সালে হইয়াছে ৬.২ মিলিয়ন বেইল; চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় পাটের উৎপাদন লক্ষ্য ধরা হইয়াছে ৭.৪ মিলিয়ন বেইল। তুলা এবং তৈলবীজের ক্ষেত্রে উৎপাদন যথাক্রমে ৬ মিলিয়ন বেইল এবং ৮.৫ মিলিয়ন টন পর্যন্ত বাড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইক্ষুর উৎপাদন (গুড়) ১৯৬৮-৬৯ সালে ছিল ১২ মিলিয়ন টন; চতুর্থ পরিকল্পনায় ইহার উৎপাদন লক্ষ্য ধরা হইয়াছে ১৫ মিলিয়ন টন। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষির উৎপাদন শতকরা পাঁচভাগ করিয়া বাড়িবে ধরা হইয়াছে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্প

চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্পোৎপাদন প্রতি বৎসর শতকরা ৮ ভাগ করিয়া বাড়ানো লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। যে শিল্পগুলি তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল সেগুলিকে সম্পূর্ণ করিয়া তোলাই চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের মুখ্য কর্মসূচী। তাহা ছাড়া, রপ্তানিযোগ্য সামগ্রী উৎপাদনকারী এবং আমদানির বিকল্প সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্পগুলির উন্নয়নের উপর বিশেষ আরোপ গুরুত্ব করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতা বর্তমানের ৯ মিলিয়ন টন হইতে ১২ মিলিয়ন টন পর্যন্ত বাড়াইবার কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে। লৌহ আকরিকের উৎপাদন ধরা হইয়াছে ৫৩.৪ মিলিয়ন টন; ১৯৬৮-৬৯ সালে ইহার উৎপাদন ছিল ২৬ মিলিয়ন টন। ১৯৭৩-৭৪ সালে কয়লার মোট চাহিদা ৯৩.৫ মিলিয়ন টন ধরা হইয়াছে। বোকারো ইস্পাত কারখানায় ১৯৭০-৭১ সাল হইতে ইস্পাত উৎপাদন আরম্ভ হইবে। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং এইজন্য সরকারী খাতে ২৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় রপ্তানি উন্নয়ন

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় রপ্তানির পরিমাণ প্রতি বৎসর শতকরা ৭ ভাগ হারে বাড়াইবার কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে ভারতের মোট রপ্তানির মূল্য ছিল ১৩৩০ কোটি টাকা, ১৯৭৩-৭৪ সালে, অর্থাৎ, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে মোট রপ্তানির লক্ষ্য ধরা হইয়াছে ১৯০০ কোটি টাকা। এইজন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় (১) রপ্তানি বৃদ্ধি প্রকল্প-গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে, (২) কৃষির উপর যে সকল রপ্তানি সামগ্রী

নির্ভরশীল সেগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখিবার কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে, (৩) চিরাচরিত জিনিসগুলির (traditional goods) বাহিরে নূতন জিনিসের রপ্তানি বাড়াইবার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে (যেমন, লৌহ আকরিক, সিমেন্ট, কাগজ, রাসায়নিক সামগ্রী, ঔষধ এবং প্লাস্টিকের জিনিস প্রভৃতি), (৪) রপ্তানিক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়া বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করা, রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন খরচ কমানো, রপ্তানি সামগ্রীর মান উন্নয়ন করা, জাহাজ চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি করা প্রভৃতি ব্যবস্থার উপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পর্যটকদের আকৃষ্ট করিয়া বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়াইবার চেষ্টা করা হইবে।

চতুর্থ পরিকল্পনার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

চতুর্থ পরিকল্পনায় পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৩১৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে রেলওয়ে বাবদ খরচ ধরা হইয়াছে ১০৫০ কোটি টাকা, সড়ক নির্মাণ বাবদ খরচ ধরা হইয়াছে ৮২৯ কোটি টাকা, সড়ক পরিবহন বাবদ খরচ ধরা হইয়াছে ৮৫ কোটি টাকা, বন্দর উন্নয়ন এবং জাহাজ নির্মাণ বাবদ খরচ ধরা হইয়াছে যথাক্রমে ১৯৫ কোটি টাকা এবং ১৩১ কোটি টাকা। অসামরিক বিমান পরিবহনের জন্য ২০৩ কোটি টাকা এবং যোগাযোগ খাতে ৫২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং এইজন্য ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। শিক্ষা খাতে ৮০১ কোটি টাকা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার খাতে ১৩৪ কোটি টাকা এবং স্বাস্থ্য খাতে ৪৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় অর্থসংস্থান (Financing of the Fourth Five-Year Plan)—খসড়া চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় সরকারী খাতে যে ১৪,৩৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহার অর্থসংস্থান নিম্নলিখিতভাবে ধরা হইয়াছিল; বর্তমান করের ভিত্তিতে প্রাপ্য রাজস্ব বাবদ ২৪৫৫ কোটি টাকা এবং অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ বাবদ ২৭০৯ কোটি টাকা; সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির (রেলওয়ে ব্যতীত) উদ্বৃত্ত বাবদ ১৪৬৮ কোটি টাকা, রেলওয়ে উদ্বৃত্ত বাবদ ২৬৫ কোটি টাকা, রিজার্ভ ব্যাংকের সঞ্চিত মুনাফা বাবদ ১৬৫ কোটি টাকা এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয় বাবদ ৮০০ কোটি টাকা (অবশ্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয় এবং বার্ষিক সঞ্চয়ের টাকা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ইহা হইতে ১০৪ কোটি টাকা বাদ যাইবে); সরকারী ঋণের পরিমাণ হইবে ১১৬৬ কোটি টাকা, এবং সরকারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ড হইতে পাওয়া যাইবে ৬১০ কোটি টাকা; বিবিধ মূলধনী আয় বাবদ ১১৩০ কোটি টাকা, জীবনবীমা কর্পোরেশনের প্রদত্ত ঋণ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে ঋণ বাবদ পাওয়া যাইবে ৩১৩ কোটি টাকা; নীট বৈদেশিক অথবা সাহায্য এবং ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ ধরা হইয়াছে যথাক্রমে ২১১১ কোটি টাকা এবং ৮৫০ কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিতে আমানত বৃদ্ধি হইবে বলিয়া

আশা করা যাইতেছে। ঘাটতি অর্থসংস্থান অথবা নূতন মুদ্রার পরিমাণ যে ৮৫০ কোটি টাকার বেশী হইবে এই ধারণা করা অমূলক হইবে না। বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ সম্পর্কেও অনেকটা অনিশ্চয়তা রহিয়া গিয়াছে। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য গ্রামাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে বর্ধিত আয়ের উপর করের হার কিছু বাড়ানো উচিত।

মন্তব্য ঃ আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হইতেছে বেকার সমস্যা। কিন্তু বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে কোনও সুষ্ঠু নীতি চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় এখনও রূপায়িত হয় নাই। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধকল্পে একটি সুষ্ঠু মূল্যনীতিও এখন পর্যন্ত কার্যকর হয় নাই। তবে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চতুর্থ পরিকল্পনায় দেখা যাইতেছে। বিশেষত, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা এখনও অব্যাহত আছে। পর পর তিন বৎসর ধরিয়া কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়িতেছে বলিয়াই দেশে "সবুজ বিপ্লবের" (Green Revolution) সূচনা হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থার উন্নতির জন্য যেমন রপ্তানি বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে, অনুরূপভাবে আমদানির বিকল্প জিনিস উৎপাদনের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। পরিবার পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রচেষ্টা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

Exercise

1. Discuss the features of the Fourth Five-Year Plan.
[চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।] (১৮১-৮৪ পৃঃ)
2. Write a brief note on the financing of the Fourth Five-Year Plan.
[চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।] (১৮৪-৮৫ পৃঃ)

অষ্টাদশ অধ্যায়

সরকারের অর্থনৈতিক কাজকর্ম (Economic Functions of the Government)

যে কোন অর্থনৈতিক কাঠামোয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আগেকার দিনের অনেক অর্থনীতিবিদ্ ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ পছন্দ করিতেন না। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ যে কোন ক্ষেত্রেই অবাঞ্ছনীয়, এবং ইহা ব্যবসায়ীগণের উদ্যোগ নষ্ট করে। প্রত্যেক উৎপাদকই সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য কাজ করে এবং সরকারের উচিত নয় ইহাতে হস্তক্ষেপ করা। সুতরাং সরকারের প্রকৃতপক্ষে কোনও অর্থনৈতিক কাজ নাই।

কিন্তু এই নীতি বেশী দিন লোকের সমর্থন পাইল না। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের পর হইতে দেশের অর্থনৈতিক জীবন এত জটিল হইয়া পড়িল যে, শ্রমিকশ্রেণীর কাজের ব্যবস্থা, বাসস্থানের ব্যবস্থা, মজুরি নির্ধারণ, মালিকের শোষণের হাত হইতে রক্ষা, প্রতিযোগিতায় বিপর্যস্ত শিল্পগুলির রক্ষা, বেকার সমস্যার সমাধান, একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে সরকারের হস্তক্ষেপ বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়ে। দেশে কল্যাণ রাষ্ট্র (Welfare State) প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, তবে সরকারকে কিছু-না-কিছু অর্থনৈতিক কাজ করিতেই হইবে। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিতে সম্পূর্ণভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের উপর সামাজিক মালিকানা থাকে। রাষ্ট্র সমুদয় উপকরণ নিজের নিয়ন্ত্রণে আনিয়া দেশের অগণিত জনসাধারণের কল্যাণ করিতে চেষ্টা করে। শিল্প ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা, দেশে আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইয়া দেওয়া, জনসাধারণের জন্য সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক সাম্য বজায় রাখা,—এইগুলিই সমাজতন্ত্রী সরকারের অর্থনৈতিক কাজ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমাজতন্ত্রী সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা (Development Planning) বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning) তৈয়ার করে এবং ইহাকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করিবার চেষ্টা করে।

কল্যাণ রাষ্ট্রে সরকারের ভূমিকা

সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজ (Economic Functions of a Government)—সরকারের অর্থনৈতিক কাজগুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়।

১। **নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ (Regulatory Functions) ঃ** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ করিয়া থাকে। যেমন, শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনে লাইসেন্স প্রদান করা, ব্যবসায়-বাণিজ্যকে কতিপয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা, ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং প্রথা চালু করা প্রভৃতি। দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমেও সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থ-ব্যবস্থাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। যদি বেসরকারীক্ষেত্রের উপর সরকারের কোনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তবে ব্যক্তিগত প্রয়াসের অধীনে অর্থনৈতিক কাজকর্ম শোষণমূলক অথবা দুর্নীতিপরায়ণ হইতে পারে।

ভারতের দৃষ্টান্ত ঃ ভারত সরকার নানাবিধ নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ করিয়া থাকেন। দেশের চৌদ্দটি বাণিজ্যমূলক ব্যাংককে জাতীয়করণ করা এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা হইতেছে সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক কাজের একটি দৃষ্টান্ত। শ্রমিক-মালিক বিরোধ এড়াইবার জন্য শিল্প বিরোধ আইন (Industrial Disputes Policy), শিল্প গঠন সম্পর্কে লাইসেন্স প্রদান করার নীতি, খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য রেশনিং প্রথা ও খাদ্য সংগ্রহনীতির প্রবর্তন, শ্রমিকদের কাজকর্মের

অবস্থার উন্নতিকল্পে কারখানা আইন, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন (Workmens' Compensation Act), শ্রমিক সংঘ আইন (Trade Union Act), মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণের জন্য মহাজনী আইন (Money Lenders' Act), জিনিসপত্রের সঠিক ওজন ও মান নিশ্চিত করার জন্য প্রামাণিক ওজন ও পরিমাণ আইন (Standard weights and Measures Act) প্রভৃতি হইতেছে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক কাজের দৃষ্টান্ত। দেশে বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্পতাহেতু বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকল্পে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন (State Trading Corporation) গঠন, খাদ্য-সামগ্রীর উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলি কর্তৃক ঋণ প্রদান নিয়ন্ত্রণ, কর ফাঁকি বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিও ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক কাজের দৃষ্টান্ত। ভূমি সংস্কারকল্পে জোতের ঊর্ধ্বতম সীমা (Ceiling on landholdings) নির্ধারণ, শিল্প সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ, বাণিজ্য শুল্ক ধার্য করা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাও ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

২। **সমাজসেবামূলক কাজ (Social Services)**: সরকারের সমাজসেবামূলক কাজের একটি দিক হইতেছে শ্রমিক-কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য এবং তাহাদের উৎপাদনী শক্তি বাড়াইবার জন্য সরকারকে অনেক কাজ করিতে হয়। শ্রমিকদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার করা, উপযুক্ত মজুরি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা, শ্রমিকদের কাজের উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করা, বাসস্থান ও কাজের অবস্থার উন্নতি করা, চাকুরীর নিরাপত্তা ও অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, নারী-শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন ভাতা প্রদান করা, পঙ্গু, বৃদ্ধ ও বেকার শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য করা, এই কাজগুলি আধুনিক সরকারগুলি কিছু-না-কিছু করিয়া থাকে।

শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন করা ছাড়া সরকারের অন্যতম প্রধান সমাজসেবামূলক কাজ হইতেছে দেশের নিরক্ষরতা দূর করিয়া শিক্ষার সম্প্রসারণ করা। জনসাধারণের জন্য একটি ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা, এবং বাস্তহীনদের বসবাস ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা করাও সরকারের সমাজসেবামূলক কাজ। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করাও রাষ্ট্রের অন্যতম সমাজসেবামূলক কাজ।

ভারতের দৃষ্টান্ত: শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য ভারত সরকার ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমত, ১৯৪৮ সালের কারখানা আইনে ১৪ বৎসরের নিম্নবয়স্ক কোন শিশুকে চাকরিতে নিয়োগ করা চলিবে না। শিশুদের (১৪ হইতে ১৮ বৎসরের মধ্যে) দৈনিক কাজের সময় স্থির হইয়াছে ৪½ ঘণ্টা। অন্যান্য শ্রমিকদেরও কাজের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়া প্রাপ্তবয়স্কদের বাৎসরিক ১৮ দিন এবং শিশুদের ২৪ দিন সবেতন ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৮ সালের নিম্নতম

মজুরি আইন (Minimum Wages Act) অনুযায়ী সরকার কতিপয় শিল্পে শ্রমিকদের মজুরি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। তৃতীয়ত, ১৯৪৮ সালের কর্মচারী বীমাপ্রতিষ্ঠান আইন (Employee's State Insurance Corporation Act) অনুযায়ী শ্রমিকগণ সামাজিক নিরাপত্তা হিসাবে চিকিৎসার সুবিধা, অক্ষমতাকালীন সুবিধা, পোষ্যবর্গের সুবিধা, রোগকালীন সুবিধা এবং নারী শ্রমিকগণ প্রসূতিকালীন সুবিধা পাইবে। ইহা ছাড়া ১৯৫২ সালের কর্মচারী প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড অনুযায়ী বস্ত্র, লৌহ, সিমেণ্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং, কাগজ ও সিগারেট এই ছয়টি শিল্পে কর্মচারীদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সুবিধা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কয়লা-খনির শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পেও ১৯৫২ সালে একটি আইন প্রণীত হইয়াছে।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা বিষয়ে ভারতে মাথা পিছু শিক্ষাখাতে ব্যয় দাঁড়ায় ১২.১৩ টাকা। ভারতের শাসনতন্ত্রের নির্দেশমূলক নীতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার দশ বৎসরের মধ্যে ১৪ বৎসর বয়স্ক সকল বালক-বালিকার জন্য আবশ্যিক ভাবে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করিতে হইবে। কিন্তু ভারত সরকার এখন পর্যন্ত তাহা করিতে পারেন নাই। তবে সম্প্রতি শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য ভারত সরকার ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, ছাত্রদের লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা প্রদান প্রভৃতি-ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য না দেখাইতে পারিলেও এইগুলি ভারত সরকারের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। পাকিস্তান হইতে আগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্যও বিভিন্ন ব্যবস্থা হইয়াছে। জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও ভারত সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাইতে পারেন নাই।

৩। **উৎপাদনমূলক কাজ (Productive Activities):** দেশের কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় আয় বাড়ানো যে কোন সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক কাজ। বিশেষত, অনগ্রসর দেশে এই কাজের গুরুত্ব সর্বাগ্রে। উন্নত দেশগুলিতে সরকার বহুক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হয়। ব্রিটেনে বড় বড় শিল্পগুলি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াইবার জন্য সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা সরকার দিয়া থাকেন। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কোন কোন দেশে বিভিন্ন শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়। কৃষিক্ষেত্রেও সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। রপ্তানি শিল্পে এবং আমদানির বিকল্প জিনিস উৎপাদনকারী শিল্পগুলিতে উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টাও আধুনিক সরকারগুলি করিয়া থাকেন।

ভারতের দৃষ্টান্ত: প্রথম ও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভারত সরকার কৃষির উৎপাদন বাড়াইবার জন্য অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন—(১)

ভারতে আবাদী জমির আয়তন খুব ছোট ছোট বলিয়া এবং সেগুলি ইতস্তত ছড়ানো থাকায় সরকার জমি একত্রীকরণের চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা (Co-operative Farming) এবং সমবায়ের ভিত্তিতে গ্রামের উন্নতি করার (Co-operative Village Management) ব্যবস্থাও সরকার কর্তৃক অবলম্বিত হইয়াছে। (২) প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের স্বল্পতা দূর করিবার জন্য খাদ্য এবং কৃষির উপর অধিকতর গুরুত্ব অর্পণ করা হয়। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে সরকারের কাজে মোটামুটি সাফল্য অর্জিত হইয়াছে, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায়ও কৃষিক্ষেত্র একেবারে উপেক্ষিত হয় নাই। (৩) সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার মধ্য দিয়াও সরকার কৃষির উন্নতি এবং সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ জীবনের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। (৪) স্টেট ব্যাংক (State Bank) প্রতিষ্ঠা করিয়া, সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে অধিকতর সাহায্য প্রদান করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের দুইটি তহবিল খুলিয়া এবং জাতীয় গুদামঘর বোর্ড (National Warehousing Board) স্থাপন করিয়া সরকার কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। পাঁচসালা পরিকল্পনার মাধ্যমে জলসেচ ব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ভূমিক্ষয় নিবারণের সাহায্যে কৃষির উন্নতি এবং কুটিরশিল্প ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির মাধ্যমে কৃষকদের জন্য বিকল্প কাজের ব্যবস্থাও সরকার করিয়াছেন। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি-ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন আশানুরূপ বাড়ে নাই। ১৯৬৭-৬৮ সাল হইতে ১৯৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত পর পর তিন বছর কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকায় দেশে সবুজ বিপ্লব (Green Revolution) আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া সরকার দাবি করিতেছেন। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষির উৎপাদনী শক্তি বাড়াইবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

কৃষি-উৎপাদন গড়
ভারত সরকার কর্তৃক
অবলম্বিত ব্যবস্থা

১৯৪৮ সালে সর্বপ্রথম ভারত সরকারের সুনির্দিষ্ট শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। কিন্তু, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করায় উক্ত শিল্পনীতির পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সেজন্য ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল ভারত সরকারের নূতন শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন এবং শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, গুরুভার শিল্প ও যন্ত্রোৎপাদন করিবার শিল্প-গুলিকে গড়িয়া তোলা, শিল্পক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়াইয়া দেওয়া এবং একটি বৃহৎ সমবায়মূলক প্রচেষ্টার ক্ষেত্র গঠন করাই নূতন শিল্পনীতির লক্ষ্য। এই নীতি অনুযায়ী শিল্পগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথমত, যে সকল শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সরকার গ্রহণ করিবে এই রকম ১৭টি শিল্পের উল্লেখ

ভারত সরকারের
শিল্পনীতি
(Industrial Policy)

করা হইয়াছে। এই শিল্পগুলির মধ্যে আণবিক শক্তি, গোলাবরুদ, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, খনিজতৈল, বিমান এবং রেলপথ পরিবহন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়ত ১২টি শিল্পকে ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রায়ত্তে আনা হইবে। এই সব শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদিও নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবে তবুও বে-সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাকে সাহায্য করিবে। এই শ্রেণীতে রহিয়াছে কতিপয় খনিজ পদার্থ, এ্যালুমিনিয়ম, রসায়ন শিল্পের প্রয়োজনীয় উপজাত দ্রব্য, য়্যান্টিবাইওটিক, কৃত্রিম সার, জাহাজ-শিল্প ইত্যাদি। তৃতীয়ত, অবশিষ্ট শিল্পসমূহ তৃতীয় শ্রেণীতে রহিয়াছে এবং উহাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ভার বে-সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির হাতে ন্যস্ত হইবে। এই শিল্পনীতি অনুযায়ী সম্ভবপর সকল ক্ষেত্রেই সমবায়ের নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে এবং বে-সরকারী প্রচেষ্টার কার্যকলাপ সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত করিবার উৎসাহ প্রদান করা হইবে। কুটির ও গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য শিল্প সমবায় গঠনের উৎসাহ দেওয়া হইবে। বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, ক্রমেই তাহা কমাইয়া আনিতে হইবে, এবং নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও পরিবহন ব্যবস্থায় উন্নয়নকল্পে সরকার ক্রমেই অধিক দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করিতে সরকার সর্বদাই প্রস্তুত থাকিবেন যদি বৈদেশিক বিনিয়োগ-কারীগণ আমাদের দেশের শিল্পগুলি সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম চালু আছে, সেইগুলি মানিয়া চলিতে রাজী থাকেন। প্রয়োজন হইলে এদেশে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে জাতীয় স্বার্থে সরকার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন; তবে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত কোনও প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইবে না এবং এদেশ হইতে যাহাতে ইহারা নিজেদের দেশে টাকা পয়সা পাঠাইতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে।

নূতন শিল্প গঠনের জন্য লাইসেন্স প্রদান করার নীতি

১৯৭০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি ভারত সরকার শিল্পগুলিকে লাইসেন্স দেওয়ার একটি নূতন নীতি ঘোষণা করেন, যদি কোন কোম্পানীর বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয়ের পরিমাণ দশ লক্ষ টাকা অথবা মোট বিনিয়োগের শতকরা দশভাগের বেশী না হয়, তবে এককোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করিবার ক্ষেত্রে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না। ইহাতে শিল্পোৎপাদন বাড়িবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এক কোটি টাকার বেশী বিনিয়োগ করিতে হইলে সব শিল্পেরই লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে। ফার্টিলাইজার, ট্র্যাক্টর, বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত ভূমি কর্ষণের যন্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত, পেট্রোলিয়াম অপরিশোধিত ধাতু, কোকিং কয়লা, গুরুভার শিল্প-যন্ত্রপাতি, জাহাজ নির্মাণ, নিউজপ্রিন্ট, ইলেকট্রনিক প্রভৃতি শিল্পকে "সার শিল্প" (Core Industries) আখ্যা দিয়া ইহাদের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় সে সম্পর্কে একটি বিস্তৃত শিল্প পরিকল্পনা করিবার জন্য

ভারত সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন। বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের শিল্প উৎপাদন বহুল পরিমাণে শিল্প সংরক্ষণের উপর নির্ভর করে। এই উদ্দেশ্যে একটি সুষ্ঠু শিল্প-সংরক্ষণ নীতি ১৯৪৯-৫০ সালে প্রণয়ন করা হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত ফিসক্যাল কমিশন ভারতীয় শিল্পগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন। প্রথম শ্রেণীতে আছে দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প (Defence industries)। খরচ যাহাই হউক না কেন, জাতীয় স্বার্থে সরকার এই শিল্পগুলিকে সর্বদাই সংরক্ষণ প্রদান করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে কতিপয় বুনিয়াদী ও মৌলিক শিল্প (Key and basic industries), যেমন লৌহ ও ইস্পাত। এই শিল্পগুলিও সংরক্ষণের জন্য আবেদন করিতে পারে। তবে তাহাদের সংরক্ষণ দেওয়া হইবে কি না এবং দিলেও তাহা কতখানি দেওয়া হইবে সেই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন শুল্ক-কমিশন। অবশিষ্ট শিল্পগুলি আছে তৃতীয় শ্রেণীতে। এই শিল্পগুলিকে আবার তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—(১) যে শিল্পের উন্নতিকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে, (২) যে শিল্পগুলি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মৌলিক শিল্পগুলির উন্নতিতে সহায়ক এবং (৩) অন্যান্য শিল্পসমূহ। তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ প্রদান করিবার সময় শুল্ক-কমিশন দুইটি বিষয় বিবেচনা করিবেন : (১) যে শিল্প সংরক্ষণের জন্য আবেদন করিয়াছে,—এই দেশে ইহার কি কি সুবিধা আছে এবং এই শিল্পের সম্ভাব্য উৎপাদন খরচ কত হইতে পারে এবং শিল্পটি সংরক্ষণ বা অন্য প্রকারে সরকারী সাহায্য না লইয়াও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে কি না; অথবা (২) শিল্পটি এইরূপ কিনা যাহাকে জাতীয় স্বার্থে সংরক্ষণ প্রদান করা উচিত, অথবা যাহাকে সংরক্ষণ প্রদান করা হইলে দেশের জনসাধারণের উপর ব্যয়ভার খুব বেশী হইবে কি না। উপরি-উক্ত দুইটি বিবেচনার যে কোন একটি অনুযায়ী যদি শিল্পটি সংরক্ষণ পাইবার উপযুক্ত হয়, তবে ইহাকে সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে।

ভারত সরকারের শিল্প সংরক্ষণ নীতি (Fiscal Policy)

সম্প্রতি যে চৌদ্দটি ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে তাহাতে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প এবং রপ্তানি শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অধিক পরিমাণে মূলধন সরবরাহ হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

৪। **বেকার সমস্যার সমাধান (Solving the Unemployment Problem)**——আধুনিক সরকারগুলির অন্যতম প্রধান কাজ হইতেছে দেশে বেকার সমস্যার সমাধান করা। এজন্য সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে বেকার ভাতা দেওয়া হয়। সমাজতন্ত্রী না হইয়াও কোন কোন দেশ (যেমন, শ্রমিক সরকারের আমলে ইংলণ্ড) বেকার ভাতা প্রদান করিয়াছে। বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারকে নূতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হয়, জাতীয়

উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হয় এবং নিজের উদ্যোগে রাস্তাঘাট নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ, রেলপথ প্রভৃতি সরকারী বিনিয়োগ (public works) আরম্ভ করিতে হয় যাহাতে বেকার শ্রমিকগণ কাজ পায়। প্রয়োজন হইলে দেশের কর ব্যবস্থার (Tax-System) পরিবর্তন করিয়া এবং নূতন কাগজী-টাকা ছাপাইয়া সরকারকে এইসব বিনিয়োগের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। সাধারণত, গরীবদের উপর হইতে করের বোঝা তুলিয়া দিয়া কর-প্রদানের হার কমাইয়া দিয়া এবং বড়লোকদের উপর নূতন কর স্থাপন করিয়া অথবা বর্তমান করগুলির হার বাড়াইয়া দিয়া সরকারকে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। অনেক সময় বাজেটে আয় অপেক্ষাও ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া এবং বাড়তি ব্যয়ের জন্য নূতন টাকার সৃষ্টি করিয়া সরকারকে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হয় এবং অন্যান্য বিনিয়োগে হাত দিতে হয়।

ভারতের দৃষ্টান্ত: সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা যায় ১৯৬৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে বেকার লোকের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ। কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাজের অভাব ভারতের বেকার সমস্যার বৈশিষ্ট্য। ১৯৫১ সাল হইতে ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সুরু হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত ভারত সরকারের পক্ষে বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে ভারত সরকার শ্রম-নিবিড় (Labour-intensive) উৎপাদন পদ্ধতির উপর এবং কৃষি-ভিত্তিক শিল্পগুলির (agro-industries) উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। গ্রামীণ শিল্পগুলির পুনর্গঠন করিয়া এবং দেশের মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া নূতন শিল্প গঠনের মাধ্যমে ভারত সরকার আরও বেশী কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ করিবার চেষ্টা চালাইতেছেন। বিভিন্ন বড় বড় শহরে কর্মবিনিময় সংস্থার (Employment Exchange) মাধ্যমে বেকার জনসাধারণকে কাজের সন্ধান দেওয়া এবং সমবায় আন্দোলন ও গ্রামাঞ্চলে সমাজসেবামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার উপরেও সম্প্রতি ভারত সরকার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভারতে ৪৫ লক্ষ লোকের জন্য কর্মসংস্থান করা হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় যথাক্রমে প্রায় ৮০ লক্ষ এবং ১ কোটি ৫ লক্ষ লোকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। তবুও বেকার সমস্যার তীব্রতা ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে।

৫। সরকার ও মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ (Government's role in maintaining Price stability)—দেশে যদি মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যায়, তবে জনসাধারণের বিভিন্ন জিনিস কিনিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। কিন্তু যদি সেই অনুপাতে দেশের উৎপাদন না বাড়ে তবে দেশে জিনিসপত্রের দাম খুব কম পড়িয়া যায়। মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার জন্য সরকারকে একটি সুনির্দিষ্ট

মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মারফত মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে পারে অথবা জনসাধারণের উপর কর বৃদ্ধির মারফত জনসাধারণের ক্রয় শক্তি কমাইবার চেষ্টা করেন। তাহা ছাড়া আবশ্যকীয় জিনিসপত্রের নিয়ন্ত্রণ করিয়া এবং সর্বোচ্চ দাম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া রাষ্ট্র মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিতে পারে।

ভারতের দৃষ্টান্তঃ ভারত সরকার জিনিসপত্রের দাম কমাইয়া দেশে স্থিতিশীলতা বজায় রাখিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে সুদের হার বাড়াইয়াছে এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। প্রয়োজনীয় ভোগ-সামগ্রীগুলির বিপক্ষে যাহাতে ব্যাংকগুলি ঋণ প্রদান করে এবং যাহাতে ফাটকা কারবারের সৃষ্টি না হয় সেজন্যও রিজার্ভ ব্যাংক বিভিন্ন বাণিজ্যমূলক ব্যাংককে নির্দেশ দিয়াছে। অযথা ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ে এবং বিলাস সামগ্রী ক্রয়ে যাহাতে অর্থ ব্যয় না হয় সেজন্য ভারত সরকার পরোক্ষ কর ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিয়াছেন। অপরদিকে প্রত্যক্ষ করের হার বাড়াইয়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকের ক্রয় ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, কতিপয় সামগ্রীর নির্দিষ্ট মূল্য ধার্য করিয়া এবং খাদ্য-সামগ্রীর ক্ষেত্রে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া ভারত সরকার জিনিসপত্রের দাম কমাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

৬। আয় বৈষম্য দূরীকরণ এবং একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিরোধ (Reducing inequalities in income and controlling the growth of monopolies)—আধুনিককালে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক সরকার জনসাধারণকে সমান অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে চেষ্টা করে। আবার সমাজতন্ত্রী সরকারগুলিও চেষ্টা করে দেশ হইতে আয় ও ধনের সমুদয় বৈষম্য দূর করিতে। এইজন্য সরকার বড়লোকের উপর অধিক আয়কর, সম্পত্তিকর, অন্যান্য কর স্থাপন এবং গরীবদের কর হইতে রেহাই প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করে। তাহা ছাড়া, গরীবদের নানাভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়াও তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা করা হয়। দেশের অর্থনৈতিক শক্তি যাহাতে একস্থানে কেন্দ্রীভূত না হইয়া দেশের সর্বত্র ন্যায়সঙ্গত এবং সমান ভাবে বণ্টিত হয়, সেইজন্য সরকারের ব্যয়-নীতিকেও পরিকল্পিত উপায়ে পরিচালনা করিতে হয়। বিশেষত অপেক্ষাকৃত গরীবদের জন্য সরকারী ব্যয়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা করা হয়। এইজন্য আধুনিক সরকারগুলি (যেমন, ভারত) গ্রামাঞ্চলে সমাজ সেবামূলক কাজের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

একচেটিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রতিরোধ করাও সরকারের অন্যতম কাজ। একচেটিয়া কারবারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধারণ ক্রেতাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ীগণ নিজেদের উৎপাদনাত্মক

প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে ব্যর্থ হয়। একচেটিয়া কারবারে শ্রমিক শোষণও ক্রমশই বাড়িয়া চলে। এইজন্য আধুনিক সরকারগুলি সর্বদাই একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। ব্যক্তিগত একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিরোধ করার জন্য অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবসায়ের (state monopolies) সৃষ্টি করা হয়, কারণ, সেক্ষেত্রে সমাজের সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়।

ভারতের দৃষ্টান্ত : সাধারণ মানুষের মধ্যে আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইবার জন্য ভারত সরকার একদিকে যেমন বড়লোকদের উপর করের বোঝা বাড়াইয়াছেন, অপরদিকে কোন কোন শিল্পে শ্রমিকদের জন্য সর্বনিম্ন মজুরির (minimum wages) ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের সব শিল্পের ক্ষেত্রে মজুরি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয় নাই। গরীবদের অবস্থার উন্নতির জন্য এবং একটি ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করার জন্য সরকারের দিক হইতে আশানুরূপ ব্যবস্থা এখনও অবলম্বিত হয় নাই। বিনা বেতনে বালক-বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, বস্তি উচ্ছেদ করিয়া গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা, খাদ্য-সামগ্রীর দাম কমাইবার জন্য রেয়াৎ (subsidy) দেওয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া ভারত সরকার গরীবদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করিতেছেন।

একচেটিয়া ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের উপায় নির্দেশ করিবার জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটি (যেমন, আয়-বণ্টনের উপর 'মহলানবীশ কমিটি', একচেটিয়া ব্যবসায় সম্পর্কে 'হাজারী কমিশন', শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থা সম্পর্কে 'দত্ত কমিটি') গঠন করিয়াছেন। সম্প্রতি ভারত সরকার যে শিল্প লাইসেন্স নীতি ঘোষণা করিয়াছেন, সেই অনুযায়ী সরকারী ক্ষেত্রের আওতার বাহিরে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠনের অনুমতি দিয়াছেন বটে,—কিন্তু সেগুলি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে। এক কোটি টাকার উপরে বিনিয়োগ করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স আদায় করিতে হইবে।

ভারতের শাসনতন্ত্রে ন্যায়ের (justice) আদর্শ গৃহীত হইয়াছে এবং সকল নাগরিককেই সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার আদর্শ বিঘোষিত হইয়াছে। ভারত সরকার এই আদর্শকে লক্ষ্য রাখিয়াই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে একটি সমাজ গঠনের চেষ্টা করিতেছেন, ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনারও অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইয়া দেশের অর্থনৈতিক শক্তির সমবণ্টন করা যাহাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতে অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত না হয়।

৬। **ব্যাংক ব্যবস্থার সুসংগঠন করা (Organisation of the Banking system)**—যে কোন সরকারেরই অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক কাজ হইতেছে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার সুসংগঠন করা। কারণ, দেশের মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির রাখা, এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি করার ক্ষেত্রে ব্যাংক ব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। সব সরকারই এই উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থাপন করিয়া থাকেন। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করার ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

ভারতের দৃষ্টান্তঃ ভারতে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়াকে ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ১৯৫৫ সালে স্টেট ব্যাংক স্থাপিত হয়। এই ব্যাংক কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমান চৌদ্দটি ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে। আশা করা যায়, এই ব্যাংক জাতীয়করণের ফলে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প এবং রপ্তানি-শিল্পে উৎপাদনমূলক প্রচেষ্টার জন্য ব্যাংকপ্রদত্ত ঋণের পরিমাণ বাড়িবে।[১] রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির বাহিরে যে ব্যাংকগুলি আছে সেগুলির জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (social control) ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এই ব্যাংকগুলি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণদান যথাযথভাবে হইতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য এবং ঋণদান নীতি প্রয়োগে সম্মতি প্রদান করার জন্য একটি জাতীয় ঋণ পরিষদ (National Audit Council) গঠন করা হইয়াছে।

৭। **সরকার ও বহির্বাণিজ্য (Government and Foreign Trade)**—দেশের বহির্বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দেশে আমদানির পরিমাণ কমাইয়া দিয়া দেশ হইতে বিদেশে জিনিসপত্রের রপ্তানি বাড়াইয়া দিতে সব রাষ্ট্র চেষ্টা করিয়া থাকে। আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার আমদানি নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তন করে অথবা বিদেশ হইতে আমদানি করিবার জিনিসপত্রের উপর বেশী হারে শুল্ক ধার্য করে; বহির্বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকার বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্গে দেশের মুদ্রার বিনিময় হারও পরিবর্তিত করে। কোন কোন দেশে আজকাল রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের (State trading) প্রচলন করা হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে সরকার বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা উন্নয়নের জন্য শিল্প সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তন করেন।

ভারতের দৃষ্টান্তঃ ভারতে বহির্বাণিজ্যের উন্নতির জন্য রপ্তানি বৃদ্ধির এবং আমদানি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় রপ্তানির পরিমাণ শতকরা ৭ ভাগ বাড়াইবার কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে। সরকার যে শুধু রপ্তানির পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা নহে, আমদানির পরিমাণ কমাইবার জন্য দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর এবং আমদানির বিকল্প জিনিসের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। বহির্বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন (State Trading Corporation) গঠন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, ধারে বিদেশে মাল রপ্তানি করিবার ক্ষেত্রে টাকা প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চয়ত

---

১ ভারতে ব্যাংক জাতীয়করণের উপর ১২৭-১২৮ পৃষ্ঠার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

প্রদান করিবার জন্য ভারত সরকার রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা কর্পোরেশন (Export Credit Guarantee Corporation) গঠন করিয়াছেন। ভারতে রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে বহির্বাণিজ্যে ভারতের অবস্থার উন্নতিকল্পে ১৯৬৬ সালের ৫ই জুন তারিখে ভারত সরকার টাকার বহির্মূল্য হ্রাস (devaluation) করিয়াছিলেন। বহির্বাণিজ্যের অবস্থা যাহাতে উন্নত হয় সেজন্য ভারত সরকার বৈদেশিক মুদ্রা (Foreign exchange) নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও সুদৃঢ় করিয়াছেন।

৮। **সরকার ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Government and Economic Planning)**—দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ হইতেছে একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গঠন করা। কোন দেশেরই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয় যদি সেই কাজে সরকারের কোন সক্রিয় ভূমিকা না থাকে। এই সক্রিয় ভূমিকা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে রূপায়িত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যাহাতে কেবল বেকার সমস্যার তীব্রতা এবং দেশবাসীর দারিদ্র্য হ্রাস পায়, সেজন্য সরকারকে জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি এবং নূতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হয়। এইগুলি যদি পরিকল্পিত উপায়ে করা না হয়, তবে এইগুলির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয় না। কতিপয় অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং নির্দিষ্ট সঙ্গতির সাহায্যে সম্পন্ন করিবার জন্য যে পরিকল্পনা করা হয় তাহাকেই আমরা বলি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning)। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গঠন করার মুখ্য দায়িত্ব সরকারের এবং এজন্য সরকারকে একটি পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) গঠন করিতে হয়। এই কমিশন দেশের জনসংখ্যা এবং সমুদয় প্রাকৃতিক ও আর্থিক সম্পদ সম্বন্ধে সব রকম জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেগুলি বিশ্লেষণ করিয়া একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কতিপয় উৎপাদন লক্ষ্য (targets of production) স্থির করে। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদন লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করিবার কর্মসূচী গৃহীত হয়। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

Exercise

1. Discuss the Economic Functions of a Government.
(সরকারের অর্থনৈতিক কাজগুলি আলোচনা কর।)

[**সংকেত :** এই অধ্যায়ে সরকারের যে আটটি কাজের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সারাংশ লিখিতে হইবে।]

2. Discuss the Fiscal Policy and Industrial Policy of the Government of India. (ভারত সরকারের শিল্প সংরক্ষণ নীতি এবং শিল্পনীতি আলোচনা কর।) (১৮৯-১৯১ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the measures adopted by the Government of India for labour welfare. (শ্রম-কল্যাণ সম্পর্কে ভারত সরকার কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি আলোচনা কর।) (১৮৭-১৮৮ পৃষ্ঠা)

4. Discuss ths measures adopted by the Government of Indin for reducing in equalities of income. (আয়ের বৈষম্য কমাইবার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি আলোচনা কর।) (১৯৩-১৯৪ পৃষ্ঠা)

5. What measures have been adopted by the Government of India to develop the agricultural system. (কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ভারত সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?) (১৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা)

6. Write a note on the unemployment problem in India. Discuss the employment policy during the plan period. (ভারতের বেকার সমস্যার উপর একটি টীকা লিখ। পরিকল্পনাকালে কর্মসংস্থান নীতি সম্পর্কে আলোচনা কর।) (১৬৮ ১৯২ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the measures adopted by the Government of India to improve the position of foheign trade. (বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা উন্নত করার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি আলোচনা কর।) (১৬৯ পৃষ্ঠা ; ১৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা)

উনবিংশ অধ্যায়

সরকারী রাজস্ব এবং ব্যয় নীতি (Government Revenues and Taxation)

ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় নীতি এবং সরকারী আয়-ব্যয়ের পার্থক্য

ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় (Private Finance) এবং সরকারী আয়-ব্যয়ের (Public Finance) মধ্যে আমরা বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাই। ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় নীতিতে জনসাধারণ আয় অনুযায়ী ব্যয় করে ; কিন্তু সরকারী আয়-ব্যয় নীতিতে সরকার ব্যয়ের পরিমাণ আগে স্থির করে এবং ব্যয় অনুযায়ী আয় বাড়ায়। আয় হইতে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়া গেলে জনসাধারণকে ধার করিতে হয়। অনুরূপভাবে সরকারকেও বাড়তি ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য সরকারী ক্ষেত্রে ধার করিতে হয়। সরকার ধার করে বিদেশ হইতে অথবা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যমূলক ব্যাংক এবং জনসাধারণের নিকট হইতে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ধার নেওয়ার অর্থ হইতেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মারফৎ নূতন কাগজী মুদ্রা সৃষ্টি করা।

রাষ্ট্রের রাজস্বের উৎস (Sources of Revenues of the State)—রাষ্ট্রের রাজস্ব সংগ্রহ করিবার উৎস আছে। প্রথমত, রাষ্ট্র জনগণের উপর কর ধার্য করিতে পারে। রাজস্ব সংগ্রহের ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় উৎস। দ্বিতীয়ত, সরকার নিজের সম্পত্তি হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারে। কোন রাজ্যের বন সম্পদ অথবা নিজস্ব গৃহ অথবা অন্য সম্পত্তি হইতেও কিছু উপার্জন করিতে পারে। তৃতীয়ত,

সরকার ব্যবসায় পরিচালনা করিয়াও কিছু উপার্জন করিতে পারে। ভারত সরকার ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading Corporation) প্রতিষ্ঠান, পরিবহন, ব্যবসার পরিচালনা এবং ডাকবিভাগ পরিচালনা করিয়া কিছু উপার্জন করে। সর্বশেষে, সরকার জনসাধারণের কোন বিশেষ উপকার করিয়া ইহার বিনিময়ে তাহাদের উপর দাম অথবা ফি (Fee) আদায় করিতে পারে।

কর (Taxation)—কোন প্রতিদানের আশা না রাখিয়া যখন বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে টাকা প্রদান করিতে হয়, তখন ইহাকে কর বলে। কর সকলকেই প্রদান করিতে হয় যদি তাহাদের উপর ধার্য করা হয়। দ্বিতীয়ত, কর প্রদান করিবার সময় সরকারের নিকট হইতে ইহার প্রতিদানে কিছু পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। যখন অর্থ প্রদানের প্রতিদানে কিছু পাইবার সম্ভাবনা থাকে, সরকার কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অথবা জনগণকে কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য জনগণের নিকট অর্থ আদায় করে, তখন ইহাকে 'Fee' বলে।

করের প্রকারভেদ (Types of Taxation)—কর সাধারণত প্রত্যক্ষ (Direct) অথবা পরোক্ষ (Indirect) এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যক্ষ করে কর প্রদানের বোঝা প্রত্যক্ষভাবে করদাতাগণের উপর পড়ে। অপ্রত্যক্ষ করে কর প্রদানের বোঝা করদাতাগণের উপর পড়ে না। ইহা চূড়ান্তভাবে পড়ে ক্রেতাদের উপর। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর। যিনি করপ্রদানযোগ্য আয় উপার্জন করেন তাঁহাকে আয়কর প্রদান করিতে হয়। বিক্রয় কর একটি পরোক্ষ কর। এই কর প্রকৃতপক্ষে প্রদান করিতে হয় ক্রেতাগণকে। সিনেমা দেখার সময় যে প্রমোদকর দিতে হয়, তাহা একটি পরোক্ষ কর। এই কর প্রদান করিতে হয় তাহাদের, যাহারা সিনেমার টিকিট ক্রয় করেন।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর

যখন লোকের আয় বাড়িয়া গেলে করের পরিমাণ বাড়িয়া যায়, তখন ইহাকে প্রগতিশীল কর (Progressive Tax) বলে। এই কর ধার্য করা হইলে বড়লোকদের বেশী কর প্রদান করিতে হয়। তাহাতে আয় ও ধনের বৈষম্য কমিয়া যায় এবং সমাজে আয় ও ধনের অপেক্ষাকৃত সমবণ্টনের লক্ষণ দেখা যায়। যখন আয় বাড়িয়া গেলেও করের হার একই থাকে তখন ইহাকে সমানুপাতিক কর (Proportional Tax) বলে। আবার যখন আয় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে করের হার কমিয়া যায়, তখন ইহাকে প্রতিক্রিয়াশীল কর (Regressive Tax) বলে। যে রাষ্ট্র কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হইতে চাহে, সেই রাষ্ট্রকে প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থায় গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে সমাজের অর্থের বৈষম্য কমিয়া যায়।

প্রগতিশীল, সমানুপাতিক এবং প্রতিক্রিয়াশীল কর

করের সূত্র (Canons of Taxation)—সরকারের দিক হইতে কর ধার্য করিবার কতিপয় সাধারণ সূত্র থাকা উচিত। অ্যাডাম স্মিথ চারিটি সূত্রের কথা

উল্লেখ করিয়াছিলেন ; যথা—সামর্থ্য (Canon of Equity), স্থিরতা (Canon of Certainty), সুবিধা (Canon of Convenience) এবং ব্যয়-সংকোচন (Canon of Economy)। সামর্থ্যের সূত্র অনুযায়ী গরীব অপেক্ষা ধনীদের উপর করের বোঝা বেশী হওয়া উচিত ; কারণ তাহাদের কর-প্রদানের ক্ষমতা বেশী। সুবিধার সূত্র অনুযায়ী কর-প্রদান যাহাতে কর-প্রদানকারীর সুবিধা হয়, সেই রকম সময়ে ইহা ধার্য অথবা সংগ্রহ করা উচিত। সরকারের দিক হইতেও যাহাতে কর সংগ্রহে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ব্যয়-সংকোচনের সূত্র অনুযায়ী কর-সংগ্রহের কাজে যাহাতে যতদূর সম্ভব অল্প খরচ হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

অ্যাডাম স্মিথ প্রদত্ত সূত্রগুলি ছাড়াও আধুনিক কর-ব্যবস্থায় আরও কতিপয় সূত্র অনুসৃত হয়। প্রথমত, কর-প্রদান প্রণালী সর্বদা পরিবর্তনশীল ও নমনীয় (Flexible) হওয়া উচিত যাহাতে সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী করের পরিমাণের পরিবর্তন করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, কর-ব্যবস্থাকে এমনভাবে গঠন করা উচিত যাহাতে ইহা উৎপাদনের উদ্যোগ (Enterprise) ও অনুপ্রেরণার (Incentive) পরিপন্থী না হয়। অর্থাৎ কর ধার্যের ব্যাপারে উৎপাদনশীলতার নীতি (Canon of Productivity) মানিয়া চলা উচিত। করলব্ধ আয়ের পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে ইহার সাধারণ ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের গুণাগুণ (Relative Merits and Demerits of Direct and Indirect Taxation)—প্রত্যক্ষ কর-ব্যবস্থার নিম্নলিখিত গুণ আমরা দেখিতে পাই। প্রথমত, এই ব্যবস্থায় কর-প্রদানের আর্থিক বোঝা করদাতার উপরেই থাকে বলিয়া করদাতা অনুভব করেন যে তিনি সরকারকে কর প্রদান করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার নাগরিক চেতনা বাড়িয়া যায় এবং সরকারী ব্যয়ের গতি ও প্রগতি জানিবার জন্য একটি কৌতূহল জন্মে।

প্রত্যক্ষ কর-ব্যবস্থার গুণ

দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ করে সরকার প্রগতিশীল করনীতি অনুসরণ করিয়া দেশে অর্থ ও ধনের বৈষম্য কমাইবার চেষ্টা করিতে পারেন। সুতরাং দেশের সমুদয় অর্থনৈতিক শক্তির সমবণ্টনের চেষ্টা করা প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমেই সম্ভবপর। কর ধার্য করিবার সময় সামর্থ্যের সূত্র (Canon of Equity) অনুসরণ করা প্রত্যক্ষ করে সম্ভবপর।

তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষ করে প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ সম্বন্ধে সরকারের একটা ধারণা থাকে। পরোক্ষ করে এই ধারণা থাকে না। প্রত্যক্ষ করে আমরা নিশ্চয়তার সূত্র (Canon of Certainty) কার্যকরী হইতে দেখিতে পাই, করদাতাগণও জানিতে পারেন তাঁহাদের কত কর প্রদান করিতে হইবে।

প্রত্যক্ষ করে কতিপয় ত্রুটিও আছে। প্রথমত, প্রত্যক্ষ করের সাহায্যে সব লোকের নিকট হইতে কর পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ কর-ব্যবস্থা অনেক

ক্ষেত্রে সরকারকে জনগণের নিকট অপ্রিয় করিয়া তোলে। জনসাধারণের উপর করের বোঝা যদি কেবলই বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তবে জনসাধারণও অসন্তুষ্ট হইয়া পড়ে। তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষ কর-ব্যবস্থায় কর ফাঁকি দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ।

প্রত্যক্ষ করের দোষ

পরোক্ষ করের প্রধান গুণ হইতেছে এই যে ইহাতে সব লোকেরই কিছু-না-কিছু কর প্রদান করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, এই কর-ব্যবস্থা জনগণের মধ্যে বেশী অসন্তোষের সৃষ্টি করে না। কারণ, এই ব্যবস্থায় কর-প্রদানের বোঝা শেষ পর্যন্ত বহন করিতে হয় ক্রেতাকে। ক্রেতাও জিনিস কিনিবার সময় এই কর দিতে প্রস্তুত হইয়া জিনিস কিনে। ক্রেতা বুঝিতে পারে না যে সে কর দিতেছে। প্রথমত, কতিপয় মাদক দ্রব্যের উপর এই কর ধার্য করা হইলে সমাজের উপকার হয়। কারণ, সেই ক্ষেত্রে সেই জিনিসগুলির দাম বাড়িয়া যায় ও সেইগুলির জন্য চাহিদা কমিয়া যায় এবং সেইজন্য সেইগুলির উৎপাদনও কমিয়া যায়।

পরোক্ষ করের গুণ

পরোক্ষ করের কতিপয় ত্রুটিও আছে। প্রথমত, পরোক্ষভাবে কর-প্রদানকারীদের নাগরিক চেতনা অপেক্ষাকৃত কম জাগরিত হয়। দ্বিতীয়ত, পরোক্ষ কর ধার্য করা হইলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায় এবং তাহার ফলে ইহাদের চাহিদাও কমিয়া যায়। সেইজন্য জিনিসগুলির উৎপাদন কমিয়া যায়। তৃতীয়ত, পরোক্ষ কর ধার্য হইলে দেশের মধ্যে আয় ও ধনের বৈষম্য বাড়িয়া যায়। গরীব ও বড়লোকদের একই কর দিতে হয়, অথচ তাহাদের আর্থিক অবস্থা একপ্রকার নয়। কর ধার্য করিবার সময় কর-প্রদানকারীর আর্থিক অবস্থা এবং কর-প্রদানের ক্ষমতার কথা বিবেচনা করা উচিত। তবে আধুনিক কর-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ কর এবং পরোক্ষ কর উভয়ই ধার্য করিতে হয়।

পরোক্ষ করের ত্রুটি

পরোক্ষ করে কর-প্রদানের ক্ষমতার সূত্রটি (Canon of ability to pay) উপেক্ষিত হয়। সর্বশেষে, প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা পরোক্ষ কর বেশী ব্যয়বহুল। সেইজন্য পরোক্ষ করে ব্যয় সংকোচনের সূত্রটি (Canon of economy) উপেক্ষিত হয়।

বাজেট (Budget)—সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাবকে বাজেট বলা হয়। প্রতি বৎসর দেশের আইনসভাকে এই বাজেট অনুমোদন করিতে হয়। বাজেট অনেক প্রকারের হইতে পারে; যেমন, চল্‌তি বাজেট (Current Budget) অর্থাৎ চল্‌তি আয় ও ব্যয়ের হিসাব; মূলধন বাজেট (Capital Budget) ইত্যাদি। ভারতে আলাদাভাবে আমরা রেলওয়ে বাজেট দেখিতে পাই। যখন বাজেটে সরকারের আয় ও ব্যয় পরস্পরের সমান হয়, তখন ইহাকে আমরা সম বাজেট (Balanced Budget) বলি। যদি আয় হইতে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হয়, তবে ইহাকে ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget) বলা হয়। যখন ব্যয় হইতে আয়ের পরিমাণ বেশী হয় তখন ইহাকে উদ্বৃত্ত বাজেট (Surplus Budget) বলা হয়।

কর-প্রদানের বোঝা চালন (Shifting of Tax Burden)—যখন করদাতা

নিজে কর-প্রদানের বোঝা বহন না করিয়া তাহা অন্য কাহারও উপর চালন করে তখনই ইহাকে Shifting বলা হয়। যেমন, বিক্রয় কর (Sales Tax) ধার্য হইলে বিক্রেতা নিজে কর-প্রদানের বোঝা বহন না করিয়া বিক্রয়যোগ্য জিনিসটির দাম করের পরিমাণ অনুযায়ী বাড়াইয়া দেয় এবং কর-প্রদানের বোঝা ক্রেতার উপর চালন করে। এই ভাবে একজনের উপর হইতে আরেকজনের উপর কর-প্রদানের বোঝা চালন করা তখনই সম্ভবপর হয় যখন যে জিনিসটির উপর কর ধার্য করা হইয়াছে সেই জিনিসটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক (elastic) হয়। সরকার যখন আমদানি শুল্ক (import duty) ধার্য করে, তখন অনেকক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণ আমদানিকৃত জিনিসের দাম বাড়াইয়া দিয়া ক্রেতাদের নিকট হইতে শুল্কের টাকা আদায় করে, ইহাকে বলা হয় অগ্রে কর-প্রদানের বোঝা চালন (Forward Shifting)। আবার, এমনও হইতে পারে যে আমদানি শুল্ক প্রদান করিতে হইবে বলিয়া জিনিসের দাম বাড়ানো হইবার পর দেখা গেল জিনিসটির চাহিদা কমিয়া গিয়াছে। তখন ব্যবসায়ীগণ চেষ্টা করিবে শুল্ক প্রদানের বোঝা যে দেশ হইতে জিনিসপত্র আমদানি করা হইতেছে সেই দেশের ব্যবসায়ীদের উপর চালন করিতে; অর্থাৎ, তাহারা তখন শুল্কের পরিমাণ অনুযায়ী কম দামে জিনিস আমদানি করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। এইভাবে কর-প্রদানের বোঝা অপরের উপর চালন করাকে বলা হয় 'পশ্চাৎ বোঝা চালন' (Backward Shifting)।

কর-প্রদানের বোঝা বা করভার (Incidence of Taxation)—করদাতা কর-প্রদানের যে বোঝা নিজে বহন করে তাহাকে বলা হয় করভার বা incidence of taxation. প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করভার একজনের উপর হইতে আর একজনের উপর চালন করা যায় না; যেমন, যাহার উপর আয়কর ধার্য করা হইয়াছে, তাহাকেই কর-প্রদান করিতে হইবে। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতা নিজে করভার বহন না করিয়া তাহা আরেকজনের উপর চালন করিতে পারে (যেমন, বিক্রয় করের ক্ষেত্রে)। কোন জিনিসের উপর কর ধার্য করা হইলে করভার কত হইবে তাহা নির্ভর করে সেই জিনিসের জন্য চাহিদা ও ইহার যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। যে জিনিসের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক সেই জিনিসের উপর যদি কর ধার্য করা হয়, তবে করদাতার আর্থিক বোঝা খুব বেশী হয়। কারণ চাহিদা অস্থিতিস্থাপক থাকার দরুন তাহাকে বাধ্য হইয়াই সেই জিনিসটি কিনিতে হয় এবং কর প্রদান করিতে হয়। অপরপক্ষে যদি চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়, তবে করদাতার আর্থিক বোঝা তত বেশী হয় না; কারণ, জিনিসটির উপর কর ধার্য হওয়া মাত্রই করদাতা জিনিসটি ক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। শুধু চাহিদা নহে, যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও অনুরূপভাবে কর-প্রদানের আর্থিক বোঝাকে প্রভাবিত করে।

কর নীতি (Principles of Taxation)—কর ধার্য করার সময় সরকার কি নীতি অবলম্বন করিবেন সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রথম নীতিটি হইতেছে উপকার তত্ত্ব (Benefit theory)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যে যেই

পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, সে সেই পরিমাণ কর প্রদান করিবে। কিন্তু, এই নীতিটির প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে রাষ্ট্রের নিকট হইতে কে কি পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকে, তাহার পরিমাপ করা কঠিন। রাষ্ট্র মোট যে রাজস্ব পায়, তাহার অধিকাংশই সামাজিক স্বার্থে খরচ হইয়া থাকে। সুতরাং কে কত সুযোগ-সুবিধা পাইল তাহার সঠিক পরিমাপ করা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের মধ্যে ধনীদের অপেক্ষা গরীবগণ সাধারণত বেশী সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং এই তত্ত্ব অনুযায়ী গরীবদের বেশী কর প্রদান করিতে হয়; এই যুক্তি কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। তবে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে না হইলেও সামগ্রিকভাবে এই তত্ত্বটির কিছু যৌক্তিকতা আছে।

উপকার তত্ত্ব

কর-প্রদানের সামর্থ্য তত্ত্ব

কর-প্রদানের দ্বিতীয় নীতিটি হইতেছে কর-প্রদানের সামর্থ্য তত্ত্ব (Ability to pay theory)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যাহার যে পরিমাণ কর-প্রদান করিবার সামর্থ্য আছে, তাহাকে সেই পরিমাণেই কর-প্রদান করিতে হইবে। প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করে, তবে সামগ্রিক প্রকৃত করভার (real burden) কম হইবে।

এই তত্ত্বটি বাস্তবে পরিণত করার প্রধান অসুবিধা হইতেছে এই যে এমন কিছু সঠিক মানদণ্ড নাই যাহার সাহায্যে করদাতার কর-প্রদানের সামর্থ্য পরিমাণ করা যাইতে পারে। অনেকের মত কাহার কত সম্পত্তি আছে তাহা পরিমাণ করিয়া কর-প্রদানের সামর্থ্য পরিমাপ করা যাইবে। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কারণ, এমন অনেক লোক আছে যাহাদের হয়ত কোন সম্পত্তি নাই, অথচ অন্যভাবে তাহাদের অনেক আয় আছে। অনেকে মনে করেন খরচের পরিমাণের দ্বারা লোকের কর-প্রদানের সামর্থ্য সম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে। অধ্যাপক ক্যালডর এই মত পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু, এই যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক সময়ে মানুষ ঠেকায় পড়িয়া বেশী খরচ করিতে পারে। কিন্তু, এই খরচের সাহায্যে তাহার কর-প্রদানের সামর্থ্যের সঠিক পরিমাপ হয় না। আবার অনেকে মনে করেন, যেহেতু সম্পত্তি ও ব্যয়—কোনটির সাহায্যেই লোকের কর-প্রদানের সামর্থ্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভবপর নয়, সেইজন্য লোকের আয়কর-প্রদানের সামর্থ্যের ভিত্তি হওয়া উচিত। কিন্তু, আয়ের সাহায্যেও লোকের কর-প্রদানের সামর্থ্য সর্বদা পরিমাপ করা যায় না। প্রথমত, করদাতা তাহার প্রকৃত আয়ের পরিমাণ গোপন রাখিতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন করদাতার নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগ সমান নয়। যে গরীব, তাহার নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগ খুব বেশী। আবার কোন বড়লোকের নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগ খুব বেশী নয়। তৃতীয়ত, একই পরিমাণ আয় অর্জন করিবার জন্য বিভিন্ন লোকের ত্যাগ স্বীকার বিভিন্ন পরিমাণে হইতে পারে। একজন কেরানী সমস্ত মাস ধরিয়া খাটিয়া ১০০ টাকা বেতন পান। অথচ এই ১০০ টাকা উপার্জন করিবার জন্য একজন ব্যবসায়ীকে হয়ত আরও কম পরিশ্রম করিতে হয়। সুতরাং উভয়কে যদি

একই হারে কর প্রদান করিতে হয়, তবে ন্যায়বিচার হয় না। এইজন্য জোসিয়া স্ট্যাম্পের (Josiah Stamp) মতে লোকের কর-প্রদানের সামর্থ্য যাহাতে সঠিকভাবে পরিমাপ করা হয় সেইজন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলি পালন করিতে হইবে।

প্রথমত, আয়কর ধার্য করিবার সময়কাল বিচার করিতে হইবে। যখনই কাহারও আয় হইবে তখনই তাহাকে কর প্রদান করিতে হইবে, এই নীতি (pay as you earn principle) চালু করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, নীট আয়ের পরিমাপ করিবার জন্য আয় অর্জন করিবার সময়ে যাহা ব্যয় হয় এবং যন্ত্রপাতির যাহা ক্ষয়ক্ষতি হয়, তাহা বাদ দিতে হইবে। তৃতীয়ত, আয়কে দুইভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, যথা, অর্জিত আয় (earned income) এবং অনুপার্জিত (unearned income) আয়। চতুর্থত, আয়কর ধার্য করিবার সময় করদাতার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে। যেমন, করদাতার পরিবারের আয়তন যদি বড় হয়, তবে, সেই পরিমাণে আয়করের হারও কম হওয়া উচিত। কর প্রদান করার অর্থ হইতেছে ত্যাগ (sacrifice) স্বীকার করা। এই ত্যাগ স্বীকার করাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; সমান ত্যাগ স্বীকার (equal sacrifice) এবং সর্বনিম্ন ত্যাগ স্বীকার (least aggregate or minimum sacrifice)। সমান ত্যাগ স্বীকার নীতি অনুযায়ী প্রগতিশীল কর (progressive taxation) ধার্য করা উচিত যাহাতে সকলের ত্যাগ সমান হয়। এই নীতি অনুযায়ী যাহারা বড়লোক তাহাদের বেশী কর দেওয়া উচিত এবং যাহারা গরীব তাহাদের কম কর দেওয়া উচিত। দ্বিতীয় নীতি অনুযায়ী আয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ে কর ধার্য করিতে হইবে যাহাতে ত্যাগের পরিমাণ সর্বনিম্ন হয়। কিন্তু, এই নীতির বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইতেছে এই যে, ইহাতে বড়লোকদের বিনিয়োগ স্পৃহা (inducement to invest) এবং সঞ্চয়ের প্রবণতা (propensity to save) ব্যাহত হয়।

তৃতীয়ত, কর ধার্য করার আর একটি নীতি হইতেছে পরিচালন খরচ নীতি (cost of service principle)। এই নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য যে সমস্ত কাজ করে সেইগুলির খরচ অনুযায়ী তাহাদের উপর কর ধার্য করা উচিত। কিন্তু, এক্ষেত্রেও আমরা বলিতে পারি, কোন ব্যক্তি-বিশেষের জন্য রাষ্ট্রের সঠিক কত খরচ হইতেছে, তাহার পরিমাপ করা সম্ভবপর নহে।

পরিচালন খরচ নীতি

আধুনিককালে কর ধার্য করিবার সময় সরকারকে বিবেচনা করিতে হয় যে কর-ব্যবস্থা (অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে) অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। আবার, উন্নত দেশগুলির করনীতি এমনভাবে গঠিত হয় যেন কর-ব্যবস্থা দেশের আয় এবং উৎপাদন স্তর ও কর্মসংস্থানের স্তরকে উঁচু রাখিতে সাহায্য করে।

প্রগতিশীল করের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against progressive taxation)—প্রগতিশীল করের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে এই যে ইহা ন্যায়সঙ্গত (equitable)। এই ব্যবস্থায় ধনীদের বেশী কর দিতে হয়।

যাহার যত বেশী আয় তাহাকে তত বেশী আয়কর দিতে হয়। আবার যাহার কম আয়, তাহার উপর ধার্য করের হারও অল্প। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থায় করদাতা অনুভব করেন যে তিনি সরকারকে কর প্রদান করিতেছেন এবং তাঁহার আয় বেশী হইলে করের হারও বেশী হইতেছে। ইহাতে তাঁর নাগরিক চেতনা বাড়িয়া যায়। তৃতীয়ত, প্রগতিশীল করের মাধ্যমে সরকার দেশে জনগণের মধ্যে আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইবার চেষ্টা করিতে পারেন। সুতরাং দেশে সমুদয় অর্থনৈতিক শক্তির সমবণ্টনের চেষ্টা করা প্রগতিশীল করের মাধ্যমেই সম্ভবপর। আয়কর, উত্তরাধিকার কর, ব্যয় কর, মূলধন মুনাফা কর, সম্পদ কর, দান কর প্রভৃতি হইতেছে প্রগতিশীল কর।

প্রগতিশীল করের পক্ষে যুক্তি

যাঁহারা প্রগতিশীল কর পছন্দ করেন না, তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সকলেরই সমান অনুপাতে কর প্রদান করা উচিত। আয় বেশী হইলেই যে বেশী কর দিতে হইবে তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। দ্বিতীয়ত, যাহাদের আয় বেশী, তাহাদের উপর অধিক হারে কর ধার্য হইলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে তাহাদের উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণা কমিয়া যাইবে। আমরা এই যুক্তির উত্তর দিতে পারি। বড়লোকদের উপর অধিক হারে কর ধার্য করিলে যে বাড়তি রাজস্ব পাওয়া যাইবে, তাহার সাহায্যেই সরকার দেশের উৎপাদন বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারে। সমাজতন্ত্রে মূল লক্ষ্য হইতেছে জনগণের মধ্যে আয় ও ধনের সমতা আনয়ন করা। সেইদিক হইতে প্রগতিশীল কর সমর্থনযোগ্য। আয়করের সাহায্যে ধনী ও গরীবের মধ্যে আয়ের পার্থক্য অনেক কমিয়া যায়। ইহাতে আয় ও ধনের পুনর্বণ্টন হয়। অল্প আয় উপার্জনকারীগণও বিনিয়োগের কাজে অগ্রসর হইতে সাহস পায়।

প্রগতিশীল করের বিপক্ষে যুক্তি এবং ইহার জবাব

ভারতের কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of the Indian tax system)—ভারতে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ উভয় প্রকার করই প্রচলিত আছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মোট রাজস্ব বিচার করিলে পরোক্ষ করের অবদান শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী। আয়কর, মূলধন মুনাফা কর, উত্তরাধিকার কর, দান কর, সম্পদ কর, কৃষি-আয় কর প্রভৃতি হইতেছে ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন প্রত্যক্ষ কর। তন্মধ্যে কৃষি-আয় কর ধার্য করেন রাজ্য সরকারগুলি। কেন্দ্রীয় পরোক্ষ করের মধ্যে প্রধান হইতেছে অন্তঃশুল্ক (Exci-e duties) এবং বাণিজ্য শুল্ক (customs); রাজ্য-সরকারগুলি বিক্রয় কর, প্রমোদ কর, প্রভৃতি পরোক্ষ কর ধার্য করিয়া থাকে।

ভারতে বিভিন্ন খাতে সরকারী ব্যয় (Different types of Public Expenditure in India)—সরকারী ব্যয় নানা খাতে হইতে পারে। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় রাখার জন্য সরকারকে প্রচুর টাকা ব্যয় করিতে হয়। ইহার পর আসিতেছে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যয়। তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও সরকারকে অনেক টাকা ব্যয় করিতে হয়। ভারতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ

সর্বাপেক্ষা বেশী অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য। কিন্তু এককভাবে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী। পরিকল্পনাবাবদ যে ব্যয় হয় তাহার মধ্যে একটা বিরাট অংশ হইতেছে বিনিয়োগ-ব্যয়। সমাজ সেবামূলক ব্যয়ের পরিমাণও ভারতে যথেষ্ট।

সরকারী ব্যয়ের ফলাফল (Effects of Public Expenditure)—এখন আমরা সবকারী ব্যয়ের সমালোচনা করিব। ডক্টর ড্যালটনের মতে উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব তিনটি দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা যাইতে পারে। যথা, (১) কর্মোত্তম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার (ability to work and save) উপর প্রভাব (২) কর্মোত্তম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার (desire to work and save) উপর প্রভাব এবং (৩) অর্থনৈতিক সম্পদ ও উপকরণসমূহ নিয়োগের দিক পরিবর্তনের (diversion of economic resources) উপর প্রভাব। যে সকল সরকারী ব্যয়ের প্রভাবে জনসাধারণের উৎপাদনী-শক্তি বাড়িয়া যায় (যেমন, জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য ব্যয়) সেইগুলি লোকের কাজ করিবার এবং উত্তম বাড়াইবার পক্ষে সহায়ক হয়। কর্মোত্তম বাড়িলে উৎপাদন বাড়ে; ইহাতে আয় বাড়ে এবং আয় বাড়িলে সঞ্চয়ের ক্ষমতা বাড়ে। বেকার ভাতা, বৃদ্ধবয়সের পেন্সন প্রভৃতি ব্যয় জনসাধারণের কর্মোত্তম এবং সঞ্চয়ের স্পৃহা কমাইয়া দেয় বলিয়া ড্যালটন মনে করেন। অনেকক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক সম্পদগুলির একত্রীকরণ অথবা সংহতিকরণে (mobilisation) সরকার একটি বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করে, এবং ইহাতে অনেক সময়ে নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়। সরকার কর্তৃক এই ধরনের খরচের ফলে অর্থনৈতিক সম্পদ অথবা উপকরণগুলির এইপ্রকার দিক পরিবর্তন হইয়া থাকে। অর্থনৈতিক সম্পদ অথবা উপকরণগুলির এইপ্রকার দিক পরিবর্তনের ফলে যদি সামগ্রিকভাবে জাতীয় আয় অথবা উপকরণগুলির উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়া যায়, তবে সরকারী ব্যয় সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত হয়।

উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব

সরকারী ব্যয়ের সাহায্যে সমাজে আয়বৈষম্য কমাইয়া ফেলা সম্ভবপর। সরকার যদি ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া গরীবদের জন্য সেই অর্থ ব্যয় করে (যেমন, সরকারের হস্তান্তর ব্যয়) তবে সেই ব্যয়ের প্রভাবে সমাজে আয়বৈষম্য অনেক কমিয়া যায়। ডক্টর ড্যালটনের মতে সরকারী ব্যয়ও প্রগতিশীল (progressive) নীতির ভিত্তিতে হওয়া উচিত। যেমন, যে যত গরীব, সে সরকার হইতে তত বেশী আর্থিক সাহায্য পাইবে। সরকারী ব্যয়ের ফলে যদি আয়ের পুনর্বণ্টন হয় তবে ইহা সমাজের কতিপয় ক্ষেত্রে শুভকর হইতে পারে। যেমন, গরীবদের আয় বাড়িলে ভোগের প্রবণতা বাড়িবে এবং ইহা উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হইবে। কিন্তু অপর দিকে আয়ের এই ধরনের পুনর্বণ্টন হইবার ফলে যদি ধনী ব্যক্তিদের কর্মোত্তম এবং সঞ্চয়ের স্পৃহা কমিয়া যায় তবে ইহা সামগ্রিকভাবে সমাজের পক্ষে শুভকর নাও হইতে পারে।

বণ্টনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব

যদি দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান না থাকে তবে সরকারী ব্যয়ের সাহায্যে আমরা দেশের অর্থনৈতিক সম্পদসমূহের সদ্ব্যবহার করিতে পারি। ইহাতে একদিকে যেমন উৎপাদন ও আয় বাড়ে, অপরদিকে সেই প্রকার কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়ে। বাণিজ্যিক মন্দার সময়ে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইলে সংকট মুক্তির অবস্থা সৃষ্টি করা যায়; ইহাতে উৎপাদন, আয় এবং কর্মসংস্থান বাড়িয়া যায়।

কর্মসংস্থান ও আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব

সরকারী ঋণের শ্রেণী-বিভাগ (Classification of Public debts)—সরকারী ঋণের বিভিন্ন প্রকার শ্রেণী-বিভাগ করা যায়।

(১) মৃতভার ঋণ (dead-weight debt); (২) নিষ্ক্রিয় ঋণ (Passive debt) এবং (৩) সক্রিয় ঋণ (active debt)। যে-সব সরকারী ব্যয় কোন রূপেই সমাজের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করে না অথবা রাজস্ব ও ভবিষ্যৎ উপযোগিতার স্রোত সৃষ্টি করে না, তাহাকেই মৃতভার ঋণ বলা হয়। যেমন, যুদ্ধে সরকারী ব্যয়। (৪) যে-সব সরকারী ব্যয় সমাজে উপযোগিতা অথবা আনন্দের সৃষ্টি করে, কিন্তু আর্থিক আয় অথবা দেশের মূলধন এবং শ্রমের দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে না, তাহার নাম নিষ্ক্রিয় ঋণ। যেমন, সরকারী দান প্রভৃতি। কেহ কেহ ইহাকে অনুৎপাদক ঋণ (Unproductive Debt) বলেন।

(৫) ক্রমবর্ধনশীল যে-সব পরিকল্পনার দরুন ঋণ হইতে যে মূলধন ব্যয় করা হয় এবং সমাজের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য যে ব্যয় করা হয় তাহাকে সক্রিয় ঋণ বলে। যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-খাতে সরকারী ব্যয়। অনেকে ইহাকে Productive Debt বা উৎপাদক ঋণ বলেন।

(৬) যে সকল ঋণ দেশের নাগরিকগণের নিকট হইতে গ্রহণ করা হয় তাহাকে দেশীয় বা আভ্যন্তরীণ ঋণ (Internal debt), এবং যাহা বিদেশীদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হয়, তাহাকে বৈদেশিক ঋণ (External debt) বলা হয়।

(৭) বেশ দীর্ঘকাল পরে যে ঋণ শোধ করা হইবে, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহার নাম দীর্ঘকালীন ঋণ (Funded Debt) এবং স্বল্পকালের মধ্যে যে-সব ঋণ পরিশোধ করা হয়, তাহাকে বলা হয় স্বল্পকালীন ঋণ বা ভাসমান ঋণ (Unfunded Debt বা Floating Debt)।

সরকারের ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য (Purpose for which Public debt may by incurred)—ঋণ গ্রহণ করার ব্যাপারে সরকারের অনেক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। প্রথমত, যুদ্ধবিগ্রহের সৃষ্টি হইলে সরকার যুদ্ধের খরচ নির্বাহ করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, বাজেট ঘাটতির সৃষ্টি হইলে সেই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য সরকার ঋণ করিতে পারে। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অথবা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। সাধারণত উৎপাদনাত্মক বিনিয়োগের (Productive investment) জন্য সরকার

অনেক ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। চতুর্থত, সমাজকল্যাণের জন্য, যেমন দেশের রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপনের জন্যও সরকার ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন। সর্বশেষে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্য সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে (ব্যাংক ব্যবস্থা হইতে নহে) ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য যদি সরকার ঋণ গ্রহণ করে তাহা সমর্থনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু যখন সরকারী ঋণের টাকা শুধু বিলাসসামগ্রী ক্রমে খরচ করা হয় অথবা অনুৎপাদনমূলক (unproductive) ব্যাপারে খরচ করা হয়, তখন সেই সরকারী ঋণকে সমর্থনের অযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

সরকারী ঋণ পরিশোধের বিভিন্ন পদ্ধতি Different methods of the repayment of public debt) সরকারী ঋণ পরিশোধ করার বিভিন্ন পদ্ধতি হইতেছে ; (১) বাজেটে উদ্বৃত্তের (Budget Surplus) সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে ঋণ শোধ করা ; (২) একটি সঞ্চিত তহবিলের (Sinking Fund) সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নিয়মিতভাবে প্রতি বছর কিছু টাকা রাখিয়া দেওয়া এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশ কিছু বাড়িলে তাহা হইতে টাকা তুলিয়া ঋণ পরিশোধ করা ; (৩) ঋণের রূপান্তর (Commission of Debt) করা, অর্থাৎ বাজারে সুদের হার কমিয়া গেলে সরকার এই কম সুদের হারে ঋণ গ্রহণ করিয়া পূর্বের ঋণ পরিশোধ করিতে পারে ; (৪) মূলধনের উপর এককালীন কর (Capital Levey) ধার্য করিয়া ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা এবং (৫) ঋণ অস্বীকার করা (Repudiation of Loans)। শেষোক্ত ব্যবস্থাটি ক্ষেত্রবিশেষে মারাত্মক হইতে পারে। কেননা, এক্ষেত্রে সরকারের উপর জনগণ বিশ্বাস হারাইতে পারে। রাশিয়ায় বিপ্লবের পর নূতন সরকার পূর্ববর্তী জারদের আমলের সব ঋণ অস্বীকার করিয়াছিলেন। মূলধনের উপর এককালীন কর ধার্য করিয়া ঋণ পরিশোধ করাও আজকাল সাধারণত দেখা যায় না। ঋণ পরিশোধের জন্য অধিক পরিমাণে কর ধার্য করার ব্যবস্থা অনেক দেশেই গৃহীত হইয়াছে।

ভারতে সরকারী ঋণ (India's public debt)—১৯৬৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ভারত সরকারের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ হইয়াছে যথাক্রমে ৬,৯২৮ কোটি টাকা এবং ৬,২২৫ কোটি টাকা (ভারত সরকারের ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেট অনুযায়ী)। ভারতে সরকারী ঋণের পরিমাণ ক্রমশই বাড়িতেছে এবং তাহার শতকরা ৯০ ভাগই উৎপাদনমূলক প্রচেষ্টার জন্য। তবে একদিকে যেমন সরকারী ঋণের পরিমাণ বাড়িতেছে, অপরদিকে ভারতে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরিমাণও ইদানীং কিছু বাড়িয়াছে।

Exercise

1. What is the distinction between Public Finance and Private Finance ?
(সরকারী আয়-ব্যয় এবং ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের পার্থক্য কি ?) (১৯৭ পৃঃ)

2. Define a tax and show the distinction between Direct Tax and Indirect Tax with examples. (১৯৭-৯৮ পৃঃ)

(করের সংজ্ঞা প্রদান কর এবং উদাহরণ সহযোগে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।)

3. What are the sources of revenue of a modern state ?

(আধুনিক রাষ্ট্রের রাজস্বের উৎস কি কি ?) (১৯৭ পৃ:)

4 Discuss the relative merits and demerits of Direct and Indirect Taxation ?

(প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের সুবিধা-অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।) (১৯৯-২০০ পৃ:)

5. What do you mean by 'Budget' ? What are the different types of budgets ?

(বাজেট বলিতে তুমি কি বুঝ ? বাজেট কত প্রকার হইতে পারে ?) (২০০ পৃ:)

6, Discuss tbe canons of Taxation.

(কর ধার্যের সূত্রগুলি আলোচনা কর।) (১৯৮-১৯৯ পৃ:)

7. Write a note on the principles of Taxation.

(কর ধার্যের বিভিন্ন নীতির উপর একটি টিপ্পনী লিখ।) (২০১-২০৩ পৃ:)

Or. Write notes : (a) Progressive tax, (b) Proportional tax, and (c) Regressive tax.

[অথবা, (ক) প্রগতিশীল কর (খ) সমানুপাতিক কর এবং (গ) প্রতিক্রিয়াশীল করের উপর টিপ্পনী লিখ।] (২০২-২০৪ পৃ:)

8. Write notes on Shifting and Incidence of Taxation.

(কর প্রদানের বোঝা চালন এবং করভার সম্বন্ধে টিপ্পনী লিখ।) (২০০-২০১ পৃ:)

9. Discuss the merits and demerits of Progressive Taxation.

(প্রগতিশীল করের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।) (২০৩-২০৪ পৃ:)

10. Discuss the effects of Public Expenditure.

(সরকারী ব্যয়ের বিভিন্ন প্রভাব আলোচনা কর।) (২০৪-২০৫ পৃ:)

11. What are the different types of Public Debt ? What are the purposes of public Debt ?

(সরকারী ঋণ কত প্রকার ? কি কি উদ্দেশ্যে সরকারী ঋণ গ্রহণ করা হয় ?) (২০৫-২০৬ পৃ:)

12. What are the different methods of repayment or Public debt ?

(সরকারী ঋণ পরিশোধ করার বিভিন্ন পদ্ধতি কি কি ?) (২০৬-২০৭ পৃ:)

পৌরনীতি

পূর্বাভাষ : পৌরনীতির বিষয়বস্তু (Subject-matter of Civics)

সংস্কৃত 'পুর' শব্দটির বিশেষণ হইতেছে পৌর। পৌর জীবনে মানুষের চলাফেরা, বিশেষত, নাগরিকগণ পৌর জীবনে কিভাবে চলাফেরা করে, কি তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য, ইত্যাদি সবই পৌরবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

নাগরিক হিসাবে মানুষ যে সকল অধিকার ভোগ করে এবং কর্তব্য পালন করে ও সমাজের সহিত মানুষ যে সম্পর্ক বজায় রাখে, তাহা অনুশীলন করা পৌর বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। এই অধিকার প্রয়োগ ও কর্তব্য পালনে নাগরিককে আইনের অধীনে থাকিয়া কাজ করিতে হয়। নাগরিকদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, জনমতের প্রভাব, দলীয় সংগঠন,—এককথায় নাগরিকদের মধ্যে যাবতীয় সামাজিক সম্পর্ক এবং বাধ্যবাধকতা, সবই পৌরবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। তাহা ছাড়াও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ এবং সেইগুলির সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্কও পৌরবিজ্ঞান অনুশীলন করিয়া থাকে। সর্বশেষে, রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বিভিন্নরূপ এবং সেইগুলি নাগরিকদের কিভাবে প্রভাবিত করে, তাহাও পৌরবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

প্রথম অধ্যায় | *ব্যক্তি এবং সমাজ* (Individual and Society)

মানুষ হইতেছে একটি সামাজিক প্রাণী। যে কোন সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রথম ধাপ হইতেছে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক নির্ণয় করা। ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক কিভাবে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিতে হইলে এই বিষয়ে যে সকল তত্ত্ব বিভিন্ন যুগে প্রচারিত হইয়াছে সেগুলি আমাদের আলোচনা করা উচিত। সমাজের সৃষ্টি-সম্পর্কে যান্ত্রিক মতবাদ (Mechanistic theory) প্রচারিত আছে, তাহা অনুযায়ী মানুষ কতিপয় বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় সমাজ গঠন করিয়াছে। অর্থাৎ, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক কতিপয় উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত। এই মতবাদের একটি বিশেষ প্রকাশ হইতেছে রাষ্ট্রগঠনে সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory)[১]। হব্‌সের (Hobbes) মতে ব্যক্তিসমূহ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়াই সমাজ-গঠনের সূচনা করিয়াছিল, এবং এই

সমাজ-গঠনের যান্ত্রিক মতবাদ (Mechanistic theory)

১ পরবর্তী অধ্যায়ে "সামাজিক চুক্তি মতবাদ" বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সমাজ ছিল নিঃসঙ্গ ও কদর্য প্রকৃতির রাজত্ব হইতে ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার উপায়। লকের (Locke) মতে প্রকৃতির রাজত্ব কদর্য এবং দুর্বিষহ ছিল না। প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু সেই অবস্থা ছিল প্রাক-রাজনৈতিক অবস্থা। একটি সুনির্দিষ্ট সরকারের অভাবে অনুরূপ অবস্থার অনেক অসুবিধা ছিল। সেজন্য মানুষ রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। রুশোর (Rousseau) মতে প্রকৃতির রাজত্ব ছিল ভূস্বর্গের ন্যায়। তবুও মানুষ চাহিয়াছিল একটি সুগঠিত সরকারের মাধ্যমে নিজেদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিতে। এইভাবে মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকগণ মনে করিতেন যে প্রকৃতির রাজত্বে সব ব্যক্তিই স্বাধীন ও সমান ছিল; কিন্তু শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সামাজিক সুবিধাসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই মানুষ সমাজ গঠন করিয়াছিল। অ্যাডাম স্মিথ তাঁহার অর্থনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে মনে করিতেন যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক স্বার্থেই বিভিন্ন ব্যক্তি সমাজ-গঠনের অনুপ্রেরণা পাইয়াছিল। চুক্তি তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজ ছিল বিভিন্ন ব্যক্তির নিজেদের মধ্যে অথবা ব্যক্তি ও সরকারের মধ্যে চুক্তির ফল।

আমরা এই তত্ত্বটি বর্জন করিতে পারি। কারণ, এই তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজ-গঠনের পূর্বেই ব্যক্তি নিজেই ব্যক্তিত্ব জাহির করিয়া চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ সমাজে প্রবেশ করিবার পূর্বেই সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য এবং সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিতে পারিত। এই ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তি ও সমাজ যে অবিচ্ছেদ্য এই সত্যটি বিবেচিত হয় নাই। মানব জাতির ক্রমাবর্তনের ইতিহাসে কেহ কাহারও পূর্ববর্তী নহে।

সমাজ গঠনের জৈবিক তত্ত্ব (Organic Theory regarding the formation of the Society—জীব যদি সুস্থ ও সবল হইয়া বাঁচিয়া থাকে, তবেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির অনুরূপ অস্তিত্ব থাকিতে পারে। সেই প্রকার সমাজ বর্তমান থাকিলেই ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব অথবা সমাজে সুস্থ জীবন যাত্রা প্রতিষ্ঠিত হইলেই ব্যক্তি সুখী হইতে পারে। জীবদেহের ক্রমবর্ধনের সহিত যেমন বিভিন্ন জীবকোষ জটিল আকার ধারণ করে, সমাজের ক্রমবর্ধনের সহিত সেই প্রকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এবং জনসাধারণের ক্রিয়াকলাপের পরিধিও বাড়িয়া যায়। জীবদেহের বিভিন্ন কোষের মধ্যে যেমন শিরা-উপশিরা মারফৎ যোগাযোগ আছে, সেই প্রকার সমাজের মধ্যেও আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থা (Communication System) দেখিতে পাই।

সমাজ-গঠনের জৈবিক তত্ত্ব

আরেকটি মতবাদ অনুযায়ী সমাজকে জীবদেহের সহিত তুলনা করা হয়। জীবদেহের কাঠামো এবং সমাজের কাঠামো ও কাজের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য এই মতবাদে আলোচিত হয়। সমাজ জীবদেহের বিভিন্ন স্তরের ন্যায় জন্ম, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য ও মৃত্যু প্রভৃতি স্তরের মধ্য দিয়াই আবর্তিত হয়। কিন্তু স্পেনসারের (Spencer) মতে এই যুক্তিটি

গ্রহণযোগ্য নহে। জীবদেহ হইতে মস্তিষ্ক চলিয়া গেলে ইহা অকেজো হইয়া পড়ে; কিন্তু সমাজের একটি বৃহৎ অংশ সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও ইহা অকেজো হয় না। জীবদেহের একটি অংশ বিচ্যুত হইলে ইহা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সমাজ দেহের কোন অংশ বিচ্যুত হইলে সমাজ ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। দেহের বিভিন্ন কোষ দেহের সহিত যেভাবে জড়িত, ব্যক্তি সমাজের সহিত সেভাবে জড়িত নয়।

কি অর্থে মানুষ সামাজিক প্রাণী? (In what sense is man a social animal?)—মানুষ সামাজিক প্রাণী। কোন ব্যক্তিই সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহে না। শুধু সম্পত্তির নিরাপত্তাই নহে, নিজের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য এবং একটি সভ্য জীবনযাপনের জন্যও মানুষ সমাজের উপর নির্ভরশীল। সব ব্যক্তি সর্বদাই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন গবেষণার ফলে মনস্তাত্ত্বিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে মানুষের মানবিক বৃত্তিগুলির বিকাশ তখনই হয় যখন মানুষ একটি সামাজিক প্রাণীতে পরিণত হয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সমাজের উপর বা সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। সামাজিক ঐতিহ্যের উপরেও ব্যক্তি নির্ভরশীল। "মানুষ সামাজিক জীব" এই উক্তিটি করেন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল। মানুষ যে সামাজিক প্রাণী তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে মানুষের মধ্যে সংঘবদ্ধ হইয়া থাকিবার প্রেরণা। সংঘবদ্ধতা যদিও মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃত্তি, তবুও এই প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে। অনেকে পরিবারের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হইয়া থাকে, আবার অনেকের মধ্যে পরিবারের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া সমগ্র বিশ্বকে আপন করিয়া লওয়ার আগ্রহ দেখা যাইতে পারে। যখন কোন মানুষ সমগ্র বিশ্বকেই আপন মনে করে তখন তাঁহাকে বিশ্বমানব (Universal Man) বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এইজাতীয় উদারপ্রাণ মহাপুরুষের সংখ্যা খুবই অল্প।

মানুষ একটি সামাজিক প্রাণী

সাধারণ মানুষ বিশ্বজনীন মনোভাব লইয়া সর্বদা চলিতে পারে না। নিজের প্রকৃতিতেই মানুষ প্রকাশিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে আমরা মহাপুরুষদের প্রদর্শিত পথ ভুলিয়া আপন ইচ্ছায় চলি। আমাদের এইজাতীয় প্রকৃতিকে জার্মান দার্শনিক কাণ্ট (Kant) "অসামাজিক সামাজিকতা" (Unsocial Sociableness) আখ্যা দিয়াছেন। সামাজিকতা এবং দ্বন্দ্বপ্রীতি মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। একদিকে যেমন একজন মানুষ অপর মানুষের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিতে চায়, অপরদিকে একজন মানুষের পক্ষে অন্য মানুষের সহিত কলহে লিপ্ত হইতেও দেখা যায়। মিলনের বা যোগক্ষেত্র স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা হইতে আসে মানুষে মানুষে সহযোগিতার (Co-operation) ভাব, আবার কলহে লিপ্ত হইবার প্রবৃত্তি হইতে সৃষ্টি হয় অসহযোগ এবং সংঘর্ষের (Conflict) বিভিন্ন রূপ। মানব সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এই সহযোগিতা এবং সংঘর্ষ উভয়ের সমন্বয়ে। এই দুইটির সমন্বয়ে যাহা সৃষ্ট হয় তাহাকে বলা হয়

সামাজিক উত্তরাধিকার (Social Heritage)। এই সামাজিক উত্তরাধিকারের মাধ্যমেই মানুষের জীবন বিকশিত হয়। কেননা এই উত্তরাধিকারের মধ্যে থাকে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সম্ভাবনা। ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সমুদয় সুযোগ-সুবিধা (Opportunities) হইতেই মানুষের অধিকারের (Rights) সৃষ্টি হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে মানুষ যে সামাজিক প্রাণী তাহার মূল ভিত্তি হইতেছে **মানুষের সংঘবদ্ধতা এবং সামাজিক উত্তরাধিকারের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সম্ভাবনা।**

ব্যক্তি হইতে সমাজ (From Individual to Society—Factors in the formation of Society)—মানুষ সামাজিক প্রাণী—**যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করে তখনই সমাজ গঠিত হয়।** সমাজের দুইটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে; একটি হইতেছে মানুষ কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য একত্র হইয়া বাস করে। দ্বিতীয়ত, মানুষ সর্বদা সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করে।

সমাজ-গঠনের উপাদান

প্রাচীন বর্বর যুগে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব ছিল না। পাহাড়, পর্বত এবং অরণ্যচারী মানুষ তখন অসভ্য জীবনযাপন করিত। তখন অভাববোধের তাড়না খুব তীব্র ছিল না এবং অভাব দূর করিবার প্রেরণাও খুব তীব্র ছিল না। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মানুষ একটি অশৃঙ্খলিত জীবনযাপন করিত। যাহাদের শক্তি বেশী থাকিত, তাহারাই অপরের উপর প্রভুত্ব করিত। ইহাকে আমরা আদিম অসভ্যতার (Savagery) যুগ বলিতে পারি। আদিম সভ্যতার যুগের পর বর্বরতার যুগ (Barbarism), যখন মানুষ কাঁচা মাংস পোড়াইয়া খাইত। কারণ, সেই সময়ে একটি পাথরের সহিত অপর পাথরের ঘর্ষণে যে আগুনের সৃষ্টি করা যায়, মানুষ তখন তাহা বুঝিতে পারিল।

আদিম অসভ্যতার যুগ

বর্বরতার যুগ শেষ হইয়া গেলে মানুষ চাষবাস করিতে শিখিল। বিভিন্ন জীবজন্তুকে তাহারা পোষ মানাইতে শিখিল এবং এইভাবে কতিপয় জন্তুকে তাহারা গৃহপালিত জন্তুতে পরিণত করিল। গৃহপালিত জীবজন্তুর সাহায্যে চাষবাস আরম্ভ করা হইতে লাগিল। মানুষের অভাববোধের তাড়না দেখা যাওয়ার পর হইতেই সেই অভাব দূর করিবার জন্য মানুষ চেষ্টা করে। ইহার প্রথম পর্যায় হইল চাষবাসের সাহায্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন। তারপর মানুষ নিজেদের পরিবার (Family) গঠন করিতে আরম্ভ করে। নিজের সন্তান-সন্ততি এবং ইহার পরে যাহাদের সহিত রক্তের সম্পর্ক আছে তাহাদের লইয়া মানুষ পরিবার গঠন করিতে আরম্ভ করে। সমাজ-গঠনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পরিবারের একটা বিশেষ অবদান আছে। কয়েকটি পরিবার যখন বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য সংঘবদ্ধ হইল, তখনই গোষ্ঠী ও ক্রমে উপজাতির সৃষ্টি হইল। তাহারাই সমাজ গঠন করিল।

মানুষ কর্তৃক পরিবার গঠন

সমাজগঠনের পথে তিনটি জিনিস আমরা দেখিতে পাই ; যথা, পরিবার, গোষ্ঠী ও উপজাতি। তারপর আমরা দেখিতে পাই জাতীয় জনসমাজ। সমাজ গঠিত হইবার পর সৃষ্টি হইল রাষ্ট্রের। পরস্পর নির্ভরশীল লোকসমষ্টিকে আমরা সমাজ বলিতে পারি।

পরিবার হইতে গোষ্ঠী ও উপজাতির সৃষ্টি

প্রাচীন সমাজে কোন কোন পরিবারে পিতাই প্রধান থাকিতেন, এই সব পরিবারকে বলা হইত পিতৃতান্ত্রিক পরিবার (Patriarchal family)। আবার কোন কোন পরিবারের মাতাই প্রধান থাকিতেন, এই সব পরিবারকে বলা হইত মাতৃতান্ত্রিক পরিবার (Matriarchal family)। পরিবার হইতেছে সমাজ-গঠনের প্রাথমিক সংগঠন।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার

সমাজ-জীবনের একটি বিশেষ উপযোগিতা হইতেছে এই যে, ইহাতে মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইয়া নিরাপদে এবং শান্তিতে বসবাস করিতে পারে। সুন্দর জীবনযাপনের জন্য মানুষের নিজেদের মধ্যেই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থাকা দরকার এবং শান্তি শৃঙ্খলার একটি পরিবেশ থাকা দরকার ; তাহা সম্ভব হয় সামাজিক জীবনের দৃঢ় সংগঠনের মধ্যে।

সমাজ-জীবনের উপযোগিতা

পরিবার (Family) :

পরিবার হইতেছে সমাজের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক ব্যক্তি-সমষ্টি (Primary Association)। মানুষ জন্মসূত্রে পরিবার ভুক্ত হয়। রাষ্ট্রের ন্যায় পরিবারও হইতেছে একটি আবশ্যিক সংস্থা (compulsory unit)। কবে এবং কিভাবে পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। যখন মানুষ বুঝিতে পারিল যে সংঘজীবনকে সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করা দরকার তখনই মানুষ পরিবার গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ইতিহাসের বিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহা একটি স্ব-সীমিত ব্যক্তি হইতে অল্প সংখ্যক কয়েকজন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত এমন একটি সংস্থায় পরিণত হইয়াছে যেখানে সকলেই খুব ঘনিষ্ঠ রক্ত-সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ। এই কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে রহিয়া গিয়াছে স্ত্রী ও পুরুষ ; যাহারা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করিয়া সন্তান-সন্ততির জন্ম দিয়াছে এবং একটি সুসম্বদ্ধ পরিবার গঠন করিয়াছে। পরিবারের আকৃতি খুবই ছোট হয়, এবং ইহার সদস্যগণের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের এমন একটি সম্পর্ক থাকে যাহা হইতে শিশুদের জন্ম হয় এবং তাহারা লালিতপালিত হয়।[১] পরিবারের সব সদস্যগণ একত্রিত হইয়া বাস করে এবং তাহাদের মধ্যে যে ঐক্যবোধ বজায় থাকে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ : (১) একটি বিবাহের

পরিবার গঠন

১ "The family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the prevention and upbringing of children."—MacIver

সম্পর্ক, (২) বিবাহ-সম্পর্কের মাধ্যমে স্ত্রী এবং পুরুষের মাধ্যমে একত্রিত থাকিবার প্রয়াস, (৩) একটি পদবী যাহার দ্বারা পরিবারের সদস্যদের বংশ-পরিচয় নির্ণীত হয়, (৪) সন্তান-ধারণ ও সন্তান-প্রতিপালন করিবার জন্য অর্থনৈতিক সঙ্গতির ব্যবস্থা, এবং (৫) একটি সাধারণ বাসস্থান যেখানে পরিবারের সব সদস্য একত্রিত হইয়া বসবাস করে।

পরিবারের পিতা এবং মাতার মধ্যে যে বিবাহিত জীবন থাকে তাহার মাধ্যমে একটি পরিবারের সহিত আরেকটি পরিবারের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। প্রাচীনকালে পরিবারের পরিচয় মাতা অথবা পিতার দিক হইতে হইত এবং তাহা হইতেই **মাতৃতান্ত্রিক পরিবার** (matriarchal family) এবং **পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের** (patriarchal family) সৃষ্টি হয়। যখন বিবাহিত জীবনে স্ত্রী সমগ্র পরিবারের প্রধানা হিসাবে অধিষ্ঠিতা হন, তখনও আমরা **মাতৃতান্ত্রিক পরিবারেরই** (matriarchal family) একটি বিশেষরূপ দেখিতে পাই। কারণ পরিবারের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের সদস্যগণ তাঁহার কর্তৃত্বই মানিয়া চলেন। অপরদিকে যদি বিবাহিত জীবনে স্বামীই সর্বময় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিয়া পরিবারের প্রধান হিসাবে অধিষ্ঠিত হন, তবে আমরা **পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের** (Patriarchal family) একটি বিশেষরূপ দেখিতে পাই। আধুনিককালে পরিবারের বংশপরিচয় সাধারণত পিতার দিক হইতেই হইয়া থাকে।

পরিবারসংগঠনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য (Distinctive features of the family organisation)—সমাজের উপর যতগুলি সংস্থা প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে পরিবার হইতেছে অগ্রণী এবং আদিম সংস্থা। পরিবারের বিভিন্ন রূপ থাকিতে পারে, কিন্তু আদি কাল হইতেই পরিবারের সংগঠনের মধ্যে একটি বিশেষ ধারাবাহিকতা দেখা যায়। পরিবারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে আটটি। যথা—

(১) **বিশ্বজনীনতা (Universality) :** সমুদয় সামাজিক সংগঠনের মধ্যে পরিবার হইতেছে প্রায় বিশ্বজনীন সংগঠন। সব সমাজেই ইহা দেখা যায়। সামাজিক ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন যুগেও ইহা দেখা গিয়াছে। যে কোন মানুষই কোন-না-কোন পরিবারের সদস্য।

(২) **আবেগের ভিত্তি (Emotional basis) :** মানুষের চরিত্রের কতিপয় বিশেষ আবেগের উপর পরিবারের সংগঠন নির্ভরশীল। বিবাহ, মাতা কর্তৃক সন্তান-ধারণ, সন্তান লালন-পালন, মাতৃস্নেহ, পিতার যত্ন প্রভৃতি হইতেই মানুষের সৃষ্টি এবং শৈশব হইতে ক্রমে কৈশোর এবং যৌবনে পরিণত হইয়া থাকে। মানুষের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসা, বংশের গৌরব, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব এবং অপরদিকে একজনের ব্যক্তিগত সম্পদ থাকার দরুন আরেকজনের মনে হিংসার সৃষ্টি,—প্রভৃতি সবই পারিবারিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে।

(৩) **গঠনমূলক প্রভাব (Formative influence) :** জীবনের উচ্চতর পন্থাগুলির মধ্যে পরিবার হইতেছে সর্বাপেক্ষা আদি সামাজিক পরিবেশ। শারীরিক

গঠন এবং মানসিক অভ্যাস যে উপাদানগুলির উপর ভিত্তিশীল সেইগুলিকে পরিবার এবং ইহার পরিবেশ প্রভাবিত করিয়া থাকে।

(৪) **সীমিত আকার (Limited size) :** পরিবারের আকার স্বভাবতই সীমিত হইয়া থাকে। পরিবারের মধ্যে ততজনই সদস্য থাকে যাহাদের মধ্যে রক্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে এবং এই সম্পর্কের ভিত্তিতেই তাহাদের পরিচয় নিরূপিত হয়।

(৫) **সমাজ-কাঠামোর কেন্দ্র-স্থল (Nuclear position in the social structure) :** পরিবার হইতেছে সমাজ সংগঠনগুলির মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সমগ্র সমাজ-কাঠামো হইতেছে কতিপয় পরিবারের সংগঠন। অবশ্য উচ্চতর ও জটিল সভ্য-সমাজে পরিবারের এই ভূমিকা না-ও থাকিতে পারে। সমাজ সম্পর্কে যত সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে একটি আদি সংজ্ঞা অনুযায়ী সমাজ হইতেছে কতিপয় পরিবারের সমষ্টি ("a union of families")।

(৬) **সদস্যের দায়িত্ব (Responsibility of Members) :** পরিবারের সদস্যের কতিপয় সাধারণ দায়িত্ব আছে। পরিবারের নিরাপত্তা, ভরণপোষণ প্রভৃতির জন্য সব প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যেরই দায়িত্ব থাকে যদিও পরিবারের যিনি প্রধান তাঁহার দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। পরিবারের কোন বিপদের সৃষ্টি হইলে ইহার সব সদস্যই সেই বিপদ হইতে পরিবারকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করে। আবার পরিবারের গৌরব বৃদ্ধি হইলে সব সদস্যই সেই গৌরবের অংশীদার হয়।

(৭) **সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social regulation) :** পরিবারকে কতিপয় সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকিতে হয়। বিবাহ সম্পর্কে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কতিপয় সম্পর্ক আছে যেগুলির ক্ষেত্রে কোন অবস্থায়ই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না। পরিবারের কোন সদস্যকে বিবাহ করিবার সময় সামাজিক বিধি-বিষেধ মানিয়া চলিতে হয় এবং সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন করিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছা করিলেই যে কোন সদস্য তাহার পরিবার-ভিত্তিক পরিচয় অস্বীকার করিতে পারে না।

(৮) **পরিবারের স্থায়ী এবং অস্থায়ী প্রকৃতি (Permanent and temporary nature of family) :** সংস্থা (institution) হিসাবে পরিবার হইতেছে স্থায়ী এবং বিশ্বজননী; কিন্তু নিছক সংঘ (association) হিসাবে পরিবার অস্থায়ী হইতে পারে। কারণ একটি পরিবারের আয়তন এখন যাহা দেখা যাইতেছে, কয়েক বছর পরেও যে তাহাই থাকিবে, অথবা এখন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যে সদ্ভাব দেখা যাইতেছে, কয়েক বছর পরেও যে তাহাই থাকিবে সেই বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই।

আধুনিক পরিবারের পরিবর্তনশীল কাজ (Changing functions of a modern family) : সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবার গঠন এবং পরিবারের বিভিন্ন কাজেরও অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। প্রাচীনকালে পরিবারের মুখ্য কাজ

ছিল, পরিবারের প্রধান স্ত্রী ও পুরুষ সদস্যের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সন্তানের সৃষ্টি ও লালন-পালন করা, সন্তানকে কর্মক্ষম ও শিক্ষিত করিয়া তোলা,—পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার বিধান করা এবং সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবারের দিক হইতে দায়িত্ব পালন করা। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যাহাতে সম্প্রীতি বজায় থাকে এবং পরিবারের সদস্যগুলি যাহাতে বৃহত্তর সমাজে নিজেদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করিতে পারে সেদিকে পরিবারের যিনি প্রধান তাহাকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। পরিবারের এই কাজগুলির মধ্যে মুখ্য ভূমিকা যদি পিতা গ্রহণ করিতেন এবং পিতার নামেই যদি পরিবারের পরিচিতি হইত তবে সেই পরিবারকে বলা হইত পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। আবার, এই দায়িত্ব যদি মাতার নামেই পালিত হইত এবং মাতার নামেই যদি পরিবারের পরিচিতি হইত, তবে সেই পরিবারকে বলা হইত মাতৃতান্ত্রিক পরিবার। কিন্তু, আধুনিকালে পরিবারের কাজ সম্বন্ধে মানুষের ধারণার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে আমাদের দেশেই আমরা বড় বড় যৌথ-পরিবার (joint family) দেখিতে পাইতাম। যৌথ-পরিবারের কাজ ছিল পরিবাবের সব সদস্যদের স্বার্থ সমান দৃষ্টিতে দেখা এবং পরিবারের সদস্যদের সামগ্রিক উপার্জিত অর্থ একই তহবিলে রাখিয়া তাহা হইতেই পরিবারের সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করা। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাবে এবং অর্থ নৈতিক চাপের দরুন বর্তমানে যৌথ-পরিবার প্রথা ক্রমশই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এবং সেক্ষেত্রে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক পরিবারের সৃষ্টি হইতেছে। পরিবারের যিনি প্রধান তাঁহার প্রধান কাজ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া আদর্শ নাগরিকে পরিণত করার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা।

পরিবারের কাজ সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা

পরিবারের কাজ সম্পর্কে আধুনিক ধারণা

ব্যক্তি-কেন্দ্রিক পরিবার

আধুনিককালে অর্থ নৈতিক চাপের দরুন পরিবারের স্ত্রীলোকদের চাকুরি করিতে হয়। অনেক সময় শিশু-সন্তানকে অন্যের হেপাজতে রাখিয়া মাতাকে চাকরির কাজেই বাহির হইতে হয়। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের আয়ে সংসার চালানো আধুনিক পরিবার-প্রথার একটি বৈশিষ্ট্য। ইহার ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী-শিক্ষার সম্প্রসারণ হইতেছে। পূর্বে পরিবারে পুরুষেরা কাজে বাহির হইতেন এবং স্ত্রীলোকেরা ঘর-সংসার দেখাশোনা করিতেন ; কিন্তু মুখ্যতঃ অর্থ নৈতিক চাপের দরুনই পরিবারের কাজের মধ্যে এই পরিবর্তন দেখা যাইতেছে।

অর্থ নৈতিক চাপের দরুন স্ত্রীলোকদেরও অর্থ-উপার্জনের প্রচেষ্টা দেখা যায়

পরিবারের কাজে আরেকটি পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। পূর্বে আমাদের দেশে বিভিন্ন পরিবারে বার মাসে তের পার্বন—বা বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা, ব্রত ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। অর্থ নৈতিক চাপের দরুন এবং নূতন আলোক-প্রাপ্ত, শিক্ষিত ব্যক্তিদের সামাজিক উৎসব ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর

পরিবর্তনের দরুন পূজা-ব্রত ও বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের চাপ কমিয়া গিয়াছে। তবে বড় বড় সামাজিক উৎসবে এখনও পরিবারের সকলের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি-সম্ভাষণ চলিয়া থাকে এবং সব পরিবারই কতিপয় বড় বড় সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে; যেমন, হিন্দুদের দুর্গাপূজা, মুসলমানদের ঈদ এবং খ্রীষ্টানদের বড়দিন প্রভৃতি উৎসবের একটি চিরন্তন আবেদন সংশ্লিষ্ট ধর্মের পরিবারের কাছে থাকে।

সামাজিক উৎসবাদির চাপ হ্রাস

সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের ভূমিকা (Role of the Family in the Social system)—পরিবারের ভূমিকা সর্বকালে এবং সর্বদেশেই গুরুত্বপূর্ণ। মানবসমাজের বিবর্তনেও পরিবারের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের সমবায়েই সমাজ গঠিত। পরিবারের উপর ভিত্তি করিয়া বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, বিবাহ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান; কারণ, কতিপয় বিধিনিষেধের উপর এই প্রতিষ্ঠানদ্বয় ভিত্তিশীল। হিন্দু পরিবার এবং মুসলমান পরিবারের নিয়ম অনেক ক্ষেত্রে আলাদা থাকায় বিবাহ এবং সম্পত্তি উত্তরাধিকারের নিয়ম এই দুইটি ক্ষেত্রে একপ্রকার নয়। পরিবারের দরুন সমাজে শ্রমবিভাগ (Division of Labour) সুষ্ঠুরূপ ধারণ করে। প্রাচীনকালে যে চতুরাশ্রম বা ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র এই চার শ্রেণীর লোকের কাজের বিভাগ সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাও পরিবারের উপর ভিত্তিশীল ছিল। বর্ণভেদ প্রথারও মূল ভিত্তি হইতেছে পরিবার। পারিবারিক শ্রম-বিভাগ হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল গ্রামীণ সম্প্রদায় (Village Community)।

বর্তমানকালে আমরা পারিবারিক জীবনের বন্ধন অনেক শিথিল হইতে দেখিতেছি। অর্থনৈতিক চাপ, শিক্ষার প্রকৃতির পরিবর্তন, মানুষের আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব,—প্রভৃতি কারণে পারিবারিক বন্ধন ক্রমেই শিথিল হইতেছে। তবুও পরিবার এখনও সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি। সন্তান-সন্ততির লালনপালন, শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা, সম্পত্তির বণ্টন ব্যবস্থা, সংঘবদ্ধভাবে জীবন কাটাইবার জন্য এবং সাংসারিক নিরাপত্তার জন্য বাড়ীঘর নির্মাণ করা, অর্থ বিনিয়োগ করা, সবই পরিবারের ভিত্তিতেই সংগঠিত হয়। পরিবারের বৃদ্ধ সভ্য-সভ্যাদের দায়িত্ব গ্রহণ করা যুবক সভ্যদেরই দায়িত্ব। উৎপাদন-ব্যবস্থা যদিও এখন কলকারখানা দ্বারাই পরিচালিত হয়, তবুও তাহাতে পরিবারের ভূমিকা অবলুপ্ত হয় নাই। পরিবারের কর্তা এখনও তাঁহার সন্তান কোন্ উপজীবিকা গ্রহণ করিবে অথবা কোন্ চাকরি গ্রহণ করিবে সে সম্পর্কে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন। তাহাছাড়া, এখনও অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক বৃত্তি (Family occupations) অনুসৃত হয়। যেমন, চিকিৎসকের ছেলে চিকিৎসক। শিক্ষকের ছেলে শিক্ষক, কুম্ভকারের ছেলে কুম্ভকার, সূত্রধরের ছেলে সূত্রধর, এ-জাতীয় নজিরের অভাব নাই।

পারিবারিক কাজ সম্পর্কে এখন দৃষ্টিভঙ্গীরও যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে। সমাজ ব্যবস্থা বর্তমানে এমন হইয়াছে যে, পরিবারের স্ত্রীলোকদেরও অনেকক্ষেত্রে আজ রান্নাঘরের চারদেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া চাকুরির সন্ধানে বাহির হইতে হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আয়ে সংসার চলে এইজাতীয় বহু দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে আছে। অর্থনৈতিক চাপের দরুনই পরিবারের ভূমিকা পরিবর্তিত হইতেছে।

মানুষের সংঘবদ্ধতার দরুন এবং সামাজিক উত্তরাধিকারের ঐতিহ্যে সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবারের ভূমিকা অতীতেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এখনও আছে।

সমাজ-গঠনে পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal Theory of the origin of Society)—এই মত অনুযায়ী সমাজ এবং রাষ্ট্রকে এমন এক পরিবারে সম্প্রসারিত পরিণতি বলিয়া মনে করা হয় যেখানে পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ পুরুষই অথবা Patriarch সর্ব কর্তৃত্বের অধিকারী। স্যার হেন্‌রী মেইন (Sir Henry Maine) এই তত্ত্বের সমর্থনে প্রাচীনকালের রোমক, হিন্দু এবং অন্যান্যদের সমাজ-ব্যবস্থার নজির দেখাইয়াছেন। এই মত অনুসারে কয়েকটি পরিবার লইয়া একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, কয়েকটি গোষ্ঠী লইয়া একটি উপজাতির সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এই সব পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ পুরুষই পরিবারের প্রত্যেকের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব করিতেন। পরিবার হইতে গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, তখন গোষ্ঠীপতি হইতেন সেই গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ। অবশেষে যখন গোষ্ঠী হইতে, উপজাতি এবং সর্বশেষে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়, তখন যিনি পিতৃশ্রেষ্ঠ তিনিই রাষ্ট্রনায়কের পদ গ্রহণ করিতেন। এরিস্টটলও পরিবার হইতে যে সমাজ এবং রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে এই মতবাদ প্রচার করেন।

পিতাকে প্রধান হিসাবে স্বীকার করিয়া পরিবারের বিস্তৃতি

এই মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন ম্যাকলীনান, মর্গান প্রমুখ পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ। তাঁহাদের মতে প্রাচীন রোম এবং আরও কয়েকটি দেশে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার দেখা গেলেও একথা বলা যায় না যে ইহাই রাষ্ট্র গঠনের আদি এবং সর্বজনীন রূপ। অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচীনকালে পরিবার ছিল মাতৃতান্ত্রিক। তাহা ছাড়াও, অনেক লেখক এই মত পোষণ করেন যে অনেক জাতি আছে যাহারা পরিবার গঠন না করিয়াই এমনিতেই দলবদ্ধ হইয়া প্রাচীনকালে বাস করিত, এবং পরিবারের সম্প্রসারণহেতু যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে ইহা অনেক ক্ষেত্রেই সত্য নহে।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Matriarchal Theory)—এই মতবাদ অনুযায়ী প্রাচীনকালের পরিবারগুলি ছিল মাতৃতান্ত্রিক, অর্থাৎ মাতার দিক দিয়াই পরিবারের পরিচয় প্রকাশ পাইত। তৎকালীন যুগে বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল এবং মাতৃশ্রেষ্ঠই (matriarch) পরিবারের প্রধানা বলিয়া বিবেচিত হইতেন। পরিবার হইতে ক্রমে সৃষ্টি হয় গোষ্ঠীর এবং তাহার পরিচয়ও হয় মাতার দিক হইতে। গোষ্ঠী

মাতাকে প্রধান হিসাবে স্বীকার করিয়া পরিবারের বিস্তৃতি

হইতে উপজাতি এবং উপজাতি হইতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ম্যাকলীনান, জেংকস্ এবং এই মতবাদের অন্যান্য সমর্থকগণ মনে করেন যে প্রাচীনকালে মাতাই ছিলেন সন্তান-সন্ততিদের অভিভাবিকা। বিবাহ-প্রথার বহু পূর্ব হইতেই মাতার সম্বন্ধ দিয়া সন্তানের পরিচয় নিরূপিত হইত।

কিন্তু সমাজের সম্প্রসারণে ও রাষ্ট্রগঠনের এই রূপটিও যে সর্বজনীন নয়—তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ নাই যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি পিতৃতান্ত্রিক অথবা মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে হইয়াছে। রাষ্ট্র গঠনের কারণ হইতেছে বহুবিধ। সুতরাং রক্তের সম্পর্ক হেতু অথবা স্বগোত্রীয় মানুষের বন্ধনহেতুই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে, একথা বলা ঠিক নহে। রাষ্ট্র হইতেছে একটি বিবর্তন প্রক্রিয়ার সৃষ্ট, এই বিবর্তন-প্রক্রিয়ার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞাতিত্ব মাত্র একটা কারণে হইয়াছে—কিন্তু ইহাই একমাত্র কারণ নহে।

যৌথ-পরিবার প্রথা (Joint Family System)—ভারতে আমরা যৌথ-পরিবার প্রথা দেখিতে পাই। এই প্রথা অনুযায়ী মূল পরিবারের কর্তার সহিত তাহার পুত্র, পৌত্র এবং এমন কি প্রপৌত্রগণ পর্যন্ত যথাসম্ভব একান্নবর্তী হইয়া বাস করে। যৌথ-পরিবারের প্রধানকে কর্তা বলা হয়। তিনি হইতেছেন পরিবারের সম্পর্কে সর্বপ্রধান এবং বয়সে সর্বজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। যৌথ-পরিবার প্রথা অনুযায়ী পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের আয় একত্রিত করিতে হয় এবং কর্তার নির্দেশ অনুযায়ী তাহা খরচ করা হয়। পরিবারের সমস্ত সম্পত্তিতে সকলেরই যুক্ত মালিকানা থাকে। যৌথ-পরিবারের সামাজিক জীবনযাত্রাও কর্তার নির্দেশে পরিচালিত হয়।

যৌথ-পরিবারের সুবিধা (Merits of a Joint Family)—(১) অধিকাংশ স্বতন্ত্র পরিবারকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আর্থিক সংস্থানের জন্য যে মানসিক উদ্বেগ ভোগ করিতে হয়, যৌথ-পরিবারের সভ্যগণ তাহা হইতে মুক্ত। কারণ, এক সভ্যের উপার্জনের ঘাটতি অন্য এক সভ্যের উপার্জনের প্রাচুর্য হইতে পূরণ করা যাইতে পারে। যদি পরিবারের কোন সভ্য বেকার থাকে, বেকার জীবনের শারীরিক ও মানসিক গ্লানি তাহাকে কম ভোগ করিতে হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যমূলক সমাজের যে সমস্যাগুলি দূর করিবার জন্য পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক রাষ্ট্রগুলিকে বিরাট আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, যৌথ-পরিবার প্রথা তাহার অনেকগুলির সৃষ্টি পর্যন্ত হইতে দেয় না। পাশ্চাত্যের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তাজনক আইনগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যৌথ-পরিবার প্রথা পরিবারের সভ্যদের সহজেই অনুরূপ নিরাপত্তা দান করে। অসহায়া বিধবা অথবা পিতৃমাতৃহীন শিশু প্রভৃতির আশ্রয় মিলে একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে। সর্বোপরি পরিবারের সকলের মধ্যে এমন একাত্মবোধ গড়িয়া উঠে যাহা পাশ্চাত্য পারিবারিক জীবনে পাওয়া যায় না।

যৌথ-পরিবার ব্যবস্থার সুবিধা

(২) কৃষিজমির ক্ষেত্রে যৌথ-পরিবার প্রথা জমির উপবিভাগ এবং বিখণ্ডন (Subdivision and fragmentation of lands) প্রতিরোধশীল। কারণ যৌথ-

পরিবারের মাধ্যমে অনেক সময়েই জমির-বাঁটোয়ারা এড়াইয়া চলা যায়। ইহাতে যে শুধু একটি আর্থিক সুবিধা হয়, তাহাই নহে। পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিও ইহাতে প্রশস্ত হয়।

(৩) ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও যৌথ-পরিবারের সভ্যদের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। অনেক সময় দেখা যায় ব্যবসায়-বাণিজ্যে কেহ হাত দিলে তাহার যৌথ-পরিবার মূলধন সরবরাহ করিয়া প্রাথমিক ঝুঁকি গ্রহণ করে। দেশের মূলধন সৃষ্টিতে ইহার একটি বিশেষ মূল্য আছে।

(৪) আলাদা আলাদা পরিবারের লোকদের যতটা সাংসারিক ব্যয় হয়, অনুরূপ সভ্যসংখ্যা-বিশিষ্ট যৌথ-পরিবারে তাহা অপেক্ষা কম সাংসারিক ব্যয় হয়। তাহাতে পরিবারের সামগ্রিক সঞ্চয় বৃদ্ধি হয় এবং সেই সঞ্চিত অর্থ বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টায় বিনিয়োগ করা সম্ভবপর হয়।

যৌথ-পরিবার পরিবারস্থ সভ্যের কাছে একাধারে একটি শ্রম-সংস্থা এবং একটি কল্যাণকারক সমাজ।

যৌথ-পরিবারের অসুবিধা

যৌথ-পরিবার ব্যবসায় কতকগুলি অসুবিধাও আছে। যথা—(১) ভরণ-পোষণ সম্বন্ধে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়ার সুযোগ থাকায় যৌথ-পরিবারের কোন কোন সভ্যের মধ্যে কর্ম-বিমুখতা এবং অপরের উপার্জনের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিবার স্পৃহা জাগ্রত হইতে পারে। ইহা শিল্পোন্নয়নের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। যৌথ-পরিবার প্রথা আমাদের দেশের প্রচ্ছন্ন বেকার অবস্থার (disguised unemployment) জন্য অনেকাংশে দায়ী।

(২) যৌথ-পরিবারে অনেক সময় অমিতব্যয়িতা এবং সঞ্চয়ের অভাবও দেখা যায়। তাহাতেও শিল্পোদ্যমের অভাব ঘটে।

(৩) শ্রমের গতিশীলতা (mobility of labour) অনেক সময় যৌথ-পরিবার প্রথার দরুন কমিয়া যায়। যৌথ-পরিবারে সংহতি যাহাতে বজায় থাকে এইজন্য পরিবারের কর্তা অনেক সময় পরিবারের কর্মক্ষম সভ্যগণকে স্বগ্রাম ছাড়িয়া অন্য গ্রামে যাইয়া উপার্জন করিতে বাধা দেন। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শ্রমের গতিশীলতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিশেষত, ভারতবর্ষের ন্যায় অনুন্নত দেশে সমগ্র শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য শ্রমের গতিশীলতা অপরিহার্য। যৌথ-পরিবার প্রথা শ্রমের গতিশীলতা ব্যাহত করিয়া দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ প্রতিহত করে।

(৪) যৌথ-পরিবার ব্যবস্থার আর একটি অপগুণ হইল, কোন একজন সভ্যের উপার্জন বেশী হইলেও, তাহার পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থাৎ তাহার ইচ্ছানুযায়ী খরচ করিবার অধিকার থাকে না। গৃহকর্তার ইচ্ছানুযায়ী তাহার উপার্জিত অর্থের ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাতে মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যম গোড়াতেই বিনষ্ট হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে স্বভাবতই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ চিত্তকে আকর্ষণ

করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাও অনেক পরিমাণে আমাদের পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী উল্টাইয়া দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের গতিশীলতা বর্তমানে বেকার সমস্যার যুগে কিছুটা বাড়িয়াছে। কারণ, বেকার যুবকরা বর্তমানে চাকুরি পাইলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যাইতে দ্বিধা করে না। শ্রমের গতিশীলতা নির্ভর করে অনেক পরিমাণে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। দেশান্তরে যাওয়া পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজ এবং স্বল্পব্যয়সাধ্য হওয়ায় শ্রমের গতিশীলতা অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে। শ্রমের গতিশীলতা বাড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই যৌথ-পরিবার ব্যবস্থার প্রতি দেশবাসীর আকর্ষণ কমিয়া আসিয়াছে।

যৌথ-পরিবার ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা

বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের সৃষ্টি (Evolution of the Social Life)— সমাজ-জীবনের সৃষ্টি হইয়াছে মানব সমাজের এক বিবর্তনের মধ্য দিয়া—আদিম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত মানব-সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ সামাজিক সংগঠন হিসাবে গঠিত হইতেছে। সমাজের সৃষ্টি বিবর্তনের মাধ্যমে হইয়াছে বলিয়াই ঐতিহাসিকগণ মনে করেন রাষ্ট্রের সৃষ্টিও হইয়াছে অনুরূপ বিবর্তনের মাধ্যমে। অর্থাৎ যেভাবে সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে সেইভাবে রাষ্ট্রেরও সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাকে **রাষ্ট্র সৃষ্টির বিবর্তনবাদ অথবা ঐতিহাসিক মতবাদ** বলা হয়।

সমাজ-জীবনের সৃষ্টি

সামাজিক জীবনের ক্রমবিকাশে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

প্রথমত, মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে চায়। এরিস্টটল অনেক আগেই বলিয়া গিয়াছেন, মানুষ স্বভাবতই সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রাণী। সমাজবদ্ধ হিসাবে বাস করিবার প্রেরণা সৃষ্ট হইয়াছে পরিবার হইতে। সুতরাং সমাজ-গঠনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পরিবারের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। রক্ত-সম্পর্কের বন্ধন মানুষকে পরিবারে একত্রিত করে। বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পারিবারিক বন্ধনের সৃষ্টি হইতে গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। পরিবার হইতে গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী হইতে সৃষ্ট হয় বৃহত্তর উপজাতি এবং সর্বশেষে সৃষ্ট হয় জাতি। এইভাবে রক্ত-সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র পরিবারের চরম পরিণতি হইয়াছে জাতিগঠনের মধ্যে।

পারিবারিক বন্ধন

দ্বিতীয়ত, ধর্মের বন্ধনও সামাজিক জীবনের ক্রমবিকাশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। রক্ত-সম্পর্কের বন্ধন ছাড়াও মানুষ অনেক সময়ে একত্রিত হইয়াছে এবং তাহা হইয়াছে একই ধর্মের ভিত্তিতে। অতি প্রাচীনকালে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে শ্রদ্ধা এবং ভয়ের চক্ষে দেখিত। সমাজের বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই নৈসর্গিক শক্তিগুলিকে আয়ত্তাধীনে আনার দাবি করিয়া সমাজের অন্যান্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। অনেক সময় রাজারাও এই ধর্মসম্বন্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের ধর্মগুরু

ধর্মের বন্ধন সমাজ-গঠনের পক্ষে সহায়ক

আখ্যা দিতেন। বর্তমানকালের ইংলণ্ডের রানী সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মমহাসংগঠনের প্রধান (Head of the Established Church) হিসাবে পরিচিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে রাষ্ট্রীয় চেতনায় উন্মেষ হইবার অনেক পূর্বেই মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্যবোধ গড়িয়া উঠে। সেই অবস্থায় রাষ্ট্র-শাসকের বশ্যতা স্বীকার করা এবং তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা (ethical compulsion) বলিয়া বিবেচিত হয়।

তৃতীয়ত, রক্ত-সম্পর্কের বন্ধন এবং ধর্মীয় বন্ধন ছাড়াও সামাজিক জীবনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হইতেছে সামরিক শক্তি এবং ক্ষেত্রবিশেষে পাশবিক শক্তি। ভ্রাম্যমাণ জীবন পরিত্যাগ করিয়া মানুষ যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হইল, তখন নিজেদের ধন-সম্পত্তি ও প্রাণের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় যাঁহারা শক্তিশালী তাঁহারা অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া সেই নিরাপত্তা-রক্ষার দায়িত্বগ্রহণ করেন। যুদ্ধকালে যিনি নেতা নির্বাচিত হইতেন, শান্তির সময়েও তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকৃত হইত। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে শুধু শারীরিক বল অথবা সামরিক শক্তিই দলপতি নেতৃত্বের প্রধান ভিত্তি ছিল না। শাসিতের ইচ্ছা এবং সহযোগিতা রাষ্ট্র-গঠনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ শাসিতের ইচ্ছা ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ মানুষকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জাতীয় চরিত্র এবং জাতীয়তাবোধ সামাজিক জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই সকল উপাদান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে সমাজ বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। প্রথম পর্যায়ে পরিবারের সৃষ্টি হয়, পরিবার হইতে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হইতে উপজাতি এবং সর্বশেষে উপজাতি হইতে জাতির সৃষ্টি হয়। জাতি যখন সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জন করিল, তখন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল। কিন্তু, দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্র-গঠনের ভিত্তি ছিল মানব সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক চেতনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক, তাহা ইহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। আন্তর্জাতিকতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রনীতিরও পরিবর্তন হইয়াছে।

সামরিক শক্তি ও রাষ্ট্র সৃষ্টির অন্যতম ভিত্তি

সামাজিক জীবনের পরিণতি হিসাবে রাষ্ট্রের সৃষ্টি

সর্বশেষে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা, সম্পত্তি বজায় রাখার চেষ্টা, অভাব পূরণ করিয়া নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করিবার প্রেরণা প্রভৃতিও মানুষকে সংঘবদ্ধ হইয়া বসবাস করিবার প্রেরণা দেয়। মানুষ যখন বুঝিতে পারিল যে একটি সুনির্দিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থার মাধ্যমেই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব, তখনই মানুষ সেই সমাজ-ব্যবস্থাকে স্থায়ী রাখার জন্য স্বেচ্ছায় কর প্রদানে সম্মত হইল। ইহার পূর্বে সবল ব্যক্তিগণ দুর্বলের নিকট হইতে বলপ্রয়োগ কর আদায় করিত, অথচ ইহার বিনিময়ে সমুদয় দায়িত্ব সর্বাংশে সম্পাদন করিত না।

সমাজ-জীবনের গঠনে বিভিন্ন উৎপাদনগুলি নিয়ে চিত্রে দেখানো হইয়াছে।



রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা

উপরের চিত্রে সমাজ-ব্যবস্থার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তির বিশেষ ভূমিকা দেখানো হইয়াছে।

Exercise

1. Discuss the role of the individual in the Society. (৩-৪ পৃষ্ঠা)
   (সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তির ভূমিকা আলোচনা কর)।
2. Discuss the distinctive features of a modern Family.
   (পরিবারের গঠন এবং পরিবারের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর)।
   (৫-৭ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the factors contributing to the evolution of Society.
(সমাজের ক্রমবিবর্তনের উপাদানগুলি আলোচনা কর)।

4. Give an account of the changing functions of a modern family.
(পরিবারের পরিবর্তনশীল কাজের একটি বিবরণী দাও)। (৭-৯ পৃষ্ঠা)

5. Give a brief idea of the Evolution of the Social Life.
(সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও)।
(১৩-১৫ পৃষ্ঠা)

6. Write notes on :—
(a) Patriarchal Theory.
(b) Matriarchal Theory.
[টীকা লিখ : (ক) পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ (খ) মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ।]
(১০-১১ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the merits and demerits of the Joint family System in the Indian context.
(ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে যৌথ-পরিবার প্রথার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর)। (১১-১৩ পৃষ্ঠা)

8. In what sense is a man social animal ?
(কি অর্থে মানুষ সামাজিক প্রাণী ?) (৩-৪ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the role of the family in the social system.
(সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবারের ভূমিকা আলোচনা কর।) (৯-১০ পৃষ্ঠা)

10. Write a short note on the organic theory regarding the formation of society. (২-৩ পৃষ্ঠা)
(সমাজ গঠনের জৈবিক তত্ত্বের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।)

রাষ্ট্র, সমাজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
(The State, the Society and other Associations)

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (Definition of the State)—'রাষ্ট্র' (State) কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ইটালীর দার্শনিক মেকিয়াভেলি। গ্রীক এবং রোমানগণ রাষ্ট্র বুঝাইতে যথাক্রমে "পোলিস" এবং "সিভিটাস্" এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিতেন। 'রাষ্ট্র' কথাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিক 'রাষ্ট্র' কথাটির বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন। গ্রীক্ দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, যখন স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে জনগণ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট শহরের মধ্যেই একই শাসনব্যবস্থার আওতায় আসে, তখন ইহাকে রাষ্ট্র বলা হয়। প্রাচীন গ্রীসে আমরা দেখিতে পাইতাম শহর রাষ্ট্র বা City State। স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ জীবনের জন্য এরিস্টটল মানব জীবনের নৈতিক চরিত্র সংগঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা

বিভিন্ন দার্শনিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন ; নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হইল। হল্যাণ্ডের (Holland) মতে, রাষ্ট্র হইতেছে এমন একটি জনসমষ্টি যাহারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অধিকার করিয়া নিজেদের মধ্যে সংখ্যাধিক্যের ইচ্ছাকে বিরোধী দলের ইচ্ছার উপরে স্থান দিতে পারিবে। উইলসনের মতে (Woodrow Wilson) রাষ্ট্র হইতেছে একটি জাতি যাহা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনের জন্য সংগঠিত হইয়াছে।[১]

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলি আলোচনা করিলে আমরা রাষ্ট্রের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। কিন্তু, উপরের সংজ্ঞাগুলি কোনটিই ত্রুটিবিহীন নহে। অনেকের মতে ডক্টর গারনার (Dr. Garner) কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তাঁহার মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শাসনতান্ত্রিক আইনের দিক হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্র অল্পসংখ্যক অথবা বহুসংখ্যক জনসমষ্টি—যাহারা স্থায়িভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে এবং যাহারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন অর্থাৎ বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত এবং যাহাদের একটি সুনিয়ন্ত্রিত সরকার আছে, যে সরকারের নির্দেশ ঐ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী প্রতিনিয়ত পালন করিতে অভ্যস্ত।[২]

---

১ "The State is a people organised for law within a definite territory." —Wilson

২ "The State as a concept of Political Science and Constitutional Law, is a community of persons, more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience."—Garner

রাষ্ট্রের উপাদান (Elements of the State)—গার্নারের সংজ্ঞা হইতে আমরা রাষ্ট্রের নিম্নোক্ত উপাদানগুলি আলোচনা করিতে পারি। **রাষ্ট্রের প্রধানত চারিটি উপাদান ;** যথা—**জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, শাসনপ্রতিষ্ঠান** অথবা **সরকার** এবং **সার্বভৌম ক্ষমতা**। বাস্তবতার দিক হইতে রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে শাসন-প্রতিষ্ঠান ও সার্বভৌমত্ব।

(ক) **জনসমাজ (Population)**—জনসমষ্টি না হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। রাষ্ট্রে অনেক প্রকার লোক থাকিতে পারে, যেমন পূর্ণ নাগরিক, অসম্পূর্ণ নাগরিক (অর্থাৎ, যাহাদের ভোটাধিকার জন্মে নাই), বিদেশী ও প্রজা। জনসমাজ রাষ্ট্রের একটি অত্যাবশ্যক উপাদান, কিন্তু, একটি রাষ্ট্রে জনসংখ্যা কত হওয়া উচিত, তাহার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। এরিস্টটলের মতে, একটি শহর-রাষ্ট্রে (City State) যতজন লোক থাকা উচিত, ততটাই রাষ্ট্রের জনসমষ্টি হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানে জনসমষ্টির কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নাই। আমরা চীন এবং ভারতের ন্যায় জনবহুল রাষ্ট্র এবং বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, সিরিয়া প্রভৃতি অল্পসংখ্যক জনসমষ্টি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রও দেখিতে পাই। তবে কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এমন হওয়া উচিত যাহাতে উক্ত জনসমষ্টি লইয়া রাষ্ট্রের বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করা যাইতে পারে।

জনসংখ্যার নির্দিষ্ট সীমা নাই

(খ) **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Definite Territory)**—রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা থাকে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই পরিচালিত হয়। নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ব্যতীত রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। ভ্রাম্যমাণ যাযাবর জাতি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না। যখন একদল লোক একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থাকিতে আরম্ভ করে, তখনই রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। এই ভৌগোলিক সীমা কতবড় হইবে তাহা স্থিরীকৃত করা যায় না। রাষ্ট্রের আয়তন বড় অথবা ছোট উভয়ই হইতে পারে। আধুনিককালে যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের আয়তনের সীমারেখা স্থির করিবার প্রয়োজনীয়তা কমিয়া গিয়াছে।

রাষ্ট্র-গঠনে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অত্যাবশ্যক

সমুদ্রোপকূল হইতে সমুদ্রের অভ্যন্তরে কয়েক মাইল পর্যন্ত এবং উর্ধ্বেও কিছুটা দূরত্ব পর্যন্ত একটি রাজ্যের এলাকা বলিয়া স্বীকৃত হয়। বৈদেশিক রাষ্ট্র দূতাবাসও সংশ্লিষ্ট বিদেশী রাষ্ট্রের এলাকা বলিয়া বিবেচিত হয়। এমন কি সমুদ্রে যদি কোন রাষ্ট্রের জাহাজ চলিতে থাকে, তবে সেই জাহাজ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের এলাকা বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহাই রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের বিশেষ অর্থ।

(গ) **সরকার (Government)**—শুধু জনসমাজ থাকিলে এবং সেই জনসমাজ একটি নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস করিলেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় না। রাষ্ট্রের একটি সুসংগঠিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত সরকার থাকা চাই,—এই সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। জনসমষ্টিরই কল্যাণের জন্য তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

তাহা ছাড়া দেশে যাহাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে, সেইদিকেও রাষ্ট্রের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। জনসমাজের কল্যাণের জন্য দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার দায়িত্ব হইতেছে সরকারের। সরকারের আবার তিনটি বিভাগ আছে—আইনসভা (Legislature), শাসনবিভাগ (Executive) বিচারবিভাগ (Judiciary)। সরকার বলিতে রাষ্ট্র বুঝায় না, কিন্তু সরকার না থাকিলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং গঠন হইতে পারে না।

(ঘ) সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)—রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান উপাদান সার্বভৌমত্ব : সার্বভৌমত্ব না থাকিলে রাষ্ট্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সুনিয়ন্ত্রিত সরকার থাকিলেও সার্বভৌম ক্ষমতাবিহীন রাষ্ট্র প্রকৃত রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে না। এই সার্বভৌম ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র দেশের জনসমষ্টির নিকট হইতে একক এবং পূর্ণ আনুগত্য লাভ করে। রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানই অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত করিতে পারে না। যিনি সার্বভৌম বলিয়া বিবেচিত হন অথবা যে প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের ভিতরে কোন শক্তিই রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপকে অমান্য করিতে পারে না ; ইহাকে **রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব** (Internal Sovereignty) বলা হয়। আবার, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি **সার্বভৌমত্বের বাহ্যিক প্রকাশ** (External Sovereignty)। অধ্যাপক গার্নারের মতে, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না হইয়া প্রায়-মুক্ত হইলেও (independent, or nearly so, of external control) কোন দেশ রাষ্ট্রপদবাচ্য হইবে।

রাষ্ট্রের আরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে ; সেইগুলি হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা (permanence and continuity) এবং আন্তর্জাতিক আইনের বলে রাষ্ট্রের সমানাধিকার (equality of States)।

আমাদের দেশের কোন রাজ্য প্রদেশকে আমরা রাষ্ট্র বলিতে পারি না কারণ, ইহার নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমাজ এবং আঞ্চলিক সরকার থাকিলেও সার্বভৌমত্ব নাই। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হইলে কোন সরকার অথবা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন জনসমাজসহ কোন নির্দিষ্ট ভূভাগ রাষ্ট্রপদবাচ্য হইতে পারে না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গ-রাজ্য (Component State) হিসাবে ইহাকে ভদ্রতাসূচকভাবে রাজ্য (State) বলিয়া অভিহিত করা হয়। দেশ স্বাধীন হইবার পূর্বে যখন মহীশূরে একটি দেশীয় রাজ্য ছিল, তখনও ইহাকে রাষ্ট্র বলা যাইত না। কারণ, তখনও ইহার সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল না।

নিউইয়র্ক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গ-রাজ্য (Component State) এবং ইহাকেও আমরা রাষ্ট্র বলিতে পারি না। কারণ, ইহার সার্বভৌম ক্ষমতা নাই, যদিও সেখানে আমরা নির্দিষ্ট ভূভাগ, জনসমাজ এবং আঞ্চলিক সরকার দেখিতে পাই। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ-রাজ্যগুলিকে কখনই রাষ্ট্র বলা যায় না।

বর্তমানকালে, বিশেষত প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতি (League of Nations) গঠন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘ (United Nations) গঠন বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌম ক্ষমতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। জাতিপুঞ্জ অথবা জাতি-সংঘ একটি রাষ্ট্র নহে। কারণ, জাতিপুঞ্জের সদস্যদের মধ্যে প্রত্যেকরই যে কোন সময়ে জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ ছাড়িয়া দেওয়ার অধিকার থাকায় ইহার প্রকৃত সার্বভৌমত্ব নাই। তাহা ছাড়া, জাতিসংঘের জন্য নির্দিষ্ট জনসমাজ এবং স্থায়ী ভূভাগ নাই। প্রত্যেক দেশের নির্দিষ্ট ভূভাগ আছে এবং সেই দেশের আঞ্চলিক সরকার অথবা সেই দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে জাতিপুঞ্জ অথবা জাতিসংঘের আইনগত কোন ক্ষমতা নাই। সর্বোপরি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ আনুগত্য জানাইবেন, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই।

রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government)—রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে আমরা বিভিন্ন পার্থক্য দেখিতে পাই। সরকার হইতেছে রাষ্ট্র-গঠনের একটি উপাদান মাত্র। সুতরাং, সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের একটি অংশ মাত্র।

(১) রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমগ্র জনসমাজ রাষ্ট্রের সভ্য ; কিন্তু, সরকার গঠিত হয় অল্পসংখ্যক লোক লইয়া। অর্থাৎ আইনসভার সদস্য, শাসনবিভাগের মন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী এবং বিচারবিভাগের বিভিন্ন বিচারক ও অন্যান্য কর্মীদিগকে লইয়া সরকার গঠিত হয়।

(২) রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু, সরকার কখনই স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না। দেশে সাধারণ নির্বাচনের পর যে রাজনৈতিক দল সরকার গঠনের যোগ্যতা অর্জন করে, সেই রাজনৈতিক দল কর্তৃক সরকার গঠিত হয়। আবার পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে যদি কখনও আইনসভা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে সরকারের পরিবর্তন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সরকার রাষ্ট্রের মত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নয়।

রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, সরকার একটি অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান

(৩) রাষ্ট্র বলিতে প্রথমেই আমরা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা করি। কিন্তু সরকার বলিতে শুধু আইনসভা, শাসনবিভাগ কর্মীদের একটি সমষ্টি বুঝায়।

রাষ্ট্রের ভূখণ্ড আছে সরকারের ভূখণ্ড নাই

(৪) রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু, সরকার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালনা করে। সরকারের নিজস্ব সার্বভৌমত্ব নাই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ হইতে দেখিতে পাই, সে দেশে শাসনতন্ত্রই সার্বভৌম এবং সরকার শাসনতন্ত্র হইতে ক্ষমতা লাভ করে।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আছে, সরকারের সার্বভৌমত্ব নাই

(৫) সব রাষ্ট্রেই আমরা প্রধানত চারিটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। যথা,—জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূভাগ, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব। কিন্তু, বিভিন্ন দেশে সরকারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ; কোন দেশে হয়তো সরকার প্রজাতন্ত্রী, আবার কোন দেশে সরকার

হয়তো দায়িত্বশীল। আবার, সরকার গণতান্ত্রিক অথবা একনায়কতান্ত্রিক, এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় অথবা এককেন্দ্রিক হইতে পারে।

(৬) নাগরিকগণের বিভিন্ন অধিকারের উৎস হইতেছে রাষ্ট্র,—সরকার নহে। সরকারের দায়িত্ব হইল সেই অধিকার রক্ষা করা। নাগরিকগণের সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিতে পারে,—কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহাদের কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না।

(৭) রাষ্ট্র রূপহীন একটি ধারণা মাত্র। সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের বহিঃপ্রকাশ। সরকার রাষ্ট্রকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ (State and other Associations)—রাষ্ট্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলি আমরা অন্যান্য সংঘে দেখিতে পাই না।

প্রথমত, রাষ্ট্রের একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড চাই। অন্যান্য সংঘের নির্দিষ্ট ভূভাগের দরকার নাই।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘের কোন স্থায়িত্ব নাই। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রচলিত মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই মতবাদের পরিবর্তন হইলেই সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন হয়।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের অনেক উদ্দেশ্য থাকে। মনুষের বহির্জীবনের বিভিন্ন দিক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহাকে বিভিন্ন দিকে উন্নত হইতে সাহায্য করে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘগুলি দুই-একটি উদ্দেশ্য অথবা কতিপয় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কাজ করে এবং তাহাতে মানুষের বহির্জীবনের সামগ্রিক উন্নতি হয় না।

চতুর্থত, রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘের সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। একটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

পঞ্চমত, মানুষ একই সময়ে বিভিন্ন সংঘের সভ্য হইতে পারে অথবা কোন সংঘেরই সভ্য না হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে কোন না কোন রাষ্ট্রের সভ্য হইতেই হইবে এবং সে একই সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সভ্য হইতে পারে না।

রাষ্ট্র ও সমাজ (State and Society)—রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে আমরা যে সম্পর্ক দেখিতে পাই, রাষ্ট্র এবং সমাজের সম্পর্কের মধ্যেও তাহার সাদৃশ্য আছে। রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। সমাজের পরিধি অপেক্ষা রাষ্ট্রের পরিধি অনেক ব্যাপক। রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবার বহু পূর্বেই সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সুনিয়ন্ত্রিত সরকার থাকা চাই। কিন্তু, সমাজ-গঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সুনিয়ন্ত্রিত সরকার আবশ্যক নহে। আবার রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার সার্বভৌমত্ব। সমাজের সার্বভৌম ক্ষমতার কোন প্রয়োজন নাই। সর্বশেষে, যেহেতু রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র, সেইজন্য সমাজের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অপেক্ষাও ব্যাপক। রাষ্ট্র মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু সমাজের উদ্দেশ্য মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করা।

সমাজের মধ্যে আমরা যে সকল প্রতিষ্ঠান দেখি, সেগুলির মধ্যে রাষ্ট্রই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। ক্ষমতা এবং উদ্দেশ্যের দিক হইতেও ইহা অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি (Origin of State)—রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। চিরাচরিত মতবাদগুলির মধ্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ (Theory of Divine Origin), বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force) এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory) বিশেষ পরিচিত। আমরা এই তিনটি মতবাদ আলোচনা করিয়া দেখিব যে রাষ্ট্রের সৃষ্টির পক্ষে এই তিনটি মতবাদের কোনটিই পর্যাপ্ত নহে।

রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ (Theory of Divine Origin of the State) :—রাষ্ট্র ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট—এই মতবাদটি রাষ্ট্রের উৎপত্তির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মতবাদ বলিয়া অনেকে মনে করেন।

রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক সৃষ্টি সম্পর্কিত মতবাদের চারিটি বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক সৃষ্টি সম্পর্কিত মতবাদটি নিম্নলিখিত চারিটি সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত: (১) একমাত্র রাজতন্ত্রই হইল ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত শাসন পদ্ধতি। কারণ, রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবেই রাজকার্য করেন। (২) রাজার অবর্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং যথারীতি রাজ্যশাসন করিবেন। (৩) রাজা তাঁহার কাজের জন্য জনসাধারণ অথবা তাহাদের প্রতিনিধির নিকট দায়ী নহেন। তিনি তাঁহার কাজের জন্য শুধু ঈশ্বরের নিকট দায়ী। (৪) প্রজাদের উচিত বিনা বিচারে এবং বিনা দ্বিধায় রাজার আদেশ পালন করা এবং রাজার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।

সমালোচনা—এই মতবাদ অনেক কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রথমত, রাষ্ট্র একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের ভিত্তি। ভগবান নিশ্চয়ই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করেন না। দ্বিতীয়ত, এই মতবাদ বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র সমর্থন করে। কিন্তু বর্তমানকালে আমরা প্রকৃত ক্ষমতাশালী রাজতন্ত্র দেখিতে পাই না, যদিও এখনও অনেক দেশে নামেমাত্র রাজতন্ত্র আছে।

এই মতবাদ মানুষের স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক

তৃতীয়ত, মানুষের জন্মগত স্বাধীনতার পক্ষে এই মতবাদ বিশেষ বিপজ্জনক। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করিয়া রাজা অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাচারী হইয়াছেন। বিশেষতঃ রাজা মনে করেন যে তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং প্রজাদের নিকট তাঁহার কোনই দায়িত্ব নাই এবং তিনিই প্রজাদের পূর্ণ আনুগত্য পাইবার একমাত্র অধিকারী, তিনি যে স্বেচ্ছাচারী হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি প্রকৃতই রাজা নিজেকে আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করেন, তবে তাঁহার পবিত্র দায়িত্ব হইবে ঈশ্বরেরই সন্তান জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করা এবং নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া প্রজাদের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখা। কিন্তু

উক্ত মতবাদে বিশ্বাসী শাসকগণ কখনই এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন নাই। বরং অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইয়া তাঁহারা অত্যাচারী, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এবং স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তবে এই মতবাদটির একটি দিক আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে। যখন মানুষের রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার মোটেই সৃষ্টি হয় নাই, তখন এই মতবাদটি রাষ্ট্র সম্বন্ধে অন্তত একটি ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, এই মতবাদের একটি অন্তর্নিহিত সত্য হইতেছে, রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার একটি নৈতিক উদ্দেশ্য আছে। যে জনসমাজকে লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, তাহার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ব্যাপারেও রাষ্ট্রের একটি দায়িত্ব আছে। আবার, শাসকগণ যদি মনে রাখেন যে যেহেতু তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সেইজন্যই ঈশ্বরের সন্তানগণের জীবনযাত্রা উন্নত করার ব্যাপারে তাঁহাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব আছে তবে শাসনব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়।

এই মতবাদের নৈতিক মূল্য

বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force)—বলপ্রয়োগ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে অধিকতর শক্তিশালী লোক অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক অপেক্ষাকৃত দুর্বল লোক অথবা গোষ্ঠীর উপর বলপ্রয়োগের দ্বারা। আমরা এই মতবাদের দুইটি তাৎপর্য দেখিতে পাই। প্রথমত, রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে এই মতবাদ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি দেয়,—তাহা হইতেছে বলই রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং দ্বিতীয়ত, শুধু রাষ্ট্রের সৃষ্টিই নহে, রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব কোন জিনিস ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত তাহার নির্দেশও এই মতবাদে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতবাদের গোড়ার কথা হইতেছে যে শক্তিশালী লোক অথবা শক্তিশালী গোষ্ঠী বা উপজাতি যথাক্রমে দুর্বল লোক অথবা দুর্বল গোষ্ঠী বা উপজাতিকে শারীরিক পরাক্রমে পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে কোন দলপতি যখন তাঁহার নিজের সেনাবাহিনীর সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট ভূভাগে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন, তখনই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইত। সুতরাং এই মতবাদ অনুযায়ী যুদ্ধ রাষ্ট্রের সৃষ্টির অন্যতম উপাদান।

বলপ্রয়োগ হইতেছে রাষ্ট্রের মূলভিত্তি

কিন্তু সামরিক শক্তিই রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি নয়। রাষ্ট্র রক্ষার জন্য যেমন সামরিক আয়োজন অথবা সেনাবাহিনী চাই, তেমনি এক সদাসতর্ক এবং সচেতন জনমতেরও 'প্রয়োজন আছে। কারণ, রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি হইতেছে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সাধারণ ইচ্ছা। সুসংগঠিত এবং সচেতন জনমত অপেক্ষা বড় শক্তি বর্তমানকালের রাষ্ট্রের নাই। জনসাধারণ রাষ্ট্রের প্রতি যে স্বাভাবিক আনুগত্য প্রকাশ করে তাহা রাষ্ট্রের ভয়ে নহে; রাষ্ট্র মানুষের অনেক চাহিদা পূরণ করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বুঝিতে পারে, রাষ্ট্রের আইন তাহার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং সুষ্ঠু নাগরিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ততক্ষণ পর্যন্তই সে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও

শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে অনেক সময় পশুবলের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু এই পশুবলই রাষ্ট্রের ভিত্তি নহে। যে অধিকারের ভিত্তি হইতেছে পশুবল, তাহা কখনও চিরস্থায়ী হয় না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে জনসাধারণের শাসককুলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন। শুধু মানুষের সাধারণ ইচ্ছাই আবার রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি নহে। কারণ বিভিন্ন যুগে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন শক্তি বিভিন্নভাবে রাষ্ট্র গঠনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। একদিকে যেমন বলপ্রয়োগ মতবাদ গণতন্ত্রবিরোধী, অপরদিকে তেমনি ইহা ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের বিবর্তনকে উপেক্ষা করে। তৃতীয়ত, শুধু বলপ্রয়োগের সাহায্যে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভবপর নহে। কারণ, সামরিক শক্তির সমাপ্তি একদিন হইবেই ; তখন এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রেরও বিলুপ্তি ঘটিবে। ইতিহাসের দিক হইতেও বলপ্রয়োগ মতবাদ সত্য নহে। চতুর্থত, এই মতবাদের কোন নৈতিক ভিত্তি নাই। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করাই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু "জোর যার মুলুক তার" এই মতবাদে কোন দিনই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ, রাষ্ট্রকে একটি কল্যাণরাষ্ট্রের রূপ দেওয়ার ইচ্ছা, বাস্তবে রূপায়িত হইবে না।

রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি হইতেছে জনগণের সাধারণ ইচ্ছা

তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে সর্বদাই সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। এইজন্য রাষ্ট্র অনেক পরিমাণে শক্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু পশুবলই রাষ্ট্রের সৃষ্টির কারণ নহে। গ্রীন তাঁহার "Principles of Political Obligation" বইয়ে বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রের ভিত্তি জনগণের ইচ্ছা, বলপ্রয়োগ নয়" ("Will, and not force, is the basis of the state")। রাষ্ট্রের ক্ষমতা সর্তাধীনে প্রদত্ত,—ইহা সর্বদাই একটি অছি স্বরূপ। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের ক্ষমতা জনগণেরই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। জনগণ কেন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাহার সন্তোষজনক যুক্তি এই মতবাদ দেখাইতে পারে না। গণতন্ত্রের যুগে জনগণের সক্রিয় সমর্থন ব্যতীত কোন রাষ্ট্রই স্থায়ী হইতে পারে না। ১৬৮৮ সালের ইংলণ্ডের "গৌরবময় বিপ্লব", ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব, ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সর্বোপরি ভারতের অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রমাণ করিয়াছে যে বলপ্রয়োগ অপেক্ষাও জনগণের ইচ্ছার উপরই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অধিক নির্ভর করে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ (The Social Contract Theory)—সামাজিক চুক্তি মতবাদ খুবই প্রাচীন। গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটো এবং ভারতীয় দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির বিভিন্ন মতবাদগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই মতবাদ শুধু রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণই বিশ্লেষণ করে না—ইহা রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণের পক্ষেও বিশেষ সহায়ক। এই মতবাদের তিনজন প্রধান প্রচারক হইলেন

তিনজনের মতেই রাষ্ট্র সৃষ্ট হইবার পূর্বে একটি প্রকৃতির রাজত্ব ছিল

হব্‌স্ (Hobbes), লক্ (Locke), এবং রুশো (Rousseau)। তাঁহারা তিনজনেই এই বিষয়ে একমত যে রাষ্ট্রের সৃষ্টির পূর্বে একটি প্রকৃতির রাজ্য (State of Nature) ছিল এবং সেখানে কোন সুসংগঠিত সমাজ ছিল না। তবে, প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনায় এই তিনজনের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। এই তিনজন আর একটি বিষয়ে একমত যে প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া একটি চুক্তি সম্পন্ন করে এবং এই চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় এবং মানুষ প্রকৃতির রাজত্বের অরাজকতা হইতে মুক্তিলাভ করে। এই সামাজিক চুক্তি সম্পন্ন হয় একজন বিশেষ ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসংসদের সহিত জনগণের মধ্যে। তবে সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে আমরা হব্‌স, লক্ এবং রুশোর মধ্যে মতের অনেক অমিল দেখিতে পাই।

হব্‌সের অভিমত (Views of Hobbes)—"লেভিয়াথান" নামক পুস্তকে হব্‌স্ তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। হব্‌সের মতে প্রকৃতির রাজত্ব ছিল দুর্বিষহ। মানুষের জীবনযাত্রা প্রকৃতির পরিবেশে খুবই "দীন, নিঃসঙ্গ, কদর্য, পশুসুলভ এবং স্বল্পায়ু" ছিল। এই পরিবেশে মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা ছিল না এবং মানুষের প্রণীত কোন আইন ছিল না। এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যেই একটি চুক্তি সম্পাদন করে এবং চুক্তি অনুযায়ী একজনকে শাসক নির্বাচিত করে। শাসক এই চুক্তির একটি পক্ষ নহে। শাসকের হস্তে জনসাধারণ অপরিমেয় ক্ষমতা বিনা সর্তে অর্পণ করে। রাজা জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হইতেন ; কিন্তু নিজের কাজের জন্য প্রজাদের কাজে তিনি দায়ী থাকিতেন না। প্রজারাও রাজার নিকট কোন ব্যাপারে কৈফিয়ৎ দাবি করিতে পারিত না অথবা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারিত না। হব্‌সের মতে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমেই রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। তিনি রাজশক্তিকে অব্যাহত রাখিবার সমর্থক ছিলেন বলিয়াই "লেভিয়াথান" (Leviathan) পুস্তকে গণশক্তিকে অস্বীকার করেন। লেভিয়াথান নামক সুবৃহৎ সামুদ্রিক জীবের ক্ষমতা যেমন অবাধ, এবং অপরিমেয়, তেমনি "লেভিয়াথান" পুস্তকে হব্‌স্ শাসকের ক্ষমতাকে অবাধ এবং অপরিমেয় মনে করিয়াছেন। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সর্বশক্তিমান রাজশক্তিও জনসাধারণের মধ্যেই একটি চুক্তি অথবা ইচ্ছার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মূলত হব্‌স্ ছিলেন আইনানুগ সার্বভৌমত্বে (legal sovereignty) বিশ্বাসী।

হব্‌স্ গণশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া রাজশক্তিকে অব্যাহত রাখিতে চাহিয়াছিলেন।

লকের অভিমত (Views of Locke)—জন্ লক্‌ও এই সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রচারক ছিলেন। লকের সহিত হব্‌সের সাদৃশ্য ছিল তিনটি বিষয়ে, যথা : (১) মানুষ প্রকৃতির রাজত্বে বাস করিত, (২) জীবনযাপনের জন্য তাহাদের একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রের ও সুসংগঠিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন ছিল এবং (৩) তাহারা

নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা অথবা শাসক নির্বাচিত করিত ও এই চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইত। কিন্তু হব্‌সের সহিত লকের পার্থক্য আমরা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে দেখিতে পাই :

লকের মতে প্রকৃতির রাজত্ব কদর্য, পশুসুলভ এবং দুর্বিষহ ছিল না। এই প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের ছিল অবাধ স্বাধীনতা। মানুষের মধ্যে সাম্যভাবও বিদ্যমান ছিল। তবে এই অবস্থা ছিল প্রাক্-রাজনৈতিক অবস্থা। প্রাক্-রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল সুন্দর। কিন্তু একটি সুনির্দিষ্ট সরকারের অভাবে সেই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে জীবনযাত্রার অনেক অসুবিধা ছিল এবং সেই অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্যই একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়।

লকের মতে প্রকৃতির রাজত্ব পশুসুলভ এবং কদর্য ছিল না।

দ্বিতীয়ত, লকের মতে রাজা অথবা শাসক সামাজিক চুক্তির একটি পক্ষ এবং সামাজিক চুক্তির সর্ত অনুযায়ী তিনি জনসাধারণের একটি প্রতিনিধিমণ্ডলীর প্রতি তাঁহার কাজের জন্য দায়ী। রাজাকে অবাধ এবং অপরিমেয় ক্ষমতা দেওয়া হয় না। কারণ, রাজা যদি চুক্তি ভঙ্গ করেন তবে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার অধিকার গণশক্তির হাতে থাকে।

লকের মতে প্রথমে একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং তাহার পর রাজনৈতিক চুক্তির মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসহ একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। হব্‌সের ন্যায় লক্ আইনানুগ সার্বভৌমত্বে (legal sovereignty) বিশ্বাসী ছিলেন না ; তিনি রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বে (political sovereignty) বিশ্বাসী ছিলেন।

লক্ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

রুশোর অভিমত (Views of Rousseau)—হব্‌স্ এবং লকের মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করিবার জন্য রুশো চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১] ১৭৬১ সালে "Contract Social" বইয়ে রুশো তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। হব্‌স্ এবং লকের মতবাদের সঙ্গে তাঁহার মতবাদের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। তিনিও মনে করিতেন যে, রাষ্ট্র সৃষ্টি হইবার পূর্বে একটি প্রাকৃতিক রাজত্ব ছিল। কিন্তু হব্‌সের ন্যায় তিনি সেই প্রকৃতির পরিবেশকে ভয়াবহ অথবা দুর্বিষহ বলিয়া চিত্রিত করেন নাই। রুশোর মতে তাহা ছিল ভূস্বর্গের ন্যায়। লকের ন্যায় তিনি মনে করিতেন যে সেই প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা ও সাম্যভাব। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রবর্তনের ফলে মানুষ নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে থাকে এবং তখন হইতে প্রকৃতির রাজত্ব ক্রমশ অসহনীয় হইতে লাগিল। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তি

হবস্ ও রুশোর মতবাদের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য

১। "Rousseau tried to combine the views of Hobbes and Locke."

সম্পাদন করিয়া একজনকে শাসক নির্বাচিত করিল। হবসের মত রুশোও মনে করিতেন যে, শাসক সামাজিক চুক্তির একটি পক্ষ নয়। মানুষ নিজেদের মধ্যেই চুক্তি সম্পাদন করিয়া সার্বভৌম ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিল। কিন্তু হবস্ মনে করিতেন, সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে রাজার হাতে। রুশো বর্ণিত সামাজিক চুক্তি সাধারণ ইচ্ছার (General Will) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাহা সর্বদাই সমষ্টিগতভাবে প্রয়োগ করা হইবে, অর্থাৎ, ব্যক্তিগত ইচ্ছা সর্বদাই সমষ্টিগত ইচ্ছার অধীন থাকিবে—ইহাই ছিল রুশোর অভিমত। রুশোর মতবাদে রাজতন্ত্রের স্থান নাই,—রাষ্ট্রের নিছক প্রতিনিধি হিসাবেই সরকারের প্রয়োজনীয়তা। রুশোর মতে সরকারও চুক্তির পক্ষ নহে; সুতরাং সরকারও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। গণ-সার্বভৌম ইচ্ছা করিলেই সরকারের অদল-বদল করিতে পারে। রুশোর মতবাদ ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্তন করে। রুশোর মতবাদে স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর (liberty, equality and fraternity) বাণী প্রচারিত হয়। রুশো বলিতেন, "জনসাধারণের কথাই ঈশ্বরের বাণী" (Voice of the people is the voice of God") এবং "মানুষ স্বাধীন হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই সে অধীনতাপাশে বদ্ধ" ("Man is born free, but everywhere he is in chains")। মানুষের স্বাধীনতা সম্পর্কে এমন উদাত্ত ঘোষণা অন্য কোন রাষ্ট্রনীতিবিদ্ করিতে পারেন নাই। হবসের মতবাদের সহিত রুশোর মতবাদের একটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। হবসের মতে সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতে এবং তাহা অবিভাজ্য ও হস্তান্তরের অযোগ্য। রুশোর মতেও সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য ও হস্তান্তরের অযোগ্য; কিন্তু তাহা রাজার হাতে নহে, তাহা সমাজের হাতে, সাধারণ ইচ্ছার (General Will) হাতে। লকের মতবাদের সঙ্গেও রুশোর মতবাদের একটি সাদৃশ্য আছে। লকের মতে রাজার হাতে অর্থাৎ শাসকের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে না। রুশোর মতেও সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতে অর্থাৎ শাসকের হাতে থাকে না; তবে রুশোর ন্যায় লক্ কখনই জনসাধারণের হাতে সমুদয় ক্ষমতা অর্পণের ("all powers to the people") কথা বলেন নাই। লকের মতে রাজার বিরুদ্ধে প্রয়োজন হইলে বিদ্রোহ করিবার আইনসঙ্গত অধিকার গণপ্রতিনিধিদের আছে; কিন্তু রুশোর মতে তাহা মানুষের জন্মগত অধিকার। সুতরাং রুশো লোকায়ত্ত সার্বভৌমত্বে (Popular Sovereignty) বিশ্বাসী ছিলেন এবং লক্ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বে (Political Sovereignty) বিশ্বাসী ছিলেন।

শাসক ও সরকার চুক্তির একটি পক্ষ নহে

মানুষের স্বাধীনতাই বড় জিনিস

লক্ এবং রুশোর মধ্যে পার্থক্য

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা—সামাজিক চুক্তি মতবাদের অনেক

সমালোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত, এই মতবাদের পিছনে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই। দ্বিতীয়ত, এই মতবাদটি অযৌক্তিক। যাহারা আদিমকালের প্রকৃতির রাজত্বে বাস করিত এবং যেখানে হবসের ভাষায় মানবজীবন ছিল কদর্য ও পশুসুলভ, সেখানে কিভাবে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হইল এবং সামাজিক চুক্তি হইল—তাহার কোন যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাই না। এরিস্টটল অনেক আগেই বলিয়াছিলেন, মানুষ সামাজিক প্রাণী। সুতরাং ভূস্বর্গ হোক অথবা একেবারে কদর্য ও পশুসুলভই হোক,—প্রকৃতির রাজত্ব একটি উদ্ভট পরিকল্পনা। প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং "স্বাভাবিক" অধিকার ছিল, এই ধারণা করা অযৌক্তিক। কেননা, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ যেখানে ছিল না—সেখানে একজনের স্বাধীনতার উপর অপরের হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই মতবাদটি অযৌক্তিক। তৃতীয়ত, এই মতবাদের একটি বিপজ্জনক দিক আছে। তাহা হইতেছে এই যে, মানুষের সাধারণ ইচ্ছা অনেক সময়েই রাষ্ট্রকে খেয়ালের বস্তুতে পরিণত করিতে পারে এবং সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারিতাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। এই মতবাদে জনমতকে অতিরিক্ত প্রাধান্য প্রদান করায় অনেকক্ষেত্রেই বিপ্লবের সৃষ্টি হইতে পারে ; কারণ জনমত যে সর্বদাই বিবেক বুদ্ধি প্রণোদিত হয় তাহা নহে।

এই মতবাদের যুক্তি ইতিহাসে পাওয়া যায় না

এই মতবাদটি অযৌক্তিক

এই মতবাদের একটি বিপজ্জনক দিক আছে

মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রের সদস্যপদ চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলা ভিত্তিহীন। রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে এক বিবর্তনের মাধ্যমে,—ইহা ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্ভূত, সামাজিক চুক্তির ফলে উদ্ভূত নয়। রাষ্ট্রের সৃষ্টির পিছনে আছে এক ঐতিহাসিক পটভূমিকা।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব—গণতন্ত্রের বিকাশে এই মতবাদের অবদান- রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে না পারিলেও সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং শাসকের ক্ষমতার উৎস হইতেছে জনসাধারণের সম্মতি,—এই সত্যটি সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকগণের মধ্যে সাধারণভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং একদিক হইতে ইহা গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক। একটি চুক্তি বলিতে আমরা বুঝি চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী উভয়পক্ষের কতিপয় বাধ্যবাধকতা। আধুনিককালে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সরকার একটি শাসনতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসনতন্ত্র শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটি চুক্তির সমতুল্য। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকারকে কাজ করিতে হয়। সামাজিক মতবাদে ইহাই বলা হইয়াছে যে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটি সম্পর্ক বা বোঝাপড়ার সর্ত থাকিবে এবং শাসককে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। ইহাই

সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল্য

রাষ্ট্রের সমুদয় ক্ষমতার উৎস হইতেছে গণশক্তি

গণতন্ত্রের মূল কথা। কারণ, গণতন্ত্র জনগণের সাধারণ ইচ্ছার (General will) উপর প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক চুক্তি মতবাদে যে চুক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে একটি "সামাজিক" চুক্তি; অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেকেই এই চুক্তির অংশীদার। এখানেই সামাজিক চুক্তি মতবাদ গণতন্ত্রের পথ-প্রদর্শক হইয়াছে।

১৬৮৮ সালের ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব, ১৭৭৬ সালের আমেরিকার জনগণের স্বাধীনতা এবং স্বাধিকারের সংগ্রাম, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব,—ইতিহাসের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর লক্ এবং পরবর্তীকালে রুশোর মতবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব আমরা দেখিতে পাই। ইহাই সামাজিক চুক্তি মতবাদের স্থায়ী মূল্য। আধুনিককালে আমরা নাগরিকদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে যে সব যুক্তি প্রদর্শন করি, সেইগুলির উপর প্রভাব সুস্পষ্ট। বলপ্রয়োগ নীতির অবসান ঘটাইয়া এবং রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশ্বরিক মতবাদ অগ্রাহ্য করিয়া সামাজিক চুক্তি মতবাদ দেখাইয়াছে যে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কর্তৃত্ব জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক নীতিগুলির প্রসারে সামাজিক চুক্তিমতবাদের ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

এই মতবাদ গণতন্ত্রের পথ-প্রদর্শক

Exercise

1. Define State. Distinguish between : (a) State and Government. (b) State and other Associations and (c) State and Society.

[রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রদান কর : (ক) রাষ্ট্র ও সরকার, (খ) রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং (গ) রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।] (১৭-২১ পৃষ্ঠা)

2. The State is a People organised for law within a definite territory."—Discuss the statement.

("রাষ্ট্র হইতেছে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ভিতর আইনের জন্য সংগঠিত একটি জনসমাজ"—উক্তিটির আলোচনা কর।) (১৭-১৯ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the theory of Divine origin of the State.

(রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্পর্কে ঐশ্বরিক মতবাদ আলোচনা কর।) (২২-২৩ পৃষ্ঠা)

4. "Will and not Force is the basis of the State."—Discuss.

("বলপ্রয়োগ নহে, ইচ্ছাই হইতেছে রাষ্ট্রের ভিত্তি"—আলোচনা কর।) (২৩-২৪ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the Views of Hobbes, Locke and Rousseau about the origin of the State.

(রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে হব্‌স্, লক এবং রুশোর মতবাদ আলোচনা কর।) (২৪-২৭ পৃষ্ঠা)

6. Critically discuss the Social Contract theory of the origin of State.

(রাষ্ট্র সৃষ্টির সামাজিক চুক্তি মতবাদ তত্ত্বটির আলোচনা ও সমালোচনা কর।) (২৪-২৯ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় অধ্যায়

নাগরিকতা (Citizenship)

নাগরিকতা (Citizen)—নাগরিক কথাটির সাধারণ অর্থ হইতেছে, নগরের অধিবাসী। প্রাচীন গ্রীক শহর-রাষ্ট্রের অধিবাসীগণের মধ্যে যাহারা সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করিত তাহাদিগকেই নাগরিক বলা হইত। কিন্তু, বর্তমান শহর-রাষ্ট্রের (City State) অস্তিত্ব নাই বলিয়া 'নাগরিকতা' শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্তমানে কোন নাগরিক বলিতে আমরা বুঝি এমন লোক যে একটি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং সেই রাষ্ট্রের নিকট হইতে সমুদয় পৌর, সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করে। কিন্তু, যাহারা রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে না, তাহারা নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু এরিস্টটলের মতে নাগরিককে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মিলার একটি বিখ্যাত মামলায় মন্তব্য করিয়াছিলেন, "নাগরিকগণ একটি রাজনৈতিক সমাজের সদস্য। তাহারাই রাষ্ট্র গঠন করে, এবং তাহারাই নিজেদের যৌথ ক্ষমতায় একটি সরকারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে অথবা নিজেদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অধিকার রক্ষার জন্য সেই সরকারের অধীন হইয়াছে।"[১] অধ্যাপক লাস্কি আধুনিক কালের নাগরিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে নাগরিকতার সার কথা নিহিত রহিয়াছে সাধারণের মঙ্গলের জন্য নাগরিকদের শিক্ষা-দ্বারা প্রাপ্ত মার্জিত বিচার বুদ্ধির অবদানের মধ্যে ("Contribution of one's instructed judgment to the public good"—Laski)।

নাগরিক কাহাকে বলে ?

নাগরিক ও বিদেশী (Citizen and Alien)—একজন নাগরিক (Citizen) এবং একজন বিদেশীর (Alien) মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখিতে পাই :

প্রথমত, বিদেশী হইতেছে ভিন্ন দেশের অধিবাসী। একজন বিদেশী একটি ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। যে দেশে সে বাস করে, সেই দেশের বিভিন্ন নিয়মকানুন তাহাকে মানিয়া চলিতে হয় এবং কর প্রদান করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, একজন বিদেশী যে রাষ্ট্রে বসবাস করে সেই রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর স্বাধীনতা সে ভোগ করিতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার দাবি করিতে পারে না। তৃতীয়ত, একজন বিদেশীকে বিধিনিষেধ ভঙ্গ করার অপরাধে অথবা অসদাচরণের জন্য কোন রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু জোর করিয়া তাহাকে

১ "Citizens are members of the political community to which they belong. They are the people who compose the state and who in their associated capacity have established or subjected themselves to the dominion of their collective rights."

সেনাবাহিনীতে যোগদান করানো যায় না। সে যদি কখনও রাষ্ট্র (যে রাষ্ট্রে সে সাময়িকভাবে বাস করিত) ত্যাগ করিয়া যায়, তবে তাহার সম্পত্তি ও জীবনের নিরাপত্তার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব নাই। অপরদিকে, নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা সর্বদাই তাহার রাষ্ট্র রক্ষা করে। একজন নাগরিক সম্পূর্ণভাবে সব রকম পৌর ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কদাচিৎ তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন কোন বিদেশী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিতে পারিলেও এবং সে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও তাহাকে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতির পদ জন্মসূত্রে নাগরিকতা প্রাপ্ত নাগরিক ব্যতীত অন্য কোন নাগরিক পাইতে পারে না। আবার, কোন হিন্দু পাকিস্তানের নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হইতে পারে না। কারণ, সেই পদটি মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত। একজন নাগরিককে নাগরিক জীবনের সব দায়িত্বই পালন করিতে হয়। রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইলে তাহাকে সেনাবাহিনীতেও যোগদান করিতে হয়।

বিদেশী এবং নাগরিকের মধ্যে পার্থক্য

নাগরিক ও স্বজাতীয় মানুষ (Citizen and People)—নাগরিক (Citizen) এবং স্বজাতীয় মানুষ (People) এক নহে। স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকিতে পারে যাহাদের নাগরিক অধিকার নাই। স্বজাতীয় কোন লোক যদি কোন দেশের নাগরিকতা অর্জন করে তখন সে একটি জাতির অন্তর্গত হইয়াও দেশের নাগরিক নহে। কোন বাঙালী যদি ইংলণ্ডের নাগরিকতা অর্জন করেন, অথবা আমেরিকার নাগরিকতা অর্জন করেন, তবে তিনি যে বাঙালী সেই পরিচয় কখনই বিলুপ্ত হইবে না। স্বজাতীয় লোক যদি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে অথচ তাহার পিতামাতা যদি ভারতীয় হয়, তবে কোন্ দেশের নাগরিক অধিকার সে গ্রহণ করিবে তাহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে স্বজাতীয় মানুষ বলিতে বুঝা যায় একই ঐতিহ্য দ্বারা পরিপুষ্ট একদল লোক যাহারা একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়া এক গভীর ঐক্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়। নাগরিকের ন্যায় তাহাকে রাষ্ট্রের অধিবাসী হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

নাগরিক ও প্রজা (Citizen and Subject)—নাগরিক এবং প্রজা উভয়েই এক রাষ্ট্রে বাস করে। কিন্তু প্রজা সব সময় নাগরিকের ন্যায় কতিপয় মর্যাদাসম্পন্ন এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগ করিতে পারে না। ভারতবাসীরা যখন ইংরেজের অধীন ছিল, তখন তাহারা প্রজা বলিয়া অভিহিত হইত। যাহাদের প্রজা বলা হয় তাহারা সম্পূর্ণভাবে সব রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও নাগরিকের সমান পদমর্যাদার অধিকারী হয় না। প্রজার কোন অধিকার শাসক সম্প্রদায় সাধারণত স্বীকার করিতে চায় না; শাসকের ইচ্ছায় প্রজার

সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে 'প্রজা' শব্দটি খুব কম ব্যবহৃত হয়, কেননা গণতন্ত্রের যুগে এই শব্দটির কোন স্থান নেই।

নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন উপায় (Different methods of acquiring citizenship)—নাগরিক দুই প্রকার হইতে পারে। একটি হইতেছে জন্মসূত্রে নাগরিক, অপরটি হইতেছে অর্জনের দ্বারা নাগরিক। নাগরিকতা অর্জনেরও দুইটি উপায় আছে,—প্রথমটি হইতেছে জন্মাধিকার এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে অর্জনের দ্বারা।

রক্তগত অধিকার এবং জন্মভূমিগত অধিকার

জন্মাধিকার আবার দুই প্রকার হইতে পারে—একটি হইল রক্তগত অধিকার (Jus Sanguinis) এবং অপরটি হইল জন্মভূমিগত অধিকার (Jus Soli)। প্রথম নীতিটির ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রজাত তাহার নাগরিকের সন্তানকে পিতৃত্বের ভিত্তিতে নিজ নাগরিক বলিয়া দাবি করিতে পারে। অর্থাৎ পিতা যে দেশের নাগরিক, পুত্র যদি সেই দেশেই জন্মগ্রহণ করে তবুও নিজের পিতার নাগরিকতার দাবিতে সেই দেশের নাগরিকতা লাভ করিতে পারিবে। ভারতীয় পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর যে দেশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, ভারতীয় বলিয়াই স্বীকৃত হইবে। দ্বিতীয়টির ভিত্তিতে যদি কোন ভারতীয় পিতামাতার সন্তান অন্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন তবে সেই সন্তান তাহার পিতামাতা ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও সে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই নিয়মটিতে জন্মভূমির উপর ভিত্তি করিয়াই নাগরিকতা অর্জিত হয়। যদি কোনও রাষ্ট্র এক সঙ্গে উভয় নীতিই প্রয়োগ করিয়া নাগরিকতা স্থির করে তবে একই ব্যক্তি দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকতা একই সময়ে অর্জন করিতে পারে। যদি কোন ভারতীয় নাগরিকের কোন সন্তান আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করে, তবে ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তিতে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে; আবার জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে সে আমেরিকার নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন নাগরিক সাবালক হইয়া স্থির করিবে কোন্ রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার সে ভোগ করিতে চাহে।

রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতা অর্জন করিবার যে নীতি প্রচলিত তাহার একটি প্রধান ত্রুটি হইল, পিতার জাতীয়তা নির্ধারণ করা অনেক ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

অর্জনের দ্বারা যে নাগরিকতা লাভ করা যায় তাহাকে অর্জিত নাগরিকতা (Naturalized citizenship) বলে। এই নীতি অনুযায়ী কোন দেশের জন্মগত নাগরিক অপর দেশের কতিপয় সর্ত পালন করিয়া সেই দেশের নাগরিকতা অর্জন করে। স্ত্রীলোকগণ বিবাহের দ্বারা তাঁহাদের স্বামীর নাগরিকতা অর্জন করেন। তাহা ছাড়া, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সরকারী চাকুরী করিয়া, বহুদিন বিদেশে বসবাস

অর্জিত নাগরিকতা

করিয়া, বিদেশে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া অথবা সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়া কোন ব্যক্তি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিতে পারে। নাগরিকতা অর্জন করিবার জন্য বিদেশীকে প্রথমে আবেদন

করিতে হয় এবং তাহার পর কতিপয় সর্ত পূরণ করিতে হয়। তন্মধ্যে একাদিক্রমে ঐ রাষ্ট্রে কয়েক বৎসর বাস করা এবং শান্তিপূর্ণ ও সৎস্বভাবাপন্ন জীবনযাপন করা প্রধান। অনেক ক্ষেত্রে সেই দেশের ভাষা আয়ত্ত করাও একটি সর্ত হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে নাগরিকতা অর্জন করিয়া বিদেশী ঐ রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারী হয়। কিন্তু অনেক সময় সে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে না। যেমন, আমেরিকায় কেহ জন্মগত নাগরিক না হইলে রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে পারে না।

বিভিন্ন দেশে নাগরিকতা অর্জনে বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হয়। ইটালী, জার্মানী, সুইডেন এবং সুইজারল্যাণ্ডে রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে অর্জিত নাগরিকতা অনেক সময় আদালতের মাধ্যমে স্বীকৃত হয়। আদালতের নিকট নাগরিকতা লাভের জন্য আবেদন করিতে হয়। আদালত সেই আবেদনপত্রটির খুঁটিনাটি বিচার করিয়া পরীক্ষা করে নাগরিকতা লাভের সব সর্ত পূরণ হইয়াছে কিনা। অর্জিত নাগরিকতা সম্পূর্ণ (Complete or grand) এবং অসম্পূর্ণ হইতে পারে। বেল্‌জিয়াম্‌, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এই দুই প্রকার অর্জিত নাগরিকতার মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যখন রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতা এবং জন্মস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না এবং উভয় প্রকার নাগরিককেই সব রকম সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তখন ইহাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অর্জিত নাগরিকতা (Citizenship by grand naturalization) বলি। যখন এই দুই প্রকার নাগরিকের মধ্যে তারতম্য করা হয়, তখন ইহাকে আমরা অসম্পূর্ণভাবে অর্জিত নাগরিকতা (Citizenship by partial naturalization) বলি। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের সময় জন্মগত নাগরিকতা এবং অর্জিত নাগরিকতার মধ্যে পার্থক্য করা হয়। আমেরিকায় সম্পূর্ণভাবে অর্জিত নাগরিকতা নাই।

সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ অর্জিত নাগরিকতা

এখানে উল্লেখযোগ্য, আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বিদেশীদের প্রবেশ এবং বসবাস সম্পর্কে অনেক নিয়ন্ত্রণমূলক আইনকানুন আছে। আমেরিকার এবং অষ্ট্রেলিয়ার অভিবাসন আইনগুলি (Immigration laws) প্রণীত হইয়াছে দেশের জনসমষ্টির বংশের শুচিতা রক্ষার জন্য। নাগরিকতা সম্পর্কে এই নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির কুফল হইল বিভিন্ন জাতির মধ্যে অথবা বর্ণের মধ্যে জাতিগত অথবা বর্ণগত বিদ্বেষ।

নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি (Loss of Citizenship)—বিভিন্ন উপায়ে যেমন অধিকার লাভ করা যায়, সেই প্রকার নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তিও আমরা দেখিতে পাই। বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকেরা মূল নাগরিকতা হারাইয়া থাকে। কোনও ব্যক্তি নূতন নাগরিকতা অর্জন করিলে পূর্ব নাগরিকতার অবসান ঘটে।

বিদেশী রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিলে কোন ব্যক্তির মূল নাগরিকতা নষ্ট হইয়া যায়। তবে এই চাকুরী গ্রহণ করিবার পূর্বে যদি নিজের রাষ্ট্রের অনুমতি লওয়া থাকে অথবা যদি সে নিজের রাষ্ট্রের নির্দেশেই এই চাকুরী লইয়া থাকে, তবে সে এজন্য নাগরিকতা হারাইবে না। বিদেশী জমি অথবা সম্পত্তি ক্রয়, দীর্ঘকাল যাবৎ স্বদেশের বাহিরে অবস্থান, গুরুতর অপরাধের শাস্তি হিসাবে নিজের রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি কারণে কোন নাগরিক অধিকার হারাইতে পারে।

ভারতীয়দের নাগরিকতা (Citizenship of the Indians):

কোন রাষ্ট্রের জনসাধারণকে নাগরিক এবং বিদেশী—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। নাগরিকগণ সমুদয় পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু বিদেশীগণ সব রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে না। তাহা ছাড়া একজন বিদেশী ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ভারতের শাসনতন্ত্রে কতিপয় অধিকারের বিধান আছে; সেই অধিকারগুলি মূলত, শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়া মৌলিক অধিকার বা Fundamental Rights বলিয়া পরিচিত। এই মৌলিক অধিকারের মধ্যে কতিপয় অধিকার আছে যেগুলি বিদেশীগণও এই দেশে ভোগ করিতে পারে; কিন্তু, আবার কতিপয় মৌলিক অধিকার আছে যেগুলি শুধু ভারতীয় নাগরিকগণই ভোগ করিতে পারে। শাসনতন্ত্রের ১৫ নং ধারা অনুযায়ী ধর্ম, বংশ, বর্ণ, জন্মস্থান ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে নাগরিকদের মধ্যে অধিকারের তারতম্য করা হইবে না। শাসনতন্ত্রের ১৬ নং ধারা অনুযায়ী সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে নাগরিকদের সুযোগের সমান অধিকার আছে। শাসনতন্ত্রের ১৯ নং ধারা অনুযায়ী নাগরিকগণ বাক্-স্বাধীনতার অধিকার, সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার, সভা-সমিতি করিবার অধিকার, আন্দোলন করিবার অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, সম্পত্তিরক্ষার অধিকার এবং বৃত্তির অধিকার ভোগ করে। শুধু ভারতীয় নাগরিকদেরই রাষ্ট্রপতি (৫৮ নং ধারা ১ (ক) অনুচ্ছেদ), উপরাষ্ট্রপতি (৬৬ নং ধারা, ৩ (ক) অনুচ্ছেদ), সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি (১২৪ নং ধারা ৩নং অনুচ্ছেদ), হাইকোর্টের বিচারপতি (২১৭ নং ধারার ২ নং অনুচ্ছেদ), এ্যাটর্নী জেনারেল (৭৬ নং ধারা, ১ নং অনুচ্ছেদ), রাজ্যপাল (১৫৭ নং ধারা) এবং এ্যাডভোকেট জেনারেল (১৬৫ নং ধারা) হইবার অধিকার আছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় দ্বি-নাগরিকতার কোন ব্যবস্থা নাই। যে কোন ভারতবাসী শুধু ভারতেরই নাগরিক, কোন রাজ্যবিশেষের নাগরিক নহে। ১৯৫৫ সালে ভারতীয় নাগরিকতা সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট একটি আইন প্রণয়ন করে এবং ইহাতে ভারতীয় নাগরিকতার বিবিধ বিধানগুলি সুসম্বদ্ধভাবে বিধিবদ্ধ হয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৫নং ধারার 'ক' অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে ব্যক্তি ভারতীয় এলাকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতেই স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছেন, তাঁহার পিতামাতার জাতীয়তা যেখানেই হোক না কেন, তিনি ভারতীয় নাগরিক। যদি

কোন ব্যক্তি ভারতে স্থায়িভাবে বসবাস করেন এবং তাঁহার পিতামাতার মধ্যে যে কেহ একজন ভারতীয় এলাকায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার জন্মস্থান যেখানেই হোক না কেন এবং তাঁহার পিতামাতার জাতীয়তা যেখানেই হোক না কেন, তিনি ভারতীয় নাগরিক (৪ নং ধারা 'খ' অনুচ্ছেদ); যদি কোন ব্যক্তির পিতামাতা ভারতে জন্মগ্রহণ না করিয়াও ভারতীয় শাসনতন্ত্র চালু হইবার পাঁচ বৎসর পূর্ব হইতে ভারতে বসবাস করেন, তবে সেখানেও সেই ব্যক্তির নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁহার পিতামাতার জাতীয়তার প্রশ্ন উঠিবে না।

১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন ও ভারতীয় নাগরিকতা অর্জনের বিধান

পাকিস্তান হইতে ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাইয়ের পূর্বে যাঁহারা ভারতে আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। এই তারিখের পরে যাঁহারা ভারতে আসিয়াছেন, তাঁহারা যদি বর্তমান শাসনতন্ত্র চালু হইবার পূর্বেই যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন করিবার জন্য আবেদন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারাও ভারতীয় নাগরিকতা লাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, পাকিস্তান হইতে আগত কোন ব্যক্তি অথবা তাঁহার পিতামাতা অথবা পিতামহ-পিতামহীর মধ্যে কেহ যদি ১৯৩৫ সালের ভারত সরকারের আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ভারতে' জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান করা হইয়াছে।

পাকিস্তান হইতে আগত ব্যক্তিদের জন্য নাগরিকতার বিধান

১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইনে রেজেষ্ট্রীকরণের দ্বারা বিদেশীদের ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদি কেহ ভারতীয় নাগরিকতা লাভ করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে নাগরিকতার জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং সরকার তাঁহাদের রেজেষ্ট্রীভুক্ত করিতে পারেন।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারির পর নিজের জন্মের ভিত্তিতে এবং পিতা অথবা মাতার জন্মের ভিত্তিতে ভারতীয় নাগরিকতা অর্জনের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, কেহ যদি ছয় মাস একাদিক্রমে ভারতে বসবাস করিবার পর এই দেশেই স্থায়িভাবে বসবাস করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নাগরিকতা অর্জন করিবার জন্য আবেদন করেন, তবে তিনি ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন করিতে পারেন। অন্য দেশের নাগরিক এইরকম কোন মহিলা যদি কোন ভারতীয়কে বিবাহ করেন, তবে তিনি ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন করিতে পারেন। যদি কোন নূতন অঞ্চল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় (যেমন, ১৯৬১ সালে গোয়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে), তবে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদেরও ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান করা হইবে। তাহা ছাড়া, ভারতীয় নাগরিকদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানসন্ততি এবং অন্যান্য কমনওয়েলথ-ভুক্ত

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারির পর ব্যবস্থা এবং রেজেষ্ট্রীকরণের মাধ্যমে নাগরিকতা

দেশগুলির প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক নাগরিকগণকে রেজেষ্ট্রীভুক্ত করিয়া ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান করা যাইতে পারে। রেজেষ্ট্রীভুক্ত নাগরিককে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে হয়। কমনওয়েলথের বাহিরে কোন বিদেশীকে দেশীয়করণের মাধ্যমেও নাগরিকতা প্রদান করা যাইতে পারে। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তির প্রসার প্রভৃতি ক্ষেত্রে যদি কাহারও বিশেষ অবদান থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান করিবার কড়াকড়ি হ্রাস করা হয়; যেমন, অধ্যাপক হ্যালডেনের ক্ষেত্রে দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকতা প্রদানে কড়াকড়ি করা হয় নাই।

রেজেষ্ট্রীকরণ এবং দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকতা প্রদান

১৯৫৫ সালের নাগরিকতার আইনে নাগরিকতার বিলোপসাধনেরও বিধান রাখা হয়। প্রথমত, যদি কখনও দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে ভারতের এবং অপর একটি দেশের নাগরিকতা অর্জন করিয়াছে, তবে, তাহাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটি দেশের নাগরিকতা ছাড়িয়া দিতে হইবে; নতুবা তাহার ভারতীয় নাগরিকতা নষ্ট হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, যদি কোন ভারতীয় নাগরিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অন্য কোন দেশের নাগরিকতা অর্জন করে, তবে তাহার ভারতীয় নাগরিকতা নষ্ট হইয়া যাইবে। তৃতীয়ত, যদি কখনও দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি জাল করিয়া এবং মিথ্যা প্রমাণ দাখিল করিয়া ভারতের নাগরিক হইয়াছেন, অথবা তিনি শাসনতন্ত্রের প্রতি অনুগত নহেন, তবে তাঁহার ভারতীয় নাগরিকতা নষ্ট হইয়া যাইবে।

নাগরিকতার বিলুপ্তি

অসদুপায়ে নাগরিকতা অর্জিত হইলে, শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের অভাব বা অসন্তুষ্টি অনুভূত হইলে, যুদ্ধের সময় ভারতের শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান করিলে এবং দেশের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকারক কোন কাজ করিলে, দেশীয়করণ কিংবা রেজেষ্ট্রীকরণ হইবার পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন দেশে দুই বৎসর কিংবা ইহার বেশী সময়ের জন্য কারাভোগ করিলে নাগরিকতার বিলুপ্তি হইতে পারে; অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট লোককে সরকার নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন। তাহা ছাড়া, কোন ভারতীয় নাগরিক যদি একাদিক্রমে সাত বৎসরের জন্য বিদেশে ভারত সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি না করিয়া অথবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্র না থাকিয়া ভারতীয় অফিসের সহিত যোগাযোগ না রাখেন, তবে ভারত সরকার তাঁহাকে নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩৬৭নং ধারার ৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারত ব্যতীত যে কোন রাষ্ট্রই বিদেশী রাষ্ট্র,—তবে রাষ্ট্রপতি কোন রাষ্ট্রকে "বিদেশী রাষ্ট্র নয়" বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে বিদেশী রাষ্ট্র সম্পর্কিত ঘোষণায় বলা হয় যে, কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্যে ভারতের নিকট বিদেশী রাষ্ট্র বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কমনওয়েলথের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির

কমনওয়েলথ নাগরিকতা

নাগরিকগণ ভারতে কমনওয়েলথ নাগরিকের মর্যাদা (Status of a Commonwealth Citizen) ভোগ করিবে।[১]

সুনাগরিকতার অন্তরায় (Hindrances to good citizenship)—লর্ড ব্রাইসের মতে প্রকৃত নাগরিক জীবনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে উদাসীনতা, ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি এবং দলগত স্বার্থবুদ্ধি। মূলত, ব্যক্তিগত জীবনে কতিপয় গুণের সমাবেশ হইলেই নাগরিক জীবন সার্থক হইতে পারে। প্রধানত, নাগরিককে সর্বদাই নিজের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে হইবে। অধিকার ভোগের জন্য অত্যুৎসাহী এবং কর্তব্য পালনে উদাসীন থাকিলে ভাল নাগরিক হওয়া যায় না। নাগরিকগণ যখন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে উদাসীন থাকে এবং সামাজিক ও পৌর কর্তব্যগুলি সম্পাদন করিবার সময় অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া গুরুত্ব সহকারে নিজেরা কোন কাজ করিতে চাহে না তখনই নাগরিক জীবন সার্থকতা লাভ হইতে বঞ্চিত হয়। কোন নাগরিক হয়ত দেশে নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। অথচ, এই উদাসীনতার মধ্য দিয়া আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে সে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ স্বেচ্ছায় নষ্ট করিতেছে। এই অবস্থায় কখনই নাগরিক জীবনের চরম সার্থকতা আমরা দেখিতে পাই না। তাহাতে রাজনৈতিক শিক্ষা কখনও সার্থক হয় না এবং জনসাধারণের সচেতনতা ক্রমশ কমিয়া যায়।

রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি অনেক সময় সুস্থ, সুন্দর নাগরিক জীবনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। নাগরিকগণ যখন সমাজের এবং দেশের স্বার্থ অপেক্ষাও নিজেদের স্বার্থ বড় করিয়া দেখে, তখন নাগরিক জীবন কখনই পূর্ণ এবং সার্থক হইতে পারে না। অনেক সময় এমন হয়, কতিপয় অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নাগরিকগণ নির্বাচনে অনুপযুক্ত প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করিয়া থাকে। নির্বাচনে ভোট দান করা একটি পবিত্র দায়িত্ব; নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সামাজিক স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া যদি অনুপযুক্ত প্রার্থীকে সমর্থন করা হয় তবে নাগরিক জীবন কখনই পূর্ণ ও সার্থক হইতে পারে না।

ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি

তৃতীয়ত, দলগত স্বার্থ অনেক সময় নাগরিকগণকে নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী চলিতে দেয় না। গণতান্ত্রিক সরকার রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সুতরাং আধুনিক গণতন্ত্রে নির্বাচনে ভোট দান করিবার সময় নাগরিকগণকে নিজের দলের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং দলীয় স্বার্থে পরিচালিত হইতে হয়। অনেক সময় নাগরিকগণ বাধ্য হইয়া দলীয় স্বার্থের চাপে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির পক্ষে ভোট প্রদান করে। দলীয় স্বার্থে

দলীয় স্বার্থের প্রভাব

---

১ ১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, "Every person who is a citizen of a Commonwealth country specified in the First Schedule shall, by virtue of the citizenship, have the status of a Commonwealth Citizen of India."

পরিচালিত হইলে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা অপেক্ষা নিজের দলের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করাকে বড় মনে করে। দলাদলি সুনাগরিকতার একটি প্রধান অন্তরায়।

শিক্ষার অভাব

চতুর্থত, শিক্ষার অভাব সুনাগরিকতার অপর একটি অন্তরায়। সুনাগরিকতা অর্জন করিতে হইলে নাগরিকদের দলাদলির ঊর্ধ্বে থাকিতে হইবে এবং নিজের অধিকারগুলি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে। তাহা ছাড়া, নাগরিকদের সুশিক্ষিত হইতে হইবে।

সুনাগরিকতার অন্তরায় দূর করার উপায় (Measures for removing the hindrances to good citizenship)—নাগরিক জীবনের সার্থকতার পথে যে সকল বাধা আমরা দেখিতে পাই সেগুলি দূর করিতে হইলে সরকারকে দুইটি নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমত, সরকারের কাঠামো এবং শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের আমূল সংস্কার করিতে হইবে।

সরকারের কাঠামোর সংস্কার করা

ভোটদান প্রথার পরিবর্তন, বাধ্যতামূলকভাবে ভোটদান প্রথার প্রবর্তন, গণ-নির্দেশ (Initiative) এবং গণভোট (Referendum) প্রথার প্রবর্তন এবং শাসনবিভাগে সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতির অবসান করা,—সরকারের ক্রিয়াকলাপের এইভাবে সংস্কার করিলে নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং তাহারা সুনাগরিক হইতে পারিবে। যদি সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional representation) প্রথা প্রচলিত হয়, তবে সব রাজনৈতিক দলই আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব পাইবে এবং তাহাতে রাষ্ট্রের সব নাগরিকেরই দলমত নির্বিচারে রাজনৈতিক সচেতনতা অনেক বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সব রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাধ্যতামূলক ভাবে

নির্বাচন প্রথার সংস্কার করা

ভোট দান প্রথার প্রবর্তন করিলেই যে নাগরিক জীবন সার্থকতার পথে অগ্রসর হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ, এই প্রথার একটা বিপদও আছে। অশিক্ষিত ভোটদাতাগণ অনেক সময় নিজেদের খেয়াল খুশিমত ভোট দান করিতে পারে। গণ নির্দেশ এবং গণভোট প্রথার প্রবর্তন সুইজারল্যাণ্ডে সম্ভবপর হইলেও বড় দেশগুলির পক্ষে ইহা চালু করা খুবই কষ্টসাধ্য। অবশ্য ইহা যে অসম্ভব তাহা নহে। শাসনব্যবস্থা হইতে সর্বপ্রকার দুর্নীতি নিঃশেষে দূর করিবার জন্য যদি সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় এবং জনগণের বিশ্বাসভঙ্গকারীর জন্য যদি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকে তবে নাগরিক জীবনে সকলেই শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং ন্যায়পরায়ণ হইবার চেষ্টা করিবে।

দ্বিতীয়ত, নাগরিকদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি রাষ্ট্র গ্রহণ করে তবে নাগরিক জীবন সার্থকতার পথে দ্রুত আগাইয়া যায়। সুনাগরিক যদি কেহ হইতে না পারে, তবে তাহার প্রধান কারণ হইতেছে শিক্ষার অসম্পূর্ণতা। যদি প্রত্যেকে নিজের জীবনে উপযুক্ত সাধারণ এবং রাজনৈতিক শিক্ষা পায়, তবে প্রত্যেকেই সুন্দর নাগরিক জীবনযাপন করিতে চেষ্টা করিবে। একটি জাতির

প্রধান সম্পদ হইল শিক্ষিত নাগরকবৃন্দ। দেশের সাংস্কৃতিক জীবন যদি উন্নত হয়, এবং কেহ যদি শিক্ষা অর্জন করা একটি আদর্শ বলিয়া মনে করে, শিক্ষার আলোকে যদি সে ন্যায়-অন্যায় বুঝিতে পারে এবং মানসিক দুর্বলতা ত্যাগ করিতে পারে, তবে তাহার পক্ষে একজন সুনাগরিক হওয়া মোটেই অসম্ভব নহে, বরং তাহার নাগরিক জীবন পূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ সাধারণ শিক্ষা এবং জ্ঞান অর্জন হইতেই লোকের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। নিজের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সে সচেতন হয়। সেইজন্য সুন্দর নাগরিক জীবনের একটি প্রধান সর্ত হইল নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা।

শিক্ষার প্রসার যাহাতে হইতে পারে সেই ব্যবস্থা করা

সুনাগরিকের গুণ (Qualities of Good Citizenship)—সুনাগরিক হইতে চাহিলে কোন লোকের পক্ষে তিনটি গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। যথা, বুদ্ধি, আত্মশাসন এবং বিবেকবিচার।

প্রথমত, সুনাগরিককে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে। এইজন্য প্রথম প্রয়োজন হইতেছে তাহার উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষা এবং বুদ্ধি।

দ্বিতীয়ত, সুনাগরিকের নিজেকে নিজেই শাসন করিবার ক্ষমতা থাকা দরকার। ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে তাহাকে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে যদি ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিবর্তে সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া, সুনাগরিককে তুচ্ছ দলাদলির উর্ধ্বে থাকিতে হইবে। সংযত জীবনযাপন করাও সুনাগরিকতার অন্যতম লক্ষণ।

তৃতীয়ত, দলাদলির চাপে সুনাগরিকের কখনই নিজের বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দেওয়া উচিত নহে। কর্তব্যনিষ্ঠা সততার সহিত সব কাজ করিয়া যাওয়া উচিত। সুনাগরিককে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে তাহার যেমন কতিপয় মূল্যবান অধিকার আছে, সেই প্রকার কতিপয় কর্তব্যও আছে। সেই কর্তব্য হইতেছে দেশমাতার প্রতি, সমাজের প্রতি। তাহার কর্তব্যবোধ জাগরিত হইলেই সে প্রকৃতপক্ষে সুনাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

Exercise

1. (a) Define citizenship. (b) Distinguish between a Citizen and an Alien. [(ক) নাগরিকতার সংজ্ঞা প্রদান কর, (খ) নাগরিক এবং বিদেশীদের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।] (৩০-৩১ পৃষ্ঠা)

2. Distinguish between (a) Citizen and People, (b) Citizen and Subject. (c) Natural and Naturalised Citizens. [এইগুলির পার্থক্য আলোচনা কর :—(ক) নাগরিক ও স্বজাতীয় মানুষ, (খ) নাগরিক ও প্রজা, (গ) স্বাভাবিক নাগরিক এবং নাগরিকতা অর্জনকারী।] (৩১-৩২ পৃষ্ঠা)

3. How is the citizenship acquired? (নাগরিকতা কিভাবে অর্জিত হয়?) (৩২-৩৩ পৃষ্ঠা)

4. What are the essential qualities of a good Citizen? (সুনাগরিকের প্রধান গুণ কি কি?) (৩৯ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the main obstacles to the exercise of good citizenship. How can you remove these obstacles? (সুনাগরিকতার প্রধান অন্তরায়গুলি আলোচনা কর। এই অন্তরায়গুলি কিভাবে দূর করা যায়?) (৩৭-৩৯ পৃষ্ঠা)

6. How far are the obstacles to the exercise of good citizenship operating in India? (ভারতের সুনাগরিকতার অন্তরায়গুলি কি পরিমাণে দেখা যায়?)

[**ইঙ্গিত** : সুনাগরিকতার অন্তরায়গুলি ভারতের নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভারতের নাগরিকদের মধ্যেও আমরা অশিক্ষা, স্বার্থবুদ্ধি এবং রাজনৈতিক দলাদলি কিছু পরিমাণে দেখিতে পাই। কিন্তু, এই অন্তরায়গুলি ভারতের ক্ষেত্রে চিরকালীন নয়; এইগুলি দূর করার চেষ্টা হইতেছে। সুনাগরিকতার বিভিন্ন অন্তরায়গুলি উল্লেখ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর লিখ।]

7. Write a note on Indian Citizenship. (ভারতীয় নাগরিকতার উপর একটি টীকা লিখ।) (৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ অধ্যায় | *নাগরিকের অধিকার* (Citizen's Rights)

অধিকারের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন রূপ (Definition and different types of Rights)—সাধারণ অর্থে "অধিকার" কথাটির অর্থ হইতেছে কতিপয় কাজ করা অথবা না করার স্বাধীনতা। 'অধিকার' জিনিসটি নিছক দৈহিক শক্তি হইতে অথবা একটি সামাজিক মূল্যের ভিত্তি হইতে উদ্ভূত হইতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমরা 'অধিকার' জিনিসটিকে মানুষের সামাজিক চরিত্র হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করি। প্রাকৃতিক অধিকার সব মানুষেরই থাকে। কিন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অর্থে অধিকার সব মানুষের থাকে না। যাহারা সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ তাহারাই অধিকার ভোগ করে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা। সামাজিক কল্যাণ ব্যক্তিগত কল্যাণের উপর ভিত্তিশীল। সেইজন্য সর্বাধিক ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে কতিপয় পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার প্রদান করার দরকার হয়। অধ্যাপক লাস্কির মতে 'অধিকার' হইতেছে সামাজিক জীবনের এমন কতিপয় সর্ত যেগুলি ব্যতীত

নাগরিকদের অধিকার প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা

মানুষ কখনও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে পারে না।[১] রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকগণকে কতিপয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যেগুলির সাহায্যে তাহাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে এবং সামাজিক জীবনেও তাহাদের কল্যাণ হইতে পারে। সামাজিক জীবনে নাগরিকদের বিভিন্ন অত্যাবশ্যক চাহিদা মিটাইবার জন্য রাষ্ট্র যদি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে, তবেই রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকগণ পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিবে; তখন রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে সর্বাধিক সমাজ কল্যাণ হয়। গ্রীনের মতে 'অধিকার' হইতেছে এমন একটি শক্তি যাহা সাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধিকারী হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং দাবি করা হয়।[২] অধিকার বলিতে সামাজিক জীবনের এমন কতকগুলি সুবিধা বুঝায় যেগুলি জনসাধারণ নিজেদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক মনে করে এবং সমাজও অনুরূপ স্বীকার করে। এই অধিকারগুলির অস্তিত্বের জন্য চাই একটি সুসংহত সামাজিক জীবন। তাহা ছাড়া, এই অধিকারগুলির যাহাতে অপব্যবহার না হয় অর্থাৎ, এই অধিকারগুলি যেন জনসাধারণকে নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত না করে সেইজন্য কতিপয় রাষ্ট্রীয় আইন থাকে। অধিকার সর্বদাই রাষ্ট্রীয় আইন কর্তৃক স্বীকৃত ও কার্যকরী হওয়া উচিত এবং বাস্তবে তাহাই হইয়া থাকে। কেননা, প্রত্যেকটি আইনের যেমন একটি সামাজিক মূল্য এবং উদ্দেশ্য আছে, প্রত্যেকটি অধিকারেরও সেই রকম একটি সামাজিক মূল্য এবং উদ্দেশ্য আছে।

অধিকারের অর্থ

অধিকারগুলিকে আমরা প্রধানত নৈতিক অধিকার (Moral Rights) এবং আইনগত অধিকার (Legal Rights), এই দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। নৈতিক অধিকারগুলি আমাদের নীতিজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি এবং বিবেকের প্রেরণার উপর ভিত্তিশীল। এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকরী হয় না। কিন্তু, আইনগত অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকরী হয়। একজন লোক যদি মিথ্যা কথা বলে, তবে সে সত্য কথা বলার নৈতিক অধিকারের অপচয় করিল,—রাষ্ট্র সেক্ষেত্রে তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু একজন নাগরিক যদি অপর কোন নাগরিকের নামে সাধারণ নির্বাচনে জাল ভোট প্রদান করে, তবে রাষ্ট্র তাহাকে আইনগত অধিকারভঙ্গকারী হিসাবে শাস্তি প্রদান করিতে পারে। আইনগত অধিকারগুলিকে আমরা পৌর অধিকার (Civil Rights) এবং রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) এই দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। পৌর অধিকার বলিতে সাধারণত এমন

অধিকারের শ্রেণী বিভাগ

---

১ "Rights are those conditions of social life without which no man can be his best self."—Laski

২ "Right is a power claimed and recognised as contributory to good."—Green

কতিপয় অধিকার মনে করা হয় যেগুলি ছাড়া সভ্য নাগরিক জীবনযাপন করা অসম্ভব। এই অধিকারগুলি নাগরিকদের চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের নিম্নলিখিত পৌর অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

পৌর অধিকার (Civil Rights) :

১। **জীবন রক্ষার অধিকার (Right to life)**—পৌর অধিকারগুলির মধ্যে ইহাই আদিম অধিকার। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যদি গোলযোগ হয় অথবা রাষ্ট্রের উপর যদি বাহিরের আক্রমণ হয়, তবে নাগরিকগণের রাষ্ট্রের নিকট নিজেদের জীবন রক্ষার দাবি করিবার অধিকার আছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই সেইজন্য নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। কোন নাগরিককে আত্ম-হত্যা করা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

জীবন রক্ষার অধিকার

২। **স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার (Right to move freely)**—প্রত্যেক নাগরিকেরই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার এবং নিজের মানসিক বৃত্তিগুলিকে নিজের রুচি অনুযায়ী বিকাশ করিবার অধিকার আছে। কোনও লোককে বিনা বিচারে আটক রাখা যাইবে না।

স্বাধীনভাবে চলা-ফেরার অধিকার

৩। **কাজ করিবার এবং সম্পত্তিরক্ষার অধিকার (Right to work and property)**—কাজ করিবার অধিকার সব নাগরিকেরই থাকে। তবে কোন কোন রাষ্ট্রে, যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে, রাষ্ট্রের নির্দেশে নাগরিককে অনেক সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক কাজ করিতে হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গুলিতে কাজ করার অধিকারের উপর এই নিয়ন্ত্রণ নাই। প্রত্যেকেরই নিজের পছন্দমত জীবিকা গ্রহণের স্বাধীনতা থাকে। নিজের সম্পত্তিরক্ষার অধিকারও নাগরিক জীবনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই অধিকারটি সর্বজনীন নহে। সামাজিক কল্যাণের জন্য—অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের শোষণ-মুক্ত করিবার জন্য—রাষ্ট্র কোন সম্পত্তি নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারে; সেইক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এমনিতে সাধারণ অবস্থায় নিজের ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিককেই রাষ্ট্র প্রদান করিয়া থাকে।

কাজ করিবার ও সম্পত্তিরক্ষার অধিকার

৪। **স্বাধীনভাবে আইনসঙ্গত চুক্তি করিবার অধিকার (Right of Contract)**—এই অধিকারটি সম্পত্তিরক্ষার অধিকারের একটি বিশেষ দিক। বর্তমান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে চুক্তি একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন নাগরিক ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থে কোন

বিষয় সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা মানিয়া লয়। তবে চুক্তি যাহাতে সর্বদাই রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সম্পাদিত হয়, সেদিকে রাষ্ট্র লক্ষ্য রাখিবে এবং আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করিবে। চুক্তি করার স্বাধীনতা এবং মর্যাদা যাহাতে নাগরিকগণ বজায় রাখিতে পারে সেই স্বাধীনতা তাহাদের প্রদান করা উচিত।

চুক্তি করিবার অধিকার

৫। **বাক্-স্বাধীনতার অধিকার (Right of the Freedom of speech)**—বাক্-স্বাধীনতা বর্তমানে নাগরিকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিকার। এই পৌর অধিকার রাজনৈতিক বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার হিসাবেও বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু মূলত ইহা একটি পৌর অধিকার। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কথা বলিবার অধিকার যদি মানুষ না পায় তবে তাহার ব্যক্তিগত পূর্ণ বিকাশ কখনই সম্ভবপর হয় না। নিজের মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার অধিকার সব মানুষেরই থাকা উচিত। এই অধিকারটিই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। কারণ, কোন গণতান্ত্রিক সরকারের শক্তি এবং স্থায়িত্ব প্রধানত নির্ভর করে জনমতের সমর্থনের উপর। নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতাই প্রধানত একটি বিশেষ দিকে জনমত সংগঠনের জন্য দায়ী। বক্তৃতার সাহায্যে জনমতের উপর যত প্রভাব বিস্তার করা যায়, অন্য কোন উপায়ের সাহায্যে জনমতের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করা যায় না। কিন্তু এই অধিকারটিও সর্বজনীন নহে। কাহারও কথা বলার স্বাধীনতা যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে অথবা অন্যান্য নাগরিকদের অধিকার বজায় রাখার পক্ষে ক্ষতিকর হয়, তবে রাষ্ট্র সেই অধিকার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। আমাদের স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার আছে বলিয়াই যে আমরা যাহা খুশী তাহাই করিব অথবা কাহাকেও অপমান করিব তাহা কখনই রাষ্ট্র সমর্থন করিবে না। বিশেষত, যুদ্ধ অথবা আপৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য নাগরিকদের এই অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত অবশ্যক হইয়া পড়ে।

বাক্-স্বাধীনতার অধিকার

৬। **সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (Freedom of the press)**—সভ্য নাগরিক জীবন এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। নাগরিকদের যেমন স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার আছে, সেইরূপ স্বাধীনভাবে কোন কিছু লিখিবারও অধিকার আছে। সরকারের ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক এবং নাগরিকগণের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কাহারও যদি কিছু বলার থাকে, তবে তাহা সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে বলা যাইতে পারে। সংবাদপত্র জনমতকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। সংবাদপত্রের মত অনুযায়ী সরকার প্রভাবান্বিত হয়। সংবাদ-পত্র যখন সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের খোলাখুলি সমালোচনা হয়, তখন তাহাতে সরকারও উপকৃত হয় এবং জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী নিজের ক্রিয়া-কলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। গণতন্ত্রের যুগে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একটি

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। যুদ্ধের সময় অথবা দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার স্বার্থের এই অধিকারটি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

৭। **সভা-সমিতি গঠনের স্বাধীনতা (Right of Association)**—মানুষ সামাজিক প্রাণী। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রেরণায় মানুষ সভা-সমিতি গঠন করিতে চায়। যখন বিভিন্ন নাগরিক কোন বিষয়ে একই অভিমত পোষণ করে তখন তাহারা একটি সমতি গঠন করে। একটি সভার মাধ্যমে তাহারা নিজেদের মতামত প্রচার করিতে পারে। সুতরাং সভ্য নাগরিক জীবনের জন্য সভা-সমিতি গঠনের অধিকার নাগরিকদের থাকা আবশ্যক। এই অধিকারটি রাজনৈতিক সভা-সমিতি গঠন করে। কিন্তু সভা-সমিতি যে সর্বদাই রাজনৈতিক হইবে এমন কোন কথা নাই।

সভা-সমিতির গঠনের স্বাধীনতা

৮। **পরিবার গঠনের স্বাধীনতা (Right to have family)**—সভ্য নাগরিক জীবনের জন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই বিবাহ করিয়া পরিবার গঠনের অধিকার আছে। এই ব্যাপারে কোন বাধ্য-বাধকতার প্রশ্ন থাকিতে পারে না।

পরিবার গঠনের অধিকার

৯। **ধর্মাচরণ এবং বিবেকের স্বাধীনতা (Freedom of worship and conscience)**—মানুষের মধ্যে ধর্মভীরুতা থাকা খুবই স্বাভাবিক। সভ্য নাগরিক জীবনের জন্য মানুষের চিন্তার এবং বিবেকবুদ্ধি স্বাধীনভাবে চালনা করিবার অধিকার থাকা উচিত। একজন নাগরিকের কাছে যে ধর্মীয় মতবাদ গ্রহণযোগ্য মনে হইবে, আরেকজন নাগরিকের কাছে তাহা গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারে। ধর্মাচরণে প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজের স্বাধীনতা থাকা উচিত। মানুষের বিবেকবুদ্ধির প্রেরণায় চালিত হইবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যে সকল রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ (যেমন, ভারতবর্ষ), সে সকল রাষ্ট্রেও প্রত্যেক নাগরিকের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মীয় আচরণ করার অধিকার আছে। ধর্মের ভিত্তিতে যুদ্ধবিগ্রহ মধ্যযুগীয় ইতিহাসে আমরা অনেক দেখিয়াছি। সুতরাং সভ্য নাগরিক জীবনের জন্য এই অধিকারের গুরুত্ব মোটেই কম নহে।

ধর্মাচরণের অধিকার

১০। **শিক্ষার অধিকার (Right of education)**—নাগরিকগণ যাহাতে নাগরিক দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইতে পারে, সেইজন্য শিক্ষা পাইবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই আছে। রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত শিক্ষা নাগরিক-গণকে প্রদান না করে তবে নাগরিকগণ কখনই নিজেদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে না।

শিক্ষার অধিকার

উপরোক্ত অধিকারগুলি ছাড়াও নাগরিকদের আরও কতিপয় পৌর অধিকার আছে, যেমন, নিজেদের কৃষ্টি ও ভাষা রক্ষা করিবার অধিকার, আইনের চোখে সমানাধিকার, নিজেদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ইত্যাদি।

রাজনৈতিক অধিকার (Political Right) :

রাজনৈতিক অধিকারের দ্বারা নাগরিকগণ সরকার পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে আমরা নাগরিকদের নিম্নলিখিত রাজনৈতিক অধিকার দেখিতে পাই।

১। **বাসস্থানের অধিকার (Right of residence)**—এই অধিকার অনুযায়ী যে কোন নাগরিক রাজনৈতিক স্বার্থ ও কারণ নির্বিশেষে দেশের যে কোন স্থানে বসবাস করিতে পারে। এই অধিকারটিকে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয় এই কারণে যে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিদেশীগণ এই অধিকার লাভ করিতে পারে না। যদি বিদেশীগণ এই অধিকার ভোগ করিতে পারিত, তবে ইহা রাজনৈতিক অধিকার না হইয়া পৌর অধিকার হইত। কোন নাগরিকের বাসস্থানের সহিত রাষ্ট্রের অথবা রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকের নিরাপত্তা কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে জড়িত থাকিতে পারে।

বাসস্থানের অধিকার

২। **বিদেশে থাকাকালীন জীবনরক্ষার অধিকার (Right to have protection while staying abroad)**—কোন নাগরিক যদি বিদেশে গমন করে তবে বিদেশে যাইয়াও সে নিজ রাষ্ট্রের নিকট হইতে তাহার জীবন রক্ষার অধিকার দাবি করিতে পারে।

বিদেশে জীবন রক্ষার অধিকার

৩। **ভোট প্রদান করিবার অধিকার (Right to vote)**—সমুদয় রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে ইহাই প্রধান। বিশেষত, পরোক্ষ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য এই অধিকারটি অপরিহার্য। প্রত্যেক নাগরিকেরই সরকারের ক্রিয়াকলাপে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করিবার অধিকার আছে। সেইজন্য সে নির্বাচন প্রার্থী হইবার অথবা তাহার পছন্দমত প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করিবার অধিকারী হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ইহা একটি মৌলিক অধিকার। বিদেশীগণ এই অধিকার হইতে বঞ্চিত।

ভোট প্রদানের অধিকার

৪। **সরকারী চাকুরী করিবার অধিকার (Right to hold public office)**—নাগরিকগণের সরকারী চাকুরী করিবার অধিকার থাকিবে। ইহার তাৎপর্য হইতেছে সরকারী কাজের জন্য লোক মনোনয়নে প্রার্থী হইবার সমান অধিকার সব নাগরিকেরই আছে। বিদেশীগণ কোনও রাষ্ট্রে সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকারী হইবে না। তবে কোন রাষ্ট্রে সরকারের বিশেষ সম্মতিতে এবং সংশ্লিষ্ট বিদেশী রাষ্ট্রের অনুমতিতে এই অধিকার কোন বিদেশীকে সাময়িকভাবে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু, বিদেশী নাগরিকতা অর্জন করে না।

সরকারী কাজ করিবার অধিকার

৫। **আবেদন করিবার অধিকার (Right of Petition)**—নাগরিকদের যদি সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ অথবা ক্ষোভের কারণ থাকে তবে তাহা দূর করিবার জন্য নাগরিকগণ সরকারের নিকট আবেদন করিবার অধিকার লাভ করে।

আবেদন করিবার অধিকার

৬। **স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিবার অধিকার (Right of resistance)**—প্রতিরোধ করিবার অধিকার বলিয়া কোন একটি বিশেষ অধিকার আছে কিনা ইহা লইয়া সন্দেহের কারণ ঘটিতে পারে। তবে এই অধিকারের তাৎপর্য হইতেছে যদি সরকার কখনও অন্যায়ভাবে নাগরিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে তবে তাহা প্রতিরোধ করিবার অধিকার নাগরিকদের থাকে। সাধারণত, সভানুষ্ঠান করিয়া, শোভাযাত্রা করিয়া এবং সংবাদপত্রের মারফৎ অথবা আইনসভার ভিতরে সরকারের কঠোর সমালোচনা করিয়া নাগরিক স্বাধীনতায় অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে একটি হইতেছে সংবিধানিক প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা (Right of constitutional remedies)।

স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিবার উপায়

বিভিন্ন দেশে অধিকার রক্ষার সর্ত (System of guaranteeing these rights in different countries) :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের নাগরিকদের বিভিন্ন পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে এইগুলিকে মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইগুলিকে অধিকারের বিধি (Bill of Rights) বলা হয়। অন্যান্য অধিকার হইতে এই অধিকারগুলি সম্পূর্ণ পৃথক এবং এইগুলি যদি রাষ্ট্র পালন না করে তবে নাগরিকগণ সংবিধানিক অধিকারের সাহায্যে ইহার প্রতিকার করিতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নেও লিখিতভাবে নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু সেদেশে নাগরিকগণ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকায় এই অধিকারগুলির উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত, ততটা গুরুত্ব তাহারা দিতে পারে না। আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্ত অনেক পরিমাণে নাগরিক অধিকারগুলির নিরাপত্তা রক্ষা করে। ইংলণ্ডে লিখিত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে নাগরিক অধিকারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকিলেও নাগরিকগণ নিজেদের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। ইহা সম্ভবপর হইয়াছে ইংলণ্ডের আইনের নিয়ম (Rule of law) এবং প্রচলিত আইনগুলির (conventions) সাহায্যে। ইংলণ্ডের বিচারবিভাগও এই প্রচলিত আইনগুলিকে প্রকৃত আইনের মর্যাদা দিয়াছে এবং সেইগুলি নাগরিকদের বিভিন্ন পৌর ও রাজনৈতিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নাগরিক অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় হইতেছে নাগরিকগণের সদা সচেতন।

আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে অধিকার রক্ষার সর্ত

অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights)—আধুনিক লেখকগণের মতে অর্থনৈতিক অধিকার না থাকিলে পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকারগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। অর্থনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে অন্যতম হইতেছে চাকুরী পাইবার অধিকার। একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া অন্যান্য দেশে রাষ্ট্র নাগরিকদের এই অধিকার সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়া লয় নাই। দেশে যাহাতে বেকার-সমস্যার সৃষ্টি

না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের। শুধু চাকুরী পাইবার অধিকার নহে, নিজের পছন্দমত জীবিকা অর্জনের অধিকারও নাগরিকগণ দাবি করিতে পারে। তাহা ছাড়া, নাগরিকগণ নিজের চেষ্টায় ধনবৃদ্ধি অথবা সম্পত্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে পারে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নূতন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করাও একটি অর্থনৈতিক অধিকার। শ্রমিকগণ কতক্ষণ কারখানায় কাজ করিবে এবং তাহারা ন্যায্য মজুরি পাইল কিনা এ বিষয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টি থাকা উচিত। কারণ, কাজের সময় স্থির করিয়া লওয়া এবং ন্যায্য মজুরি পাওয়া নাগরিকদের একটি মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার। স্বাধীনভাবে নিজেদের অর্থ বিনিয়োগ করাও নাগরিকদের আর একটি অর্থনৈতিক অধিকার।

অর্থনৈতিক অধিকার

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)—নাগরিকগণ যে সকল পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে সেগুলির মধ্যে কতিপয় অধিকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন দেশের শাসনতন্ত্র লিখিতভাবে নাগরিকদের এই অধিকারগুলি প্রদান করিয়াছে। তাহাতে এই অধিকারগুলিকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করিয়া অপরাপর অধিকার হইতে পৃথক করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নাগরিকগণ নিজেদের দেশের শাসনতন্ত্র হইতেই এই অধিকারগুলি পায় বলিয়া সরকারের ক্ষমতা নাই এই অধিকারগুলি স্বীকার না করিয়া লওয়া। এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। তবে দেশে যদি জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য সাময়িকভাবে এই অধিকারগুলির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ সময়ে যদি রাষ্ট্র নাগরিকদের এই অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করে তবে নাগরিকগণ বিচারবিভাগের কাছে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে।

আধুনিক কালে নাগরিকগণ যে সকল অধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার ভোগ করে, সেইগুলি হইতেছে—(১) জীবনের অধিকার (Right of life), (২) কাজ করিবার অধিকার (Right of work), (৩) সম্পত্তি রক্ষার অধিকার (Right of Property), (৪) যুক্তিসঙ্গত মজুরি ও নির্দিষ্ট কার্যকাল পাইবার অধিকার (Right of reasonable wage and hours of work), (৫) শিক্ষার অধিকার (Right of education), (৬) ধর্মাচরণের স্বাধীনতা (Freedom of worship and conscience), (৭) বাক্-স্বাধীনতা (Freedom of speech), (৮) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (Freedom of the press), (৯) সভা ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা (Right of association), (১০) ভোট প্রদান করিবার ক্ষমতা (Right to vote), (১১) সরকারী চাকুরী করিবার ক্ষমতা (Right to hold public offices), (১২) সরকারের অনুসৃত নীতির সমালোচনা এবং প্রতিবাদ করিবার অধিকার (Right of resistance), এবং (১৩) রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ভোগের অধিকার (Right to enjoy political power)।

ভোটাধিকারের ভিত্তি (Basis of the Right to Vote)– ভোটাধিকারের

ভিত্তি সম্বন্ধে যুক্তি আছে। আধুনিক যুগে অনেকের মতে নির্বাচকের বা ভোটারের বয়সই ভোটাধিকারের ভিত্তি হওয়া উচিত। মধ্যযুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে সামাজিক শ্রেণী ও মর্যাদা, কর প্রদান অথবা সম্পত্তি ভোটাধিকারের ভিত্তি হওয়া উচিত। আবার অনেকের মতে শিক্ষাই ভোটাধিকারের ভিত্তি হওয়া উচিত। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, সামাজিক মর্যাদা, সম্পত্তি, কর প্রদান, শিক্ষা, কোনটিই ভোটাধিকারের ভিত্তি হইতে পারে না। অনেকের সম্পত্তি আছে অথচ রাজনৈতিক শিক্ষা নাই; আবার অনেকের রাজনৈতিক শিক্ষা আছে অথচ সম্পত্তি নাই। আবার যাহাদের কোন পুঁথিগত বিদ্যা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নাই তাহাদের মধ্যেও হয়ত অনেক ব্যক্তি থাকিতে পারেন যাঁহারা প্রকৃতই রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। তাহা ছাড়া, সম্পত্তি, কর প্রদান এবং শিক্ষার ভিত্তিতে নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদান করিলে, তাহাদের মধ্যে বৈষম্য আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং ইহাতে গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকা উচিত এবং সেক্ষেত্রে ধনী এবং গরীবের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে কোনও প্রকার তারতম্য করা উচিত নহে। এমন অনেক গরীব ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের রাজনৈতিক জ্ঞান এবং শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা খুবই বেশী। যাঁহাদের সাহায্যে রাষ্ট্র বিশেষভাবে উপকৃত হইতে পারে তাঁহাদের নিশ্চয়ই নির্বাচিত করিবার অধিকার প্রদান করা উচিত। সেজন্য অনেকে বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক মাত্রেরই ভোট প্রদান করিবার অধিকার থাকা উচিত। ইহাকেই সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতি (Universal Suffrage) বলে। এই নীতির সমর্থনে বলা হয়, "যাহা সকলকে স্পর্শ করে, তাহা সকলের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়া উচিত" (What touches all, should be decided by all)। সুতরাং প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে এবং সেই অধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যেককেই শাসক নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া উচিত। কোন ব্যক্তি বা দলকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অর্থ হইতেছে গণতন্ত্রের অমর্যাদা করা; কেননা, সেক্ষেত্রে অন্যান্য শ্রেণীর সমপর্যায়ে সেই ব্যক্তি অথবা দলকে উন্নীত করা হয় না। অধ্যাপক জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, যদি সমাজের কোন একটি শ্রেণীকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, তবে সেই শ্রেণীর স্বার্থ আইন-পরিষদে অবহেলিত হয়।

সর্বজনীন ভোটাধিকার.—ইহার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি

সর্বজনীন ভোটাধিকারের অর্থ এই নয় যে সমাজের সকলেরই ভোট প্রদান করিবার অধিকার থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদেরই এই নীতি অনুযায়ী ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া হয়। আবার প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের মধ্যে যদি কেহ উন্মাদ, দেউলিয়া অথবা ফৌজদারী আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযুক্ত হয়, তাহাদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে। রাশিয়ায় ১৮ বৎসর

বয়সে, ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ এবং আমেরিকায় ২১ বৎসর বয়সে এবং নরওয়েতে ২৩ বৎসর বয়সে নাগরিকগণকে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া হয়। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে অনেক দেশেই নির্বাচকমণ্ডলীর একটি বিরাট অংশ অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ থাকে। কিন্তু, প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশে এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, সর্বজনীন ভোটাধিকারের আগে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ("Universal education must precede universal suffrage.")

সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিপক্ষে যুক্তি

Exercise

1. Define Rights, Distinguish between (a) Moral and Legal Rights, and (b) Civil and Political Rights. [অধিকারের সংজ্ঞা প্রদান কর। (ক) নৈতিক ও আইনগত অধিকার এবং (খ) পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।] (৪০-৪২ পৃষ্ঠা)

2. Describe the different civil rights that a citizen enjoys.
(একজন নাগরিক যে পৌর অধিকারগুলি ভোগ করে, সেগুলি আলোচনা কর।) (৪২-৪৪ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the different political rights of a citizen in democratic country. (গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকের বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকারগুলি আলোচনা কর।) (৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা)

4. What are the rights of a citizen to (a) Public Meeting, (b) Freedom of speech, (c) Freedom of the press ?
(নাগরিকদের সভাসমিতি গঠনের অধিকার, বাক্-স্বাধীনতার অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায় ?) (৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা)

5. Examine the different views regarding the basis of the Right to Vote. (H. S. 1967)
(ভোটাধিকারের ভিত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ পর্যালোচনা কর।) (৪৭-৪৯ পৃষ্ঠা)

6. Do you support the Universal Suffrage ? Give reasons for your answer. (তুমি কি সর্বজনীন ভোটাধিকার সমর্থন কর ? তোমার উত্তরের যুক্তি প্রদর্শন কর।) (৪৭-৪৯ পৃষ্ঠা

7. What is meant by the Right of Free Speech ? Is it essential for Democracy ? Should there be any limits to this ? (H. S. 1963)
(বাক্-স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায় ? গণতন্ত্রের পক্ষে কি ইহা খুব প্রয়োজনীয় ? এই অধিকারের কি কোন সীমা থাকা উচিত ?) (৪৩ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম অধ্যায়

নাগরিকের কর্তব্য
(Duties of a Citizen)

অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক (Relation between Rights and Duties)– নাগরিকদের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। নাগরিক অধিকার কখনই অবাধ অথবা অসীম নহে। সমাজ-জীবনে নাগরিকদের অধিকার ভোগ করার একটি গণ্ডী আছে এবং সেই গণ্ডীর সীমারেখা, অন্যান্য নাগরিকদের অধিকারের উপর নির্ভর করে। কারণ, প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রের নিকট হইতে বিভিন্ন অধিকার পাইয়া থাকে এবং প্রত্যেকেই সমানভাবে সেই অধিকারগুলি ভোগ করে বলিয়া কেহ কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সমাজ-জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যখন মানুষের ধারণা জন্মায় তখনই তাহার কর্তব্যবোধের উন্মেষ হয়। প্রকৃতির রাজ্যে কর্তব্য এবং অধিকারের মধ্যে এই সম্পর্ক নাই ; কারণ সেখানে মানুষের সামাজিক সচেতনতা থাকে না। সামাজিক কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্র নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার প্রদান করিয়া থাকে এবং যাহাতে নাগরিকগণ সকলেই এই অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারে রাষ্ট্রেরও সেদিকে দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব আছে।

নাগরিকদের পরস্পরের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। আবার একটি অধিকার যুগপৎ রাষ্ট্র এবং অন্যান্য নাগরিকদের নিকট বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল আমি যাহাতে এই অধিকার ঠিকভাবে ভোগ করিতে পারি সেদিকে দৃষ্টি রাখা, এবং অন্যান্য নাগরিকদের কর্তব্য হইল আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। কিন্তু, আমারও এক্ষেত্রে দুইটি কর্তব্য আছে। প্রথমত, আমাকে দেখিতে হইবে যেন আমার অধিকার পালনের মধ্য দিয়া আমি অন্যান্য নাগরিকদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করি। দ্বিতীয়ত, আমার কর্তব্য হইতেছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। অন্যান্য নাগরিকদের অধিকারে আমি হস্তক্ষেপ করিতে পারি না, যেমন অন্যান্য নাগরিকগণ আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। অন্যান্য নাগরিকগণ এবং আমি আমাদের কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতেছি কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব হইল রাষ্ট্রের। আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে,—ইহা অন্যান্য নাগরিকদের পক্ষে একটি কর্তব্য। তাহাদের কর্তব্য হইতেছে আমার জীবনের কোনও ক্ষতি না করা। আবার আমার স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার আছে, এক্ষেত্রে আমার কর্তব্য হইতেছে অপরের বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ না করা। অন্য নাগরিকদেরও অধিকার আছে তাহাদের বাড়িতে কাহাকেও অনধিকার প্রবেশ করিতে না দেওয়া। আমার

ভোটদানের অধিকার আছে ; সেক্ষেত্রে আমার কর্তব্য হইল ঠিকভাবে ভোট প্রদান করা। দেখা যাইতেছে, আমার অধিকারের ফলে অন্য নাগরিকদের উপরে যেমন কর্তব্যের দায়িত্ব চাপিয়াছে, সেই প্রকার আমার নিজের উপরেও কতিপয় কর্তব্যের দায়িত্ব পড়িয়াছে। অধিকার এবং কর্তব্যের এই পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহারা একই আদর্শের দুইটি বিভিন্ন দিক। অধিকার এবং কর্তব্য,—উভয়েরই চূড়ান্ত লক্ষ্য হইতেছে সমাজের কল্যাণ করা, সামাজিক জীবনের পরিবেশ সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল করা। আমার অধিকারের অর্থ হইতেছে অপরের কর্তব্য এবং অপরের অধিকারের অর্থ হইতেছে আমার কর্তব্য,—ইহাতে আমার এবং অপর সকলের স্বাধীনতা বজায় থাকিবে। নাগরিকদের সব রকম অধিকার রক্ষা করিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন নাগরিকগণ নিজেদের অধিকারগুলি ভুলিয়া না যায়, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া, সময় মত কর প্রদান করিয়া এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষায় সাহায্য করিয়া নাগরিকগণ নিজেদেরই অধিকারের নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইলে নাগরিকদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করা কর্তব্য। বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকার-গুলিও যাহাতে ঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা নাগরিকদের কর্তব্য। অধিকার কখনও ফাঁকা কথা নয়,—প্রতিটি অধিকারের সহিত কর্তব্য জড়িত থাকে। অধিকার এবং কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

নাগরিকের কর্তব্য (Duties of a Citizen)—নাগরিকদের অনেক কর্তব্য আছে। নিজের পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি এবং রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের অনেক কর্তব্য আছে।

পরিবারের প্রতি কর্তব্য—যে পরিবারে নাগরিক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই পরিবারের প্রতি তাহার বিশেষ কর্তব্য আছে। নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বার্থ অপেক্ষাও পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি এবং স্বার্থকে তাহার বড় করিয়া দেখিতে হয়। পিতামাতার বৃদ্ধ বয়সে অথবা তাঁহাদের অক্ষমতায় তাঁহাদের ভরণপোষণ করা এবং ভ্রাতাভগ্নীদের সুস্থ, সুন্দর জীবনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া নাগরিকের পারিবারিক কর্তব্য। পরিবারের মধ্যে থাকিয়াই নাগরিক তাহার প্রথম কর্তব্যজ্ঞান লাভ করে।

পরিবারের প্রতি কর্তব্য

সমাজের প্রতি কর্তব্য—যে সমাজে নাগরিক বাস করে, সেই সমাজের প্রতিও তাহার কর্তব্য আছে ; সমষ্টির স্বার্থকে নিজের স্বার্থ অপেক্ষা বড় করিয়া দেখিতে হয়। সেইজন্য নাগরিকের উচিত, নিজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিবার প্রয়োজনীয়তা ঘটিলেও সামাজিক স্বার্থকে বড় করিয়া দেখা। সামাজিক জীবন যাহাতে সুন্দর হয়, সমাজের গ্রাম ও শহর যাহাতে পরিচ্ছন্ন থাকে, সমাজের বিপন্ন ও অসহায় ব্যক্তিগণ যাহাতে অবহেলিত না হয়, সমাজে যাহাতে শিক্ষার প্রসার ঘটে ও সমাজ হইতে যাহাতে সমস্ত দুর্নীতি দূর হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া নাগরিকের কর্তব্য।

রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য—রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকের অনেক কর্তব্য আছে।

(১) সময় মত কর প্রদান করা যাহাতে রাষ্ট্রকে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন না হইতে হয়, (২) রাষ্ট্রের প্রতি স্বভাবগত আনুগত্য প্রকাশ করা যাহাতে রাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে, (৩) ভোটাধিকার ব্যবহার করা যাহাতে সরকারের কাজে নাগরিক অংশ গ্রহণ করিতে পারে এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করিতে পারে। (৪) সরকারী কাজে গাফিলতি প্রদর্শন না করা, (৫) দলীয় স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখা, (৬) যুদ্ধের সময় অথবা দেশের জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকা এবং সর্বদা আইন মান্য করিয়া চলা,—ইত্যাদি সবই রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য।

নাগরিক যদি নিজের কর্তব্য সম্পাদনে উদাসীন থাকে, তবে অল্পদিনের মধ্যেই তাহার নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি ঘটে।

Exercise

1. **Discuss the different duties of a citizen.**
   (নাগরিকের বিভিন্ন কর্তব্য আলোচনা কর।) **(৫১-৫২ পৃষ্ঠা)**
2. **"Rights imply duties"—Discuss the statement.**
   ("অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত"—উক্তিটি আলোচনা কর।) **(৫০-৫১ পৃষ্ঠা)**

ষষ্ঠ অধ্যায়	জাতি ও জাতীয়তাবাদ (The Nation and Nationalism)

জাতীয় জনসমাজ (Nationality)—যখন স্বজাতীয় একদল লোক (A group of people) আরও গভীর ঐক্যবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের অন্যান্য জনসমাজ হইতে স্বতন্ত্র মনে করে তখন জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয়। একটি নির্দিষ্ট ভূভাগে কোন জনসমষ্টির যখন একই ভাষা একই ঐতিহ্য এবং একই আচার-ব্যবহার থাকে তখন তাহারা স্বজাতীয় লোক (people) বলিয়া পরিচিত হয়। জাতীয় জনসমাজ (Nationality) গঠিত হয় এইরূপ জনসমষ্টি বা স্বজাতীয় লোক লইয়া যাহাদের মধ্যে ভাষাগত, বংশগত, ধর্মগত, বা সাংস্কৃতিক ঐক্য বিদ্যমান থাকে এবং যাহারা একটি নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস করে।

জাতীয় জনসমাজ গঠনের জন্য উপরের কোন উপাদানই অপরিহার্য নয়। জাতীয় জনসমাজে যে বংশগত ঐক্য একেবারে অপরিহার্য তাহা নয়। জার্মান ও ইংরাজ একই টিউটন বংশের, কিন্তু তাহারা দুইটি পৃথক জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। অপরপক্ষে পাঞ্জাবী ও বাঙালী এক বংশের না হইলেও বর্তমানে একই জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

জাতীয় জনসমাজের উপাদান

দ্বিতীয়ত, ভাষাগত ঐক্যও জাতীয় জনসমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য নয়। ভারতবর্ষে অনেক ভাষাভাষী আছে; কিন্তু ইহাতে আমাদের জাতীয় সংহতি এবং ঐক্য নষ্ট হয় নাই। রাশিয়ায়ও অনেক ভাষা প্রচলিত। সুতরাং ভাষার ঐক্য না থাকিলেও জাতীয় জনসমাজ গঠিত হইতে পারে।

তৃতীয়ত, ধর্মগত ঐক্যও জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নয়। জাতীয় জনসমাজ গঠনের জন্য ধর্মকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিতে ইহার গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ ভারতের কথা ধরা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে অনেক ধর্মের লোক বাস করে। কিন্তু, ধর্মের অনৈক্য এই দেশে জাতীয় জনসমাজ গঠনে অন্তরায় হয় নাই।

চতুর্থত, ভৌগোলিক ঐক্য (Geographical unity) জাতীয় জনসমাজ গঠনের আর একটি উপাদান। কিন্তু, এই উপাদানটিও যে সর্বদা অপরিহার্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। ইহুদী জাতি বহুদিন একটি নির্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে বাস না করিয়াও নিজেদের ঐক্যবোধের প্রেরণায় জাতীয় জনসমাজ গঠন করিয়াছিল। পক্ষান্তরে ভারতে একটি নির্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে থাকিয়াও হিন্দু এবং মুসলমানগণ বহুদিন পর্যন্ত এক জাতিতে পরিণত হয় নাই।

উপরি-উক্ত চারিটি উপাদান হইতেছে জাতীয় জনসমাজ গঠনের বাহ্যিক উপাদান; ইহাদের কোনটিই অপরিহার্য নয়। এই উপাদানগুলি না থাকিলেও জাতীয় জনসমাজ গঠিত হইতে পারে যখন জাতীয় জনসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভাবগত ঐক্যে

(Spiritual unity) অনুপ্রাণিত হইয়া একজাতিতে পরিণত হয়। যদি একই ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জীর পথে তাহাদের জীবন গঠিত হয়, যদি তাহারা একই ঐতিহ্য অথবা সভ্যতার অধিকারী হয়, যদি তাহাদের আত্মত্যাগ এবং সুখ-দুঃখের একই স্মৃতি থাকে এবং যদি একই অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক আদর্শের লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য তাহারা ঐক্যবদ্ধ হয়- এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য নিজেদের ঐতিহ্য রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করে, তখন তাহাদের এই ভাবগত ঐক্য জাতীয় জনসমাজ গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং তাহারা নিজেদের অপর জাতি অপেক্ষা স্বতন্ত্র মনে করে। জাতীয় জনসমাজের উপাদান বংশগত অথবা ভাষাগত ঐক্য নহে, ইহার প্রধান উপাদান ভাবগত ঐক্য।[১] প্রকৃতপক্ষে একটি জাতিকে আমরা তখনই 'জাতি' বলিয়া গণ্য করিতে পারি যখন ইহার সদস্যেরা মনে করেন যে তাহারা একটি জাতি গঠন করিয়াছেন। রেনানের (Renan) মতে এই ঐক্যবোধ মূলত আধ্যাত্মিক বা ভাবগত।[২]

জাতীয় জনসমাজের ভিত্তি হইতেছে ভাবগত ঐক্য

জাতীয় জনসমাজের মধ্যে সাধারণত জনসমষ্টির বংশগত ঐক্য, ভাষাগত ঐক্য, ভৌগোলিক ঐক্য, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের ঐক্য এবং আচার-ব্যবহারের ঐক্য থাকে। কিন্তু, এই উপাদানগুলি কোনটিই অপরিহার্য নয়। যে উপাদানটি জাতীয় জনসমাজ গঠনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা হইতেছে ভাবগত ঐক্য। একই ধর্ম, একই জনগোষ্ঠী অথবা একই ভাষা কোনটির উপরেই জাতীয়তাবাদ নির্ভর করে না। ইহা চিন্তাগত ঐক্যের উপর নির্ভরশীল। জাতীয় জনসমাজের নিজস্ব সরকার নাও থাকিতে পারে। যখন কোনও জাতীয় জনসমাজের নিজস্ব সরকার থাকে, তখন ইহাকে জাতি (Nation) বলা হয়। সেই সরকার স্বাধীন হইতে পারে অথবা স্বাধীনতা অর্জন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে পারে। শুধু এই উপাদানটি ছাড়া জাতি ও জনসমাজের মধ্যে পার্থক্য নাই।

জাতীয় জনসমাজ ও জাতির মধ্যে পার্থক্য

জাতি ও রাষ্ট্র (Nation and State)—উপরের আলোচনা হইতে আমরা একটি জাতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই—(১) নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা অথবা ভৌগোলিক ঐক্য, (২) একটি জনসমষ্টি যাহাদের মধ্যে সাধারণত বংশগত, ধর্মগত, ভাষাগত এবং আচার ব্যবহারগত ঐক্য থাকে, (৩) একটি সরকার যাহা স্বাধীন হইতে পারে অথবা নাও হইতে পারে (স্বাধীন না হইলেও এই রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনটি স্বাধীন হইবার জন্য ইচ্ছুক থাকিবে)। কিন্তু, জাতির সার্বভৌমত্ব থাকে না। যদি কোনও জাতীয় সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereign authority) থাকে, তবে ইহা রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে

১ "Neither biological nor linguistic unity but a spiritual unity"—Spengler

২ "This sentiment is essentially spiritual in character."—Renan

এই সার্বভৌমিকতা এবং রাষ্ট্র বলিতে বুঝায় সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের অধিকারী এক জাতীয় জনসমাজ। রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য চারিটি,—যথা, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, একটি জনসমষ্টি, একটি সরকার এবং ইহার সার্বভৌম ক্ষমতা। প্রথম তিনটি বৈশিষ্ট্য একটি জাতির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটি অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা শুধুমাত্র রাষ্ট্রেই দেখা যায়।

ভারত কি একটি জাতি?

ভারতবর্ষ একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে থাকিয়া নিজেদের সরকার গঠন করিয়াছে এবং সেই সরকার স্বাধীন ও সার্বভৌম। যতদিন এই সরকার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিল না, অথচ স্বাধীন হইবার জন্য ইচ্ছুক ছিল, ততদিন ভারতকে একটি জাতি বলা হইত, কিন্তু রাষ্ট্র বলা হইত না। সুতরাং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বেও ভারতকে একটি জাতি বলিয়া গণ্য করা হইত। এখন ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন জাতি ও স্বাধীন রাষ্ট্র।

জাতির আত্ম-নির্ধারণের নীতি অথবা 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতি (Principle of Self-determination of Nations, or the Principle of 'One Nation, One State')—যখনই কোন জাতীয় সমাজ নিজের পৃথক সত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয় তখনই ইহা নিজের পৃথক সত্তাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক জাতিই চায় নিজের জাতীয় চরিত্র বজায় রাখিতে এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিতে। গত শতাব্দীতে জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছিলেন যে সাধারণভাবে স্বাধীন সরকার বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় জনসমাজের সীমান্তরেখার সমানুপাতে রাষ্ট্রের সীমারেখা টানা উচিত। ইহা হইতেছে জাতীয় আত্মনির্ধারণের অধিকার (Right of self-determination)।

"এক জাতি, এক রাষ্ট্রের" পক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of Mono-national State)—জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে যখনই কোন জাতীয় ঐক্য প্রবল হয়, তখন সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত জনগণের নিজস্ব ও পৃথক সরকার দাবি করিবার প্রাথমিক যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত।

অর্থাৎ জন স্টুয়ার্ট মিল "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" (One Nation, one State) নীতি সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিভিন্ন জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

জাতিগুলি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার পাইলে যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে

একটি জাতীয় জনসমাজ লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের (mono-national state) পক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে, ইহা একটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষা করিতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে (poly-national state) বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয় এবং বিভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষেও টিকিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রেসিডেণ্ট উইলসন একটি জাতি লইয়া রাষ্ট্র গঠন করিবার নীতি সমর্থন

করেন। তাঁহার মতে বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজকে আত্মনির্ধারণের অধিকার প্রদান করিলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে। পতনোন্মুখ জাতির পক্ষে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে নিজের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান চাই। অপর জাতির পদানত হইয়া থাকিলে কোনও জাতীয় জনসমাজের পক্ষে নিজের ঐতিহ্য বজায় রাখা সম্ভব নহে। যদি অনেকগুলি জাতি লইয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেখানে যদি একটি বড় জাতি সর্বদাই অবিচার পাইতে থাকে অথবা নিজস্ব স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন না করিতে পারিয়া অতৃপ্ত থাকে তবে সেক্ষেত্রে সেই জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার লাভ করার যথেষ্ট দাবি আছে। কোন জাতির স্থায়সঙ্গত দাবি যদি অগ্রাহ্য করা হয় তবে জাতির আন্তর্জাতিক সম্পর্কে শান্তি নষ্ট হইতে পারে; উইলসন বলেন আত্মনির্ধারণ অধিকার শুধু নিছক বাক্যাংশ নহে, ইহা একটি পালনীয় কার্যনীতি যাহা উপেক্ষা করিলে রাজনীতিজ্ঞগণ নিজেদের বিপদ সৃষ্টি করিবেন।[১]

কিন্তু লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton) এবং গামপ্লোউইক্ (Gumplowicz) "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" নীতি সমর্থন করেন না। অ্যাক্টনের মতে জাতিতত্ত্ব হইতেছে ইতিহাসের পশ্চাদ্‌গামী পদক্ষেপ।[২] একটি জাতির বিভিন্ন অধিকারের সর্বপ্রধান বিরোধী হইতেছে জাতিতত্ত্ব স্বয়ং।

'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' গঠনের বিপক্ষে অথবা জাতির আত্মনির্ধারণ নীতির বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against the Principle of 'One Nation, One State')—প্রথম, লর্ড অ্যাক্টনের মতে সমাজে জনসমষ্টি যেমন অত্যাবশ্যক, সেইরকম সুসভ্য জীবনের একটি প্রয়োজনীয় সর্ত হইল একটি রাষ্ট্রের জাতিসমষ্টি। বুদ্ধি এবং জ্ঞানের দিক দিয়া উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিয়া অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতিগুলিও উন্নত হয়। এই সংমিশ্রণ হয় রাষ্ট্রের মধ্যেই যাহার ফলে মানবসমাজের একটি অংশের বীর্য, জ্ঞান এবং ক্ষমতা অপর একটি অংশে সঞ্চারিত হয়।

বহু জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের স্বাধীন প্রতিষ্ঠান টিকিয়া থাকে

দ্বিতীয়ত, বহু জাতি লইয়া গঠিত স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়া থাকে না, এই কথা বলা অযৌক্তিক। সুইজারল্যাণ্ড, আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে অনেক জাতি আছে। কিন্তু এই দেশগুলিতেই আমরা স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিতে পাই।

ইহা জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল

তৃতীয়ত, আত্মনির্ধারণ নীতি বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করা অনেক সময়েই জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল হয়। যে সমস্ত দেশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি অনেকদিন যাবৎ বসবাস করিয়া একটি ভাবগত ঐক্যের মাধ্যমে এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, পরবর্তীকালে যদি সেই জাতিগুলিকে আত্মনির্ধারণের অধিকার প্রদান করা হয়, অর্থাৎ নিজেদের পৃথক

---

১ "Self-determination is not a mere phrase; it is an imperative principle of action which the statesmen will henceforth ignore at their perill."

২ "The theory of Nationality is a retrograde step in history."

পৃথক রাষ্ট্র করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তাহা জাতিগুলির স্বার্থের প্রতিকূল হইবে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে লোক-বিনিময়ের সাহায্যে আত্মনির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। যেমন, প্রথম মহাযুদ্ধের পর গ্রীস এবং তুরস্কের মধ্যে লোক-বিনিময় হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, জার্মানী ও চেকোস্লোভাকিয়া এবং জার্মানী ও পোলাণ্ডের মধ্যেও লোক-বিনিময় নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। আংশিকভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও লোক-বিনিময় নীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

চতুর্থত, আত্মনির্ধারণ নীতি কার্যকরী করিলে অনেক রাষ্ট্রেরই বর্তমান কাঠামো ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি নষ্ট হইয়া যাইবে।

ইহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হইবে

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, এই নীতি কার্যকর হইলে ইউরোপে বর্তমানের আটাশটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আটষট্টি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে। বর্তমানের উত্তরআয়ার্ল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইবে। ভারতবর্ষকেও মোটামুটিভাবে ১৫।১৬টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে কোনও রাষ্ট্রই সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। নিজেদের মধ্যে কেবল বিবাদ-বিসংবাদ লাগিয়াই থাকিবে। আত্মনির্ধারণ নীতির দুইটি দিক আছে। একদিকে যেমন ইহা কোন জাতীয় জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে, অন্যদিকে ইহা জনসমাজের মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি করিতে পারে। জাতিগুলির আত্ম-নির্ধারণ নীতি একদিকে জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিল; অপরদিকে এই নীতি অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী, তুরস্ক এবং রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে ভাঙনের সৃষ্টি করিয়াছিল।[১]

পঞ্চমত, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলেই যে বিভিন্ন জাতি সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অধিকাংশ

ইহাতে ছোট ছোট জাতি-রাষ্ট্রগুলি বৃহৎ শক্তিগুলির তাঁবেদার হইয়া পড়িবে

ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি কোন-না-কোন বৃহৎ শক্তির তাঁবেদার হইয়া পড়ে। পাকিস্তানের সৃষ্টি হইয়াছিল মিঃ জিন্না কর্তৃক প্রচারিত দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে। মুসলমান জাতি পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল।

ষষ্ঠত, জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ নীতি একবার প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে ইহার পরিসমাপ্তি কোনদিনই হইবে না এবং ইহার ফলে জাতিতে জাতিতে যে কলহের

ইহাতে অনেক ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ রাষ্ট্রের বিলুপ্ত হইবে

সৃষ্টি হইবে তাহা আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন করিতে পারে। উইল্‌সন বলিয়াছিলেন, আন্তর্জাতিক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই বিভিন্ন জাতিকে আত্মনির্ধারণের অধিকার দেওয়া উচিত। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে এই নীতি কার্যকর হইলে অনেক ঐক্যবদ্ধ

---

১ লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন, "The right of self-determination is a double-edged sword; it is and has been in the past a unifying force but it may be, and has recently become, also a disintegrating force."

বৃহৎ রাষ্ট্রের বিলুপ্ত ঘটিবে। তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইবে।

সপ্তমত, অনেক জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে বিভিন্ন জাতি নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে না তাহা নহে। বস্তুত এই রাষ্ট্রগুলি একটি জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা বেশী উন্নত। আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রেটবৃটেন প্রভৃতি রাষ্ট্র ইহা প্রমাণ করে।

পরিশেষে বলা যাইতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মনির্ধারণ নীতির প্রয়োগ করা উচিত। অনেক জাতি লইয়া গঠিত কোন রাষ্ট্রে যদি দেখা যায় যে একটি জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চাহে, অথবা ইহাদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ লাগিয়াই আছে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আত্মনির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করা উচিত। সর্বক্ষেত্রে জাতিতত্ত্ব (Theory of Nationality) রাষ্ট্র গঠনের সন্তোষজনক ভিত্তি নহে।

জাতীয় জনসমাজের অধিকার (Rights of Nationality)—একটি জাতীয় জনসমাজের প্রধান অধিকার হইল আত্মনির্ধারণের অধিকার। প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির সমন্বয় দেখিতে পাই। তবুও বিভিন্ন জাতির অন্যান্য অধিকার আছে। সেগুলি আলোচিত হইল :—

বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার

(ক) জাতীয় চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার প্রত্যেক জাতিকেই দেওয়া উচিত। রাষ্ট্র কখনই এমন আইন প্রয়োগ করিবে না যাহাতে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। ইহা মূলত জাতির বাঁচিয়া থাকিবার দাবি (Right to exist)।

ভাষারক্ষার অধিকার

(খ) একটি জাতীয় জনসমাজের আর একটি দাবি হইল ভাষারক্ষার অধিকার। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহার আছে। এই সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার যাহাতে টিকিয়া থাকে সেজন্য প্রত্যেক জাতিই চেষ্টা করে। ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা না থাকিলে এবং সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন না হইলে কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে না। সুতরাং সংখ্যা-গরিষ্ঠ জাতির কখনই সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভাষার উন্নতির পথের বাধার সৃষ্টি করা উচিত নহে, অথবা নিজেদের ভাষা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

সংখ্যালঘিষ্ঠদের আচার ও প্রথা রক্ষার অধিকার

(গ) সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিকে সর্বদাই স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার (right to retention of local laws and customs) অধিকার প্রদান করা উচিত। এই সামাজিক প্রথাগুলি জাতীয় জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। লীগ্ অব নেশন্‌স্ সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির এই অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। অবশ্য দেখিতে হইবে স্থানীয় আচার ও প্রথা যেন সমগ্র জাতীয় জীবনের ক্ষতির কারণ না হয়।

(ঘ) একটি রাষ্ট্রে সব জাতিরই আইনগত এবং রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার (right to legal and political equality) থাকা উচিত। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকই এই অধিকার দাবি করিতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের চোখে সকলেই সমান।

রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার

জাতীয়তাবাদের মূল্য ও ত্রুটি—জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও সভ্যতা (Value and limitations of the idea of Nationalism—ideal of Nationalism and Civilisation):

জাতীয়তাবাদ মূলত একটি অনুভূতি যাহা একটি জাতীয় জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে। এই অনুভূতিকে আমরা ভাবগত ঐক্য বলিতে পারি। শুধু মূলগত, ভাষাগত অথবা ধর্মগত ঐক্য থাকিলেই যে এই অনুভূতি আসে, তাহা নহে। এই অনুভূতি মূলত একটি মানসিক স্বজাত্যবোধ হইতে আসে। জাতীয়তাবাদের দুইটি দিক আছে। প্রথমটি হইতেছে প্রকৃত জাতীয়তাবাদ (True Nationalism), যাহা একটি জাতিকে অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইতে অথবা অপর জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রণোদিত করে না। এই প্রকার জাতীয়তাবোধ পরস্পরের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করে না; বরং ইহা পরস্পরকে আরও কাছে টানিয়া আনে। এই প্রকার জাতীয়তাবোধ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে এবং বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করে। আদর্শ জাতীয়তাবাদের মূলনীতি হইতেছে—'নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচিতে দাও।' নিজে বাঁচিবার জন্যই তখন যে কোন রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের সহিত ভাল সম্পর্কের সৃষ্টি করিতে হয়। কারণ, বর্তমান জগতে কোন জাতি অথবা কোন রাষ্ট্রই অন্যান্য জাতি অথবা অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সব রাষ্ট্রকেই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইতে হয়। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, বর্তমান জগতে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের উপর এত বেশী নির্ভরশীল হইয়াছে যে কোন একটি রাষ্ট্রে অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা অন্যান্য রাষ্ট্রের শান্তির পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে।[১]

প্রকৃত জাতীয়তাবাদ সভ্যতার অগ্রগতির পরিচায়ক, ইহা আন্তর্জাতিকতার পথ প্রশস্ত করে

যে জাতীয়তাবোধ কোন রাষ্ট্রকে পররাজ্য আক্রমণ করিতে দেয় না এবং সব জাতির সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে অনুপ্রাণিত করে, সেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্র যে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে। আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবোধের প্রকৃত মূল্য এইখানে। কারণ, প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইলে সব রাষ্ট্রেরই কল্যাণ হয়। প্রকৃত জাতীয়তাবোধ যেখানে বজায় থাকে, সেখানে প্রত্যেক জাতিই অপর জাতির কাছে একান্ত প্রয়োজনীয়।

---

১ "The world has become so interdependent that an unfettered will of a state may be fatal to the peace of other States"—Laski

কিন্তু জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় দিকটি বিবেচনা করিলে আমরা এই আদর্শের একটি ত্রুটিও দেখিতে পাই। অনেকক্ষেত্রেই আমরা জাতীয়বোধের বিকৃত (perverted) বিকাশ দেখিতে পাই। সেক্ষেত্রে শক্তিমদে মত্ত জাতিগুলি নিজেদের সাম্রাজ্যবাদের লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, যখন কোনও রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়, তখনই জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়।[১] বিকৃত জাতীয়তাবাদ হইতে যে সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়, তাহা সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপ একটি রাষ্ট্রকে পররাষ্ট্র আক্রমণ করিবার প্ররোচনা দেয়। এই আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করে। এই আধিপত্য বিস্তারের প্রথম পর্যায় হইল অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার। তারপর, ক্রমশ "বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে।" অর্থ নৈতিক অধিকার স্থাপনের পর শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে এবং নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার হয়; সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের শিল্পজাত সামগ্রীগুলির বিক্রয়করণের জন্য অথবা শিল্পোন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই উপনিবেশগুলিই পরে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়; অনেক সময় এই শক্তিগুলি সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করে,—যেমন দুর্বল জাতিগুলির উচিত উন্নত জাতিগুলির সংস্পর্শে আসিয়া নিজেদের উন্নত করা ইত্যাদি। অনেকক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে অর্থ সাহায্য দিয়াও বড় বড় রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই প্রকার বিকৃত জাতীয়তাবোধ এবং সাম্রাজ্যবাদ কখনই আন্তর্জাতিক অনুশাসনের সহিত সুসমঞ্জস নহে। আন্তর্জাতিকতা (Internationalism) এবং সাম্রাজ্যবাদের (Imperialism) মধ্যে সর্বদাই সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে গেলে একটি রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করিতেই হইবে এবং আক্রান্ত রাষ্ট্রকেও সর্বদাই আত্মরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখিতে হইবে। তাহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন হইয়া পড়ে। দেখা যাইতেছে আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবাদে ইহা একটি ত্রুটি। যদি "এক জাতি, এক রাষ্ট্র" নীতি অনুসৃত হয়, তবে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের (Nation-states) মধ্যে গোলমালের এবং কলহের আশঙ্কা থাকে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যতক্ষণ গ্রাম্যকলহ, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং দলগত হিংসা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের প্রকৃত বিকাশ হয় না, সভ্যতারও অগ্রগতি হয় না। অপর দিকে একই রাষ্ট্রে যদি বিভিন্ন জাতি থাকে তবে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার একটি ক্ষেত্র থাকে।

উগ্র জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত প্রতিবন্ধক

সভ্যতার অগ্রগতির

ইহা সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক

---

১ "As power extends, nationalism becomes transformed into imperialism."

কিন্তু ইহার আর একটি দিক আছে। যদি একটি জাতির ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেই জাতি যদি প্রকৃত জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়, তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রটি আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। অপরদিকে যদি বহু জাতির ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক কলহ ও অসহযোগিতা লাগিয়াই থাকে তবে, সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং বিশ্বশান্তির উপর ইহার খারাপ প্রভাব হইতে পারে। ভারতবর্ষে অনেক জাতির বাস। শক, হুন, পাঠান, মোগল এখানে এক দেশে লীন হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পূর্ণ সম্প্রীতি থাকায় ভারতবর্ষ প্রকৃত জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে পারিয়াছে এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিতে পারিয়াছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রকৃত জাতীয়তাবাদের লক্ষণ

আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠিবার একটি কেন্দ্র থাকা চাই এবং তাহা হইতেছে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্র (Nation-States)। সুতরাং যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ না হইতেছে ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না। একটির পরিণতি হইতেছে অপরটি। আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। জাতীয়তাবাদ গড়িয়া উঠে একটি জাতীয় জনসমাজ অথবা একটি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া উঠে বিভিন্ন এবং সমগ্র জনসমাজকে কেন্দ্র করিয়া। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান বিভিন্ন রাষ্ট্রকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনিয়া আন্তর্জাতিকতার সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির বাহ্যিক সীমা সম্বন্ধে চলিত ভ্রান্ত ধারণা আন্তর্জাতিকতার প্রসার লাভের প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করে। যখন সব রাষ্ট্রই বুঝিতে পারিবে যে আন্তর্জাতিক আইন অথবা আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান পালন করিয়া চলিলে কোন রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয় না, তখনই প্রকৃতভাবে আন্তর্জাতিকতার বিস্তৃতি হইবে। পারস্পরিক সদিচ্ছা এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সান্নিধ্যে না আসিতেছে, ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইতে পারে না। পঞ্চশীলের আদর্শ আন্তর্জাতিকতার প্রসারের খুবই সহায়ক।

আন্তর্জাতিকতার গুরুত্ব

Exercise

1. What is a nation ? Is India a nation ?

(জাতি কাহাকে বলে ? ভারত কি একটি জাতি ?) (৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা)

2. What are the elements of Nationality ? What are the essential factors that go create the consciousness of common nationality ?

(জাতীয় জনসমাজের উপাদান কি কি? একই জাতীয় জনসমাজের চেতনা সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয় উপাদান কি কি?) (৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা)

3. Is nationality a satisfactory basis of Modern States?

(জাতীয় জনসমাজের কি আধুনিক রাষ্ট্রগুলির সন্তোষজনক ভিত্তি?)

[**ইঙ্গিত:** এই প্রশ্নের উত্তরে 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' নীতির পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর।] (৫৫-৫৮ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the arguments for and against the principle: 'One Nation, One State'. ('এক জাতি, এক রাষ্ট্র'এই নীতির পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর।) (৫৫-৫৮ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the arguments for and against 'Mono-national States' and 'Poly-national States'. (এক জাতি লইয়া গঠিত একটি রাষ্ট্র এবং বহু জাতি লইয়া গঠিত একটি রাষ্ট্রের বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর।) (৫৫-৫৮ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the Rights of Nationalities.

(জাতীয় জনসমাজের অধিকারগুলি আলোচনা কর।) (৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা)

7. What is a nation? What is meant by the right of self-determination? (জাতি কাহাকে বলে? জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার বলিতে কি বোঝায়?) (H. S. 1967) (৫৪ পৃষ্ঠা; ৫৫ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the value and limitations of the ideal of nationalism.

(জাতীয়তাবাদ আদর্শের মূল্য এবং ত্রুটি আলোচনা কর।) (৫৯-৬১ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the relationship betren nationalism and civilisation.

(জাতীয়তাবাদের আদর্শ এবং সভ্যতার মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।)

সপ্তম অধ্যায় | রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র (Constitution of the state)

শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of a Constitution)—প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি শাসনতন্ত্র থাকে। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকার রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। অস্টিনের মতে শাসনতন্ত্র "সর্বোচ্চ সরকারের কাঠামো স্থির করে।"[১]

শাসনতন্ত্র কাহাকে বলে?

সরকার কিভাবে রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করিবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা এবং তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি হইবে অথবা নাগরিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের কি সম্পর্ক থাকিবে,—সবই শাসনতন্ত্র স্থির করিয়া দেয়। সেইজন্য ডাইসির মতে শাসনতন্ত্র হইতেছে সমুদয় নিয়মের সমষ্টি যেগুলি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের ভিতরে সার্বভৌম শক্তির বণ্টন অথবা কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে।[২]

সুতরাং দেখা যাইতেছে শাসনতন্ত্র সরকারের পক্ষে একটি মৌলিক নিয়ন্ত্রণী শক্তি, সরকারের ক্ষমতা ও ক্রিয়াকলাপ, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক, সরকারের স্বরূপ ইত্যাদি সবই কতিপয় লিখিত অথবা অলিখিত আইনের সমষ্টি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেই লিখিত ও অলিখিত আইনের সমষ্টি হইতেছে শাসনতন্ত্র।

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Constitutions)—শাসনতন্ত্রকে প্রধানত লিখিত (written) এবং অলিখিত (unwritten) এই দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। লিখিত শাসনতন্ত্রে সমুদয় বিধান একটি অথবা কয়েকটি দলিলের মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে। শাসনতন্ত্রের যখন যেরূপ সংশোধন করা হয়, তাহাও সেভাবে লিপিবদ্ধ হয়। এইজাতীয় শাসনতন্ত্র পূর্ব হইতেই একটি প্রতিনিধি সংসদ দ্বারা রচিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে আমরা লিখিত শাসনতন্ত্র দেখিতে পাই। অলিখিত শাসনতন্ত্র পূর্ব হইতেই কোন প্রতিনিধি সংসদ দ্বারা রচিত হয় না। এই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন প্রথা ও প্রচলিত নিয়ম এবং আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। ইংলণ্ডে আমরা অলিখিত শাসনতন্ত্র

শাসনতন্ত্র লিখিত অথবা অলিখিত হইতে পারে

---

১ "That which fixes the structure of the supreme government."

২ "A constitution is a product of all rules which directly or indirectly affect the distribution or the exercise of the sovereign powers in the state."—Dicey

দেখিতে পাই। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, লিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যেও প্রচলিত প্রথা ও নিয়মের ভিত্তিতে কতিপয় অলিখিত অংশ গড়িয়া উঠিতে পারে, এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রেও আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন অথবা শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন চুক্তি লিখিতভাবে থাকিতে পারে। ইংলণ্ডে ১২১৫ সালের মহাসনদ এবং ১৬৮৯ সালের বিল্ অব্ রাইটস্ (Bill of Rights) ইত্যাদি লিখিতভাবে শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিসভার কোন ব্যবস্থা নাই। অথচ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান কর্মসচিবগণ (Secretaries) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রিসভার ন্যায় কাজ করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে লিখিত শাসনতন্ত্রেও অলিখিত অংশ থাকিতে পারে। সুতরাং লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের পার্থক্যকে আমরা মূলগত পার্থক্য বলিতে পারি না। আবার, লিখিত শাসনতন্ত্র থাকিলেই যে সুপ্রীম কোর্ট আইনসভা রচিত আইনকে শাসনতন্ত্র বিরোধী বলিয়া বে-আইনীরূপে বাতিল করিতে পারে তাহা নহে। যদিও আমেরিকায় তাহা সম্ভবপর, অনেক দেশেই তাহা সম্ভবপর নয়। অনেকে মনে করেন, লিখিত শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের সব অধিকার এবং রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের সম্পর্ক লিপিবদ্ধ থাকে বলিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা অধিকতর সুরক্ষিত হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র অলিখিত; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্রিটিশজাতি পৃথিবীর যে কোন জাতি অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করে।

লিখিত শাসনতন্ত্রে ও অলিখিত অংশ থাকিতে পারে এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশ থাকিতে পারে

কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণভাবে লিখিত অথবা অলিখিত হওয়া উচিত নহে। তাহাতে জাতীয় অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। জাতীয় জীবনধারার পরিবর্তন হইলে তাহা দেশের শাসনতন্ত্রের রূপ পাওয়া উচিত যাহাতে শাসনতন্ত্র দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হইতে পারে।

শাসনতন্ত্র কখনই সম্পূর্ণভাবে লিখিত কিংবা অলিখিত হওয়া উচিত নহে

শাসনতন্ত্রকে আবার নমনীয় (Flexible) এবং অনমনীয় (Rigid) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অতি সহজেই যে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করা যায় তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলে। আবার, যে শাসনতন্ত্রের সংশোধন করা খুব সহজসাধ্য নহে এবং যথেষ্ট জটিল, তাহাকে অনমনীয় শাসনতন্ত্র বলে। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র খুবই নমনীয়। যে ভাবে সাধারণ আইন পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত হয়, সেভাবেই শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধানের সংশোধন এবং পরিবর্তন করা যায়। এইজন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু, আমেরিকার শাসনতন্ত্র অনমনীয়, এবং ইহার সংশোধন করিলে একটি বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কংগ্রেস সভার দুই পক্ষের মোট সদস্যদের ⅔ অংশকে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের কোন

শাসনতন্ত্র নমনীয় কিংবা অনমনীয় হইতে পারে

বৃটেনের নমনীয় এবং আমেরিকায় অনমনীয় শাসনতন্ত্র দেখা যায়

প্রস্তাব সমর্থন করিতে হইবে, অথবা বিকল্পে পঞ্চাশটি রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ অন্তত বত্রিশটি রাজ্য দ্বারা এই পরিবর্তনের জন্য বিশেষ একটি সভা (Convention) আহ্বান করিয়া প্রস্তাবটি সমর্থন করাইতে হইবে। এইরূপে সমর্থিত পরিবর্তনের প্রস্তাব ছত্রিশটি রাজ্যের আইনসভা অথবা আহূত সভায় উপস্থিত $\frac{3}{4}$ সংখ্যক সদস্য দ্বারা সমর্থিত হইলে শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত হইবে। এই পদ্ধতি ইংলণ্ডে অনুসৃত পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক জটিল। ইংলণ্ডে সাধারণ আইনপ্রণয়ন-পদ্ধতির মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা হয়।

ভারতের শাসনতন্ত্র খুব নমনীয় অথবা খুব অনমনীয় নহে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কোন সংশোধন করিতে হইলে ঐ সংশোধন প্রস্তাবটিকে একটি বিলের আকারে পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিতে হয়। পার্লামেণ্ট সভার উভয় পরিষদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে বিলটি গৃহীত হইবে। কিন্তু এই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য আবার পার্লামেণ্টের উপস্থিত ও অনুপস্থিত সব সদস্যসংখ্যার অর্ধেকের অধিক হওয়া চাই। এইভাবে আইনসভা কর্তৃক বিলটি অনুমোদিত হইবার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য এই অনুমোদিত বিলটিকে সম্মতি প্রদান করিবার পর শাসনতন্ত্র সংশোধিত হয়।

ভারতের শাসনতন্ত্র খুব নমনীয় অথবা খুব অনমনীয় নহে

অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব (Permanence)। এই প্রকার শাসনতন্ত্রের বিধানগুলি লিখিত এবং স্পষ্ট। এইগুলিকে আমরা সহজে পরিবর্তন করিতে পারি না। জনগণের মৌলিক অধিকার এবং স্বার্থ অনমনীয় শাসনতন্ত্রে সুরক্ষিত হয় এবং জনগণেরও শাসনতন্ত্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাধারণত অনমনীয় শাসনতন্ত্র দেখা যায়; কারণ বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ অনমনীয় শাসনতন্ত্রেই বিশেষ উপযোগী। অবশ্য ভারতীয় শাসনতন্ত্র খুব নমনীয় অথবা খুব অনমনীয় নয়। অনমনীয় শাসনতন্ত্রে শাসকগণ নিজেদের স্বার্থে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারেন না। কিন্তু অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি হইল এই যে জাতীয় প্রগতির স্বার্থে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায় না। তাহাতে প্রগতিশীল জনগণের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। জাতীয় জীবনের স্বার্থের সহিত যদি শাসনতন্ত্রের প্রকৃত সমন্বয় না থাকে, তবে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র ব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্ত্র থাকে

কিন্তু, একদিক হইতে বিচার করিলে অনমনীয় এবং নমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে খুব পার্থক্য নাই। অনমনীয় শাসনতন্ত্রে প্রচলিত প্রথা গড়িয়া উঠিতে পারে এবং তাহা শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের সামিল হইতে পারে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী একটি মন্ত্রিসভা গড়িয়া উঠিয়াছে যদিও শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিসভা গঠনের কোন ব্যবস্থা নাই। যদি শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়া মন্ত্রিসভার সৃষ্টি

নমনীয় এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্রের পার্থক্য সর্বদা স্পষ্ট নহে

করিতে হইত, তবে ইহা একরূপ অসম্ভব হইত। আবার আদালতের সিদ্ধান্তের সাহায্যেও শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং কাঠামোর দিক হইতে অনমনীয় এবং নমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট নহে। তবে সুবিধা-অসুবিধার দিক হইতে বিবেচনা করিলে নমনীয় এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে।

লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা-অসুবিধা (Relative merits and demerits of a written and an unwritten Constitution) —শাসনতন্ত্রগুলিকে সাধারণত লিখিত ও অলিখিত এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে, ইহা শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক অথবা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্টভাবে লিখিয়া দেয়। ইহাতে সরকারের ক্রিয়াকলাপের বিশেষ সুবিধা হয় এবং জনসাধারণও নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকে। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পক্ষে লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র শাসনতন্ত্রই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতা এবং কাজের সীমারেখা নির্ধারণ করে। কিন্তু লিখিত শাসনতন্ত্র যদি অনমনীয় হয় তবে ইহার প্রধান দোষ হইল এই যে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে অথবা জাতীয় প্রগতির স্বার্থে ইহার দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়; তাহাতে দেশে শাসনতান্ত্রিক গোলযোগের (constitutional crisis) আশঙ্কা থাকে।

লিখিত শাসনতন্ত্রে সরকার এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক পরিষ্কার থাকে

অলিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে এই যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এবং জাতীয় প্রগতির স্বার্থে এই প্রকার শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায়। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে শাসনতন্ত্রের সমন্বয় ঘটিলে জাতীয় প্রগতির পথ সুগম হয়। ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। কিন্তু, অলিখিত শাসনতন্ত্রের একটি দোষ আছে। তাহা হইতেছে, এই প্রকার শাসনতন্ত্রকে খুব সহজেই পরিবর্তন করা যায় বলিয়া ইহার সর্বদা স্থায়িত্ব (stability) নাও থাকিতে পারে। সরকার নিজের স্বার্থে অথবা জনমতের দাবিতে যখন খুশী তখনই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারেন। তাহাতে শাসনতন্ত্রের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা এবং আস্থা কমিয়া যায় এবং শাসনতন্ত্রেরও প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। অলিখিত শাসনতন্ত্রগুলি প্রধানত প্রচলিত বিধানে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া ইহার বিভিন্ন বিধান কখনই সুস্পষ্ট হয় না। তাহাতে বিধি-নিষেধের অনেক রকম ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং জনগণের স্বার্থ কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা (unitary system of government) অলিখিত শাসনতন্ত্র কর্তৃক চালিত হইতে পারে,—যেমন, ইংলণ্ডে

অবস্থার পরিবর্তনের সহিত অলিখিত শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হয়

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় অলিখিত শাসনতন্ত্র থাকিতে পারে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে ইহা প্রয়োগ করা অসুবিধাজনক

ইহা হইয়াছে। কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অলিখিত শাসনতন্ত্র খুবই অনুপযোগী। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে সম্পর্ক শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকা উচিত।

Exercise

1. What do you mean by a constitution ? Distinguish between a written constitution and an unwritten constitution. What are their respective merits and demerits ?

(শাসনতন্ত্র বলিতে কি বুঝ ? লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। তাহাদের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ?) (৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা ; ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা)

2. Distinguish between a rigid constitution and a flexible constitution as India a rigid constitution. Give reasons for your answer.

(নমনীয় এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। ভারতের শাসনতন্ত্র অনমনীয় কি ? যুক্তিসহ তোমার উত্তর প্রদান কর।) (৬৪-৬৬ পৃষ্ঠা)

3. "The distinction between a written and an unwritten constitution is often illusory." Discuss the Statement. ("লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য প্রায়ই অলীক"—এই উক্তিটির আলোচনা কর।) (৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা)

অষ্টম অধ্যায়	সরকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Governments)

অতি প্রাচীনকাল হইতেই সরকারের শ্রেণীবিভাগ আমরা দেখিতে পাই। এরিস্টটল স্বাভাবিক এবং বিকৃত এই দুই ধরনের সরকারের কথা বলিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, তিনি শাসন-পরিচালকের সংখ্যার ভিত্তিতে স্বাভাবিক এবং বিকৃত সরকারগুলিকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন। নিম্নলিখিতভাবে এরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ দেখানো যাইতে পারে।

শাসক পরিচালকের সংখ্যা	সরকারের স্বাভাবিক রূপ	সরকারের বিকৃত রূপ
এক ব্যক্তি	রাজতন্ত্র (Monarchy)	স্বৈরাচার (Tyranny)
অল্প কতিপয় ব্যক্তি	অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)	ধনিকতন্ত্র (Oligarchy)
বহু ব্যক্তি	গণতন্ত্র (Polity)	বিকৃত গণতন্ত্র (Democracy)

আধুনিককালে আমরা নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধরনের সরকার দেখিতে পাই:—(ক) রাজতন্ত্র (Monarchy), (খ) অভিজাততন্ত্র (Aristocracy), (গ) গণতন্ত্র (Democracy), (ঘ) একনায়কতন্ত্র (Dictatorship), এবং (ঙ) আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)। এরিস্টটলের আমলে গণতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ (Direct); বর্তমানে আমরা পরোক্ষ গণতন্ত্র দেখিতে পাই। গণতন্ত্র আবার দুইপ্রকারের হইতে পারে, ইহা রাষ্ট্রপতি-শাসিত প্রজাতন্ত্র হইতে পারে অথবা মন্ত্রিসভা কর্তৃক শাসিত হইতে পারে।

আধুনিক শ্রেণীবিভাগ

রাজতন্ত্র ইংলণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রকে আমরা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) বলিতে পারি। গণতান্ত্রিক সরকারগুলি আবার কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) অথবা এককেন্দ্রিক (Unitary) হইতে পারে। ডক্টর লিকক (Dr. Leacock) সরকারকে গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং গণতন্ত্রকে (১) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র (২) এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং (৩) মন্ত্রিসভা-চালিত ও রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার—এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

রাজতন্ত্র (Monarchy)—রাজতন্ত্র দুই প্রকারের হইতে পারে; যথা, অবাধ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional

Monarchy)। রাজা চতুর্দশ লুইয়ের আমলে ফ্রান্সে অবাধ রাজতন্ত্র ছিল। চতুর্দশ লুই বলিতেন "I am the state" তাঁহাকে "Grand Monarch" বলা হইত। আজকাল অবাধ রাজতন্ত্র সাধারণত দেখা যায় না। তবে সৌদী আরব, ইথিওপিয়া, নেপাল, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে রাজতন্ত্র বিশেষ শক্তিশালী। কিছুদিন আগেও মিশরের ভূতপূর্ব রাজা ফারুক অবাধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডে আমরা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র দেখিতে পাই। অবাধ রাজতন্ত্র গণ-স্বাধীনতার পরিপন্থী। রাজা সেক্ষেত্রে যাহা খুশী তাহাই করিতে পারেন। অবশ্য রাজা যদি ভাল লোক অথবা ভাল শাসক হন তবে হয়ত রাজ্যের শাসনব্যবস্থা উন্নত হইতে পারে ;—যেমন রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট্ এবং অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় যোশেপ (Joshep II) কল্যাণকারক স্বৈরতন্ত্র (Benevolent Despotism) প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে অবাধ রাজতন্ত্র হইতেছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরনের সরকার। শুধু অবাধ রাজতন্ত্রই নহে, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেও আমরা কতিপয় ত্রুটি দেখিতে পাই। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, ভাল সরকার কখনই স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প নয় ("Good government is no substitute for self-government")। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেও নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা ব্যাহত হয়। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে সরকারের যতই সংস্কার করা হোক না কেন, সরকার মূলত রাজতন্ত্রই থাকিয়া যায়। তাহা ছাড়া, রাজতন্ত্র যে কোন সময়েই স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে। রাজতন্ত্রে প্রত্যেক রাজাই যে সুদক্ষ শাসক হইবেন, ইহার কোনও নিশ্চয়তা নাই ; রাজার দিক হইতে বিবেচনা করিলেও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ, এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই শাসনকাজ পরিচালনা করে।

অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)—গ্রীক-ভাষায় "Aristos" বলিতে বুঝায় "সর্বশ্রেষ্ঠ"। দেশের শাসনব্যবস্থা যখন শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের কয়েকজন লোক কর্তৃক পরিচালিত হয়, তখন এরিস্টটলের মতে এই শাসনব্যবস্থাকে অভিজাততন্ত্র বলা হয়। কিন্তু এই ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই অল্প। যখনই অল্প কয়েকজন শাসক (যাঁহারা সরকার পরিচালনা করেন) নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হন, তখন এই ধরনের শাসনব্যবস্থাকে ধনিকতন্ত্র (Oligarchy) বলা হয়। অভিজাততন্ত্র শাসকের সংখ্যার উপর নহে, গুণের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে। আধুনিককালে অভিজাততন্ত্রের স্থান নাই, অভিজাততন্ত্রের স্থান গ্রহণ করিয়াছে গণতন্ত্র।

গণতন্ত্র (Democracy)—গণতন্ত্র বলিতে সাধারণত বুঝায় জনগণের সরকার। গ্রীক শব্দ "Demos" হইতে "Democracy" কথাটি আসিয়াছে। "Demos" কথাটির অর্থ হইল "জনসমূহ"। সরকার হিসাবে গণতন্ত্র হইতেছে

গণতন্ত্রের অর্থ

"জনগণের সরকার, জনগণ কর্তৃক গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার" ("Government of the people, by the people and for the

people")। গণতন্ত্রকে একটি জীবনাদর্শ রূপেও গণ্য করা হয়; ইহার একটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক আছে।

গণতান্ত্রিক সরকার বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি সরকার যেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরকার গঠনে এবং পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। প্রাচীনকালে গ্রীসে শহর-রাষ্ট্রগুলি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের (Direct Democracy) ভিত্তিতে পরিচালিত হইত। বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডে আংশিকভাবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আমরা দেখিতে পাই। অন্যান্য সব গণতান্ত্রিক দেশই পরোক্ষ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ দেশের সাধারণ নির্বাচনে ভোট প্রদান করিয়া এবং সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিয়া সরকারের গঠনে ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। প্রকৃত গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছা এবং জনমতই দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করে; কোনও সরকারই জনসাধারণের ইচ্ছাকে অবহেলা করিতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকারে সকলেরই সমান সুযোগ-সুবিধা থাকে এবং প্রত্যেকেই নিজেদের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী সরকার গঠনে ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের মধ্যে যে সামর্থ্যের পার্থক্য থাকিবে না, তাহা নহে। গণতান্ত্রিক সরকার সকলকেই সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করে যাহাতে নাগরিকদের কর্ম-নৈপুণ্যের বৈষম্য যথাযথ ক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়। আধুনিককালে আমরা পরোক্ষ গণতন্ত্র দেখিতে পাই। পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণের ভোটে আইন পরিষদ গঠিত হয়। নির্বাচন শেষ হইলে যে রাজনৈতিক দল আইন পরিষদে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই রাজনৈতিক দলের নেতা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের মন্ত্রিসভাকে নিজের কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি (সাধারণত পরোক্ষভাবে) নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কোনও রাষ্ট্র প্রকৃতই গণতান্ত্রিক কিনা তাহা বিচার করিবার উপায় আছে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার স্বাধীন মত প্রচারের, বিরোধী দল গঠনের এবং নাগরিকদের সরকারী কাজে সমালোচনা করিবার অধিকার স্বীকার করে। প্রকৃত গণতন্ত্রে জনসাধারণ যে কোন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গণতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তন করিতে পারে; সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের সমান সুযোগ-সুবিধা থাকে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপালন সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকেরই ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে।

গণতন্ত্রের গুণ (Merits of Democracy)—গণতন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার প্রধান কারণ হইল, গণতান্ত্রিক সরকারকে সর্বদাই ইহার ক্রিয়াকলাপের জন্য জনসাধারণের নিকটে দায়ী থাকিতে হয়। দায়িত্ব না থাকিলে কোন সরকারই উৎকৃষ্ট সরকার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। গণতন্ত্রে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা থাকে না এবং জনগণ কর্তৃক জনগণের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক সরকারে জনসাধারণের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়। কোন সরকারের উপযোগিতা নির্ভর করে সেই সরকার কতটা ইহার লক্ষ্যে পৌছিতে পারে তাহার উপর। গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ করা। গণতন্ত্রের সমর্থকগণ দাবি করেন যে জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ একমাত্র গণতান্ত্রিক সরকারই সাধন করিতে পারে। এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণই সেইগুলি রক্ষণের জন্য সতর্ক থাকে। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকই তাহার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার সুযোগ পায়।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশ ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই তখন রাষ্ট্রের একটি একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই মনোভাব নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়াইয়া দেয় এবং ইহাতে দেশের শাসনব্যবস্থা উৎকর্ষ লাভ করে।

চতুর্থত, গণতন্ত্র নাগরিকদের স্বাধীনতা এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নাগরিকগণ সুযোগ-সুবিধা পায় বলিয়া গণতন্ত্রে মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ সুদৃঢ় হয়।

পঞ্চমত, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিকগণ, কর্তব্যবোধে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। গণতন্ত্র জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করে, তাহাদের মানসিক বৃত্তিগুলিকে উন্নত করে, সরকারী কাজে তাহাদের উৎসাহ বাড়াইয়া দেয় এবং শাসনকাজে তাহাদের অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিয়া তাহাদের স্বদেশপ্রেম বাড়াইয়া দেয়।

সর্বশেষে, গণতন্ত্রে জনপ্রিয় সরকার গঠন হওয়ায় দেশ বৈপ্লবিক গোলযোগের সম্ভাবনা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে মুক্ত থাকে। সরকারকে সর্বদাই জনগণের নিকট নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকিতে হয়। জনগণও নিজেদের কল্যাণের জন্য গঠনমূলক কাজ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

গণতন্ত্রের দোষ (Demerits of Democracy)—গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল ইহা একদল অজ্ঞ এবং অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত হয়। কিন্তু এই সমালোচনা যে সর্বদাই সত্য তাহা নহে। গণতন্ত্রের পরিচালনভার বর্তমানকালে প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের নির্বাচন প্রতিনিধি এবং তাহাদের মধ্য হইতে গঠিত মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত হয়। তাহারা প্রত্যেকেই যে অযোগ্য এবং অজ্ঞ তাহা নহে। যদি গণতন্ত্র অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক শাসিত হইত, তবে ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে আমরা গণতন্ত্রের সাফল্য দেখিতে পাইতাম না। গণতন্ত্র মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির সহায়ক।

গণতন্ত্রের আর একটি দোষ হইতেছে, ইহা শাসকের গুণ অপেক্ষা সংখ্যার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে।

দ্বিতীয়ত, স্যার হেনরি মেইন প্রমুখ রাজনীতিবিদ্‌গণ মনে করেন, গণতন্ত্রে

স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অনেক সময়েই গণতান্ত্রিক সরকারকে জনসাধারণের বিপ্লবাত্মক ক্রিয়াকলাপের ফলে ক্ষমতাচ্যুত হইতে দেখা গিয়াছে।

তৃতীয়ত, গণতান্ত্রিক সরকারের কর্মদক্ষতাও যে খুব বেশী থাকে তাহা নহে। গণতান্ত্রিক সরকারের অজ্ঞ ভোটারগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। সর্বদাই যে উপযুক্ত প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হন তাহা নহে। তাহা ছাড়া, মুষ্টিমেয় কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধিই (সাধারণত মন্ত্রিসভা) পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত শাসনক্ষমতা কার্যকর করেন। আইনসভার ভিতরের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংখ্যাধিক্যের জোরে সংখ্যালঘুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ইহাতে দেশের জনসাধারণের একটি অংশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

চতুর্থত, গণতন্ত্রের শাসকগণ যে সর্বদাই শাসিতের নিকট প্রকৃতপক্ষে দায়ী থাকেন তাহা নহে। যদিও শাসনব্যবস্থা অনুযায়ী পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা নিজের কাজের জন্য আইনসভার সদস্যগণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জনসাধারণের কাছে দায়ী তবুও শুধু মাত্র দলীয় রাজনীতি প্রসূত সংখ্যাধিক্যের জোরে মন্ত্রিগণ এই দায়িত্বের সম্পূর্ণ মর্যাদা অনেক ক্ষেত্রেই দেন না। এই দায়িত্বশীলতা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করিবার মত উপযুক্ত পন্থারও অভাব দেখা যায়।

পঞ্চমত, স্যার হেনরি প্রমুখ চিন্তানায়কগণের মতে গণতন্ত্র সাংস্কৃতিক উন্নতির এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। কলা, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের দিকে গণতান্ত্রিক সরকারগুলি প্রায়ই উদাসীন থাকে। সাধারণ লোক লইয়াই গণতন্ত্র গঠিত হয়। এই রকম বলা হয় যে সাধারণ লোকের ত্রুটিগুলি সমস্ত সামাজিক জীবনকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং অসাধারণ ব্যক্তিদের গুণগুলি বিনাশ করে।

ষষ্ঠত, গণতান্ত্রিক সরকারে প্রায়ই ব্যয়বাহুল্য দেখা যায়। তাহা ছাড়া, গণতন্ত্রে জনসাধারণের নিয়মানুবর্তিতাও অল্প থাকে। লাস্কির মতে গণতান্ত্রিক সরকার মূলত ধনতান্ত্রিক। কারণ প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের সরকার মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের দ্বারা শাসিত হয় এবং তাঁহারা প্রায়ই ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত হন।

সর্বশেষে, গণতান্ত্রিক সরকারে আইন-প্রণয়নে প্রায়ই বিলম্ব ঘটে। কারণ কোন আইন প্রণীত হইবার পূর্বে বিভিন্ন কমিটি একটি বিলের খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ইহাতে আইন-প্রণয়ন করিতে অনেক দেরী হয়। রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলেও গণতান্ত্রিক সরকারের কাজ-কর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং সেক্ষেত্রে অন্তত একজনের কর্তৃত্ব (যেমন, রাষ্ট্রপতির) সাময়িকভাবে মানিয়া চলিতে হয়। শুধু আইন-প্রণয়নই নহে সরকারের সাধারণ নীতি নিরূপণ করার ব্যাপারেও গণতান্ত্রিক সরকারে একনায়কতন্ত্রের তুলনায় যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া থাকে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের উপায় (Conditions for the success of Democracy)—গণতন্ত্রের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিতে পারে। তবুও বর্তমানে গণতন্ত্রকেই আদর্শ সরকার মনে করা হয়। সেইজন্য গণতন্ত্রের সাফল্য কিভাবে হইতে পারে, তাহা আমাদের জানা উচিত। জন্ স্টুয়ার্ট মিলের মতে জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। তিনি মনে করেন, যদি গণতন্ত্রকে সফল করিতে হয় তবে "(১) জনসাধারণের গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিবার মত ইচ্ছা ও ক্ষমতা রাখিতে হইবে ; (২) তাহাদিগকে গণতন্ত্র বজায় রাখিবার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে এবং (৩) তাহাদিগকে নিজেদের কর্তব্য পালনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা রাখিতে হইবে এবং যদি তাহাদের অধিকারগুলি বিপদের সম্মুখীন হয় তবে সেগুলি রক্ষা করিতে হইবে।"

উপরি-উক্ত সর্তগুলি ছাড়া গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য নিম্নলিখিত সর্তগুলি থাকা উচিত। প্রথমত, জনমতকে সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে। চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য। জনমত যে শুধু সতর্কই থাকিবে তাহা নহে। জনমত খুব দৃঢ় হওয়া চাই যাহাতে ইহা সরকারের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে। নাগরিকদের আলস্য এবং উদাসীনতা গণতান্ত্রিক জীবন বিকাশের প্রতিবন্ধক। তৃতীয়ত, সংখ্যালঘুদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি, যেমন, সংখ্যাগরিষ্ঠদের মানিয়া লইতে হইবে, সেই প্রকার সংখ্যালঘুদেরও উচিত আইনসভায় সংখ্যাধিক্যের অভিমত অনুযায়ী প্রণীত আইন ও বিধিনিষেধগুলি পালন করা। চতুর্থত, অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা না হইলে কখনই গণতন্ত্র সফল হয় না। জনসাধারণের মধ্যে আয় ও ধনের বৈষম্য ক্রমশ কমাইয়া ফেলা উচিত এবং সকলকেই সমান অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত। তবেই গণতন্ত্রের সাফল্যের পথ সুগম হইবে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলি গণতান্ত্রিক সরকারও অনুসরণ করিতে পারে। জনসাধারণের যাহা কিছু ভাল ও সুন্দর, তাহার যাহাতে উপযুক্ত বিকাশ হয়, সেদিকে সরকারের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ, গণতন্ত্র শুধু একটি সরকারই নহে, ইহা সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের একটি পন্থা (a way of life)।

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)—একনায়কতন্ত্রে একজন নেতার হাতে দেশের শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। একনায়কতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র এক জিনিস নহে। একনায়কতন্ত্রে শুধুমাত্র একজন নায়কের উপর দেশের শাসনভার ন্যস্ত থাকে, তাহাই নহে,—এই প্রকার শাসনব্যবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে একজাতি ও একরাষ্ট্র থাকে। একনায়কতন্ত্রে রাজনৈতিক দল মাত্র একটিই থাকে এবং সেই দলের নেতাই নায়ক নির্বাচিত হন। একজন শাসক লইয়া গঠিত রাষ্ট্রকেই "Totalitarian State" বলা হয়। বর্তমানে সংযুক্ত আরব যুক্তরাষ্ট্রে আমরা আরবজাতিকে নাসেরের একক নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে দেখিতেছি। স্পেন পর্তুগালেও আমরা একনায়কতন্ত্র দেখিতে পাই। পাকিস্থানেও আয়ুব খাঁ প্রকৃতপক্ষে একজন একনায়ক। হিটলারের

আমলে জার্মানী এবং মুসোলিনীর আমলে ইটালি একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীন ছিল। হিটলার কর্তৃক প্রবর্তিত একনায়কতন্ত্রকে নাৎসীবাদ (Nazism) এবং মুসোলিনী কর্তৃক প্রবর্তিত একনায়কতন্ত্রকে ফ্যাসীবাদ (Fascism) বলা হইত। একনায়কতন্ত্র মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান এবং রাষ্ট্রের যিনি প্রধান, তিনি রাষ্ট্রের সব রকম শক্তি প্রয়োগ করেন এবং নিজের ইচ্ছাকেই সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একনায়কতন্ত্রে দলের নেতা নাগরিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রিত করেন।

একনায়কতন্ত্রে জনগণের সহযোগিতা ও সক্রিয় ভূমিকা থাকে না

একনায়কতন্ত্রে শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের সহযোগিতা এবং সক্রিয় ভূমিকা থাকে না। জনসাধারণের পক্ষ হইতে একনায়কই নিজের ইচ্ছানুযায়ী শাসনকাজ পরিচালনা করেন। একনায়কতন্ত্রের বিশেষ গুণ হইতেছে তিনটি। প্রথমত, গণতন্ত্র অপেক্ষা একনায়কতন্ত্র অনেক বেশী কর্মকুশল। একনায়কের ইচ্ছার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে বলিয়া তিনি সহজেই শাসননীতি নির্ধারণ করিয়া তাহা কার্যকরী করিতে পারেন। বহুজনের মতামত প্রয়োজন হয় না বলিয়া সরকারের বিভিন্ন নীতি সুদৃঢ়ভাবে কার্যকরী করা একনায়কের পক্ষে সম্ভবপর। দ্বিতীয়ত, একনায়কতন্ত্রে সরকারী কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়। ইহাতে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণও অত্যন্ত অল্প। তৃতীয়ত, গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করিলেও সরকারী কাজের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে খুবই অজ্ঞ। একনায়কতন্ত্রে সাধারণ লোকের শাসনকাজে কোনও হাত থাকে না। যদি একনায়কের উদ্দেশ্য সাধু হয় এবং তিনি যদি বিশেষ কর্মক্ষম থাকেন তবে দেশের শাসনব্যবস্থা ভালভাবেই পরিচালিত হয়। একনায়কতন্ত্রে জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হয়। ইতিহাসের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই একনায়কতন্ত্রে যে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ থাকে না তাহা নহে। রাশিয়ায় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু, সেখানে একনায়ক উত্তরাধিকারসূত্রে নির্বাচিত হন না, দলীয় নেতাই একনায়ক হন। আধুনিককালের গণতন্ত্রেও সরকার পক্ষের দলীয় নেতার নির্দেশেই সব কিছু পরিচালিত হয়। একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল ইহা নাগরিকদের বুদ্ধি-বৃত্তি বিকাশের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ প্রতিরোধ করিয়া একনায়কতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করে। দ্বিতীয়ত, একনায়কতন্ত্রে উগ্র জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদই একটি রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করিতে প্রণোদিত করে। ইহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্ট হয়। ইটালী এবং জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদের ইহা একটি প্রধান দোষ ছিল এবং এই কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়ে। তৃতীয়ত, দেশের নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ যে একনায়ক সর্বদা বুঝিতে পারেন তাহা নহে ; তাহা ছাড়া, গণতন্ত্র যে সর্বদাই একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা কম কর্মকুশল তাহা নহে।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য (Distinction between Democracy and Dictatorship)—গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। গণতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী,—কিন্তু, একনায়কতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ বিশ্বাস করে না। একনায়কতন্ত্র সমগ্র জাতি এবং রাষ্ট্রকে একদৃষ্টিতে দেখে না। রাষ্ট্রের অধিনায়কই সর্বেসর্বা। দ্বিতীয়ত, একনায়কতন্ত্রে সংখ্যালঘুগণ কখনই নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে পারে না। গণতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে এবং প্রত্যেক দলই সরকার গঠন করিবার চেষ্টা করিতে পারে। গণতন্ত্রে বিরোধী দলগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দলগুলি সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করিয়া দেশের শাসনব্যবস্থা যাহাতে সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় সেইজন্য চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু, একনায়কতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে না,—শুধু একটি দলই থাকে। একনায়কতন্ত্রে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির শাসনব্যবস্থা হইতে পারে ; যেমন, হিটলারের আমলে জার্মানীতে হইয়াছিল। আবার সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একদলীয় একনায়কতন্ত্র দেখিতে পাই। কোন কোন দেশে সামরিক নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্র দেখা যায় ; যেমন, আমরা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানে দেখিয়াছিলাম। সরকারের সমালোচনা করিবার কাহারও অধিকার থাকে না বলিয়া জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধেও সরকার নিজের নীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে কিছু কিছু অবদান থাকে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কিন্তু, একনায়কতন্ত্রে খুব কঠোরভাবে দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এজন্য জনমতকে অনেকক্ষেত্রে পদদলিত করা হয়। গণতন্ত্রে যে মন্ত্রিসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় না, তাহা নহে। কিন্তু গণতন্ত্রে দেশের শাসকগণকে আইনসভায় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের কাছে নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকিতে হয়। দায়িত্বশীলতাই সরকারের উৎকর্ষ সূচিত করে। একনায়কতান্ত্রিক সরকারকে কাহারও নিকট নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করিতে হয় না। গণতন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই স্বাধীন নির্বাচন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ইহাদের স্বাধীন চিন্তাধারা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং জনমতের প্রাধান্য। অপরদিকে একনায়কতন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই মূল্যহীন ভোটাধিকার (যেমন, পাকিস্তানে দেখা যাইতেছে), একদলীয় শাসন, একনায়কের একাধিপত্য এবং রক্তাক্ত নীতি। মূলত, এই দুইটি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ পরস্পরের বিপরীত। কর্মকুশলতার দিক হইতে বিচার করিলে একনায়কতন্ত্র অধিকতর কর্মকুশল হইতে পারে যদি একনায়কের উদ্দেশ্য সর্বদাই সাধু হয়। সরকারের ভালমন্দ পরিচয় নির্ভর করে ইহা কতটা রাষ্ট্রের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছিতে পারে তাহার উপর। জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ যাহাতে অর্জিত করা যায় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করাই উৎকৃষ্ট সরকারের লক্ষণ। সেইদিক হইতে বিচার করিলে গণতন্ত্রের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক শাসন (constitutional rule) একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর ভাল।

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Cabinet or Parliamentary Form of Government and the Presidential or Non-Parliamentary Form of Government)—গণতান্ত্রিক সরকারগুলি কোন সময়ে মন্ত্রিসভা কর্তৃক চালিত হয়, আবার কোন সময়ে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চালিত হয়। মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের একজন নামে মাত্র প্রধান (Titular Head) থাকেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধরনের সরকারের প্রধান একজন রাষ্ট্রপতিও হইতে পারেন। যেমন, ভারতে মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার থাকিলেও রাষ্ট্রপতিই শাসন-বিভাগের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। আইনসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতাকেই রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। মন্ত্রিসভা তাহার বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে এবং কোন সময় আইনসভার অনাস্থাভাজন হইলে পদত্যাগ করে। এইজন্য মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারকে দায়িত্বশীল সরকার বলা হয়। এই ধরনের সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ (Separation of Powers) হয় না, এবং মন্ত্রিসভা ও আইনসভা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল থাকে। ইদানীংকালে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় সরকারের এককেন্দ্রিকতার দিকে একটি ক্রমবর্ধমান ঝোঁক দেখা যায়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে আমরা এককেন্দ্রিক সরকার দেখিতে পাই। ভারতবর্ষে সরকারের কাঠামোর দিক হইতে বিচার করিলে ইহাকে যদিও যুক্তরাষ্ট্রীয় বলা হয় তবুও কর্মক্ষেত্রে ইহার এককেন্দ্রিকতার দিকে একটি ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারে বংশানুক্রমে কেহই রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে থাকেন না। এই ধরনের সরকারে রাষ্ট্রপতি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্ত্র থাকে এবং শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসন-বিভাগ (Executive) আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল অথবা ইহার কর্তৃত্বাধীন নহে। আমেরিকায় আমরা এই ধরনের শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া শাসন-বিভাগের কাজ চালান।

এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সভ্যগণ আইনসভার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস) সদস্য নহেন এবং ইহার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী নহেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের নিয়োগ করেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের বরখাস্ত করিতে পারেন। মন্ত্রিসভা নিজের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছেই দায়ী থাকেন। যদিও রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়, তবুও শাসন-বিভাগ ও আইনসভা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। যেমন, সরকারের শাসন-বিভাগ যে বাজেট অনুযায়ী টাকা খরচ করে সেই বাজেট অনুমোদন করিবার ক্ষমতা হইতেছে আইনসভার।

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারগুলি অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্রীয়। এইগুলির লিখিত

শাসনতন্ত্র থাকে এবং ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়। রাষ্ট্রের প্রধান যদি শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী মারাত্মক অপরাধ করেন এবং শাসনতন্ত্র অমান্য করেন, তবে একটি বিচার ব্যবস্থার সাহায্যে তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি পদ হইতে সরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি শুধু নামেমাত্র রাষ্ট্রের প্রধান নহেন। জনগণই রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাচিত করেন এবং তিনি প্রকৃতই দেশের শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারে একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা গণতন্ত্রের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের দোষগুণ (Merits and Demerits of a Cabinet Government)—এই ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইতেছে এই যে ইহাতে দেশের শাসন-বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। মন্ত্রিগণ জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাহারা আইন পরিষদের নিকট নিজেদের কাজকর্মের জন্য দায়ী থাকেন। ইহাতে সরকারের ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতা এবং জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। মন্ত্রীদের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়া সম্ভব নহে। কারণ, তাঁহাদের কার্যকাল নির্ভর করে আইন-পরিষদের সদস্যদের আস্থাভাজন হইয়া থাকার উপর। দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিগণ দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আইনসভায় নির্বাচিত হন। সেজন্য তাঁহারা বিভিন্ন স্থানের জন্য যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপ আইন-প্রণয়ন করিতে পারেন।

কিন্তু এই ব্যবস্থার দোষও আছে। দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে এই ধরনের শাসনব্যবস্থা দ্রুত কাজ সমাধার পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করে। তাহা ছাড়া, অনেকজন মন্ত্রীকে একমত হইয়া সরকারের নীতি নির্ধারণ করিতে হয়। ইহাতেও সরকারী নীতি কার্যকরী করিতে বিলম্বের এবং অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসনে এই বিলম্ব এবং অসুবিধার কারণ ঘটে না। কারণ, সেক্ষেত্রে সরকারের নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে তিনিই সর্বেসর্বা। তাঁহাকে আইন-পরিষদের নিকট কাজের জন্য দায়ী থাকিতে হয় না।

রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনের দোষগুণ (Merits and Demerits of a Presidential System)—দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে রাষ্ট্রপতির শাসন খুবই কার্যকরী হয়। এখানে আমরা ভারতের কথা উল্লেখ করিতে পারি। ভারতে স্বাভাবিক অবস্থায় মন্ত্রিসভাই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। কিন্তু জরুরী অবস্থায় দেশে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রপতি-শাসনের আর নীতি কার্যকরী করিতে বিলম্ব বা অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। রাষ্ট্রপতির শাসনে সরকারের একটি গুণ হইতেছে এই যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে সরানো যায় না—ইহাতে দেশের শাসনব্যবস্থার কর্মকুশলতা বাড়ে। কিন্তু মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় অনবরত মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হইতে পারে (যেমন, ফ্রান্সে এবং পাকিস্তানে এতকাল হইয়াছে) এবং তাহাতে দেশের শাসনব্যবস্থার কর্মকুশলতা অনেক কমিয়া যাইতে পারে। রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনে সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতার

স্বতন্ত্রীকরণ করা হয়; ইহাতে শাসন-বিভাগের আইনসভা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে। যদি রাষ্ট্রপতি যে রাজনৈতিক দলের লোক, সেই রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করিতে পারে, তবেই এই গোলযোগের আশঙ্কা থাকে। মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারে এই বিরোধের আশঙ্কা থাকে না, এবং মন্ত্রিসভা ও আইনসভার মধ্যে সম্পূর্ণ বোঝাপড়া থাকে।

Exercise

1. Show Aristotle's classification of Governments. What is the modern classification of Governments ?
(এরিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর। সরকারের আধুনিক শ্রেণীবিভাগ কিরূপ ?) (৬৮ পৃষ্ঠা)

2. Write notes on : (a) Monarchy and (b) Aristocracy.
[টীকা লিখ : (ক) রাজতন্ত্র এবং (খ) অভিজাততন্ত্র।] (৬৮–৬৯ পৃষ্ঠা)

3. What do you mean by Democracy ? What are its merits and demerits ? What are the conditions of its success ? (H. S. 1966)
(গণতন্ত্র বলিতে কি বুঝ ? ইহার গুণ এবং দোষ কি কি ? ইহার সাফল্যের সর্ত কি কি ?) (৬৯-৭৩ পৃষ্ঠা)

4. Distinguish between Democracy and Dictatorship.
(গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।) (৭৫ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the merits and demerits of Dictatorship.
(একনায়কতন্ত্রের গুণ ও দোষ আলোচনা কর।) (৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা)

6. Distinguish between Parliamentary and Presidential Systems of Governments. (H. S. 1963, 1965, 1967)
What are their respective merits and demerits ?
(মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। ইহাদের গুণ ও দোষ কি কি ?) (৭৬-৭৮ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the conditions for a successful democracy. Is Democracy suited to India ? (গণতন্ত্রের সাফল্যের সর্তগুলি আলোচনা কর। ভারতের পক্ষে কি গণতন্ত্র উপযুক্ত ?) (৭৩ পৃষ্ঠা)

[ইঙ্গিত : গণতন্ত্রের সাফল্যের যে উপায়গুলি আলোচিত হইয়াছে, সেইগুলি যে সম্পূর্ণভাবে ভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। তবে ভারতের জাতীয় সরকারের গত কুড়ি বৎসরের কাজকর্ম হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই দেশে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয় নাই। বিগত চারিটি সাধারণ নির্বাচন যেরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে গণতন্ত্রকে সফল করিবার ইচ্ছা ভারতবাসীর আছে। সুতরাং গণতন্ত্র ভারতের উপযুক্ত নয়, এই কথাও বলা ঠিক নয়।]

নবম অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং একককেন্দ্রিক সরকার (Federal Government and Unitary Government)

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of a Federal Government)—যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে আমরা জাতীয় ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির মধ্যে একটি সংহতির প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং জাতীয়তাবোধ হয়ত কয়েকটি রাষ্ট্রের সংঘ করিবার অনুকূল হয়। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে নিজেদের ক্ষমতা বিসর্জন দিতে রাজী নাও থাকিতে পারে। এইরকম ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি বৃহত্তর সংঘ (Union) গঠন করিবার প্রেরণা আসিতে পারে। এই বৃহত্তর সংঘে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, অথচ সার্বভৌম ক্ষমতা একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতা দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেকটি রাজ্যই (যেগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে) নিজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। প্রত্যেক রাজ্যের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি লিখিত এবং সাধারণত অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাঠামোর মূল ভিত্তি হইতেছে এই লিখিত শাসনতন্ত্র। সেজন্য এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে স্থানীয় শাসনব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ায় এবং দেশের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে প্রদান করায় একদিকে যেমন জাতীয় ঐক্য বজায় থাকে, অপরদিকে তেমন সমগ্র রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ও জাতীয় ঐক্য দৃঢ় ও সংহত করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ অনুকূল হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা লিখিত শাসনতন্ত্রই নির্ধারণ করে। দেশের সামগ্রিক ঐক্য এই জাতীয় শাসনব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অটুট থাকে। প্রত্যেক নাগরিকই সাধারণত (ভারতের ক্ষেত্রে নহে) দ্বৈত নাগরিকতা লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ, প্রথমত, তিনি নিজের স্থানীয় রাজ্যের নাগরিক এবং দ্বিতীয়ত, তিনি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লিখিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী অটুট থাকে এবং সবগুলি মূলরাষ্ট্রই এই সার্বভৌমত্ব মানিয়া চলে।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Features of a Federal Government)—যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে আমরা এই নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাই :—

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির সহাবস্থান থাকে। উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে ইহাদের ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে এবং উভয়েরই কাজের পরিধি শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। দেশের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কিত সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করা হয়। স্থানীয় শাসনব্যাপারে এবং স্থানীয় স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলির সম্পর্কিত সমুদয় ক্ষমতা রাজ্য সরকারগুলিকে প্রদান করা হয়।

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত এবং অনমনীয় থাকে। শুধু তাহাই নহে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্যই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয় থাকে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কোন রাজ্য সরকার নিজের ইচ্ছানুযায়ী সহজে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিয়া নিজের কর্মপরিধির পরিবর্তন করিতে না পারে।

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা থাকে। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য এই ধরনের বিচার-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে যাহাতে নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হয় অথবা রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে নিজেদের ক্ষমতা লইয়া সংঘাতের সৃষ্টি না হয়, সেইজন্যই বিচার-ব্যবস্থাকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই ক্ষমতার বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার-ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক আইনগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখে এবং অনেক ক্ষেত্রে শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের বিভিন্ন নির্দেশ বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থাকে শাসনতন্ত্রের রক্ষক (Guardian of the Constitution) বলা হয়।

পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রে আমরা দ্বি-নাগরিকতা (Double citizenship) দেখিতে পাই। অর্থাৎ, নাগরিকগণ মূলরাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্র উভয়েরই নাগরিকতা অর্জন করে। ষষ্ঠত, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন করা হয়।

সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক মূলরাষ্ট্রকেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে হয়। একমাত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে কোন মূলরাষ্ট্রেরই যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহির হইয়া আসিবার ক্ষমতা নাই।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় সর্ত (Essential conditions for the success of a federation)—প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং ইহার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র (geogra-

ভৌগোলিক যোগসূত্র

phical contiguity)। ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকিলেই বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যবোধ আসে। যদি ইহাদের মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র না থাকে, তবে একটি সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা খুবই কঠিন হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, যদি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ ভৌগোলিক-ভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে, তবে তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ভাবের আদান-প্রদান হইতে পারে না এবং ইহাতে জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিবার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়। নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে দুইটি বৃহৎ অংশের মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র নাই। ইহার ফলে পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং শাসনব্যবস্থায় অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

জাতীয়তাবোধ

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে ইহার বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের অধিবাসীগণের জাতীয়তাবোধের উপর। যুক্তরাষ্ট্রে ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা হয়ত থাকিতে পারে। কিন্তু তবুও দেশের জনসাধারণ যদি গভীর জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এজন্য প্রয়োজন হইতেছে, মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি ভাবগত ঐক্যের।

মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমান অর্থনৈতিক স্বার্থ

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রের মধ্যে আয়তন, সঙ্গতি ও সম্পদ এবং প্রধানত রাজনৈতিক অধিকারের সমতা না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সফল হয় না। মূল রাষ্ট্রগুলির আয়তন, এবং সম্পদের বৈষম্য কিছু-না-কিছু থাকিবেই। কিন্তু, যাহা একেবারে অপরিহার্য, তাহা হইতেছে ইহাদের রাজনৈতিক সমতা। জাতীয় ব্যাপারে প্রত্যেকটি মূলরাষ্ট্রেরই সমান ভূমিকা থাকা চাই যাহাতে একটি রাষ্ট্র বিশেষ রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া অপর রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে না পারে।

মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারের সমতা

চতুর্থত, শুধু রাজনৈতিক সমতাই নহে, সমান অর্থনৈতিক স্বার্থও সাফল্যজনক-ভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময় প্রত্যেক মূলরাষ্ট্রের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে আঞ্চলিক বৈষম্য (Regional disparities) দূর করার প্রচেষ্টা।

লিখিত শাসনতন্ত্র

পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে যাহাতে কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক গোলযোগের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য একটি লিখিত শাসনতন্ত্র থাকা খুবই আবশ্যক। তবেই যুক্তরাষ্ট্র সফল হইবে। সর্বশেষে নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষা, শ্রমকুশলতা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কখনই সফল হয় না। সদাসচেতন জনমত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় করে।

যুক্তরাষ্ট্রের গুণ (Merits of a Federal Government)—যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে সমগ্র দেশের সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরনের আইন প্রণীত হয়, আবার বিশেষ আঞ্চলিক স্বার্থের ক্ষেত্রেও আইন প্রণয়ন করাও যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভব হয়। এইভাবে ইহা জাতীয় ঐক্য এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে।

জাতীয় ঐক্য এবং স্থানীয় শাসনের মধ্যে সামঞ্জস্য

দ্বিতীয়ত, বড় বড় দেশের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ উপযোগী। কারণ, সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়। একই স্বার্থ-সমন্বিত বড় বড় দেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে।

বড় বড় দেশের পক্ষে ইহা উপযোগী

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় শাসনের সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। জনসাধারণের স্বাধীনতা এবং বিভিন্ন মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের পক্ষে ইহা উপযোগী।

স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় শাসনের সম্ভাবনা নাই

সর্বশেষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসন-বিভাগের কাজ বিশেষ উন্নত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং মূল রাষ্ট্রগুলির সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন হওয়ায় শাসনকাজের অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার ভারমুক্ত হওয়ায় জাতীয় উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করার দিকে মনোনিবেশ করিতে পারে।

শাসন-বিভাগের কাজের উন্নতি

যুক্তরাষ্ট্রের অপগুণ (Demerits of a Federal Government)—যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উপরি-উক্ত গুণগুলি থাকা সত্ত্বেও কতিপয় অপগুণ আছে। প্রথমত, শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টিত হওয়ায় শাসনব্যবস্থা প্রায়ই তাহাদের সম্পত্তির উপর অধিকারের দাবিতে এবং কতিপয় ক্ষেত্রে আইন-প্রণয়ন করিবার অধিকারের দাবিতে নিজের সন্ধি-সর্তগুলি কার্যকরী করিবার জন্য জাতীয় সরকারকে বাধ্য করিয়া ইহাকে বিব্রত করিতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইহা ঘটিয়াছে।

কেন্দ্রীয় এবং মূল রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা থাকার দরুন সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ব্যয়সঙ্কুল হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক এই দুই প্রকার সরকার থাকায় সরকারের ক্রিয়াকলাপে অনেক ক্ষেত্রেই বিলম্ব ঘটিয়া থাকে।

ইহা ব্যয়সঙ্কুল

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি বৃহৎ মূলরাষ্ট্র মিলিত হইয়া শক্তিশালী একটি দল গঠন করিয়া জাতীয় কাজে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে। অপরপক্ষে বলা যায়, বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে মূল রাষ্ট্রগুলি পৃথক হইয়া রাষ্ট্র গঠন করিবার প্রয়াসীও হইতে পারে।

জাতীয় কাজের মূল রাষ্ট্রগুলির অসহযোগিতা

চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের কতিপয় অসুবিধা

আছে। অনেক বিষয়েই হয়ত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরনের আইন প্রণীত হওয়া উচিত; কিন্তু এই বিষয়গুলি সম্পর্কিত আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা যদি আঞ্চলিক সরকারগুলির হাতে থাকে, তবে সমগ্র দেশে একই ধরনের আইন না হইয়া সেক্ষেত্রে আইনের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা একপ্রকার নহে। কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকাইলে ইহা আমরা দেখিতে পাই। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্ন লইয়া বিরোধের সৃষ্টিও বিরল নহে। আমেরিকায় আমরা ইহা দেখিয়াছি। বর্তমানে অনেক দেশেই শিল্পব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের এই ত্রুটিটি অনুভূত হইয়াছে।

ক্ষমতা বণ্টনের অসুবিধা

যুক্তরাষ্ট্রের এই ত্রুটিগুলি থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার খুবই জনপ্রিয়। সেজন্যই আধুনিককালে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে একটি ঝোঁক দেখা যাইতেছে। এই ঝোঁকের প্রথম কারণ হইল দেশরক্ষার প্রয়োজনীয়তা। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে আত্মরক্ষার প্রেরণাই বিভিন্ন রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রেরণা দেয়। সম্প্রতি মিশর, সিরিয়া ও ইয়েমেন লইয়া যে আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, তাহার পিছনেও আমরা দেখিতে পাই সাম্রাজ্যবাদীদের কবল হইতে নিজেদের রক্ষা করার তাগিদ।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সাম্প্রতিক ঝোঁক

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Features of a Unitary Government)

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ইহার ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই থাকে। আঞ্চলিক সরকার বলিয়া এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের কোন-প্রকার সরকার নাই; সুতরাং সেক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা বিভাগের কোন প্রশ্ন উঠে না। দ্বিতীয়ত, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই সর্বেসর্বা। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কোন প্রকার ক্ষমতা থাকে না। তৃতীয়ত, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত অথবা অলিখিত, নমনীয় অথবা অনমনীয় হইতে পারে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত এবং নমনীয়। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ইহা যে সর্বদাই লিখিত অথবা অনমনীয় হইবে, তাহা নহে। তাহা ছাড়া, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সাধারণত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও স্বাধীন বিচারালয় থাকে না।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার গুণ (Merits of Unitary form of Government)—এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল সমগ্র দেশে একই প্রকার আইন প্রণীত হয় এবং একই শাসননীতি অনুসৃত হয়। ছোট ছোট দেশগুলির মধ্যে ভৌগোলিক যোগসূত্র থাকে, সেগুলির জন্য এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। তাহা ছাড়া, যে সকল দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা অল্প এবং যে সকল দেশ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্য উপযুক্ত হয় নাই, সেই দেশগুলির জন্য এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। যুদ্ধের সময় পররাষ্ট্র নীতি এবং প্রতিরক্ষা নীতি সুদৃঢ় করার ব্যাপারেও এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপযোগী। আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন সময়েই আঞ্চলিক সরকার-

গুলির মতামতের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় না। সেজন্য জরুরী ব্যাপার গুলিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত অবলম্বনের দিক হইতে এবং সামগ্রিকভাবে শাসনব্যবস্থার ব্যয়সংকোচনের দিক হইতে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার কতিপয় বিশেষ সুবিধা আছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা লইয়া দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না, দায়িত্ব সম্পর্কেও অস্পষ্টতা থাকে না, এবং একই কাজ দুইবার করিতে হয় না। সরকারের সমুদয় ক্ষমতা একই কর্তৃপক্ষের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে, ইহাতে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যায়।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার অপগুণ (Demerits of Unitary form of Government)—বর্তমানে গণতন্ত্রের যুগে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল ইহাতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা নাই। অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় অধিবাসীদের বিভিন্ন স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করিতে পারে না। হয়ত কেন্দ্রীয় সরকার এমন কতিপয় আইন করিতে পারে যেগুলি মাত্র একটি বিশেষ অঞ্চলের স্বার্থের সহিত জড়িত ; অথচ ইহা সমগ্র দেশের প্রতিই প্রযুক্ত হয়। তাহা ছাড়া, যাঁহাদের রাজনৈতিক সচেতনতা খুব বেশী এবং যাঁহারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান, তাঁহারা কখনই এই ধরনের সরকারকে সমর্থন করেন না। তবে ইংরেজদের রাজনৈতিক সচেতনতা খুব বেশী থাকা সত্ত্বেও সে দেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত, তাহার প্রধান কারণ হইল, ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রে সংরক্ষণশীলতার প্রভাব খুবই বেশী। সংরক্ষণশীলতার প্রভাবে তাঁহারা রাজতন্ত্র বজায় রাখিতে চাহেন। তদুপরি দেশ হিসাবেও ইংলণ্ড খুবই ছোট। রাজতন্ত্র বজায় রাখিবার আগ্রহে এবং দেশের ক্ষুদ্র আয়তন থাকার দরুন, ইংরেজদের পক্ষে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভবপর হইয়াছে।

এককেন্দ্রিক সরকারের একটি প্রধান ত্রুটি হইতেছে, ইহা সরকারী কাজে স্থানীয় উৎসাহ প্রতিরোধ করে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়,—এবং এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় সরকারের কাজকর্মে স্থানীয় স্বার্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া পরিবর্তনশীল সামঞ্জস্যবিধানের অবকাশ খুব অল্প থাকে।

Exercise

1. Compare the advantages and disadvantages of a Unitary State with those of a Federal State. (যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা ও অসুবিধাগুলির সহিত এককেন্দ্রিক সরকারের সুবিধা অসুবিধাগুলির তুলনা কর।) (৮২-৮৪ পৃষ্ঠা)

2. What are the features of Federal State ? How is it distinguished from a Unitary System ? (যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য কি কি ? এককেন্দ্রিক সরকারের সহিত ইহার পার্থক্য কোথায় ?) (৭৯-৮০ পৃষ্ঠা ৮৩ পৃষ্ঠা)

[**ইঙ্গিত :** এই প্রশ্নের শেষ অংশের উত্তরে এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিয়া দেখাও যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইতে ইহা কি পরিমাণে পৃথক।]

3. Discuss the merits and demerits of a Federal State.
(যুক্তরাষ্ট্রের গুণ ও অপগুণ আলোচনা কর।) (৮২-৮৩ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the merits and demerits of a Unitary State.
(এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের গুণ ও অপগুণ আলোচনা কর।) (৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা)

দশম অধ্যায়

সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান (Separation of Powers of the Government)

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি (Theory of Separation of Powers)— সরকারের ক্ষমতাগুলিকে বিভিক্ত ভাগে বিভন্ন করার প্রয়োজনীয়তা অতি প্রাচীনকালের লেখকগণও অনুভব করিয়াছিলেন। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে গণ-পরিষদ (Public Assemble), ম্যাজিস্ট্রেটস্ (Magistrates) এবং বিচার-বিভাগ (Judiciary) এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। পলিবিয়াস (Polybius) এবং সিসারো (Cicero) সরকারের ক্ষমতার "প্রতিষেধক এবং ভারসাম্য"কেই (checks and balances) রোম প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষের কারণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগেও সরকারের বিভিন্ন কাজের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে।

প্রাচীনকালের কোন কোন লেখকগণ সরকারের ক্ষমতাগুলিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছিলেন

জন লক্ (John Locke) সরকারের ক্ষমতাগুলি আইন-প্রণয়ন, পরিচালন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় এই তিনভাগে বিভক্ত করেন। সরকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিভাগ বলিতে রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের উৎস বুঝায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান তত্ত্বটিকে মূলনীতি হিসাবে প্রথম বিবেচনা করেন মন্টেস্কু (Montesquieu)। বৃটিশ সরকারের গঠন বিবেচনা করিয়া মন্টেস্কু এই অভিমত প্রকাশ করেন যে সরকারের ক্ষমতাগুলির তিনটি বিভাগ আছে—আইন-প্রণয়ন, শাসন-পরিচালন এবং বিচার-ব্যবস্থা। যদি এই ক্ষমতাগুলি এবং এইগুলির যে কোনও দুইটি শুধুমাত্র একজনের হাতে ন্যস্ত থাকে, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সেজন্য তিনি সরকারের ক্ষমতাগুলিকে বিভিন্ন স্বাধীন বিভাগের হাতে অর্পণ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ইংলণ্ডে যদিও মন্টেস্কুর সুপারিশ অনুযায়ী সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় নাই, কিন্তু তাঁহার তত্ত্বের মূলনীতিগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর

মন্টেস্কুর অভিমত

শেষার্ধে আমেরিকান এবং ফরাসী বিপ্লবের সময় এই তত্ত্বটি রাষ্ট্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬৫ সালে ব্ল্যাকস্টোন তাঁহার "Commentaries on the Laws of England" বইয়ে বলেন যে একই ব্যক্তি যদি যুগপৎ আইন-প্রণয়ন বিভাগ এবং পরিচালন বিভাগের ক্ষমতা লাভ করেন, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির অর্থ

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির অর্থ হইতেছে এই যে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ নিজেদের কাজে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিবে। আইনসভার কাজ হইবে মুখ্যত আইন-প্রণয়ন করা, শাসন-বিভাগের কাজ হইবে সেই আইনকে কার্যকরী করা এবং বিচার-বিভাগের কাজ হইতেছে আইনভঙ্গ-জনিত যে কোন অপরাধের বিচার করা। সরকারের এই তিনটি ক্ষমতা যদি একজন লোকের হাতে অথবা একটি কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত হয়, তবে ইহা স্বৈরাচারের পথ প্রশস্ত করে এবং গণ-স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করে। আইন-প্রণয়ন বিভাগ এবং শাসন-বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করা যে সর্বদা বাঞ্ছনীয় তাহা নহে; তাহা ছাড়া, এই দুইটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ করা সম্ভবপরও নয়। কিন্তু, বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখিবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহারা বিচার-বিভাগের স্বাধীনতার উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। আইন-বিভাগের সদস্যগণ আইন-প্রণয়ন করেন; কিন্তু, মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভায় সদস্যগণ মন্ত্রীদের ক্রিয়াকলাপের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারেন এবং দরকার হইলে অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারেন। সুতরাং মন্ত্রিসভা-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় আইন-প্রণয়ন বিভাগ এবং শাসন-বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করা যায় না। শুধু মন্ত্রিসভা-চালিত শাসন-ব্যবস্থাতেই নহে, রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায়ও এই দুইটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করা সম্ভবপর নয়। কারণ গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে শাসন-বিভাগ যে অর্থ ব্যয় করে, তাহা আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। দেখা যাইতেছে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী করা সম্ভবপর নয়। তবে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা বজায় রাখা সম্ভবপর; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যদি আইনসভা এমন কোন আইন প্রণয়ন করে যাহা সেই দেশের শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার-বিভাগ সেই আইন বাতিল করিয়া দিতে পারে। বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে একটি অমূল্য সম্পদ। শুধু তাহাই নহে, বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা সরকারের আইন-প্রণয়ন বিভাগ এবং শাসন-বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। জনসাধারণও নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে।

মন্ত্রিসভা-চালিত অথবা রাষ্ট্রপতি-চালিত কোন সরকারেই এই নীতি প্রয়োগ করা যায় না

বিচার-বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব

সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির সমালোচনা (Criticisms of the Theory of Separation of Powers)—সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের পক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি হইল ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সরকারের শাসন-পরিচালন বিভাগ কখনই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যাইবে। আমরা এই উভয় যুক্তিরই সমালোচনা করিতে পারি। প্রথমত, জনসাধারণের স্বাধীনতা কখনই সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিয়া অর্জিত অথবা রক্ষিত হয় না। নাগরিক স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য প্রথমত চাই একটি জনমত। তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি যাহাতে সর্বদাই সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে অধিকতর স্বাতন্ত্র্যবিধান করিলেই যে সরকারের কর্মকুশলতা বাড়িয়া যাইবে তাহা নহে। বরং, যদি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র বজায় থাকে এবং যদি এই বিভাগগুলি পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটি সুসমঞ্জস নীতি অনুসরণ করে, তবে সরকারের সব বিভাগেরই কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যাইবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভা এবং শাসন-বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ খুবই বেশী। সেজন্য বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সরকারের এই দুইটি বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা থাকা উচিত। ইংলণ্ডে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় নাই, কিন্তু বরাবরই বৃটিশ সরকারের ন্যায় কর্মকুশল সরকার খুব অল্পই দেখা গিয়াছে। তাহা ছাড়া, ইংলণ্ডে নাগরিকগণ যে অনুপাতে স্বাধীনতা ভোগ করেন, অন্য কোনও গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকগণ ইহা অপেক্ষা বেশী স্বাধীনতা ভোগ করেন না। ভারত সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় নাই। কিন্তু ভারতেও এজন্য নাগরিক স্বাধীনতা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং কর্মকুশলতাও কমিয়া যায় নাই। সুতরাং নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্যবিধান করা উচিত, এই যুক্তির কোনও সার্থকতা নাই। সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিলে নাগরিকদের যতটা স্বাধীনতা রক্ষিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীনতা অর্জিত ও রক্ষিত হয় যখন সরকারের সমুদয় ক্ষমতা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে এই প্রকার বিভাগের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট নীতি প্রকাশ করিবার একটি উপায় এবং সেজন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কিছু যোগাযোগ এবং সামঞ্জস্য বজায় রাখা রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের দিক হইতে খুবই প্রয়োজনীয়।[১]

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা

---

১ 'The government of each state is a unit, engaged in expressing and executing the will of the state, and a certain degree of harmony among the various organs, no matter how extensively differentiated, is essential".—Gettel

যদি চূড়ান্তভাবে সরকারের সমুদয় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয়, তবে ইহা ভাল সরকার গঠনের পক্ষে প্রবল অন্তরায় হয়। অপরপক্ষে, একটি বিভাগের ক্ষমতাকে যদি অপর বিভাগের অন্য ক্ষমতার সাহায্যে প্রতিরোধ করিয়া ভারসাম্য বজায় রাখা হয়, তবে তাহাতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে গোলযোগ এবং সংহতির অভাব ক্রমেই বাড়িয়া যায়। তাহাতে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক কমিয়া যায়।[১]

চূড়ান্তভাবে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ভাল সরকার গঠনের অন্তরায়

সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা শুধু যে অবাঞ্ছনীয়, তাহাই নহে, বাস্তবে ইহা কার্যকরী করার মধ্যে অনেক অসুবিধাও আছে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজ বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্য একই থাকে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ করিয়া থাকে এবং অনেক সময় কোন বিভাগকে অপর কোন বিভাগের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই বিভাগগুলির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা সম্ভবপর নহে। সরকারের যে শুধু তিনটিই বিভাগ, এই যুক্তিতে সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণ একমত নহেন। অনেকের মতে সরকারের পাঁচটি বিভাগ ; যথা—নির্বাচকমণ্ডলী, আইনসভা, শাসন-পরিচালন বিভাগের প্রধানগণ অথবা মন্ত্রিসভা সরকারের বাঁধাধরা কাজ করিবার জন্য শাসন-বিভাগের কর্মচারী অথবা কর্মপরিষদ (administrative officials or bodies) এবং বিচার-বিভাগ। এককভাবে এই পাঁচটি পারস্পরিক নির্ভরশীলতা একান্ত আবশ্যক।

ইহা কার্যকরী করার অসুবিধা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু পরিমাণে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হইলেও সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করা সম্ভবপর হয় নাই। ইংলণ্ডে এবং ভারতেও ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর হয় নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতাগুলির স্বাতন্ত্র্যবিধান করা যে শুধু অবাঞ্ছনীয়, তাহাই নহে,—ইহা অসম্ভবও বটে। সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে হইলে আইনসভাই হউক অথবা শাসন-বিভাগই হউক, যে কোন একটি বিভাগকে অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতা দিতেই হইবে।

ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ করা অসম্ভব

বর্তমানকালে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বলিতে সরকারী বিভিন্ন বিভাগকে সম্পূর্ণ-

১ আমেরিকার শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কালে জেমস্ ম্যাডিসন (James Madison) বলিয়াছিলেন, "The powers properly belonging to one department ought not to be directly and completely administered by either of the other departments ought to prossess, directly or indirectly, and overruling influence over the administration of their respective powers." এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতিটি খুবই নমনীয় (flexible) এবং ইহার বাস্তব উপযোগিতাও অনেক কম।

ভাবে পৃথক করা বুঝায় না। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বলিতে বর্তমানে দুইটি জিনিস বুঝায়। প্রথমত, আইনসভা, শাসন-বিভাগ অথবা বিচার-বিভাগ ইত্যাদির বিভিন্ন ক্ষমতা আংশিকভাবে স্বতন্ত্র করা। মণ্টেস্কু (Montesquieu) সে অর্থে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন, সেই নীতি বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ন্যায়ের দিক হইতে চিন্তা করিলে বিচার-বিভাগের ক্রিয়াকলাপ শাসন-বিভাগ এবং আইনসভার ক্রিয়াকলাপ হইতে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে বিচার-বিভাগ ইহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারে।

ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করা অর্থে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পৃথক করা বুঝায় না

ভারতের শাসনতন্ত্রে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি কতদূর কার্যকরী হইয়াছে?—ভারতের শাসনতন্ত্রে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি বিশেষ অনুসৃত হয় নাই। জরুরীকালে রাষ্ট্রপতির অর্ডিনান্স জারী করিবার ক্ষমতা আছে। মন্ত্রিসভার সদস্যগণও আইনসভার সদস্য। সুতরাং আইন-প্রণয়ন বিভাগ এবং শাসন-বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র আমরা ভারতীয় শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাই। শাসন-বিভাগের কাজের জন্য মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট দায়ী, এবং আইনসভা কোন অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে। অপরপক্ষে মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি যে কোন সময়েই আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। আইন-সভা আহ্বান করা এবং আইনসভার অধিবেশন বজায় রাখার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির আছে। ভারতের জেলা শাসনের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, জেলা-শাসকের হাতে বিচার-বিভাগীয় এবং শাসন-বিভাগীয় উভয়প্রকার ক্ষমতাই অর্পিত হইয়াছে। জেলাশাসক একাধারে জেলার শাসনকর্তা এবং অপরদিকে ফৌজদারী মামলার বিচারপতি। ভারতের শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিতে (Directive Principles of the State Policy) বিচার-বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিয়োগ করেন, এবং প্রাণদণ্ড মকুব প্রভৃতি কতিপয় বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা তিনি ভোগ করিয়া থাকেন। তবে রাষ্ট্রপতি সাধারণক্ষেত্রে বিচার-পতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন না, এবং শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত তাহাদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতার পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা আইনসভা অথবা রাষ্ট্রপতির (জরুরী অর্থসংকট অবস্থা ব্যতীত) নাই। অযোগ্যতা এবং অসদাচরণের অপরাধ ব্যতীত অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। কিন্তু, বিচারপতিদের অযোগ্যতা এবং অসদাচরণের অপরাধ পার্লামেণ্টের প্রতি কক্ষের দুই সংখ্যাধিক্যের প্রস্তাবে প্রমাণিত হইবে।

ভারতের শাসনতন্ত্রে ইহা কার্যকরী নয়

Exercise

1. Give a critical estimate of the Theory of Separation of Powers. (H. S. 1966) (ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান তত্ত্বটির একটি সমালোচনামূলক বিবরণী দাও।) (৮৫-৮৯ পৃষ্ঠা)
2. "Strict Separation of Powers is neither possible nor desirable"—Discuss the statement. ("ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধান সম্ভবপরও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।"—এই উক্তিটি আলোচনা কর।) (৮৭-৮৯ পৃষ্ঠা)
3. How far do you find Separation of Powers in India? (ভারতে কি পরিমাণে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান দেখিতে পাও?) (৮৯ পৃষ্ঠা)

একাদশ অধ্যায় | আইন-পরিষদ (Legislature)

পূর্ব অধ্যায়েই বলা হইয়াছে যে সরকারের তিনটি বিভাগ আছে। যথা, আইন পরিষদ (Legislature) শাসন-বিভাগ (Executive) এবং বিচার-বিভাগ (Judiciary)

আইন-পরিষদের কাজ (Functions of the Legislature)—সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আইনসভার গুরুত্ব খুবই বেশী। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের উপর ভিত্তি করিয়া শাসন-বিভাগ এবং বিচার-বিভাগ তাহাদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া থাকে। আইন-পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে আইন-প্রণয়ন করা। বিভিন্ন রাষ্ট্রে আইন পরিষদগুলির আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি বিভিন্ন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে আইন-প্রণয়ন করা যাহাতে দেশের শাসনকাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

আইন-প্রণয়ন করা

দ্বিতীয়ত, আইন পরিষদ অনেকক্ষেত্রেই গণপরিষদের ভূমিকা অবলম্বন করিয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন অথবা শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়া থাকে। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতবর্ষে ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীনতার পরেও আড়াই বছর পর্যন্ত আইন-সভাই গণপরিষদের কাজ নির্বাহ করিত।

কোন কোন ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা

তৃতীয়ত, অনেক সময় আইন পরিষদ একটি নির্বাচনী সংস্থায় (Electoral College) পরিণত হইয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতে পারে। ভারতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইন পরিষদের উভয় কক্ষ এবং রাজ্য সরকারগুলির আইন পরিষদের নিম্ন-কক্ষগুলি নির্বাচনী সংস্থা গঠন করিয়া থাকে।

নির্বাচনী সংস্থায় পরিণত হইয়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা

চতুর্থত, আইন পরিষদ জনস্বার্থ সম্পর্কিত সরকারের বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান চালাইবার জন্য কমিটি অথবা কমিশন নিযুক্ত করিতে পারে।

সরকারের আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ অনুমোদন করা

পঞ্চমত, সরকারের আয়-ব্যয়ের পরিমাণ বরাদ্দ অনুমোদন করিবার দায়িত্ব আইন পরিষদের। সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য আইন পরিষদের নিম্নকক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ অথবা সিনেট—সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত বিলগুলি অনুমোদন অথবা পরিবর্তন করিতে পারে।

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের মন্ত্রিসভা নিয়ন্ত্রণ করা

ষষ্ঠত, মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার আইন পরিষদ সরকারের শাসন-বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। মন্ত্রিগণকে আইন পরিষদের সভ্য হইতে হয় এবং নিজেদের কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলই মন্ত্রিসভা গঠন করে।

সর্বশেষে, কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন, ইংলণ্ডের লর্ড সভা) আইনসভা বিচার-বিভাগের কাজও করিয়া থাকে। ভারতে রাষ্ট্রপতি যদি শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করেন, তবে ভারতের পার্লামেণ্ট তাঁহাকে অভিযুক্ত এবং পদচ্যুত (Impeached) করিতে পারে।

আইন পরিষদে সরকার-বিরোধী দলের ভূমিকাও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এক-কক্ষ বনাম দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ (Unicameral vs. Bicameral Legislature)—কোন কোন আইন পরিষদে (যেমন, ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং ভারতের ক্ষেত্রে) দুইটি কক্ষ থাকে। যথা, নিম্নকক্ষ (Lower House) এবং উচ্চতর কক্ষ (Upper House)।

দ্বি-কক্ষ আইন-সভার পক্ষে যুক্তি

আইন পরিষদ এক-কক্ষ বিশিষ্ট হইবে অথবা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হইবে, এই সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। লেকি (Lecky) তাঁহার "Democracy and Liberty" বইয়ে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের নীতিকে নিকৃষ্টতম বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে উচ্চতর কক্ষ নিম্নকক্ষ কর্তৃক দ্রুত আইনগুলি অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিয়া সেগুলির সংশোধন ও পরিবর্তন করিতে পারে এবং নিম্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধ করিতে পারে। নিম্নকক্ষ হইতে উচ্চতর কক্ষে বিল প্রেরণ করা এবং অনুমোদিত হওয়া সময়সাপেক্ষ। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে কোন বিল সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করার সময় পাওয়া যায়।

১ সেইজন্য লেকি বলেন, "The necessity of Second Chamber to exercise a controlling modifying and retarding influence, has acquired almost the position of an axiom."

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে যুক্তি—আমরা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি।

প্রথমত, আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে আইন-প্রণয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট বিবেচনা করা এবং সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়। এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ অনেক ক্ষেত্রেই দ্রুত আইন-প্রণয়ন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং সেক্ষেত্রে সদস্যগণ অনেক সময় ভাবাবেগে পরিচালিত হন। তাহাতে আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনগুলি প্রায়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আইন পরিষদের দুইটি কক্ষ থাকিলে ইহাদের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ প্রতিযোগিতা হয় এবং একটি কক্ষ কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি অপর কক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পায়।

দ্বিতীয়ত, আইন পরিষদে দুইটি কক্ষের অস্তিত্ব থাকিলে গণ-সার্বভৌমের ইচ্ছা বিশ্লেষণ করা সহজ হয়। যদি উভয় কক্ষের সদস্যগণ একই সময়ে নির্বাচিত না হইয়া বিভিন্ন সময়ে জনগণ কর্তৃক নির্বচিত হন, তবে যে কোনও একটি কক্ষের সদস্যগণের পক্ষে সর্বদা জনমতের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকা সম্ভবপর হয়।

তৃতীয়ত, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে বলা হয় যে ইহা ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষক। যদি আইন পরিষদে মাত্র একটি কক্ষ থাকে, তবে ইহা যে কোন সময়েই স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাইতে পারে এবং ইহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকে। অপরপক্ষে আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে এক কক্ষ অপর কক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিবন্ধক হইতে পারে এবং স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিতে পারে। লর্ড ব্রাইস মনে করেন যে কোনও একটি পরিষদ থাকিলে ইহার স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে স্বেচ্ছাচারিতা এবং দুর্নীতির দিকে, সেইজন্য সম-ক্ষমতাসম্পন্ন অপর কোনও পরিষদ থাকা উচিত যাহা ইহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে। এইজন্যই আইন পরিষদে দুইটি কক্ষের বিশেষ প্রয়োজন।

অধ্যাপক ব্রাইস ও জন স্টুয়ার্ট মিলের অভিমত

কিন্তু এক্ষেত্রে জন্ স্টুয়ার্ট মিলের যুক্তি অনুধাবনযোগ্য। মিল দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই যে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের প্রয়োজন, তিনি ইহা স্বীকার করেন না।[১] নিম্ন-কক্ষের স্বৈরাচার বন্ধ করিতে হইলে নির্বাচকমণ্ডলীকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে এবং সেভাবে জনমত গঠন করিতে হইবে।

মিলের মতে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা অপরিহার্য নহে

চতুর্থত, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের একটি বিশেষ সুবিধা হইল, ইহা রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীকে আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ প্রদান করেন। দুগুইটের

---

১ মিল বলেন, "I see little value on any check which a second chamber can apply to a democracy otherwise unchecked."

(Duguit) মতে শ্রেষ্ঠ আইন পরিষদ হইতেছে তাহা যেখানে একটি কক্ষ রাষ্ট্রের সমগ্র জনসমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করিবে এবং অপর কক্ষ সমগ্র জনসমষ্টির বিভিন্ন দলের এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করিবে। এই সুবিধাটি যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি মূলরাষ্ট্র সিনেটে সমান মর্যাদা লাভের সুযোগ পাইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আইন পরিষদে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে একটি কক্ষের সংরক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী এবং অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় কক্ষের উদারনৈতিক মতবাদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার প্রয়োজনীয়তা

পঞ্চমত, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ আইন পরিষদের উচ্চতর কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিজেদের কর্মপ্রতিভা, যোগ্যতা এবং রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিবার সুযোগ লাভ করেন। তাঁহাদের পরামর্শে আইনসভার কার্যাবলীর মান অনেক উন্নত হয় এবং শাসনব্যবস্থারও অনেক সংস্কার সাধিত হয়। আইন পরিষদের প্রধান কাজ শুধু আইন-প্রণয়ন করাই নহে, প্রণীত আইনগুলি যাহাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে, সেদিকেও আইন পরিষদের লক্ষ্য রাখিতে হয়। যদি আইন পরিষদে যোগ্যতর ব্যক্তির স্থান থাকে, তবেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এজন্য উচ্চতর পরিষদে অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং রাজনীতিবিদ্, ব্যবহারজীবী প্রভৃতির প্রবেশের ব্যবস্থা থাকা উচিত। সর্বশেষে, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে আর একটি যুক্তি হইতেছে, ইহা শাসন-বিভাগের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়। যদি আইন পরিষদে শুধু একটি কক্ষ থাকে, তবে ইহা সর্বদাই শাসন-বিভাগের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু, যদি আইন পরিষদে সম-ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি কক্ষ থাকে তবে কাহারও পক্ষেই শাসন-বিভাগের উপর নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার করা সম্ভব নহে। যদি, কখনও দুইটি কক্ষের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়, তবে শাসন-বিভাগের পক্ষে নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিবার অবস্থা অনুকূল হয়।

উচ্চকক্ষে যোগ্যতর ব্যক্তিও সদস্য হইতে পারেন

উভয় কক্ষের সমান ক্ষমতাসম্পন্ন হইবার প্রয়োজনীয়তা

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের বিপক্ষে এবং এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে যুক্তি—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোন কোন লেখক এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের সমর্থক ছিলেন। আমেরিকায় বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন (Benjamin Franklin) এবং ইংলণ্ডে বেন্থাম্ Bentham) মনে করিতেন যে আইন পরিষদে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে শুধু এমন একটি কক্ষ থাকা উচিত, এবং রাষ্ট্রের অবিভাজ্য সার্বভৌমত্ব ইহাতে ন্যস্ত করা উচিত যাহাতে ইহার মধ্যে সেই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তব রূপ পায়। কিন্তু পরবর্তীকালে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠন করিবার নীতি জনপ্রিয়তা

অর্জন করে। বর্তমানে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠন করিবার নীতি কোন কোন রাষ্ট্র অনুসরণ করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত অনেক নূতন রাষ্ট্রের যেমন, আধুনিক গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, পানামা, ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র, কস্টা রিকা (Costa Rica), হণ্ডুরাশ (Honduras), স্যালভাডর (Salvador) প্রভৃতি শাসনতন্ত্রে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক রাষ্ট্রনীতিবিদের মতে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের নীতি রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে একটি সাময়িক নীতি মাত্র। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রগুলিতেও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ, জাতীয় কেন্দ্রিকতার (national centralization) গতি প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি।

এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন-সভার বিপক্ষে যুক্তি

প্রথমত, যদি আইন পরিষদের মাত্র একটি কক্ষ থাকে, তবে, আইন-প্রণয়ন ব্যবস্থা অনেক সরল হয়, শাসন-বিভাগের দায়িত্ব কোথায় থাকিবে তাহা ঠিকভাবে নির্ধারণ করা সহজ হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলীও একটি প্রত্যক্ষ এবং প্রামাণ্য প্রতিনিধিত্ব হয়।[১]

দ্বিতীয়ত, লাস্কি প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন-প্রণয়নের জন্য মাত্র একটি আইন পরিষদই যথেষ্ট ; উচ্চ পরিষদের প্রয়োজন আইন-প্রণয়নে খুব বেশী অনুভূত হয় না। অবশ্য মার্কিন সিনেট ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের আইন পরিষদের উচ্চতর কক্ষ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করে না। ফরাসী লেখক আবে সিঁয়ে (Abbe Seieyes) বলিয়াছিলেন যে উচ্চ-পরিষদ যদি আইন-প্রণয়নের ব্যাপারে নিম্ন-পরিষদের সহিত একমত হয়, তবে ইহা বাহুল্য মাত্র, আর যদি ইহা নিম্ন-পরিষদের সহিত একমত না হয়, তবে ইহা বিপজ্জনক। সুতরাং, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের কোন প্রয়োজন নাই।[২]

তৃতীয়ত, আইন পরিষদের দুইটি কক্ষ থাকিলে উচ্চতর কক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মনোনয়ন করা যায় বটে ; কিন্তু মনোনয়ন ব্যবস্থাকে কখনই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

চতুর্থত, বর্তমানে নিম্ন-পরিষদে আইন-প্রণয়ন করিবার সময় যে সব ব্যবস্থাই দ্রুত অবলম্বিত হয়, তাহা নহে। আইনসভা বিভিন্ন কমিটির সাহায্যে যে কোনও আইন-প্রণয়নের জন্য যে কোন প্রস্তাবেরই খুঁটিনাটি বিষয় পর্যালোচনা করিয়া থাকে এবং সেগুলির উপরে যথেষ্ট বিতর্ক হয়। তাহা ছাড়া, নিম্ন-পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন যে উচ্চ-পরিষদ খুব বেশী সংশোধন অথবা আংশিক বাতিল করিতে পারে তাহা নহে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের ক্ষেত্রে নহে)। সেজন্য অধ্যাপক লাস্কির

১ "It is simple. It definitely locates responsibility and furnishes a means for a direct, authoritative representation of the electorate."

২ "Of what use will a second chamber be? If it agrees with the Representative House, it will be superfluous, if it disagrees, mischievous."

মতে আইন-প্রণয়নের জন্য একটি পরিষদই যথেষ্ট। আধুনিক আইন পরিষদের নিম্ন-কক্ষে যথাসম্ভব বিতর্ক এবং বিচার-বিবেচনার পর আইন প্রণীত হয়। সুতরাং উচ্চ-কক্ষের প্রয়োজনীয়তা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে খুবই কম।

পঞ্চমত, আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে সরকারের খরচ অনেক বাড়িয়া যায়। ব্যয়-সংকোচনের দিক হইতে চিন্তা করিলে আইন পরিষদে একটি কক্ষ থাকা উচিত।

ষষ্ঠত, উচ্চ-পরিষদ যে সর্বদাই আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থসংরক্ষণ করিয়া থাকে তাহা নহে। আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা হইতেছে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-বিভাগ।

Exercise

1. Discuss the functions of a legislature.

(আইন পরিষদের বিভিন্ন কাজ আলোচনা কর।) (৯০-৯১ পৃষ্ঠা)

2. "The function of the legislature is not merely the making of law." What other functions does legislature in a democratic country discharge ?

("আইন পরিষদের কাজ শুধু আইন-প্রণয়নই নয়।" গণতান্ত্রিক দেশে আইন পরিষদ আর কি কি কাজ করে ?) (৯০-৯১ পৃষ্ঠা)

3. Examine the utility of the Second Chamber.

(আইন পরিষদের উচ্চতর কক্ষের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা কর।)

4. "If the Second Chamber agrees with the Representative House, it will be superfluous. if it disagrees, mischievous."—Discuss the validity of this statement.

("যদি উচ্চতর কক্ষ জনপ্রতিনিধি সভার সহিত একমত হয়, তবে ইহার প্রয়োজন নাই। যদি ইহা একমত না হয়, তবে ইহা বিপজ্জনক।" এই যুক্তিটির সারবত্তা আলোচনা কর।) (৯২-৯৫ পৃষ্ঠা)

দ্বাদশ অধ্যায়

শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ (Executive and the Judiciary)

শাসন-বিভাগ (Executive)—সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগই প্রকৃতপক্ষে প্রধান বিভাগ। অধিকাংশ দেশেই শাসন-বিভাগের প্রধানকে রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে স্বীকার করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি শুধু শাসন-বিভাগের প্রধান নহেন, রাষ্ট্রেরও প্রধান। শাসন-বিভাগের প্রধান সাধারণত নির্বাচিত হয়। তবে গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি কতিপয় দেশে উত্তরাধিকার সূত্রে যিনি রাষ্ট্রের প্রধান হন তিনিই শাসন-বিভাগেরও প্রধান বলিয়া স্বীকৃত হন। শাসনকর্তৃপক্ষ একক (single) অথবা সমষ্টিগত হইতে পারে।

একক শাসনকর্তৃপক্ষ (Single Executive)—যখন শাসন-বিভাগের শীর্ষে মাত্র একজন ব্যক্তিই সর্বাধিনায়ক থাকেন, তখন ইহাকে একক শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হয়। একনায়কতন্ত্রে এবং রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন-বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন একজন ব্যক্তি। তাঁহার কাজের সহায়তার জন্য তিনি সহকারী অথবা সচিবমণ্ডলী গঠন করিতে পারেন। এই ব্যবস্থার একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি শাসনকাজ সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু, এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে একক শাসনকর্তৃপক্ষ থাকায় যে কোন সময়ে দেশে স্বৈরাচারের সূচনা হইতে পারে।

একক শাসনকর্তৃপক্ষ

যখন শাসন পরিষদ একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত হয়, তখন ইহাকে **সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষ** (Plural Executive) বলা হয়। এই প্রকার শাসনকর্তৃপক্ষের প্রকৃত উদাহরণ হইতেছে সুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদ (Federal Council)। সাতজন সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া ইহা গঠিত। এই সাতজনের মধ্য হইতে প্রতি বৎসর একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়। ক্ষমতার দিক হইতে বিচার করিলে তিনি অপর ছয় জন হইতে অধিকতর ক্ষমতা ভোগ করেন না। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও তেত্রিশ জন সদস্য লইয়া একটি রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী (Presidium) গঠিত হয়। এই ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল এই যে শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষে অবস্থিত সকলের সমবেত রাজনৈতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দেশের শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া দেশের শাসনকর্তৃপক্ষের কর্মকুশলতা বাড়িয়া যায় এবং স্বৈরাচারের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। কিন্তু, এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল এই যে একাধিক ব্যক্তি শাসন-বিভাগের শীর্ষে থাকায় সকলের একমত হইয়া শাসনকাজ সম্বন্ধে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অযথা বিলম্ব ঘটিতে পারে। ক্ষমতা ও দায়িত্ব যদি একাধিক

সমষ্টিগত শাসন-কর্তৃপক্ষ

এই ব্যবস্থার গুণ

সমষ্টিগত শাসন-কর্তৃপক্ষ থাকার ত্রুটি

ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে বন্টিত হয়, তবে ইহার ফলে সরকারের শাসন-বিভাগের কর্মকুশলতা কিছু পরিমাণে কমিবেই, দায়িত্ব ভাগাভাগি হইলেই শাসনকর্তৃপক্ষ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং দেশের শাসন কাজ সম্বন্ধে কোন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রায়ই অসুবিধাজনক হয়।

শাসন-বিভাগের কাজ (Functions of the Executive)—ব্যাপকভাবে চিন্তা করিলে আইন-প্রণয়ন এবং বিচার ছাড়া সরকারের সমুদয় ক্রিয়াকলাপ শাসন-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের যে ইচ্ছা প্রকাশিত এবং প্রতিফলিত হয়, তাহা কার্যকর করিবার কর্তৃপক্ষ শাসন-বিভাগ বলিয়া পরিচিত। সুতরাং শাসন-বিভাগের কর্তৃপক্ষ বলিতে আমরা বুঝি (১) শাসন-বিভাগের প্রধান (Executive Head)—তিনি রাজা অথবা রাষ্ট্রপতি হইতে পারেন, (২) শাসন পরিষদ (Executive council), (৩) মন্ত্রিসভা (Ministry) এবং (৪) সরকারী কর্মচারীবৃন্দ (Civil Service)।

শাসন-বিভাগের গঠন

সাধারণত শাসন-বিভাগের পাঁচ প্রকার কাজ থাকিতে পারে,—(১) শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতা (Administrative power) অনুযায়ী কাজ; (২) কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (Diplomatic activities), (৩) সামরিক ক্ষমতা (Military power) অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, (৪) আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা (Legislative Power) অনুযায়ী কাজ এবং (৫) বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial power) অনুযায়ী কাজ। এই পাঁচটি কাজকে আমরা তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করিতে পারি, যথা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, শাসন বিভাগীয় ক্রিয়াকলাপ এবং আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা অনুযায়ী ক্রিয়াকলাপ।

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (Political Functions)—শাসন-বিভাগের কর্তৃপক্ষ দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার গঠন করিয়া থাকেন। যিনি প্রধানমন্ত্রী হন, তাঁহার প্রথম এবং প্রধান কাজ হইল সুষ্ঠু সরকার গঠন করা। যিনি রাষ্ট্রের প্রধান অথবা রাষ্ট্রপতি, তিনি প্রথমেই শাসন-বিভাগের কাজের জন্য বিভিন্ন সচিব নিযুক্ত করিবেন। শাসন-বিভাগের কর্তৃপক্ষকে দলীয় সরকার স্থায়ী রাখিবার জন্য শাসন-বিভাগের কর্তৃপক্ষকে দলীয় রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। উপরোক্ত কাজ ছাড়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসন-বিভাগকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক (Diplomatic relations) বজায় রাখিতে হয়। এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রগুলির কী সম্পর্ক হইবে তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব হইতেছে শাসন-বিভাগের। শাসন-বিভাগের কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক দূত নিয়োগ করেন, এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত দূত বিনিময় করেন এবং প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন প্রকার সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ হন। শাসন-বিভাগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ হইতেছে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর পর পর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

মন্ত্রিসভার গঠন এবং কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ

শাসনসংক্রান্ত কাজ (Administrative Functions)—শাসন-বিভাগের

প্রধান কাজ হইতেছে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনগুলিকে প্রকৃতভাবে কার্যকর করা যাহাতে দেশে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে, এবং জনসাধারণকে সেগুলি পালন করিবার জন্য বাধ্য করা। এইজন্য শাসন-বিভাগ পুলিশ বাহিনী পরিচালনা করিয়া আইন-ভঙ্গকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করে এবং জনসাধারণকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য প্রণোদিত করে।

শাসন-বিভাগীয় কাজগুলিকে সফল করিবার জন্য শাসনকর্তৃপক্ষকে কিছু পরিমাণে সামরিক ক্ষমতা এবং বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। পররাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য শাসন-বিভাগ স্থল-বাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং বিমান-বাহিনী গঠন করিয়া সেইগুলি যাহাতে উপযুক্তভাবে পরিচালিত হয় সেই ব্যবস্থা করে। তবে কোন রাষ্ট্রে (যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) যুদ্ধ ঘোষণা করা অথবা সন্ধি চুক্তি করার জন্য শাসন-বিভাগকে আইন পরিষদের অনুমোদন অর্জন করিতে হয়। শুধু সামরিক ক্ষমতাই নহে, শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করিবার জন্য শাসন-বিভাগের কিছু কিছু বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা থাকে। অধিকাংশ দেশে উচ্চ বিচারালয়ে বিচারপতিগণকে রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি নিযুক্ত করেন। রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড হইতে রেহাই দিতে পারেন। ভারতের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে জেলার ভিতরে ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার করিতে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের শাসন-বিভাগকে কিছু পরিমাণে বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা দেওয়ায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

সামরিক ক্ষমতা

বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা

আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ (Legislative Functions)—যদিও রাষ্ট্রের আইন-প্রণয়ন করিবার জন্য আলাদা আইন পরিষদ থাকে, তবুও শাসন-বিভাগকে কতিপয় ক্ষেত্রে সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। যখন আইন পরিষদের অধিবেশন বন্ধ থাকে তখন প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারেন; পরে ইহাকে আইন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়। সাধারণত জরুরী অবস্থায় শাসন-বিভাগ এই কাজ করিয়া থাকেন। কোন কোন দেশে (যেমন ভারতবর্ষে) শাসন-বিভাগের যিনি প্রধান তিনি আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন, ইহা স্থায়ী রাখেন এবং প্রয়োজনের সময় ইহা ভাঙ্গিয়া দেন।

আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা

বিচার-বিভাগের কাজ (Functions of the Judiciary)

কোন দেশের শাসন-বিভাগের উৎকর্ষ বহুল পরিমাণে ইহার বিচার-বিভাগের উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। বিচার-বিভাগ বিভিন্ন মামলার বিচার করিবার সময় রাষ্ট্রীয় আইনগুলি প্রয়োগ করে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেগুলি ব্যাখ্যা করে। অনেক

ক্ষেত্রে এইভাবেবিচার-বিভাগ নূতন আইনের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচারকদের প্রদত্ত রায় আইনের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে।

যদিও বিচার-বিভাগের প্রধান কাজ হইতেছে নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক কলহ, রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের বিবাদ, ফৌজদারী মামলার, অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে মূলরাষ্ট্রগুলির সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বিবাদ এবং মূলরাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদের বিচার করা, তবুও বিচার-বিভাগ এমন কতিপয় কাজ নির্বাহ করে যেগুলিকে প্রকৃতপক্ষে বিচার-বিভাগীয় কাজ বলা যায় না; যেমন, কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মচারী নিয়োগ করা, লাইসেন্স অনুমোদন করা, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করা, নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ করা এবং পতনোন্মুখ প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি অথবা প্রাপক (Receiver) নিয়োগ করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্‌জাংসন জারী করাও বিচার-বিভাগের অন্যতম কাজ। অনেক দেশে বিচার-বিভাগ আইনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ঘোষণাপত্রের সাহায্যে কোন জিনিসের বিচার করিতে পারে। ইহাকে "ঘোষণামূলক বিচার" ("Declaratory Judgment") বলে। বিচার বিভাগের আদিম ক্ষমতায় (original powers) বিচারকগণ তাহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন মামলার বিচার করেন। তাহা ছাড়া, নিম্ন-আদালত হইতে উচ্চ-আদালতে কোন কোন মামলার রায় সম্বন্ধে পুনর্বিচারের জন্য আপীল করা যায়। বিচারকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে আইন পরিষদ ও শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে রাষ্ট্রীয় আইনের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন।

আইন পরিষদের সহিত বিচার-বিভাগের সম্পর্ক এই যে আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিবার দায়িত্ব হইতেছে বিচার-বিভাগের। সুষ্ঠু বিচার কাজের জন্য বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় থাকা উচিত।

বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা

বিচারপতিগণ যাহাতে বিচারকাজে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে শাসনকর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ হইতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা উচিত। অনুরূপভাবে শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেরও বিচার-বিভাগের নিয়ন্ত্রণ হইতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা উচিত। আমেরিকা এবং ভারতে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। অনেক ক্ষেত্রে শাসনকর্তৃপক্ষের যিনি প্রধান তিনি কোন কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ড মকুব করার মত বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। আবার বিচারপতিগণও অনেক ক্ষেত্রে (যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) কোন বিশেষ আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন অবৈধ ঘোষণা করিতে পারেন।

বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of the judiciary)

বিচারকগণের পবিত্র দায়িত্ব হইতেছে, যে কোন প্রকার অভিযোগে অভিযুক্ত

ব্যক্তিদের ন্যায়-বিচার করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং দেশে আইনের মর্যাদা বজায় রাখা। এইজন্য বিচার-বিভাগকে সর্বদাই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে হয়। যদি বিচার-বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে আইনের প্রয়োগ না করেন, তবে অনেক ক্ষেত্রে নির্দোষ ব্যক্তির শাস্তি হইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, শাসন-বিভাগ যাহাতে কোনও সময়েই স্বৈরাচারের প্রশ্রয় না দেয় এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার-বিভাগকে ইহার কাজ-কর্ম করিতে হয়। বিচার-বিভাগ হইতেছে শাসনতন্ত্রের রক্ষক। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত হয় এবং তাহা রক্ষা করিবার গুরুদায়িত্ব হইতেছে বিচার-বিভাগের। বিচার-বিভাগ যাহাতে এই দায়িত্ব পালনে সমর্থ হইতে পারে সেজন্য ইহাকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে হইবে।

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সহিত আঞ্চলিক সরকারগুলির যদি কোনও সময়ে বিরোধের সৃষ্টি হয় অথবা শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া মতান্তর হয়, তবে ইহার মীমাংসা করিবার দায়িত্ব হইতেছে বিচার-বিভাগের। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইলে বিচার-বিভাগকে পক্ষপাতদুষ্ট হইলে চলিবে না।

বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা যায় তিনটি উপায়ের সাহায্যে। প্রথমত, বিচারকদের নিয়োগ করিবার নীতি এরূপ হওয়া উচিত যে বিচারকগণ যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের সুচিন্তিত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত প্রদান করেন, তবে শাসন-বিভাগ অথবা আইন পরিষদ ইহাদের কোনও প্রকার ক্ষতি করিতে পারিবে না এবং ইহাদের কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা অথবা কর্মোন্নতির পথে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি হইবে না। যদি বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতি যথাসম্ভব বিভিন্ন সর্ত হইতে মুক্ত রাখা হয়, তবেই বিচারকগণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার করিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, বিচারকদের কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনও অবস্থায়ই তাঁহাদের অপসারণ করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত নহে। অবশ্য বিচারকগণ অন্যায় এবং দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা যাইতে পারে। কিন্তু, সাধারণ ক্ষেত্রে বিচারকদের কখনই অন্য কোনও কারণে অপসারণ করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত নহে। তবেই তাঁহারা স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিভাগের সমুদয় কাজ নির্বাহ করিতে পারেন। তৃতীয়ত, বিচারকদের বেতন এবং অন্যান্য ভাতার পরিমাণ বেশী দিতে হইবে যাহাতে বিচারকগণের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শিত হয় এবং তাঁহারাও অর্থের প্রলোভনে নিজেদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি বিসর্জন দিতে না পারেন।

বিচারপতিদের যোগ্যতা (Qualifications of the Judges)— বিচার-বিভাগের প্রধানগণের নিজেদের পদমর্যাদায় কতিপয় যোগ্যতা থাকা চাই। প্রথমত, বিচারপতিগণের আইন শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা উচিত যাহাতে তাঁহারা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আইনের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, বিচারপতিগণকে সর্বদাই রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ হইতে হইবে

যাহাতে বিভিন্ন মামলার বিচার করিবার সময় কোন রকম রাজনৈতিক মতবাদ অথবা ধারণার বশবর্তী তাঁহারা না হন।

তৃতীয়ত, শাসনতন্ত্রের রক্ষক এবং ভাষ্যকার হিসাবে বিচারপতিগণকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া তাঁহাদের সর্বদাই বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র এবং রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে অবহিত থাকিতে হয়।

Exercise

1. Discuss the functions of the Executive of a Government.
(সরকারের শাসন-বিভাগের কাজগুলি আলোচনা কর।) (৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the functions of the Judiciary. What should be the qualifications of the Judges? (বিচার-বিভাগের বিভিন্ন কাজ সম্বন্ধে আলোচনা কর। বিচারপতিদের যোগ্যতা কিরূপ থাকা উচিত?) (৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা; ১০০-১০১ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the importance of the independence of Judiciary. How can the independence of Judiciary be ensured? (৯-১০০ পৃষ্ঠা)
(বিচার-বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর। কিভাবে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা অর্জন করা যাইতে পারে?)

ত্রয়োদশ অধ্যায় | সরকারের কাজ (Functions of the Government)

রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজ সম্বন্ধে রাষ্ট্রনীতিবিদ্গণ একমত নহেন। কেহ কেহ বলেন, রাষ্ট্রের কাজকর্ম যতদূর সম্ভব কম হওয়া উচিত; কারণ, জনসাধারণের বিভিন্ন কাজে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে। এই মতবাদকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ (individualism) বলা হয়। আবার কেহ কেহ মনে করেন, জনসাধারণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক। এই মতবাদকে সমাজতন্ত্রবাদ বলে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ *Laissez faire* নীতি বা স্বাধীন প্রচেষ্টার নীতির উপর ভিত্তিশীল। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র জনসাধারণের কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করিবে না। কারণ, জনসাধারণ নিজেদের ভালমন্দ রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক ভাল বোঝে এবং সেজন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে যুক্তি (Arguments in Favour of Individualism)—সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন লোকের প্রয়োজনীয় চাহিদা বিচার করিয়া দেখিবার এবং তাহা মিটাইবার যোগ্যতা রাষ্ট্রের আছে কিনা সে বিষয়ে

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থকগণ সন্দিহান। তাহাদের মতে মানুষ নিজের মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন। সুতরাং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইয়া সহজাত ন্যায়পরতার ভিত্তিতে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কাজ করিলে মানুষ প্রকৃত সুখী হইবে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকিলেই মানুষ আত্মবিশ্বাস হারাইয়া রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। সুতরাং ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হইয়া সহজাত ন্যায়পরতার ভিত্তিতে (Ethical argument) নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে দেওয়া উচিত।

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে মানুষ আত্মবিশ্বাস হারায়; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ মানুষকে নিজের সম্বন্ধে সচেতন করে

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের মতে যোগ্যতম ব্যক্তিগণকে বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। ডারউইন প্রদত্ত বিবর্তনবাদ (Doctrine of Evolution) প্রয়োগ করিয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীগণ বলেন রাষ্ট্রীয় সাহায্য না পাইলেও সমাজের যোগ্যতম ব্যক্তিগণ জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে এবং তাহাতে সমগ্র সমাজের অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে।

যোগ্যতম ব্যক্তির সুযোগ

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক দিক হইতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীগণের যুক্তি হইতেছে এই যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বেসরকারী প্রয়াস এবং উদ্যোগ বিনষ্ট হয়। তাহারা শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে সহযোগিতা অপেক্ষা পারস্পরিক প্রতিযোগিতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। অবাধ বাণিজ্যের (Free trade) মধ্য দিয়া শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন এবং উৎকর্ষ বৃদ্ধি হইবে বলিয়া *Laissez faire* তত্ত্বের সমর্থকগণ মনে করেন। জিনিসপত্রের দাম এবং আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের পারিশ্রমিক যদি অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, তবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীগণের মতে মূল্যস্তর স্বাভাবিক থাকে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা

চতুর্থত, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীগণ বলেন যে অতীতে অনেক দেশেই জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করার জন্য সমুদয় সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। যেহেতু জনসাধারণ নিজেদের ভাল মন্দ নিজেরাই বুঝিতে পারে সেজন্য তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে দূরে রাখিলেই তাহাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইবে।

জনকল্যাণে সরকারী প্রচেষ্টার ব্যর্থতা

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদের সমালোচনা—এই মতবাদের যে মোটেই যুক্তি নাই তাহা নহে। তবে এই মতবাদটিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা কোন দেশেই সম্ভবপর হয় নাই। এই মতবাদের বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি দেওয়া যায়।

প্রথমত, অবাধ প্রতিযোগিতা বিভিন্ন শিল্পকে অবাধ সংঘ প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার দেয় এবং এইভাবে একচেটিয়া কারবারের পথ সুগম করে।

দ্বিতীয়ত, একথা ঠিক নয় যে জনসাধারণ সর্বদাই নিজেদের ভালমন্দ নিজেরা বুঝিতে পারে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার নিরাপত্তা এবং সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিশেষ প্রয়োজন। অনেক সময় শিক্ষিত লোকেরাও ভুলের বশে নিজেদের স্বার্থের প্রতিকূল কাজ করিয়া থাকে। যাহাতে জনসাধারণের স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকে, সেজন্য সর্বক্ষেত্রেই কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা থাকা উচিত। দুর্বল এবং অক্ষমকে সাহায্য করিবার জন্য রাষ্ট্রকেই আগাইয়া আসিতে হয়।

রাষ্ট্র জনগণের ভাল-মন্দ জনগণ অপেক্ষা অনেক বেশী বুঝিতে পারে

তৃতীয়ত, আধুনিক যুগে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত কোন দেশ সুপরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে পারে না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের সৃষ্টি করে। কারণ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকায় অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোকেরা অন্যদের শোষণ করিতে পারে। অবাধ প্রতিযোগিতা অথবা অবাধ বাণিজ্য অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান এবং রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুত অর্জিত হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ দরকার

সর্বশেষে রাষ্ট্রীয় সহায়তা না থাকিলে জনসাধারণের মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশ হয় না এবং দেশের সামগ্রিক স্বার্থে ইহাকে কাজে লাগানো যায় না। রাষ্ট্রের সাহায্য অথবা সহযোগিতা পাইলেই মানুষ আদর্শ নাগরিক হইয়া নিজের এবং সমগ্র দেশের কল্যাণের জন্য চেষ্টা চালাইয়া যাইতে পারে।

জনগণের মানসিক বৃত্তির বিকাশে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ দরকার

সমাজতন্ত্রের আদর্শ (Ideal of Socialism)—রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের দিক হইতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। সমাজতন্ত্রে যাহারা বিশ্বাসী তাহাদের মতে রাষ্ট্র মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সমাজতন্ত্রে সব সামাজিক কাজেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকে। উৎপাদনের উপকরণগুলিও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন। সমাজতন্ত্রের আরও বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে জনগণের মধ্যে আয় ও ধনের বৈষম্য কমিয়া যায়, সমুদয় শিল্প ও জাতীয়করণ করা হয়, এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লাভের স্থানে সামাজিক লাভের বৃদ্ধি করাই সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য।

সমাজতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of Socialism)—সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলেই ইহার সুবিধাগুলি আমরা দেখিতে পাই। প্রথমত, সমাজতন্ত্রে ধনী-নির্ধনের মধ্যে তারতম্য অথবা পার্থক্য করা হয় না বলিয়া শ্রমিকদের এবং দরিদ্রদের স্বার্থ যথোপযুক্ত সংরক্ষিত হয়। সমাজ যখন সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত হয়, তখনই মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে এবং মানুষ তাহার পূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ন্যায়পরতার দিক হইতে আদর্শ হিসাবে সমাজতন্ত্রের স্থান খুবই উঁচুতে।

সমাজতন্ত্রের শোষণ নাই

দ্বিতীয়ত, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমরা যে অবাধ বাণিজ্য এবং প্রতিযোগিতা

দেখিতে পাই, তাহার অপচয়গুলি সমাজতন্ত্রে বন্ধ হয়। সমাজতন্ত্রে উৎপাদকগণ সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের প্রেরণায় কাজ করেন না। কারণ, সমাজতন্ত্রে সমুদয় মুনাফা সমাজের কোনও ব্যক্তিবিশেষের নহে। উৎপাদকগণের কাজের লক্ষ্য হইতেছে সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নতি করা।

মুষ্টিমেয়ের অর্থনৈতিক সাম্য

তৃতীয়ত, নীতিশাস্ত্রের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া সমাজতন্ত্রবাদীগণ দাবি করেন যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের নৈতিক চরিত্রের মান অবনত হয় এবং অসততা বাড়িয়া যায় বলিয়া সমাজতন্ত্র দেশের শাসন-ব্যবস্থার নৈতিক মান অনেক উন্নত করে। সমাজতন্ত্রবাদীগণ মনে করেন যে যতদিন ধনের বৈষম্য থাকিবে এবং সেজন্য মুষ্টিমেয় লোকের হাতের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইবে, ততদিন লোকের ভোটাধিকারের মূল্য নাই। সম্পত্তির সাম্য এবং অর্থনৈতিক সাম্য রাজনৈতিক অধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

সামাজিক মালিকানায় সকলের অর্থনৈতিক হিতার্থে প্রাকৃতিক সম্পদগুলি পরিচালিত হয়

চতুর্থত, জমি, খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় না থাকিয়া সামাজিক মালিকানার অধীন থাকিলে এইগুলি সমাজের সকলের হিতার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। তাহাতে সব মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে সমান উপকার পায়। তাহা ছাড়া, মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ সমগ্র সমাজের স্বার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। সমষ্টিগত স্বার্থের উন্নতি হইলেই মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থের উন্নয়ন সম্ভবপর হয়।

সমাজতন্ত্র গণতন্ত্রের পরিপূরক

পঞ্চমত, গণতন্ত্রের সার্থক রূপ দেখিতে পাওয়া যায় যদি সমাজতন্ত্রকে গণতন্ত্রের পরিপূরক ধরিয়া লওয়া হয়। গণতন্ত্রে সকলকেই সমান অধিকার দেওয়া হয়। সমাজতন্ত্রে সকলকেই রাষ্ট্র সমান দৃষ্টিতে দেখে, সমান অধিকার ও সুযোগ দান করে এবং সর্বপ্রকার শোষণ হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করে। সর্বশেষে সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হয় বলিয়া অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুত হয়।

সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Socialism)— সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল ইহা রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতার উপর অত্যধিক আস্থা রাখে এবং ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার কোন মূল্য দেয় না।

সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ

দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের চাপে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের কর্মকুশলতা কমিয়া যায়; কারণ জনসাধারণ ইহার গঠনমূলক সমালোচনা করিবার সুযোগ পায় না।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বে-সরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা নষ্ট হয়। মানুষ যদি তাহার ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিচয় কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে দিতে না

পারে, তবে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। সমাজতন্ত্রে মানুষ নিজের পছন্দ অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ, প্রত্যেকের বৃত্তি নির্বাচনের (choice of occupation) ক্ষমতা থাকে রাষ্ট্রের হাতে।

সমাজতন্ত্রে বৃত্তি নির্বাচনের স্বাধীনতা নাই

চতুর্থত, উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইলে উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। ধনতন্ত্রে উৎপাদকগণ যখন কোন জিনিস উৎপাদন করে, তখন লাভের আশায় তাহারা খুবই আন্তরিকভাবে কাজ করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে লাভের অর্থ যায় রাষ্ট্রের হাতে ; সেখানে উৎপাদকগণও আন্তরিকভাবে কাজ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করে না।

সমাজতন্ত্রে উৎপাদনে ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা নষ্ট হয়

পঞ্চমত, সমাজতন্ত্রবাদীগণ মানুষকে তাহার নিজের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যতটা স্বার্থপর মনে করেন, মানুষ যে সব সময়েই সেই প্রকার হয়, তাহা নহে। আমেরিকা একটি ধনতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু, সেই দেশের শ্রমিকদের যে অবস্থা খুব খারাপ তাহা নহে। বরং একজন আমেরিকানের মাথাপিছু জাতীয় আয় একজন রাশিয়ানের মাথাপিছু জাতীয় আয় অপেক্ষা অনেক বেশী ; জীবন যাত্রার মানও রাশিয়া অপেক্ষা আমেরিকায় অনেক উন্নত। সুতরাং শ্রমিকরা কখন কতটা সুবিধা পাইবে তাহা মালিকদের মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলেই যে শিল্পপতিগণ সর্বদা শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন, এমন কোনও কথা নাই।

সমাজতন্ত্র ছাড়াও অর্থ নৈতিক উন্নতি হইতে পারে

সর্বশেষে, আধুনিক সমাজতন্ত্র বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত,—ইহার কোন নৈতিক ভিত্তি নাই। তাহা ছাড়া, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় মানুষের সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষ আত্মনির্ভরশীলতা হারাইয়া ফেলে। তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে আধুনিককালে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা এবং তত্ত্বাবধান ব্যতীত কোনও রাষ্ট্রের পক্ষে সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং বিজ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর নহে।

সমাজতন্ত্র বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

সরকারের ক্রিয়াকলাপ (Functions of the Government)—রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষেই কতিপয় আবশ্যিক অথবা প্রাথমিক কাজ (Essential or Primary functions) আছে। আবার কতিপয় কাজ আছে যেগুলি প্রয়োজন অনুসারে করা হয়। এইগুলিকে ঐচ্ছিক কাজ (Optional or Non-essential function) বলে। প্রয়োজনীয় কাজগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, সেগুলি প্রথমত রাষ্ট্রের এবং জনসাধারণের বিভিন্ন আইনগত অধিকার ও স্বাধীনতার সহিত জড়িত।

রাষ্ট্রের দুই প্রকার কাজ

দ্বিতীয়ত, এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সহিত জনগণের সম্পর্ক

এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের আবশ্যিক কাজগুলি স্থিরীকৃত হয়। যুদ্ধ এবং শান্তির সময়ে পররাষ্ট্রের সহিত কিরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে, তাহা নির্ধারণ করা রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় কাজ। দেশের নাগরিকদের কী পরিমাণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের কী সম্পর্ক হইবে, তাহা নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করাও রাষ্ট্রের কাজ। এজন্য রাষ্ট্রকে সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, পুলিশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এবং অনেক সরকারী কর্মচারী নিযোগ করিতে হয়।

রাষ্ট্রের একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ

তৃতীয়ত, দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে একদিকে যেমন, কারা বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগ বজায় রাখিতে হয়, অপরদিকে সেই প্রকার একটি বিচার-বিভাগ স্থাপন করিতে হয়। যে কোন ধরনের সরকারই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, রাষ্ট্রকে এই কাজগুলি সর্বদাই করিতে হয়। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ইহার সার্বভৌমত্ব। নিজের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে একটি সামরিক বিভাগ রাখিতে হয়।

চতুর্থত, রাষ্ট্রের আর একটি প্রয়োজনীয় কাজ হইতেছে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। রাষ্ট্রের অন্যান্য কাজ হইতেছে, জনসাধারণের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রসার করা।

রাষ্ট্রের অন্যান্য আবশ্যিক কাজ

রাষ্ট্রের বিকল্প অথবা ইচ্ছামূলক কাজগুলি রাষ্ট্রের ক্ষমতা অথবা নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতার সহিত জড়িত নয়। রাষ্ট্র এই কাজগুলি করে নাগরিকদের সাধারণ কল্যাণের জন্য। (১) নাগরিকদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে নিজেই উদ্যোগী হইতে পারে। (২) শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইলে রাষ্ট্র কোনও কোনও প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতি করিবার দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারে। (৩) রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, শ্রমিক-কল্যান, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে নিজেই বিভিন্ন কাজ করিতে পারে। (৪) সমাজে যাহারা বেকার, বৃদ্ধ এবং পঙ্গু, তাহাদের দুর্গতি দূর করিবার জন্য রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে বেকার-ভাতা, বার্ধক্য-ভাতা এবং অক্ষমতার ভাতা ইত্যাদি প্রচলন করিতে পারে। সাধারণত কল্যাণ-রাষ্ট্রে এই ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হয়। কল্যাণ-রাষ্ট্রের এই কাজগুলি বর্তমানে সরকার ক্রমে ক্রমে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। এই জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় এবং ইচ্ছামূলক কাজের মধ্যে সীমারেখা টানা ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িতেছে জনসাধারণের সুবিধার জন্য রেলপথ স্থাপন করা পূর্বে রাষ্ট্রে ইচ্ছামূলক কাজ বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু বর্তমানে ইহাকে রাষ্ট্রের একটি

রাষ্ট্রের ইচ্ছামূলক কাজ

কল্যাণ রাষ্ট্রের কাজ

আবশ্যিক এবং ইচ্ছামূলক কাজের মধ্যে সীমারেখা টানিবার অসুবিধা

প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়া মনে করা হয়। এমন কি শিক্ষা বিস্তারেও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্রমেই স্বীকৃত হইতেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করিবার ক্ষমতা মানুষের আছে, এই বিশ্বাস যতই বাড়িতেছে ততই বে-সরকারী ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে স্বীকৃত হইতেছে।

জনগণের কল্যাণেই রাষ্ট্রের কল্যাণ, এবং রাষ্ট্রের সমুদয় কর্মপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্য জনগণের কল্যাণ করা,—এই তত্ত্বটি যখনই স্বীকৃত হইবে তখনই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় এবং ইচ্ছামূলক কাজের মধ্যে কোনও সংঘাতের সৃষ্টি হইবে না।

Exercise

1. Critically discuss the Ideal of Individualism.
(ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের আলোচনা ও সমালোচনা কর।) (১০১-১০৩ পৃষ্ঠা)
2. What do you mean by Socialism? What are its merits and demerits?
(সমাজতন্ত্র বলিতে তুমি কি বোঝ? ইহার সুবিধা ও অসুবিধা কি কি?) (১০৩-১০৫ পৃষ্ঠা)
3. Discuss the arguments for and against Individualism.
(ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর।) (১০১-১০৩ পৃষ্ঠা)
4. What are the principal functions of the modern government in a modern state? (১০৫-১০৭ পৃষ্ঠা) (H. S. 1967)
(আধুনিক রাষ্ট্র সরকারের প্রধান কাজগুলি কি কি?)
5. Enumerate some of the essential and optional functions of the state.
(রাষ্ট্রের কতিপয় প্রয়োজনীয় এবং কতিপয় বিকল্প কাজের বর্ণনা কর।) (১০৫-১০৭ পৃষ্ঠা)

চতুর্দশ অধ্যায়

আইন ও স্বাধীনতা (Law and Liberty)

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কতিপয় নিয়মের প্রয়োজন হয় এবং নাগরিকদের নিয়মগুলি পালন করিতে হয়। এই নিয়ম নাগরিকদের প্রতিনিধিগণই সাধারণত প্রণয়ন করে। এই নিয়মগুলি একবার প্রণীত হইয়া গেলে রাষ্ট্রের সব সদস্যই সেইগুলি পালন করিতে বাধ্য। তবে এই নিয়মগুলি নাগরিকদের শুধু বহির্জীবনকেই নিয়ন্ত্রিত করে। এইগুলিকেই আমরা আইন বলি।

আইনের সংজ্ঞা (Definition of Law)—"আইন" শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, সমাজ জীবনে মানুষ সামাজিক আইন (Social Law) মানিয়া চলে,

অথবা সভ্য জীবন যাপনের জন্য মানুষকে নৈতিক আইন (Ethical Law) পালন করিতে হয়। কিন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনের সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক।

আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা

আইন সম্বন্ধে অনেকগুলি সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। অষ্টিনের মতে আইন হইতেছে সার্বভৌমের আদেশ। অর্থাৎ আইনের একমাত্র উৎস সার্বভৌম শক্তি। সার্বভৌম শক্তি হইতেছে একটি উচ্চস্তরের মানবীয় কর্তৃপক্ষ ("a determinate human superior")। জনসাধারণকে এই সার্বভৌমের আদেশকে আইন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক মতবাদের সমর্থকগণের মতে অষ্টিনের দেওয়া সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেক দেশেই প্রচলিত প্রথা (conventions or traditions) এবং বিচারলয়ের সিদ্ধান্ত হইতে কিছু না কিছু আইনের সৃষ্টি হয়। অষ্টিনের সংজ্ঞানুযায়ী সেগুলিকে উপেক্ষা করা হয়। পরবর্তীকালে অষ্টিনের সমর্থকগণ অষ্টিনের প্রদত্ত সংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন করেন। উইলসনের মতে আইন হইতেছে সমাজে প্রচলিত চিন্তাধারা ও অভ্যাসের সেই অংশ, যে অংশ কতিপয় নির্দিষ্ট সময়ের মাধ্যমে জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং যে নিয়মগুলি শাসনকর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং প্রভাব দ্বারা কার্যকর করেন।[১]

হল্যাণ্ডের (Holland) মতে আইন হইল মানুষের বহির্জীবনের কাজের একটি সাধারণ নিয়ম যাহা একটি রাজনৈতিক সংস্থার সার্বভৌম ক্ষমতার সাহায্যে বলবৎ হয়।[২]

আইনের স্বরূপ (Nature of Law)—উড্রো উইলসনের মতে আইন হইতেছে মানুষের চিন্তাধারার দর্পণ স্বরূপ। ইহা একটি সক্রিয় শক্তি যাহা শারীরিক এবং নৈতিক শক্তির মাধ্যমে বলবৎ হয়। মানুষের পরিবর্তনশীল চিন্তাধারা মানুষের সৃষ্ট আইন রূপ পায়। কোন দেশের বিভিন্ন আইন পর্যালোচনা করিলে আমরা সেই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন বিশিষ্টতার পরিচয় পাই।

আইনের স্বরূপ (Nature of Law)

আইনের প্রকৃতি আলোচনা করিলে আমরা ইহার দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। একটি হইতেছে ইহার সার্বজনীন রূপ (Generality)। আইন সমাজের প্রত্যেকের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য। যাঁহারা আইন প্রণয়ন করেন, তাঁহারাও বর্তমানকালে আইনের হাত হইতে রেহাই পান না। ধনী-নির্ধন, বড়-ছোট, সকলেই সমানভাবে আইনের অধীন। দ্বিতীয়ত, আইনের একটি বাধ্যবাধকতা আছে। অর্থাৎ লোকে আইন পালন

আইন সকলের প্রতি প্রযোজ্য

---

১ "Law is that portion of the established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of government."—Wilson.

২ "Law is a poiitical rule of external action enforced by a sovereign political authority."—Holland.

করিতে বাধ্য হয়। ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমটি হইতেছে, কেহ যদি আইন পালন না করে তবে রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দিবে। ইহা হইতেছে শারীরিক বাধ্যতা (Physical compulsion)। তাহা ছাড়া, কেহ কেহ নৈতিকবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আইন পালন করে। ইহা হইতেছে আইনের নৈতিক বাধ্যতা (ethical compulsion); কিন্তু যখন মানুষ আইন অমান্য করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয় এবং অপরের স্বাধীনতা খর্ব করে তখনই রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়।

আইনের একটি বাধ্যবাধকতা আছে

আইনের অনুমোদন (**Sanction of Law**)—আইন অমান্য করিলে শাস্তি পাইতে হইবে, ইহা আইন পালন করিবার একটি প্রধান কারণ। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আইন পালন করিবার বাধ্যবাধকতাই আইন পালনের একমাত্র সর্ত নয়।

আধুনিক লেখকদের মতে আইন হইতেছে মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণের কতিপয় নিয়ম যাহা জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণের সম্মতিই প্রকৃতপক্ষে আইনের কার্যকারিতার ভিত্তি। অধ্যাপক লাস্কির মতে আইন কার্যকরী চাহিদার উপর ভিত্তিশীল। আইনের প্রতি আনুগত্য বর্তমান কালের লেখকদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্র সার্বভৌম শক্তির ধারক মাত্র। জনসাধারণ কর্তৃক রাষ্ট্রকে এই ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে আইনের পিছনে জনগণের সম্মতির (sanction) ভিত্তি খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে শুধু রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের কথা চিন্তা করিলে চলিবে না। অধ্যাপক লাস্কির মতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়াও অন্যান্য কারণে রাষ্ট্রের আইনকে নিজের সার্থকতা প্রমাণ করিতে হইবে। রাষ্ট্র সম্বন্ধে রাষ্ট্রদর্শনের পক্ষে উপযুক্ত কোন তত্ত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে রাষ্ট্রের আইন কেন রচিত হইয়াছে, ইহার কী লক্ষ্য, অথবা কেন ইহা মনে করে যে এই লক্ষ্যগুলি আমাদেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত। আইনের অনুমোদনের একটি ভিত্তি হইতেছে ইহা পালন করিবার আইনগত বাধ্যবাধকতা। কিন্তু, তাহা অপেক্ষাও বড় সর্ত হইতেছে ইহা জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা।

আইনের অনুমোদন সম্পর্কে লাস্কির অভিমত

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অনেক শক্তি অনেকভাবে কাজ করে। কাহারও ব্যক্তিগত অনেক স্বার্থ থাকিতে পারে, অথবা যৌথভাবে হয়ত বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন স্বার্থ থাকিতে পারে। এই সব স্বার্থ যে সর্বদাই একপ্রকার হয়, তাহা নহে—ইহা কোনও সময়ে পরস্পরের প্রতিযোগী, আবার কোনও সময়ে পরস্পরের সহযোগী। সুতরাং রাষ্ট্র যদি কখনও এই ইচ্ছা করে যে, জনসাধারণ রাষ্ট্রের আইনের প্রতি স্বভাবজাত আনুগত্য প্রকাশ করিবে তবে ইহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ইহা সর্বাধিক পরিমাণে সমাজের বিভিন্ন চাহিদা মিটাইতে পারে। রাষ্ট্রের আইন

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অনেক প্রকার স্বার্থ; আইনের দায়িত্ব সেগুলির মধ্যে সমন্বয়ে সাধন করা

এবং সমাজের বিভিন্ন স্বার্থ এবং চাহিদার মধ্যে একটি সমতা আনিতে হইবে। নাগরিকদের জীবনের সুখ-সুবিধার জন্য রাষ্ট্রের আইন কতটা কি করে তাহার উপরেই নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি জনসাধারণ কতটা আনুগত্য প্রকাশ করিবে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, আইনের অনুমোদন সম্বন্ধে ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানের আইন হইতেছে সমাজের সাধারণ ইচ্ছার (general will) একটি বাস্তব রূপ। সরকারকে আইনের প্রতি জনগণের আনুগত্য আদায়ের জন্য শক্তি প্রয়োগ না করিলেও চলে যদি সেই আইন জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি বাস্তবে রূপায়িত হইবার পথে প্রতিবন্ধক না হইয়া সহযোগী হয়।

প্রখ্যাত বিধানের অনুমোদন

সেক্ষেত্রে জনগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। কারণ আইন সেখানে তাহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার পক্ষে সহায় হয়। রাষ্ট্রের আইন ছাড়াও প্রচলিত প্রথা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকিতে পারে সেগুলিকে আইনের মর্যাদা আমরা প্রদান করি। যেমন, ইংলণ্ডে আমরা বিভিন্ন প্রচলিত নিয়ম (conventions) দেখিতে পাই। সেইগুলি অনুমোদনের (sanction) প্রধান ভিত্তি হইল জনমতের প্রভাব। তাহা ছাড়া, এই প্রচলিত নিয়মগুলি মানিয়া না চলিলে শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। জনমতই হইল আইন অনুমোদনের প্রধান শক্তি। রাষ্ট্র যদি জনমতকে স্বপক্ষে আনিতে পারে তবে আইনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে ইহা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। রাষ্ট্র তখনই জনমতকে স্বপক্ষে আনিতে পারে এবং আইনের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে যখন ইহার উদ্দেশ্যের সহিত জনগণের স্বার্থের সংঘাত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

যে কোন রাষ্ট্রের আইন সার্থকতা অর্জন করে ইহা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহে সেই অনুযায়ী এবং আমদিগকেও সেইভাবেই আইন সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে।

আইনের উৎস (Sources of Law)—রাষ্ট্রই যে সর্বদা আইনের সৃষ্টি করে, তাহা নহে। আইনের সৃষ্টি অনেক শক্তির মাধ্যমে হইতে পারে ; যেমন, সামাজিক প্রথা, ধর্ম, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, ন্যায়পরায়নতা, আইনবিদ্গণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, আইন-প্রণয়ন ইত্যাদি।

১। **প্রথা (Custom)**—বিভিন্ন দেশে কতিপয় প্রথাগত বিধান আইনের সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রথাগুলি আইনগত সার্বভৌমের আদর্শে সৃষ্ট হয় না। এমন কি আইনগত সার্বভৌমকেও এই প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলিতে হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন আইনের পরিপূরক হিসাবে এই প্রথাগত বিধানগুলিও আইনের মর্যাদা লাভ করে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ব্রিটেনের কথা উল্লেখ করিতে পারি। ব্রিটেনে প্রথাগত বিধান অনুযায়ী মন্ত্রিসভাই দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং রাজা (বা রানী) শুধু নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু অনেক পূর্বে রাজাই দেশের প্রকৃত শাসক ছিলেন। প্রয়োজনের তাগিদেই এই প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে যে

ইংলণ্ডে প্রথাগত বিধান অনেক আইনের সৃষ্টি করিয়াছে

রাজাকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করিতে হইবে। দেশে যদি লিখিত এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্র থাকে, তবুও প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠিতে পারে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নহে, সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক প্রথা আইনের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। যদি জনমত এই সকল প্রথা বজায় রাখিবার পক্ষপাতী হয়, তবে রাষ্ট্র সেগুলি উপেক্ষা করিতে পারে না।

২। **ধর্ম (Religion)**—শুধু প্রচলিত প্রথাই নহে, ধর্মীয় অনুশাসনও অনেক ক্ষেত্রে আইনের উৎস হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে। সমাজ-জীবনে শৃঙ্খলা আনয়নে ধর্মীয় অনুশাসনগুলির বরাবরই একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। পুরাকাল হইতেই ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে। বর্তমানকালেও আমরা ইহার প্রভাব দেখিতে পাই। ভারতে উত্তরাধিকার আইন (Succession Act) প্রণয়নে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করা হইয়াছে। হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের জন্য সেক্ষেত্রে পৃথক পৃথক আইন ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব সূচিত করে।

ভারতে ধর্ম আইনের উৎস হিসাবে কাজ করিয়াছে

৩। **বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত (Adjudication of judicial interpretation)**—আদালতে বিচারকগণের সিদ্ধান্ত অথবা আইন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা অনেক সময়ে নূতন আইনের সৃষ্টি করে। যখন কোনও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয় না অথবা কোনও আইনের প্রকৃত অর্থ পরিষ্কার হয় না, তখন বিচারকগণ সেই আইন সম্বন্ধে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন অথবা নূতনভাবে আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কোন বিচারকের গৃহীত সিদ্ধান্ত অথবা ব্যাখ্যা যদি অপর বিচারকগণ অনুসরণ করেন, তবে সেই সিদ্ধান্ত অথবা ব্যাখ্যা নূতন আইনে পরিণত হয়।

বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত আইনের উৎস

৪। **ন্যায় বিচার (Equity)**—শুধু আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করাই নহে, বিচারকগণ অনেকক্ষেত্রে ন্যায়ের (Justice) খাতিরে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ীও কোনও আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। রাষ্ট্রের আইন যে সর্বদাই ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রেই ইহার মধ্যে ন্যায়পরতার অভাব থাকিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিচারকগণ নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কোনও আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।

ন্যায় বিচার

৫। **আইনবিদ্‌গণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (Scientific) discussion)**—অনেক সময় আইনবিদগণের মিলিতভাবে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সাহায্যেও কোন আইনের নূতন ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং সেই ব্যাখ্যা যদি আদালত কর্তৃক গৃহীত হয় তবেই ইহা আইনে পরিণত হইতে পারে। প্রাচীনকালেও সর্বজনস্বীকৃত পণ্ডিতদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আইনের মর্যাদা লাভ করিত। প্রসঙ্গক্রমে আমরা মনু-সংহিতা, পরাশর-সংহিতা ভৃগু-সংহিতা প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি।

আইনবিদ্‌গণের আলোচনা

৬। **আইনসভা (Law-making body)**—বর্তমানকালে আইনের সর্বপ্রধান উৎস হইল আইনসভা। গণতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণের সম্মিলিত ইচ্ছা আইনের মাধ্যমে রূপ পায়। যেহেতু আইনসভা প্রণীত আইন সার্বভৌম কর্তৃক কার্যকর হয়, আইনসভাই বর্তমানে আইনের সর্বপ্রথমে উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে আইন প্রণয়ন করিবার সময় আইনসভা প্রচলিত প্রথা, ন্যায়বিচার, ধর্মীয় মতবাদ ইত্যাদি উপেক্ষা করিতে পারে না।

আইনসভা

ওপেনহিম্ (Oppenheim) মনে করেন, আইনের মাত্র একটিই উৎস আছে, তাহা হইতেছে, সমাজের সাধারণ সম্মতি। জনগণের সাধারণ সম্মতিই বিভিন্নভাবে প্রথা, আচার-ব্যবহার, ন্যায়পরতা, ধর্মীয় মতামত প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

(a) **বিভিন্ন ধরনের আইন (Different types of Law)**—আমরা বিভিন্নভাবে আইনের শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি। প্রথমত, আমাদের দেখিতে হইবে কোন্ উৎস হইতে আইন প্রণীত হইয়াছে ; দ্বিতীয়ত, আইনটি সরকারী অথবা ব্যক্তিগত তাহাও আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। নাগরিকদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ভাবে যে সকল অধিকার আছে তাহার বর্ণনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আইন প্রণীত হয় তাহাকে আমরা ব্যক্তিগত আইন (Private Law) বলি। সরকারী আইন (Public Law) রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লষণ করে। সরকারী আইন রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক অধিকার এবং সম্পর্কের সহিত সংশ্লিষ্ট।

আইনের শ্রেণীবিভাগ

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও আমরা সাধারণ আইন (Common Law), সংবিধানের আইন (Constitutional Law), পৌর আইন (Municipal Law), শাসন সংক্রান্ত আইন (Administrative Law), ফৌজদারী আইন (Criminal Law), আইনসভা প্রণীত আইন (Statutes), এবং অর্ডিন্যান্সের (Ordinance) মধ্যে আইনের শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাই।

সংবিধানে দেশের শাসন সম্পর্কিত, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক, কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্য সরকারের, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্ক এবং নাগরিকগণের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে যে সকল নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ থাকে সেগুলিকে আমরা সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law) বলি। সাধারণ আদালত ছাড়া অপর একটি আদালতে অপরাধী সরকারী কর্মচারীদের পৃথক বিচার করিবার জন্য যে আইন প্রণীত হয়, তাহাকে আমরা বলি শাসনসংক্রান্ত আইন (Administrative Law)। অপরাধ সংক্রান্ত অথবা অপরাধ অনুযায়ী অপরাধীগণকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য যে আইন প্রণীত হয়, তাহাকে আমরা বলি ফৌজদারী আইন অথবা দণ্ডবিধি (Criminal Law)। যখন বিভিন্ন প্রথা হইতে উদ্ভূত আইন সংক্রান্ত কতিপয় নীতি দেশের আদালত স্বীকার করিয়া লয় এবং অন্যান্য আইনের ন্যায় বলবৎ করে, তখন সেইগুলিকে আমরা সাধারণ আইন (Common Law) বলি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী প্রকার হইবে, এবং যুদ্ধ অথবা শান্তির

সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র কোন্ নীতি অনুযায়ী চলিবে, সেই সম্বন্ধে যে সকল আইন প্রচলিত সেগুলিকে আমরা আন্তর্জাতিক আইন বলিয়া কোনও রাষ্ট্রের আইনসভা সাধারণভাবে যে আইন প্রণয়ন করে, তাহাকে আমরা আইন পরিষদ কর্তৃক সৃষ্ট আইন (statutes) বলিতে পারি। আবার জরুরী অবস্থায় অথবা আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকাকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা নিজের ঘোষণাপত্র দ্বারা সাময়িকভাবে একটি আদেশ (Ordinance) জারী করিতে পারেন। ইহাও আইন হিসাবে পরিগণিত হয়। আইনের নিয়ম (Rule of Law) কথাটির তাৎপর্য হইতেছে, (১) আইনের চোখে সকলেই সমান এবং (২) প্রত্যেক নাগরিকই সাধারণ আদালতের এলাকাধীন। আইন ভঙ্গ না করিলে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া যাইবে না। ইংলণ্ডে ইহা প্রচলিত আছে।

নৈতিক আইন (Moral laws) বলিতে আমরা বুঝি এমন কতিপয় নিয়ম যেগুলি মানুষের অন্তর্জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিতে নাই; ইহা একটি নৈতিক আইন। যখন কোন নিয়ম মানুষের বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সেই নিয়ম রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকর হয়, তখন ইহাকে আমরা প্রকৃত আইন বলি। বস্তুত, প্রাকৃতিক আইন এবং নৈতিক আইনকে আমরা প্রকৃতপক্ষে আইন বলিতে পারি না। ইহাকে কোন সার্বভৌম শক্তি কার্যকর করে না।

আন্তর্জাতিক আইন (International Law)—রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পরস্পরের সহিত সম্প্রীতি এবং মৈত্রী সম্পর্ক রাখিবার জন্য এবং একটি রাষ্ট্রের অপর রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কে নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য সকলেই সাধারণ সম্মতিতে যে নিয়ম পালন করে তাহাকেই আমরা আন্তর্জাতিক আইন বলি। আন্তর্জাতিক আইন যুদ্ধের সময় এবং শান্তির সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। কোনও দেশ অপর দেশে অবস্থানকারী ইহার নাগরিকদের উপর কতটা কর্তৃত্ব করিতে পারে তাহাও আন্তর্জাতিক আইন নির্দেশ করে।

আন্তর্জাতিক আইন কাহাকে বলে?

আন্তর্জাতিক আইন গঠনে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভূমিকা

বর্তমান জগতে বিভিন্ন দেশ পরস্পরের উপর বিশেষ নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক দেশকেই অপর দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্য দিয়া প্রথমে স্থাপিত হয় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক। এই অর্থনৈতিক সম্পর্কই কালক্রমে রাজনৈতিক সম্পর্কের আকার ধারণ করে। শুধু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যই নহে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কও থাকিতে পারে। এক কথায়, বর্তমান জগতে কোনও রাষ্ট্রই এককভাবে টিকিয়া থাকিবার কথা চিন্তা করিতে পারে না।

প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই অপর রাষ্ট্রের উপর বিভিন্ন ব্যাপারে নির্ভর করিতে হয়। একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যাহা খুশী করিয়া

যাইবে এই নীতি কোনও রাষ্ট্রই সমর্থন করিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে বিশ্বশান্তি ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু, আমরা আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইন বলিতে পারি কি না। কারণ, প্রথমত, ইহা কোনও নির্দিষ্ট উচ্চস্তরের মানবীয় কর্তৃপক্ষ প্রণয়ন করেন নাই। দ্বিতীয়ত, কোনও রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে। যে আইন অমান্যের পিছনে কোনও শাস্তির ভয় নাই, সেই আইনকে প্রকৃতপক্ষে আইন বলা যায় না। কোনও রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিলেই, আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্ন গুরুত্ব লাভ করে। সর্বশেষে, আন্তর্জাতিক আইন হইতেছে কতিপয় অসম্পূর্ণ নিয়মের সমষ্টি, যেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে একটি সংগঠিত জাতিসংঘে প্রয়োগ করা হয়।

আন্তর্জাতিক আইন কি প্রকৃত আইন

একটি রাষ্ট্র যতক্ষণ আন্তর্জাতিক আইন পালন করিতে চাহে, ততক্ষণ পর্যন্তই আন্তর্জাতিক আইন গ্রাহ্য। কিন্তু কোন রাষ্ট্রই বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক আইন অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারে না। আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান অনুমোদন হইল শক্তিশালী জনমত। বর্তমানে এমন দিন আসিয়াছে যে আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিলেই কোন রাষ্ট্রকে জনপ্রিয়তা হারাইতে হয়। কিন্তু, এজন্য যে আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ করা হয় না, তাহা নহে। কিন্তু, তাহাতে আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। সাধারণ রাষ্ট্রীয় আইনও অনেক সময় ভঙ্গ করা হয়, তাহাতে ইহার আইনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে আমরা প্রকৃতপক্ষে আইন বলিতে পারি। জাতিসংঘের অন্যতম কাজ হইল আন্তর্জাতিক আইন যেন সর্বদা বিভিন্ন রাষ্ট্র পালন করে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

আন্তর্জাতিক আইনের অনুমোদন ?

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস (Sources) হইতেছে ছয়টি। যথা :—(১) রোমান আইন ; (২) বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থাবলী ; (৩) সন্ধি এবং বিভিন্ন জাতির মহাসভা ; (৪) আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং বিচার-বিভাগীয় ট্রাইবুন্যাল ; (৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আইন এবং (৬) কূটনৈতিক মত আদান-প্রদান। উলসি, লরেন্স, হল্, এবং ওপেনহিম প্রভৃতি লেখকদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এবং গ্রন্থাবলী বর্তমানের আন্তর্জাতিক আইনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস

আইন ও নীতিশাস্ত্র (Law and Morality)—আইন মানুষের বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু, নীতিশাস্ত্র মানুষের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের সহিত, অর্থাৎ সমগ্র জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। মিথ্যা কথা বলা যদি রাষ্ট্রীয় আইনের লঙ্ঘন বুঝায় তবে তাহা সরকারী দৃষ্টিতে অপরাধ বুঝায়। কিন্তু, কেহ মিথ্যা কথা বলিলে যদি সরকারী আইনের লঙ্ঘন না হয়, তবে ইহা আইনের দিক হইতে অপরাধ নহে বটে, কিন্তু নীতিশাস্ত্রের দিক হইতে ইহা অপরাধ। সুতরাং আইন ও নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র।

আইন ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক আইনের মধ্যে পার্থক্য

দ্বিতীয়ত, অনুমোদনের দিক হইতে রাষ্ট্রীয় আইন এবং নৈতিক আইনের মধ্যে পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রীয় আইন কেহ ভঙ্গ করিলে তাহাকে শাস্তি পাইতে হয়। কিন্তু নৈতিক আইন ভঙ্গ করিলে তাহাকে রাষ্ট্রের নিকট হইতে শাস্তি পাইতে হয় না। তবে নিজের বিবেকের কাছে সে অপরাধী থাকে এবং হয়ত জনমত তাহাকে উপহাস করিতে পারে। সুতরাং শারীরিক শাস্তি যেখানে রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গ করা প্রতিরোধ করে, বিবেকের দংশন অথবা সমাজের উপহাস সেখানে নীতিবিরোধী কাজ করা প্রতিরোধ করে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় আইনগুলি নৈতিক আইন অপেক্ষা অনেক বেশী সুস্পষ্ট এবং সুসম্বদ্ধ। তাহা ছাড়া, নৈতিক আইন হইতেছে সর্বদেশের এবং সর্বকালের। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন হইতেছে আপেক্ষিক এবং বিশেষ একটি যুগে একটি দেশের উপযোগী। প্রয়োজন হইলে আমরা রাষ্ট্রীয় আইন বাতিল করিতে পারি অথবা ইহা সংশোধন করিতে পারি। কিন্তু নৈতিক আইন অমান্য করিতে পারিলেও আমরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ইহার পরিবর্তন করিতে পারি না।

চতুর্থত, নৈতিক আইনের ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট মান আছে এবং ধর্মভীরুদের এই মান অনুযায়ী কাজ করিতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনে ব্যক্তিগত ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে কোন মান নাই। তবে রাষ্ট্রকে আইন-প্রণয়ন করিবার সময় সামাজিক মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা চিন্তা করিতে হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং এইজন্য প্রয়োজন হইলে ইহার আইন নীতিশাস্ত্রের সহিত সম্পর্ক বিবর্জিত হইবে। বিশেষত, যুদ্ধের সময় অনেক রাষ্ট্রীয় আইন নীতিশাস্ত্রের বিরোধী হয়। আইন হয়ত অনেক কাজ সম্পর্কে নাগরিকদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারে। কিন্তু সেগুলি যে সর্বদাই নৈতিক নিয়ম অনুযায়ী হইবে, তাহা নহে। তবে অনেক ক্ষেত্রে নৈতিক নিয়মকে রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা দেওয়া হয় যদি সেই নৈতিক নিয়ম সামাজিক স্বার্থের সহিত এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সহিত জড়িত থাকে। কাহাকেও হত্যা করা হইলে অন্যায় হয়, ইহা একটি নৈতিক নিয়ম, সেই প্রকার ইহা একটি রাষ্ট্রীয় আইন। অনেক সময় রাষ্ট্রীয় আইন নৈতিক মানের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। পূর্বে আমাদের দেশে ধারণা ছিল, বালিকাদের খুবই অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া নীতিশাস্ত্র অনুমোদিত ; কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন যখন বাল্য-বিবাহ প্রতিরোধ করিল, তখন এই ধরনের বিবাহ নৈতিক আইনের দিক হইতে অবাঞ্ছনীয় মনে হইতে লাগিল। সতীদাহ প্রথা বর্তমানে আমরা অন্যায় বলিয়া মনে করি, কেননা লর্ড বেন্টিংকের আমলে ইহা আইন বিরোধী কাজ বলিয়া পরিগণিত হয়।

স্বাধীনতার অর্থ (Meaning of Liberty)—ইংরেজী শব্দ "Liberty" কথাটি আসিয়াছে ল্যাটিন শব্দ "Liber" হইতে। এই কথার অর্থ হইতেছে অবাধ স্বাধীনতা। সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলিতে আমরা বুঝি, সব রকম নিষেধাজ্ঞার

অভাব ("Absence of restraints")। কিন্তু জনসাধারণ প্রত্যেকেই যাহাতে ঠিক-ভাবে নিজেদের স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে এবং যাহাতে স্বাধীনতা কখনও উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত না হয় সেজন্য রাষ্ট্রের কতিপয় প্রচলিত নিষেধাজ্ঞা থাকে। এই প্রচলিত নিষেধাজ্ঞাগুলি পালন করিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় না। তবে ব্যক্তিগত সুখের জন্য অত্যাবশ্যক যে সকল সামাজিক সর্ত আছে সেইগুলির উপর কোন নিষেধাজ্ঞা থাকিবে না। এই সামাজিক সর্ত হইতে সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইলে ব্যক্তিগত সুখ কাহারও ক্ষুণ্ণ হয় না। তখনই ইহাকে অধ্যাপক লাস্কির মতে আমরা স্বাধীনতা আখ্যা দিতে পারি।[১] কিন্তু শুধু নিষেধাজ্ঞার অভাবই স্বাধীনতার প্রধান লক্ষণ নয়। স্বাধীনতার আর একটি দিক আছে। তাহা হইতেছে, জনসাধারণকে এরকম কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া যেগুলি সকলেরই সম্পাদন করার অথবা উপভোগ করার যোগ্য। মানুষের জীবন যাহাতে সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতায় ভরিয়া উঠে এবং মনুষ্যত্বের যাহাতে পূর্ণ বিকাশ হয়, সেইজন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষমতা নাগরিকদের দেওয়া উচিত। তাহাই হইতেছে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতা মানুষকে নিজের জীবনকে সুন্দর করিবার জন্য এবং নিজের মনুষ্যত্বের পরি-পূর্ণ বিকাশের জন্য যাহা করা উচিত অথবা যাহা উপভোগ করা উচিত তাহা করিতে ক্ষমতা প্রদান করে। অধ্যাপক লাস্কি স্বাধীনতার এই দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে শুধু নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাহার কখনই স্বাধীনতার প্রকৃত সর্ত হইতে পারে না। স্বাধীনতা তখনই সার্থক হয় যখন মানুষ চিন্তার অধিকার, কথা বলার অধিকার এবং কাজের অধিকার লাভ করে। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে। মানুষ যাহাতে সব অধিকার লাভ করিয়া সুন্দরভাবে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে সেইজন্য একটি নিয়ন্ত্রী শক্তি হইতেছে আইন। আইন মানুষের উপর কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু কোন নিয়ন্ত্রণ চাপাইয়া দেয় না।

নিষেধাজ্ঞার অভাবই স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ নয়

আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক (Relation between Law and Liberty) —স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে। মানুষ যাহাতে সব অধিকার লাভ করিয়া সুন্দরভাবে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে ; সেজন্য একটি নিয়ন্ত্রী শক্তি থাকা উচিত। সেই নিয়ন্ত্রী শক্তি হইতেছে আইন। আইন এই ক্ষেত্রে কতিপয় প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ দূর করে, ইহা মানুষের উপর এমন কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না যাহাতে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। একজনের স্বাধীনতায় যাহাতে অপরে হস্তক্ষেপ না করিতে পারে, সেইজন্য রাষ্ট্রীয় আইনের বিধান থাকা দরকার। তাহা হইলে মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে পারিবে।

প্রকৃত স্বাধীনতা এবং আইন পরস্পরের বিরোধী নহে। আইন অথবা সার্বভৌম

---

১ "I mean by liberty the absence of restraint upon the existence of those social conditions which in modern civilisation are the necessary guarantees of freedom."

শক্তিকে মানিয়া চলিলেই জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং অধিকতর বলশালী এবং চতুর লোকের ইচ্ছায় যাহাতে কাহারও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না হয়, সেইজন্য প্রত্যেককেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে সর্বদা মানিয়া চলা উচিত। আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে যেখানে সমাজের প্রত্যেকেই নিশ্চিন্ত-মনে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ ব্যক্তিগত জীবনের কল্যাণ অপেক্ষা অনেক বড়। কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যদি সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী হয় তবে সেক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সমাজের ক্ষতি হয় এবং রাষ্ট্র তখন আইনের সাহায্যে সকলের স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশের পথ সুগম করে। সাংবিধানিক আইনে যখন মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত থাকে, তখন রাষ্ট্রীয় আইন নাগরিকদের স্বাধীনতার অন্যতম উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইনের সহিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার তিনটি বিশেষ সম্পর্ক আমরা দেখিতে পাই।

আইনের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে

সাংবিধানিক আইন স্বাধীনতার উৎস

প্রথমত, যদি কাহারও স্বাধীনতা অন্য কোন নাগরিক কর্তৃক ব্যাহত হয় তবে রাষ্ট্রীয় আইন তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করে।

দ্বিতীয়ত, শাসকসম্প্রদায় কর্তৃক যদি নাগরিকের স্বাধীনতা অস্বীকার অথবা ব্যাহত হয় এবং সাংবিধানিক আইনগুলিও যদি ঠিকভাবে প্রয়োগ করা না হয় তবে রাষ্ট্র উপযুক্ত আইন-প্রণয়ন করিয়া নাগরিক স্বাধীনতা ভোগ করিবার রাস্তা উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারে।

আইন স্বাধীনতা রক্ষা করে

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় আইন সমাজের সর্বপ্রকার দুর্নীতি দূর করিয়া এবং স্বাধীনতার প্রকৃত বিকাশ করিতে পারে এইপ্রকার পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া– নাগরিকদের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার পক্ষে সহায়ক হইতে পারে। সুতরাং আইন এবং স্বাধীনতার মধ্যে কোনও আপাতবিরোধ নাই,—একে অন্যের পরিপূরক। আইন হইতেছে স্বাধীনতার সর্ত ("Law is the condition of liberty.")। জনসাধারণকে কতিপয় কাজ করিতে নিষেধ করিয়া রাষ্ট্রীয় আইন নাগরিক স্বাধীনতার রক্ষক হইয়াছে। জীবনধারণের জন্য মানুষের কতিপয় অত্যাবশ্যক চাহিদা আছে, যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, সম্পত্তিরক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি। এই সকল চাহিদা মিটিলেই নাগরিকগণ প্রকৃতভাবে স্বাধীনতা ভোগ করে। আইন মানুষের এই অত্যাবশ্যক চাহিদা-গুলি মিটাইয়া থাকে। অধ্যাপক লাস্কির মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নির্ভর করে জনসাধারণের জন্য আইন যে জীবনযাত্রার সৃষ্টি করে উহার উৎকর্ষের উপর। সুতরাং যতক্ষণ জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থে রাষ্ট্রের আইন মানিয়া চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহা স্বাধীনতার পরিপূরক, পরিপন্থী নহে। রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন, যেমন, "হেবিয়াস কর্পাস আইন," (Habeas Corpus Act), "অধিকারের বিধি" (Bill of Rights) প্রভৃতি জনগণের স্বাধীনতার ধারক এবং বাহক। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন যে কখনই

আইন জনগণের অত্যাবশ্যক চাহিদা মিটায়

ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে না তাহা নহে। যখন খুশী তখনই রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে দেশের আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিলে এবং উপযুক্ত কারণ না থাকা সত্ত্বেও আপৎকালীন ঘোষণা করিয়া জনগণের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলে গণস্বাধীনতা ব্যাহত হয়। কিন্তু, সদা সতর্ক জনমত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে ("Eternal vigilance is the price of liberty"—Laski)। যতক্ষণ পর্যন্ত জনমত সতর্ক এবং সদা-সচেতন থাকে, ততক্ষণ রাষ্ট্রের আইন জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে না এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। সুতরাং স্বাধীনতা বলিতে যেমন নিয়ন্ত্রণের অভাব বুঝায় না, আইন বলিতেও স্বাধীনতার একমাত্র উৎস এবং রক্ষাকবচ বুঝায় না। কিন্তু, একে অন্যের পরিপূরক। অনেক ক্ষেত্রে আইন হয়ত জনসাধারণের অজ্ঞতার ফলে এবং সতর্কতার অভাবে তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে, আবার আইন অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি-স্বাধীনতার ধারক ও বাহক হইতে পারে।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Different Types of Liberty)

১। প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (Natural Liberty)—কোন কোন ক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল প্রত্যেক মানুষের কতিপয় স্বাভাবিক এবং অবাধ কর্মদক্ষতা আছে যেগুলি মানুষ ইচ্ছা করিলেই প্রয়োগ করিতে পারে। সামাজিক চুক্তি মতবাদে বিশ্বাসী লেখকগণের মতে প্রকৃতির রাজত্বে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। প্রকৃতির রাজত্বে প্রাকৃতিক নিয়ম কর্তৃক প্রদত্ত যে স্বাধীনতা মানুষ উপভোগ করিত, তাহাই হইল প্রাকৃতিক স্বাধীনতা। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে প্রকৃতির রাজত্বে কোনও নিয়ন্ত্রীশক্তি ছিল না, এবং রাষ্ট্রের আইনের অস্তিত্বও কেহ কল্পনা করিতে পারিত না। সুতরাং প্রাকৃতিক স্বাধীনতা সকলের স্বেচ্ছাচারিতা অথবা উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়া কিছুই ছিল না।

২। পৌর-স্বাধীনতা (Civil Liberty)— পৌর জীবনে মানুষ যে অধিকার ভোগ করে তাহাই পৌর-স্বাধীনতা। নাগরিক জীবনের উপযুক্ত বিকাশের জন্য ইহা প্রয়োজনীয়। অনেক ক্ষেত্রে (যেমন, ভারতে) সংবিধানের মধ্যেই এই স্বাধীনতার ব্যবস্থা থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, স্বাধীনভাবে কথা বলার এবং চিন্তা করিবার অধিকার, ধর্মমতের স্বাধীনতা, শিক্ষাগ্রহণের স্বাধীনতা—প্রভৃতি কতিপয় অধিকারের সমষ্টিকেই আমরা পৌর-স্বাধীনতা বলি। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার ন্যায় পৌর-স্বাধীনতার গুরুত্বও কম নয়। বিশেষত, বাক্-স্বাধীনতা এবং চলাফেরার স্বাধীনতা নাগরিকদের স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এবং সুস্থ জীবনযাত্রার জন্য একান্ত প্রয়োজন। চিন্তার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেই নাগরিকগণ উন্নত ধরনের জীবনযাত্রার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিতে পারে।

পৌর-স্বাধীনতার তাৎপর্য

৩। রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty)—গণতন্ত্রের যুগে নাগরিকদের বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতার মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতাই সর্বাপেক্ষা

বেশী গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশেষত শাসন-পরিচালনার ক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার সমষ্টিকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। নির্বাচন করিবার অধিকার লাভ করা বর্তমান যুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক অধিকার। নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের উপরেই গণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের এবং যোগ্য ব্যক্তির ভোট দিবার এবং পাইবার ক্ষমতা যোগ্যতা-সম্পন্ন হইলে রাষ্ট্রের কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার এবং সরকারের অনুসৃত নীতির সমালোচনা করিবার অধিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর্যায়ে পড়ে। এই স্বাধীনতা মানুষকে প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করে এবং তাহাকে রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন করিয়া নিজের অধিকার এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে। সুতরাং এই স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে সহায়ক তাহাই নহে—উপযুক্তভাবে এই স্বাধীনতার ব্যবহার হইলে রাষ্ট্রীয় জীবনের স্তরও অনেক উন্নত হয়।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব

৪। **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty)**—অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রকৃতি হইতেছে এই যে প্রত্যেক নাগরিককে তাহার নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে কোনপ্রকার রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকিবে না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার তাৎপর্য হইতেছে এই যে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকা উচিত যেখানে বে-সরকারী শিল্প বাণিজ্য ব্যবস্থার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। পৌর-স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেমন নাগরিকগণকে আত্মসচেতন করে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও সেইপ্রকার নাগরিকগণকে আত্মনির্ভরশীল করে এবং সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করে। ধনতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকে। শ্রমকল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইবার অধিকার, বেকারভাতা পাইবার অধিকার, ইত্যাদিও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পর্যায়ে পড়ে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার তাৎপর্য

৫। **জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty)**—জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইল অন্য রাষ্ট্রের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া একটি জাতীর পক্ষে স্বাধীনভাবে সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করিবার অধিকার। জাতীয় স্বাধীনতা না থাকিলে নাগরিকগণ কখনই সম্পূর্ণভাবে পৌর-স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে না। যে স্বাধীনতা বিদেশী রাষ্ট্রের ইচ্ছা অথবা অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, সেই স্বাধীনতাকে আমরা কখনই পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি ইংরেজ শাসনের অধীনে ভারতীয়দের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সব দিক হইতেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। দেশ স্বাধীন হইবার পর এবং বিশেষত, সংবিধানে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার প্রদান করিবার পর আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায় (Different Safeguards of Liberty)—নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের জন্য এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য

ব্যক্তি-স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিমেয়। সেজন্য প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হয়।

প্রথমত, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সরকারকে সর্বদাই গণতান্ত্রিক হইতে হইবে। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিক সমান স্বাধীনতা লাভ করে। পৌর-স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিবার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে কখনও তারতম্য হয় না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে জনসাধারণকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন সরকার গণতন্ত্রের আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হয়। এইজন্য অধ্যাপক লাস্কি বলেন, চিরন্তন সতর্কতাই হইতেছে স্বাধীনতার মূল্য এবং যাহারা এই সতর্কতা বজায় রাখিতে অভ্যস্ত, তাঁহারাই স্বাধীনতার সচেতন রক্ষক হইয়া থাকেন। স্বাধীনতার পরিপন্থী যাহা কিছু দেখা যাইবে, তাহা প্রতিরোধ করিবার সাহসই হইল স্বাধীনতা রক্ষার গোপন তথ্য। এই ক্ষেত্রে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা, রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান এবং উন্নত ধরনের সংবাদ পত্রের বিশেষ ভূমিকা আছে।

দ্বিতীয়ত, যদি দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র থাকে এবং নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার থাকে তবে তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষে তাহা করা হইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলির কোনটি যদি শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত না হয়, তবে নাগরিকগণ শাসনকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিচার-বিভাগের নির্দেশ শাসনকর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং লিখিত শাসনতন্ত্র এবং শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) তাহাদের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

তৃতীয়ত, ক্ষমতার বিভাগ (Separation of Powers) করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা যাইতে পারে। সরকারের আইন-প্রণয়ন, পরিচালন এবং বিচার-বিভাগকে কাজের ভিত্তিতে পরস্পরের নিকট হইতে আলাদা করিয়া দিলে জন-সাধারণের অহেতুক অবিচার পাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

চতুর্থত, কোন কোন দেশে, যেমন ব্রিটেনে "আইনের শাসন" (Rule of Law) দ্বারা স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। 'আইনের শাসন' বলিতে বুঝায় যে আইনের চোখে বড় অথবা ছোট, ধনী অথবা নির্ধন, সকলেই সমান। কোন ব্যক্তিকে যদি অন্যায়-ভাবে অথবা বিনা কারণে জেলে আটক রাখা হয়, তবে "হেবিয়াস কর্পাস" আইন অনুযায়ী আটক ব্যক্তি আদালতে আবেদন করিতে পারে। তখন আদালত তাহাকে আটক রাখার সব কারণ খুঁটিনাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যদি দেখা যায়, সে প্রকৃতই দোষী নয়, তবে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে। যে সকল দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র নাই, সেই দেশগুলিতে ইহা স্বাধীনতার রক্ষক হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Exercise

1. Define Law. What are the sources of Law?
(আইনের সংজ্ঞা প্রদান কর। আইনের কি কি উৎস আছে?) (১০৭-১০৮, পৃষ্ঠা ; ১১০-১১২ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the relation between Law and Morality.
(আইন ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের আলোচনা কর।) (১১৪—১১৫ পৃষ্ঠা)

3. What are the features of Law ?
(আইনের কি কি বৈশিষ্ট্য আছে ?) (১০৮—১০৯ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the meaning of Liberty. "Liberty is not the absence of restraint, but an opportunity for self-realisation."
('স্বাধীনতার' অর্থ আলোচনা কর। "স্বাধীনতায় শুধু নিষেধাজ্ঞার অভাব নাই, ইহা হইতেছে আত্মোপলব্ধির একটি সুযোগ।"—এই উক্তিটি আলোচনা কর।) (১১৫—১১৬ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the nature of the different types of Liberty.
(বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতার স্বরূপ আলোচনা কর।) (১১৫—১১৬ পৃষ্ঠা, ১১৮—১১৯ পৃষ্ঠা)

6. "Law is the condition of Liberty."—Discuss the statement.
("আইন হইতেছে স্বাধীনতার সর্ত"—এই উক্তিটি আলোচনা কর।) (১১৬—১১৮ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the different safeguards of Liberty. (N. B. U. 1965), (B. U. 1961)
(স্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (১১৯—১২০ পৃষ্ঠা)

8. What is meant by "Liberty" ? Point out its relation to 'Law'. ('স্বাধীনতা' বলিতে কি বুঝায় ? 'আইনের' সহিত ইহার সম্পর্ক দেখাও।) (C. U. 1998) (১১৫—১১৮ পৃষ্ঠা)
[**ইঙ্গিত :** স্বাধীনতার স্বরূপ এবং আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্কের আলোচনা কর।]

9. Discuss the relation between Law and Liberty. (B. U. 1965), (C. U. 1964)
(আইন এবং স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।) (১১৬—১১৮ পৃষ্ঠা)

10. Discuss the nature and sanction of Law.
(আইনের স্বরূপ ও অনুমোদন আলোচনা কর।) (১০৮—১১০ পৃষ্ঠা)

পঞ্চদশ অধ্যায় | রাজনৈতিক দল (Political Parties)

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য (Features of a Political Party)—

রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে ?

রাজনৈতিক দল বলিতে বুঝায় এমন একটি জনসমষ্টি যাহারা একটি বিশেষ নীতিতে একমত হইয়া একটি রাজনৈতিক সংস্থার মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে, এবং নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া সরকার গঠন করিতে ও নিজের নীতিগুলিকে কার্যকর করিতে চেষ্টা করে। একটি রাজনৈতিক দলের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে।

তিনটি বৈশিষ্ট্য

প্রথমত, যাহারা দল গঠন করিবে, তাহাদের দলের কার্যসূচী এবং মূলনীতি সম্বন্ধে একমত হওয়া চাই। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলের সদস্যগণকে সর্ব অবস্থায় দলীয় স্বার্থরক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে। তৃতীয়ত, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দলের সদস্যগণ তাহাদের কার্যসূচী বাস্তবে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিবে ; এজন্য তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে সরকার গঠন করা।

রাজনৈতিকদলের সদস্যগণের মধ্যে যখন দলের মূলনীতি ও কর্মপন্থা লইয়া বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকেই নিজেদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে তখন ইহাকে কুচক্রী দল বা "Faction" বলা হয়। (কুচক্রী দল)

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কাজ (Functions of Political Parties in a Democracy)—রাজনৈতিক দলের প্রথম কাজ হইল দলীয় সংগঠন দৃঢ় করা এবং দলীয় মূলনীতি ও সেই নীতি কার্যকরী করিবার জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী নির্ধারণ করা। দলীয় সংগঠন দৃঢ় করিবার জন্য দলের সদস্যগণ একজন দলীয় নেতা ও একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচন করেন। রাজনৈতিক দলের মূলনীতি অনুযায়ী কর্মসূচী গ্রহণের সময় জাতীয় সমস্যাবলীকে বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিতে হয় এবং সেগুলির সমাধানের জন্য সঠিক উপায়ের নির্দেশ দিতে হয়।

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই সরকার গঠনের চেষ্টা করে। এজন্য দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় ইহা আইনসভার সদস্য হইবার জন্য যোগ্য দলীয় প্রতিনিধিগণকে মনোনয়ন করে। সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই সচেষ্ট হয় এবং নিজের কর্মসূচীর সাহায্যে জনমতকে নিজের পক্ষে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করে। (সরকার গঠনের প্রচেষ্টা) যদি রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে তবে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা অথবা মন্ত্রিসভা-চালিত গণতন্ত্রে ইহা মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং আইন-সভায় নির্বাচিত দলীয় নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সরকার গঠন করিলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাজ হইল নির্বাচনকালীন কর্মসূচী অনুযায়ী দলীয় নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা, আইন-সভার মাধ্যমে নিজের কাজের জন্য দেশবাসীর কাছে পরোক্ষভাবে দায়ী থাকা, এবং জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য দলীয় নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া দেশের আইন ব্যবস্থার সংস্কার করা, দরকার হইলে নূতন আইন প্রণয়ন করা। কোন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করিলে সরকারকে দেশের শাসনতন্ত্র মানিয়া চলিতে হয়।

সরকার গঠন করিতে না পারিলেও গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি কোন রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাধিক্য অর্জন না করিতে পারে তবে ইহা বিরোধীদলের ভূমিকা গ্রহণ করে। (বিরোধীদলের ভূমিকা) গণতান্ত্রিক সরকারের বিরোধী দলের ভূমিকা সরকারী দলের মতই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের উপর ইহার একটি সক্রিয় প্রভাব আছে। আইন পরিষদে বিরোধী দল হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলি সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপের গঠনমূলক সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার গঠন করিতে প্রস্তুত থাকিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। আইনসভায় নিজেদের কাজকর্মের দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যদি জনমত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের (সরকার পক্ষীয় অথবা সরকার বিরোধী যে কোন দলের) ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় তবে বিভিন্ন দল জনমতকে কয়েকটি বিশেষ

বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে এবং বড় বড় দেশগুলিতেও গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে পারে।

সরকার গঠন করিবার পর ইহাকে স্থায়ী রাখিবার প্রচেষ্টা

সরকার গঠন করিবার পর সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল সর্বদা সরকার স্থায়ী করিতে চেষ্টা করে। এজন্য আইনসভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হুইপ্ (Whip) নির্বাচন করে। তাঁহাদের কাজ হইল আইনসভার ভিতরে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা। অনেক সময় প্রয়োজন হইলে একাধিক রাজনৈতিক দল যৌথভাবে সরকার গঠন করিতে পারে। সেইগুলিকে "কোয়ালিশন" সরকার (Coalition Government) বলা হয়। যে সমস্ত দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থকে সেগুলিতে প্রায়ই "কোয়ালিশন" সরকার গঠিত হয়। ইংলণ্ডে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে সবগুলি দলের সহযোগিতায় জাতীয় "কোয়ালিশন" সরকার গঠিত হয়। জনমতকে প্রভাবিত করিবার জন্য আইনসভার বাহিরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে। জনমতকে প্রভাবিত করিবার প্রধান উপায় হইল দলীয় নীতি বিশেষভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা। এজন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শোভাযাত্রা, সভা-সমিতির অনুষ্ঠান, সংবাদপত্র এবং পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদির সাহায্য লইয়া থাকে।

অর্থনৈতিক কর্মসূচী

বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি অর্থনৈতিক কার্যসূচী থাকে। রাজনৈতিক কার্যসূচী হইতে অর্থনৈতিক কার্যসূচী বর্তমান কালের রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানের উপায় সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই দলীয় রাজনীতি গড়িয়া উঠে।

গণতন্ত্রের সার্থকতায় রাজনৈতিক দলের অবদান

গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্য রাজনৈতিক দলব্যবস্থার অবদান অপরিসীম। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতা রক্ষার মূল্য"।[১] জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার এবং রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক সরকার জনগণেরই সরকার। জনগণ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই সরকার গঠন করিবার চেষ্টা করে। শুধু তাহাই নহে গণতন্ত্র যাহাতে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দলই সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করে।

একনায়কতন্ত্রে মাত্র একটি দল থাকে

যে সকল দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে শুধু একটি রাজনৈতিক দলেরই অস্তিত্ব থাকে। শুধু একটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকিলে আমরা উহাকে দলায় ব্যবস্থা বলিতে পারি না। যদি দেশে একাধিক দল না থাকে তবে গণতন্ত্র বিপন্ন হইয়া পড়ে; কেননা, সেক্ষেত্রে সরকারী দলের ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা হয় না এবং সরকার স্বৈরাচারী হইয়া পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নে আমরা একদলী

১ "Eternal Vigilance is the price of Liberty"—Laski

রাজনীতি দেখিতে পাই, সেজন্য সে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আবার দলের সংখ্যা যদি খুব বেশী হয় তবে তাহাও গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। কেননা, সেক্ষেত্রে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

দলীয় শাসনের সুবিধা (Advantages of the Party System)—রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে সুসংগঠিত ও দৃঢ় করে বলিয়া জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিতে এবং তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে দলীয় শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। (১) দলীয় শাসনের একটি প্রধান সুবিধা হইল সরকার সাধারণত স্বৈরাচারী হইতে পারে না। কারণ, অন্যান্য রাজনৈতিক দল, বিশেষত আইনসভায় সরকার বিরোধী দলগুলি সরকারকে কখনই স্বৈরাচারী হইতে দেয় না। এই দলগুলি সর্বদাই সরকারের গঠনমূলক কাজের সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার গঠন করিতে প্রস্তুত থাকে। জনসাধারণেরও ইহাতে নিজেদের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়। দলীয় শাসনে সরকার-গঠনকারী দলকে সর্বদাই সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া আইনসভায় প্রত্যেক দলই যথাসম্ভব দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সমালোচনা সহ্য করিয়া সরকার পক্ষ কখনই নিজের দলীয় স্বার্থে জনস্বার্থ বিরোধী কাজকর্ম করিতে চায় না।

ইহাতে সরকার স্বৈরাচারী হইতে পারে না

(২) দলীয় শাসনের আর একটি সুবিধা হইল, রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সরকারের সহিত জনসাধারণের পরোক্ষ সূত্র স্থাপিত হয়। দেশের প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা কখনই সম্ভবপর নয়। যে সকল লোক বিভিন্ন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে একই অভিমত পোষণ করেন, তাঁহারা সর্বদাই নিজেদের মতামত রাজনৈতিক দলের মারফত আইন-পরিষদে এবং আইন পরিষদের বাহিরে সরকারের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারেন। শাসনকর্তৃপক্ষ এবং আইন-পরিষদের মধ্যে যে যোগসূত্র আমরা আধুনিক গণতন্ত্রে দেখিতে পাই তাহা শুধু দলীয় শাসনেই সম্ভব।

সরকারের সহিত জনগণের সম্পর্ক স্থাপিত হয়

(৩) দলীয় শাসন জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার করে এবং নাগরিকতাবোধ বাড়াইয়া দেয়। শুধু তাহাই নহে, দলীয় শাসন যেমন জনসাধারণকে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে, সেই প্রকার ইহা তাহাদের কর্তব্যবোধেও উদ্বুদ্ধ করে।

রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার এবং কর্তব্যবোধ

দলীয় শাসনের অসুবিধা (Disadvantages of the Party System)—গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য দলীয় শাসনের খুব প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও ইহা অনেক ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ থাকে। (১) রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল ইহা দলীয় মতবিভেদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কৃত্রিম কলহ, তিক্ততা, বিদ্বেষ, এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। দলের প্রাধান্য বজায় রাখাই যে কোন রাজনৈতিক দলের

সদস্যদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন রাজনীতিক যে কোন প্রকার মিথ্যা এবং অন্যায় আচরণের আশ্রয় লইতে পারে। দলের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য দলের সদস্যদের সর্বদাই দলীয় নেতার অনুশাসন পালন করিতে হয়।

ইহা কলহের সৃষ্টি করে

(২) ইহাতে দলীয় সদস্যদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রায়ই ক্ষুণ্ণ হয়। অনেক সময় দলীয় নেতার আদেশে সদস্যগণকে নিজেদের বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া দলের নীতিকে বড় করিয়া তুলিতে হয়। এজন্য অনেক সময় সদস্যগণ দলীয় নেতা অথবা রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় পরিষদের হাতে ক্রীড়নক হইয়া পড়েন। সদস্যদের রাজনৈতিক দলের আদর্শের অন্ধ অনুকরণ এবং ইহার প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য জনস্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া ফেলে। গণতন্ত্রে দলীয় শাসনের ইহাই প্রধান অপগুণ।

দলীয় সদস্যদের স্বাধীনতা নষ্ট হয়

(৩) তাহা ছাড়া, দেশের সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই আইন-পরিষদে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করিতে চাহে বলিয়া ফাঁকি দিয়াই হোক অথবা অন্য যে-কোন প্রকারেই হোক ভোট সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করে। ইহাতে দলীয় শাসনের নৈতিক মানের অবনতি হয়।

ইহার নৈতিক মানের অবনতি

(৪) দলীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকার পক্ষের দুর্নীতির পরিমাণও কম হয় না। নিজের দলের শক্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য অনেক সময়ই মন্ত্রিগণ দলের সদস্যদের সরকারী চাকুরী অথবা সরকারী সাহায্য বিতরণ করেন। এমনকি, অনেক সময় সরকারের পক্ষ হইতে কাহাকেও সম্মান প্রদর্শন করিবার সময়েও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতাই বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায় না,—সেখানেও দলীয় স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখা যায়। দল রাখিবার জন্য অনেক সময় দলের কতিপয় অযোগ্য এবং অনভিপ্রেত সদস্যগণকেও মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিতে হয়।

দুর্নীতির সৃষ্টি

দলীয় স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থ উপেক্ষিত হয়

(৫) দলীয় শাসনের আইন-পরিষদের ক্রিয়াকলাপেও আমরা কতিপয় ত্রুটি দেখিতে পাই। অনেক সময় সরকার-বিরোধী দলগুলি সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা না করিয়া কেবল ইহার কাজের দোষ অনুসন্ধান করিতে থাকে। সর্বদাই সরকারী কাজে বাধার সৃষ্টি করিলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বিশেষত, যে সমস্ত দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে (যেমন, ফ্রান্স) সেগুলিতে সরকার কখনই স্থায়ী ভাবে গঠিত হইতে পারে না। ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

সরকারী কাজে বিরোধীদলের অনর্থক বাধার সৃষ্টি

দলীয় শাসনের আর একটি ত্রুটি হইতেছে এই যে আত্মকলহের ফলে যদি দলের সদস্যগণের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় তবে কুচক্রীদলের (faction) সৃষ্টি হয় এবং ইহাতে মুষ্টিমেয় কতিপয় দলীয় নেতা ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে দলীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করে না।

কুচক্রী দলের সৃষ্টি

দলীয় শাসনের বিকল্প ব্যবস্থা—দলীয় শাসনের ত্রুটি দূর করার উপায় (Alternative to Party System Methods of removing the evils of the Party System)—দলীয় শাসনব্যবস্থায় উপরোক্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার ফলে অনেকে মনে করেন দলীয় শাসনের অবসান হওয়া উচিত। কিন্তু এই যুক্তি কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। যদি দলীয় শাসনের অবসান হয় তবে সব মানুষের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থই বড় হইয়া দেখা দিবে এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত হইয়া সকলকে একযোগে কাজ করিতে বাধ্য করিবার জন্য কোনও সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠান থাকিবে না। দলীয় শাসনের অবর্তমানে বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত কোনও ইচ্ছাই বাস্তবে রূপায়িত হইবার সুযোগ পাইবে না এবং নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে, জনমত গঠনে, সরকারের কাজের নৈতিক মান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রচেষ্টা বিনষ্ট হইবে। কিন্তু, দলীয় শাসনের অবসান যদি বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, শাসনতন্ত্রে এমন কোন ব্যবস্থা থাকা উচিত কিনা যাহাতে দলীয় শাসনব্যবস্থা উল্লিখিত দোষত্রুটি হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দলব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিবার জন্য নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি।

প্রথমত, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দেশের শাসনব্যবস্থা এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল অথবা ইহার নেতা সর্বময় শাসনকর্তৃত্ব লাভ না করিতে পারে। এজন্য যিনি রাষ্ট্রের প্রধান হইবেন, তাঁহাকে সর্বদাই দল-নিরপেক্ষ হইতে হইবে। ভারতের রাষ্ট্রপতি যতদিন তাঁহার পদে আসীন থাকেন, ততদিন তিনি রাজনৈতিক দল-নিরপেক্ষ থাকেন। তাহা ছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত অপেক্ষা জনসাধারণের মতামতের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। সেজন্য শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পদচ্যুতি (Recall), গণ-উদ্যোগ (Initiative), গণভোট (Referendum) এবং নির্বিশেষ গণভোটের (Plebiscite) ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কিছু ব্যবস্থা থাকা উচিত

দ্বিতীয়ত, শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকা উচিত যে, সরকারী চাকুরী, সাহায্য অথবা সম্মান বিতরণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতাকেই প্রধান মাপকাঠি ধরিতে হইবে; তাহার রাজনৈতিক মতামত অথবা দলীয় সদস্যপদ নহে। এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে দলীয় শাসনব্যবস্থা হইতে অনেক দুর্নীতি দূর হইবে।

যোগ্যতাই উচ্চপদের মাপকাঠি হওয়া উচিত

তৃতীয়ত, কোনও রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করিয়া যাহাতে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের সংশোধন না করিতে পারে সেজন্য শাসনতন্ত্রকে সর্বদাই অনমনীয় রাখিতে হইবে এবং নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার লিখিত রাখিতে হইবে।

অনমনীয় শাসনতন্ত্র হওয়া উচিত

চতুর্থত, দলীয় শাসনব্যবস্থার অপগুণে যাহাতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয় অথবা জাতীয় স্বার্থ ব্যাঘাতপ্রাপ্ত না হয় অথবা শাসনতন্ত্র মর্যাদা না হারায় সেদিকে উপযুক্ত দৃষ্টি প্রদান করিবার জন্য বিচার-বিভাগকে যথাসম্ভব স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাখিতে হইবে।

বিচার-বিভাগ স্বাধীন হওয়া উচিত

পঞ্চমত, সরকারী কর্মচারিগণকে কখনই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে এবং রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত হইতে দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য তাহারা নিজেদের রাজনৈতিক মতামত সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখিতে পারিবে। তাহারা যাহাতে দল-নিরপেক্ষ হইয়া জাতীয় স্বার্থে নিজেদের কাজ করিয়া যাইতে পারে, সেজন্য তাহাদের চাকুরী সম্পর্কীয় বিভিন্ন সর্ত এবং বেতন ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের সুবিধা সর্বদা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত।

সরকারী কাজে রাজনৈতিক মতবাদের স্থান থাকা উচিত নয়

ষষ্ঠত, আইন পরিষদে যাহাতে সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলের সদস্যগণও নির্বাচিত হইতে পারেন, সেরকম ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রের করিয়া দেওয়া উচিত।

সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি, নাগরিকদের উপযুক্তভাবে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইলে দলীয় শাসনব্যবস্থা কখনই ত্রুটিমুক্ত হইতে পারে না। সেজন্য প্রধান প্রয়োজন হইতেছে উপযুক্তভাবে শিক্ষাবিস্তার করা। যতদিন জনমত দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সচেতন না হইবে এবং শিক্ষিত না হইবে ততদিন দলীয় শাসন কখনই সার্থক হইবে না।

দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against the two party system)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেটব্রিটেনে কয়েকটি রাজনৈতিক দল থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে একটি দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থায় যে রাজনৈতিক দল আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলই শাসনকাজ পরিচালনা করে। ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে।

গ্রেটব্রিটেনে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়

দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে আমরা নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি। প্রথমত, এই ব্যবস্থায় সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়িভাবে গঠিত হয়। কিন্তু, আইন পরিষদে অপর একটি দলের অস্তিত্ব থাকায় সরকার-গঠনকারী দল কখনই জনস্বার্থবিরোধী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকিতে সাহসী হয় না। কারণ, বিরোধীদল সর্বদাই সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা করিতে এবং জনমতকে সেভাবে প্রভাবিত করিতে প্রস্তুত থাকে। দ্বিতীয়ত, দ্বি-দলীয় রাজনীতিতে দুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে বলিয়া শাসনকার্যের উৎকর্ষ অনেক বাড়িয়া যায় এবং নির্বাচকগণের পক্ষে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা সহজ হয়।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় স্থায়ী সরকার গঠিত হয়

শাসনকার্যের উৎকর্ষ বাড়িয়া যায়

দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল থাকার বিরুদ্ধে বলা হয় যে জনসাধারণের পক্ষে শুধু দুইটি দল ব্যতীত অন্য কোনও বিকল্প দলের সহিত সহযোগিতা করিবার সুযোগ না থাকায় জনমত সুষ্ঠুভাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় না। দ্বিতীয়ত, আইন পরিষদে যদি শুধু একটি সরকার পক্ষীয় দল এবং অপরটি বিরোধী দল থাকে, তবে নির্দিষ্ট সময়ের শেষোক্ত দলের মন্ত্রিসভা গঠন করিবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না।

শুধু দুইটি দলে সর্বদা জনমত সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় না

কিন্তু ব্রিটেনের দিক হইতে চিন্তা করিলে এই যুক্তি গ্রহণ করা যায় না। ব্রিটেনে শ্রমিকদল এবং রক্ষণশীল দলের শক্তি প্রায় সমান থাকায় যে দল বিরোধী দল হিসাবে কাজ করে সেই দলের পক্ষে কোনদিন সরকার গঠন করিবার সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা যায় না। সরকার পক্ষও বিরোধীদলকে যথেষ্ট সমীহ করে। যদি আইন পরিষদে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে, তবে যে কোনও দল অপর কোন দলের সহিত সম্মিলিত মন্ত্রিসভা (coalition ministry) গঠন করিতে পারে। বিশেষত, দুইটি দল থাকিলে শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারী হইবার যে সম্ভাবনা দেখা যায়, বহুদল-সমন্বিত আইন পরিষদে সেই সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। দুই দল সমন্বিত আইন পরিষদে দলীয় শাসন এবং শৃঙ্খলা খুবই কঠোর হয় এবং সেক্ষেত্রে দলীয় সদস্যগণ অনেক সময়ই নিজেদের বিবেক বুদ্ধির নির্দেশ অমান্য করিয়াও ভোট প্রদান করিতে বাধ্য হয়।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের সরকার গঠনের অসুবিধা

বহু দলব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disadvantages of a multiple party system)—বহুদল সমন্বিত আইন পরিষদের একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে জনসাধারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের মত পোষণ করিলে সেইগুলি আইন পরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। বহু দলব্যবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিও আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাইয়া স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। মন্ত্রিসভাও বহুদল সমন্বিত শাসনব্যবস্থায় স্বৈরাচারী হইতে পারে না। কারণ, সেইক্ষেত্রে সরকার পক্ষের রাজনৈতিক দলে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইতে পারে, এবং সরকার পক্ষ অন্যান্য রাজনৈতিক দল কর্তৃক তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে পারে। বহুদল সমন্বিত শাসনব্যবস্থায় বিরোধী পক্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া ইহাকে অপসারণ করা খুব কঠিন নহে। জাতীয় সংকটের সময় বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে যদি সরকার গঠিত হয় (যেমন, গ্রেটব্রিটেনে হয়), তবে শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ অনেক বাড়িয়া যায়। বহুদল সমন্বিত আইন পরিষদের প্রধান অসুবিধা হইতেছে এই যে, অনেকগুলি দল সরকারের বিরোধিতা করে বলিয়া সরকার প্রায়ই স্থায়ী হয় না। ইহাতে দেশে অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সেইজন্য কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে

জনমত নানাভাবে প্রকাশিত হয়

সরকারপক্ষ বিরোধী দলকে সর্বদা সমীহ করে

করেন, বহু দলব্যবস্থার পরিবর্তে দুই দলব্যবস্থাই প্রত্যেক দেশে থাকা উচিত। বিশেষত, যদি উভয় রাজনৈতিক দল সমানভাবে সংগঠিত হয় এবং সমান ক্ষমতার অধিকারী হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যায়। কিন্তু, বহু দলব্যবস্থায় এই সুবিধা পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া, আইন পরিষদেও আইন প্রণয়ন অথবা সংশোধন সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে একমত হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার ফলে সরকার পক্ষে কোন নীতি কার্যকর করিতে অযথা সময় অতিবাহিত হয় এবং ইহা সর্বদাই কোন-না-কোন দলের সদস্যদের অসন্তোষের কারণ ঘটায়। বহু দলব্যবস্থায় ভোটারদেরও একটি বিশেষ সমস্যা আছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সরকারী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং ইহা ভোটদাতাগণের পক্ষে কোনও ব্যাপারে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। সেইজন্য বহু দলব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই জনমতকে বিভ্রান্ত করে।

সরকারের স্থায়িত্ব থাকে না

বহু দলব্যবস্থায় ভোটারের সমস্যা

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি দুই-দলীয় শাসনব্যবস্থা বহু দলীয় শাসন-ব্যবস্থা হইতে সরকারের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে বেশী সহায়ক। কিন্তু দেখিতে হইবে দুই দলীয় ব্যবস্থায় উভয় দলের মধ্যে শক্তি সামর্থ্যের বৈষম্য যেন বেশী না হয়।

ভারতের দল-ব্যবস্থা (Indian Party System)—ভারতে আমরা বহু দল-ব্যবস্থা দেখিতে পাই। ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের শাখা, কংগ্রেসের আদি সংগঠন এবং পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী দল হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের শাখা, স্বতন্ত্র দল, জনসংঘ, দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট দল, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দল, সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল, প্রজা সমাজতন্ত্রী দল, ভারতীয় ক্রান্তি দল, প্রভৃতি হইতেছে সর্বভারতীয় দল।

ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

বিভিন্ন দলের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী (Objectives and Programmes of the different Political Parties)—ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসই সর্ববৃহৎ; কিন্তু, **জাতীয় কংগ্রেস বর্তমানে দুইভাগে বিভক্ত।** একটি শাখা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় আসীন এবং অপরটি হইতেছে পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী দল। ১৮৮৫ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অক্লান্তভাবে এই দল স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিল। রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তন হইবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস দলের কর্মসূচীর পরিবর্তন হয় এবং ইহাতে বিভিন্ন উপদলের সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা-লাভের পর কংগ্রেস ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্যের সরকার গঠনের ভার গ্রহণ করে। উভয় কংগ্রেস দলের সংগঠন মূলত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উপর ন্যস্ত; কিন্তু দলীয় নীতি নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন কংগ্রেস হাইকমাণ্ড বা ওয়ার্কিং কমিটি। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন রাজ্যে প্রাদেশিক

দ্বিধাবিভক্ত জাতীয় কংগ্রেস

কংগ্রেস কমিটি, প্রতি জেলায় জেলা-কংগ্রেস কমিটি এবং জেলা-কংগ্রেস কমিটির অধীনে আঞ্চলিক ভিত্তিতে মণ্ডল-কংগ্রেস কমিটি আছে। দলের বর্তমান শাসনতন্ত্র ১৯৪৮ সালে গৃহীত হয়। এই শাসনতন্ত্রে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে কংগ্রেস এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা করিতে চাহে যাহা শান্তি ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সামাজিক সাম্য, অর্থনৈতিক সাম্য এবং আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের উপর ভিত্তিশীল। উভয় কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কর্মসূচী হইতেছে দেশে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা এবং মিশ্র অর্থনীতির (Mixed Economy) ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি সুদৃঢ় করা। গণতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্র হইতেছে ইহাদের আদর্শ। বর্তমানে কংগ্রেসের দুইটি শাখার মধ্যে যদিও একটি কেন্দ্রীয় সরকার চালাইতেছে এবং অপরটি সেই দলের বিরোধিতা করিতেছে, ইহাদের মধ্যে আদর্শগত অথবা কর্মসূচী সংক্রান্ত পার্থক্য নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৯৬৯ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনয়ন দান লইয়া যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তাহার পরিণতি হিসাবে কংগ্রেস দুই শিবিরে বিভক্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস দল হইতে বহিষ্কৃত হইলে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বহুলাংশে কমিয়া যায় এবং ভারতের নয়টি রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে নবকংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। উত্তর প্রদেশেও সম্মিলিত সরকার (Coalition Government) গঠনে নবকংগ্রেস সহযোগিতা করিয়াছে এবং বিহারে নব কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হইয়াছে। গুজরাট ও মহীশূরে বিরোধী কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।

কমিউনিস্ট দল

ভারতের **কমিউনিস্ট দলের** সূচনা হয় ১৯২৪ সালে। কিন্তু ইংরেজ আমলে ১৯৪৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই দল স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগ পায় নাই। এই দল মূলত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট দলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী অনুসরণ করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত কমিউনিস্ট দলের যে আদর্শ, ভারতের আদি কমিউনিস্ট দলেরও সেই আদর্শ। কিন্তু বর্তমানে সংসদীয় গণতন্ত্রে ভারতের কমিউনিস্ট দল দুইটি আলাদা দলে বিভক্ত হইয়াছে, একটি হইতেছে রুশবাদী এবং অপরটি হইতেছে মার্কসবাদী। ভারতের বুকে কিছুকাল পূর্বে চীনা-আক্রমণে কমিউনিস্ট দলকে খুবই বিপর্যস্ত করিয়াছিল এবং দেশের নাগরিকদের একটি বিরাট অংশের আস্থা এই দল হারাইতে বসিয়াছিল। তাহা না হইলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে বিরাট এবং সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন হইত। স্বাধীনতার পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনেই কমিউনিস্ট দল সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে কেরালায় জয়লাভ করিয়া কমিউনিস্ট দল সর্বপ্রথম একটি অ-কমিউনিস্ট দেশে সরকার গঠন করে; কিন্তু সেই সরকার স্থায়ী করে রাখা কমিউনিস্ট দলের পক্ষে

সম্ভবপর হয় নাই। সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা এবং সম্পূর্ণভাবে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠন করাই ভারতের কমিউনিস্ট দলের **কর্মসূচী**। সরকার-বিরোধী দলগুলির মধ্যে সংগঠনের দিক হইতে বিবেচনা করিলে কমিউনিস্ট দলই বর্তমানে **শক্তিশালী**।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, কিছুকাল পূর্বে কমিউনিস্ট দল তত্ত্বগত পার্থক্যের ভিত্তিতেই দুইটি উপদলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একটি হইতেছে **দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট দল** এবং অপরটি হইতেছে **বামপন্থী কমিউনিস্ট দল**। বামপন্থী কমিউনিস্ট দল কমিউনিস্ট চীনের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত এবং দক্ষীণপন্থী কমিউনিস্ট দল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। বর্তমানে বামপন্থী কমিউনিস্ট দলের মধ্যে একটি উগ্রপন্থী কমিউনিস্ট উপদলের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট দল বলিয়া পরিচিত। বর্তমানে কেরালায় দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট দল এবং পশ্চিমবঙ্গে উভয় কমিউনিষ্ট দল সরকার গঠনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

স্বতন্ত্র দল

১৯৫৯ সালে রাজা গোপালাচারীর নেতৃত্বে এবং পরবর্তীকালে মাসানী, কে. এম্. মুন্সি প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় **স্বতন্ত্র দলের** সৃষ্টি হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই স্বতন্ত্রদল একটি সর্বভারতীয় দল হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে। তৃতীয়ত, সাধারণ নির্বাচনে এই দল সর্বপ্রথম নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। এই দল রক্ষণশীল গণতন্ত্রের (Conservative Democracy) সমর্থক এবং শিল্প-ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী। এককথায় এই দলের কর্মসূচী হইতেছে অ-সমাজতান্ত্রিক। দেশে গণতান্ত্রিক বিরোধী দলগুলির মধ্যে এই দল ইতিমধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর স্বতন্ত্র দল উড়িষ্যায় স্থানীয় জন-কংগ্রেস দলের সহযোগিতায় একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করিয়াছে।

সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল

সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলও বর্তমানে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল গঠিত হইয়াছিল প্রজাসমাজতন্ত্রী দল এবং সমাজতন্ত্রী দলের সম্মিলনে। কিন্তু পরে **প্রজাসমাজতন্ত্রী দল** পুনরায় আলাদা হইয়া যায়। প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের কর্মসূচী এবং কংগ্রেসের কর্মসূচীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য খুবই কম। আচার্য কৃপালনী, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার পর কৃষক মজদুর প্রজাপার্টি গঠিত হয় এবং পরে সেই দল কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের সহিত একত্রিত হইয়া প্রজাসমাজতন্ত্রী দল (Proja Socialist Party) গঠন করে। কংগ্রেস সরকারের পররাষ্ট্র-নীতি এবং দেশরক্ষা নীতির সহিত প্রজাসমাজতন্ত্রী দল একমত নহে। কিন্তু কংগ্রেস যেমন গান্ধীজীর সর্বোদয় নীতিকে গ্রহণ করিয়াছে, প্রজাসমাজতন্ত্রী দলও সেইপ্রকার সর্বোদয় নীতি গ্রহণ করিয়াছে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর কোন কোন রাজ্যে প্রজাসমাজতন্ত্রী দল কোয়ালিশন সরকারে যোগদান করিয়াছে। সম্প্রতি **ভারতীয় ক্রান্তি দল** নামে একটি নূতন রাজনৈতিক দল গঠিত হইয়াছে। পূর্বতন কংগ্রেস

দল হইতে কিছু কর্মী ও প্রাদেশিক নেতা বাহির হইয়া যাইয়া চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর এই দল গঠন করেন। আরেকটি সর্বভারতীয় দল হইতেছে **নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক**। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এই দলেরও উদ্দেশ্য। এই দল ইহার প্রতিষ্ঠাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

জনসংঘ

প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী **ভারতীয় জনসংঘ** গঠন করেন। মূলত ইহা ছিল হিন্দুমহাসভার সংশোধিত সংস্করণ। তবে এই দলে বর্তমানে মুসলমানদের সদস্য হইবার পথে কোন বাধা নাই। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যুর পর এই দলের সংগঠন অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছিল। কিন্তু চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতীয় জনসংঘের অবস্থা ভাল হইয়াছে এবং কয়েকটি রাজ্যে কোয়ালিশন সরকারে জনসংঘ যোগদান করিয়াছে। দিল্লী রাজ্যে জনসংঘ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর কয়েকটি আঞ্চলিক দল বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতাশালী হয়। উদাহরণস্বরূপ মাদ্রাজে ডি. এম. কে. দলের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেই দল মাদ্রাজে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সরকার গঠন করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা কংগ্রেস, বিহারে লোকতান্ত্রিক দল, উড়িষ্যায় জনকংগ্রেস, প্রভৃতিও আঞ্চলিক দল হিসাবে কাজ করিতেছে। এই আঞ্চলিক দলগুলির সদস্যগণ পূর্বে জাতীয় কংগ্রেসেরই সদস্য ছিলেন।

Exercise

1. Distinguish between a Political Party and a Faction.
(রাজনৈতিক দল এবং কুচক্রীদলের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।) (১২১-১২২ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the essential functions of a Party system in a Modern Democracy.
(আধুনিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (১২২-১২৪ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the advantages and disadvantages of the Party System.
(দলীয় শাসনব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।) (১২৪-১২৫ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the utility of the Party System in a modern democratic age.
(আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে দলীয় শাসনব্যবস্থার উপযোগিতা আলোচনা কর।) (১২৪ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the relative advantages and disadvantages of (a) Multi-party System and (b) Two-party System. (১২৭-১২৯ পৃষ্ঠা)
(দ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থা এবং বহুদল সমন্বিত শাসনব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।)

6. Is there any alternative to the Party System ? How would you remove the evils of the Party System ? (১২১-১২৮ পৃষ্ঠা)
(দলীয় শাসনব্যবস্থার কোন বিকল্প ব্যবস্থা আছে কি ? দলীয় শাসনব্যবস্থার ত্রুটিগুলি কিভাবে দূর করিবে ?)

7. Give an account of the Indian Party System.
(ভারতের দল-ব্যবস্থার বিবরণী দাও।) (১২৯-১৩১ পৃষ্ঠা)

ষোড়শ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা (Local Self-Government)

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা—সভ্য জগতে সব দেশেই আমরা কিছু-না-কিছু স্বায়ত্তশাসন দেখিতে পাই। বিশেষত, বড় বড় দেশগুলির পক্ষে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বিশেষ গুরুত্ব আছে। দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বিভিন্ন স্থানীয় অঞ্চলের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবহিত থাকা সম্ভব নহে। স্থানীয় অঞ্চলগুলির জনসাধারণ যাহাতে নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করিয়া লইতে পারে, সেইজন্য তাহাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া উচিত। তাহা ছাড়াও, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের আর একটি উপকার হইতেছে এই যে ইহা জনগণকে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা প্রদান করে, জনমতকে সুশিক্ষিত করে এবং গণতন্ত্রকে সার্থক করে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংগঠন—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দুই প্রকারের হইতে পারে; যথা, গ্রাম্য ও পৌর। একটি অথবা একাধিক গ্রাম লইয়া পঞ্চায়েৎ হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম-সভা, গ্রাম-পঞ্চায়েৎ, আঞ্চলিক-পঞ্চায়েৎ, আঞ্চলিক-পরিষদ দেখা যায়। ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ আইন প্রণীত হয় এবং ১৯৫৭ সাল হইতে ইহা কার্যকরী হয়।

ভারতে পৌর-স্বায়ত্তশাসনের বিভিন্ন রূপ আমরা দেখিতে পাই, মিউনিসিপ্যালিটি ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাস্ট (Improvement Trust) এবং বড় বড় শহরে কর্পোরেশনের মধ্যে।

গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ (Village Panchayets)—গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ সম্পূর্ণভাবে একটি ভারতীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎগুলির প্রধান কাজ হইতেছে গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, গ্রামের জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন করা, গ্রামবাসীদের মধ্যে ছোট ছোট কলহ-বিবাদের মীমাংসা করা ইত্যাদি। ভারতীয় শাসনতন্ত্রেও গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ গঠন করিবার বিধান আছে।

পশ্চিমবঙ্গের **স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা** আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, এই রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েৎ প্রথা এবং বিভিন্ন শহরে মিউনিসিপ্যালিটি আছে। সেগুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

পঞ্চায়েৎ প্রথা—পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা অনুযায়ী পঞ্চায়েৎ গঠনের জন্য প্রথমে এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া গ্রাম-সভা গঠিত হইবে। গ্রাম-সভার সদস্য হইল সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিধানসভার সদস্যদের নির্বাচকমণ্ডলী। গ্রাম-সভা একবার ষাণ্মাষিক এবং একবার বাৎসরিক সভার অনুষ্ঠান করে।

গ্রাম-সভা

গ্রাম-সভার বিভিন্ন কাজ নির্বাহ করিবার ভার অর্পিত হয় গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের উপর। গ্রাম-সভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যা অনুযায়ী সদস্য

নির্বাচন করিয়া তাহাদের উপর গ্রাম-পঞ্চায়েতের ভার অর্পণ করে। ইহা ছাড়া, রাজ্য সরকার কয়েকজন সদস্য মনোনয়ন করিতে পারেন। সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণের পঞ্চায়েতে ভোটাধিকার থাকিবে না, এবং তাহারা অধ্যক্ষ অথবা উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ

পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ যে শুধু পঞ্চায়েতের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন তাহাই নহে, পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজগুলি ঠিকভাবে চলিতেছে কি না সেদিকেও তাঁহারা দৃষ্টি রাখিবেন।

পঞ্চায়েতের কাজ

পঞ্চায়েতের প্রাথমিক কাজগুলি হইতেছে, আঞ্চলিক জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, মহামারী প্রতিরোধ, পানীয় জল সরবরাহ, সাধারণের ব্যবহার্য পুকুর, পশুচারণভূমি, কবরস্থান ও শ্মশানঘাট সংরক্ষণ এবং গ্রামবাসীদের সংক্রামক ব্যাধি অথবা মহামারী হইতে রক্ষা করা। গ্রামোন্নয়নের জন্য পঞ্চায়েতগুলি সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির সহিত একযোগে কাজ করে। ইহা ছাড়াও, পঞ্চায়েৎ-গুলির অন্যান্য কাজ আছে। প্রাথমিক, সামাজিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, পাঠাগার স্থাপন, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করা, ফেরিঘাটের দেখাশোনা করা, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইবার এবং গ্রামীণ শিল্পগুলিকে উন্নত করিবার চেষ্টা করা, পতিত জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

অঞ্চল পঞ্চায়েৎ

কয়েকটি গ্রাম-সভার প্রত্যেকটি হইতে অনধিক ২৫০ জন সদস্য নির্বাচিত হইয়া অঞ্চল পঞ্চায়েৎ গঠিত হয়। অঞ্চল পঞ্চায়েৎগুলির কার্যকাল গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলির অনুরূপ হয়। এই পঞ্চায়েৎগুলির সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে যথাক্রমে প্রধান ও উপপ্রধান বলা হয়। অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান কাজ হইল আঞ্চলিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

ন্যায় পঞ্চায়েৎ

পশ্চিমবঙ্গে আমরা আঞ্চলিক পরিষদও দেখিতে পাই। পূর্বেকার লোকাল বোর্ডের পরিবর্তে বর্তমানে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হইয়াছে। ন্যায় পঞ্চায়েতের কাজ হইতেছে বিচার-বিভাগীয়; অর্থাৎ, ইহা ছোটখাটো বিচারের ব্যবস্থা করে। গ্রাম-সভার সদস্যগণের মধ্য হইতে ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচারকগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস

জনগণের উপর কর ধার্য করিয়া পঞ্চায়েৎগুলির ব্যয় নির্বাহ করিতে হয় এবং এইজন্য অর্থসংগ্রহের ভার থাকে আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের উপর। এই টাকা 'অঞ্চল পঞ্চায়েৎ ভাণ্ডার' নামে একটি তহবিলে জমা হয় এবং ইহা হইতেই গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ এবং ন্যায়-পঞ্চায়েতের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। এই অর্থ ছাড়াও, গ্রামবাসীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান হইতেও পঞ্চায়েৎগুলি কিছু অর্থ পাইতে পারে। সরকার সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যে টাকা খরচ করেন, তাহা হইতেও পঞ্চায়েতগুলি পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়। কারণ পঞ্চায়েতের অনেক কাজ বিমিশ্র সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির (Composite Community Development Projects) মারফৎ অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতের গ্রামীণ জীবনের উন্নতি করিতে হইলে পঞ্চায়েৎগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। সমবায়ের মূল নীতিগুলি পঞ্চায়েতের মারফৎ কার্যকরী হইতে পারে। তাহা ছাড়া, পঞ্চায়েতের বৈঠকে মিলিত হইয়া কৃষকগণ নিজেদের উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা যায় কিনা সে বিষয়ে পারস্পরিক মত-বিনিময় করিতে পারে।

আয়ের উৎস

পঞ্চায়েৎগুলির আয়ের প্রধান উৎস হইতেছে, ইউনিয়ন রেট, চৌকিদারী ট্যাক্স, জিলা পরিষদ ও রাজ্যসরকার হইতে প্রাপ্ত সাহায্য, গ্রামের খোঁয়াড়, ফেরিঘাট, এবং মামলার ফী প্রভৃতি মারফৎ আয়, ইত্যাদি। এই আয়ের অধিকাংশ খরচ হইয়া যায় চৌকিদার এবং দফাদারের বেতন দিতে। তাহা ছাড়া, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, পথঘাট নির্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি খাতে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ আয় খরচ হয়।

ব্যয়

জিলা পরিষদ (District Parishads)—জিলা পরিষদের আয়তন হইতেছে সমগ্র জেলার পল্লী অঞ্চল। জিলা পরিষদের সব সদস্যরাই নির্বাচিত হন। এক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলী হইতেছে জেলার অন্তর্গত সব পঞ্চায়েতের ভোটদাতাগণ। সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে সভাপতি এবং সহ-সভাপতি নির্বাচন করেন।

জিলা পরিষদগুলির কাজ হইতেছে, সমগ্র জেলার শিক্ষাব্যবস্থা, যাতায়াতের সুব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ইত্যাদির তদারক করা। জিলা পরিষদের আয়ের উৎস হইতেছে পথ-কর, সেতু, ফেরিঘাট, ডাকবাংলা, খোঁয়াড় প্রভৃতি হইতে আয় এবং সরকারী সাহায্য। ইহা ছাড়া, জনসাধারণের নিকট হইতে জিলা পরিষদ ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। হাওড়া জিলা পরিষদ রেল হইতে লাভের অংশ বাবদ কিছু অর্থ লাভ করে।

পশ্চিমবঙ্গের স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থায় আমরা চারিটি পর্যায়ে শাসনব্যবস্থা (Four-tier machinery) দেখিতে পাই। প্রথম পর্যায়ে আছে গ্রাম পঞ্চায়েৎ, দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, তৃতীয় পর্যায়ে আছে জিলা পরিষদ। চতুর্থ পর্যায়ে আছে বিভিন্ন শহরের মিউনিসিপ্যালিটি এবং কলিকাতা কর্পোরেশন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উপর সরকারী কর্তৃত্ব (Control of the Government over Local Bodies)—স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনার এবং জিলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কাজ পরিচালনার ব্যাপারে পঞ্চায়েৎগুলি অযোগ্যতা প্রদর্শন করিলে সরকার যে কোন গ্রাম পঞ্চায়েৎ, আঞ্চলিক পরিষদ অথবা জিলা পরিষদ বাতিল করিয়া দিতে পারে। জিলা পরিষদের উপরে বিভাগীয় কমিশনার অথবা জিলা ম্যাজিস্ট্রেট যে কর্তৃত্ব করিতে পারেন, পরিষদের উপরেও জিলা পরিষদ অনুরূপ কর্তৃত্ব করিতে পারেন। রাজ্যসরকার যেরূপ জিলা পরিষদের

সভাপতি অথবা সদস্যগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন, জিলা পরিষদও সেই প্রকার আঞ্চলিক পরিষদ ও গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভাপতি এবং সদস্যদের পদচ্যুত করিতে পারে। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিভাগীয় কমিশনার এইসব প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারেন।

মিউনিসিপ্যালিটি (Municipality)—আমরা প্রত্যেক শহরে মিউনিসিপ্যালিটি দেখিতে পাই। মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যসংখ্যা কত হইবে, তাহা স্থির করার দায়িত্ব রাজ্যসরকারের। তবে কোন মিউনিটিপ্যালিটির কমিশনার বা সদস্য সংখ্যা ৯ জনের কম এবং ৩০ জনের বেশী হইবে না। মিউনিসিপ্যালিটির কার্যকালের মেয়াদ থাকে সাধারণত চার বৎসর। তবে রাজ্যসরকার ইচ্ছা করিলে এই মেয়াদ আরও দুই বৎসর বাড়াইতে পারেন। মিউনিসিপ্যালিটিতে একজন সভাপতি (Chairman), একজন উপ-সভাপতি (Vice-Chairman), একজন কর্মসচিব (Secretary), একজন হেলথ অফিসার (Health Officer), একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ সংক্রান্ত পরিদর্শক এবং অন্যান্য কর্মচারী থাকে। কমিশনারদের মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে সভাপতিকে পদচ্যুত করা যাইতে পারে। যদি কোন মিউনিসিপ্যালিটি নূতন গঠিত হয় তবে সরকার অনধিক দুই বৎসরের জন্য কমিশনারদের নিয়োগ করিতে পারেন। তপশীল শ্রেণীভুক্ত জনগণের প্রতিনিধির জন্য মিউনিসিপ্যালিটিতে আসন সংরক্ষিত থাকিবে।

মিউনিসিপ্যালিটির কাজ

শহরের জনস্বাস্থ্য, যানবাহন, যাতায়াত, শিক্ষা প্রভৃতি দায়িত্ব মিউনিসিপ্যালিটির উপরে ন্যস্ত। জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত শহর হইতে ময়লা নিষ্কাশন এবং সংক্রামক ব্যাধির হাত হইতে নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য টীকা, ইন্জেকসন প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা মিউনিসিপ্যালিটির কাজ। তাহা ছাড়া, মিউনিসিপ্যালিটি, স্কুল, বাজার, হাসপাতাল শহরের যানবাহন ব্যবস্থা প্রভৃতির পরিচালনা করিয়া থাকে।

মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের উৎস

মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের উৎস হইতেছে ইহার এলাকাভুক্ত বাড়ী এবং জমির উপর কর ধার্য করা, যানবাহনের উপর কর ধার্য করা, খেয়াঘাট, সেতু নির্মাণ, গৃহপালিত পশুর জন্য মালিকদের লাইসেন্স প্রদানের জন্য প্রাপ্ত অর্থ, ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি বৃত্তিধারীদের নিকট হইতে অনুমতিপত্র বাবদ মিউনিসিপ্যালিটি টাকা আদায় করে। তাহা ছাড়া, প্রয়োজন হইলে রাজ্যসরকার মিউনিসিপ্যালিটিকে অর্থ সাহায্য করে এবং মিউনিসিপ্যালিটিও সরকারের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া দেশের ভিতরেই ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয়

রাস্তাঘাট নির্মাণ, জল সরবরাহ, ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়, হাট-বাজার, গ্রন্থাগার ও যাদুঘর, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, শ্মশান ও কবরস্থান সংরক্ষণ এবং জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের খাতে মিউনিসিপ্যালিটির অর্থ ব্যয় হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশন (Calcutta Corporation)—কলিকাতা কর্পোরেশনের মোট সদস্যসংখ্যা হইতেছে ১০৬ জন। ইহার মধ্যে ১০০ জন কাউন্সিলার এবং ৫ জন অল্ডারম্যান আছেন এবং কলিকাতা ইন্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের সভাপতি পদাধিকার বলে সদস্য নিযুক্ত হন। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক মাত্রই কর্পোরেশনের নির্বাচনে ভোটাধিকারী হইতে পারেন। সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন মেয়র (Mayor) এবং একজন ডেপুটি মেয়র (Deputy Mayor) নির্বাচিত করেন। মেয়র কর্পোরেশনের সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁহাদের বেতন দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

কর্পোরেশনের গঠন

কর্পোরেশন বা পৌর প্রতিষ্ঠানের সাধারণ নীতিগুলি নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব হইতেছে চীফ কমিশনারের। তাঁহার নীচে দুইজন ডেপুটি চীফ কমিশনার, একজন চীফ ইঞ্জিনীয়ার, একজন হেল্‌থ অফিসার, কর্মসচিব এবং অন্যান্য কর্মচারী আছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের সংস্কারকল্পে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় যে নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন প্রণীত হইয়াছে, তদনুযায়ী কাউন্সিলারদের ক্ষমতা অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কমিশনারের ক্ষমতা অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাব্‌লিক সার্ভিস-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যসরকার কর্তৃক চীফ কমিশনার নিযুক্ত হন। কর্পোরেশন অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ করে; কিন্তু তাঁহাদের নিয়োগ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ।

কর্পোরেশনের কাজ মিউনিসিপ্যালিটির কাজের ন্যায়। কলিকাতা মহানগরীর জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ করার জন্য ময়লা নিষ্কাশন করা, হাসপাতাল নির্মাণ করা, নর্দমা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা, রাস্তাঘাটের আবর্জনা দূর করা ইত্যাদির দায়িত্ব কর্পোরেশন গ্রহণ করে। পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া, কিভাবে গৃহ নির্মাণ হইবে সে বিষয়ে নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করা, ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি বৃত্তিধারীদের কাজের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা, পশুহত্যাশালা স্থাপন করা, হাট-বাজার রক্ষণাবেক্ষণ করা, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা ও ইহাদের আর্থিক সাহায্য করা ইত্যাদি বহুবিধ কাজ কর্পোরেশন করিয়া থাকে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ যাহাতে না হয়, সেজন্য কর্পোরেশন টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। বাজারে যাহাতে পচা খাবারের জিনিস বিক্রয় না হয় সেদিকে কর্পোরেশনের লক্ষ্য থাকে। তাহা ছাড়া, শহরের কোন অংশে আগুন লাগিলে তাহা নিভাইবার জন্য দমকলবাহিনী থাকে। শহরের বিভিন্ন স্থানে যে সকল শ্মশান অথবা কবরস্থান আছে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও কর্পোরেশনের। কলিকাতা মহানগরীতে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের ব্যাপারেও কর্পোরেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কলিকাতা কর্পোরেশন অনেক অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়াছে। তাহা ছাড়া, কর্পোরেশন কর্তৃক একটি বাণিজ্যিক মিউজিয়ামও (Commercial Museum) স্থাপিত হইয়াছে।

কর্পোরেশনের কাজ

কর্পোরেশনের আয়ব্যয়—কলিকাতা কর্পোরেশন নিম্নলিখিত উৎস হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া থাকে। প্রথমত, এই মহানগরীর সমুদয় জমি ও গৃহের বাৎসরিক আয়ের উপর কর্পোরেশন নির্দিষ্ট হারে কর ধার্য করিয়া থাকে। জমি, বাড়ীর মালিক অথবা বাড়ী দখলকারীর নিকট হইতে সমান হারে এই কর আদায় করা হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ীদের নিজেদের ব্যবসায়ের জন্য কর্পোরেশনের নিকট হইতে সনদ লইতে হয়; ইহা হইতেও কর্পোরেশনের কিছু আয় হয়। তৃতীয়ত, গৃহপালিত পশু এবং বিভিন্ন যানবাহনের মালিকদের উপর কর ধার্য করা হয় এবং ইহা হইতেও কর্পোরেশনের কিছু আয় হয়। মোটর গাড়ীর উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাহা আদায় করে রাজ্যসরকার এবং তাহার অংশ কর্পোরেশন পাইয়া থাকে। চতুর্থত, হাট-বাজার হইতে এবং কর্পোরেশনের নিজস্ব সম্পত্তি হইতেও কিছু আয় হয়। সর্বশেষে, রাজ্যসরকারের অনুমতি লইয়া কর্পোরেশন জনসাধারণের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

কর্পোরেশনের আয়

কর্পোরেশনের যে সমস্ত কাজের কথা বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার জন্যই কর্পোরেশনকে মোটা রকমের টাকা খরচ করিতে হয়।

অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান—কলিকাতা শহরে আমরা আরও দুইটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই; যথা—কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (Calcutta Improvement Trust) এবং কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্ট (Calcutta Port Trust)। প্রথমটির কাজ হইতেছে কলিকাতা শহর এবং শহরতলীর বিভিন্ন ধরনের উন্নতি করা, এবং দ্বিতীয়টির কাজ হইতেছে কলিকাতা বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ করা। ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রথম প্রতিষ্ঠানটি কর্পোরেশনের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পায়। তাহা ছাড়া, জমি বিক্রয় করিয়া এবং দরকারের সময় জনগণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া এই প্রতিষ্ঠান অর্থসংগ্রহ করিতে পারে। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান ব্যয় নির্বাহের জন্য বন্দরে আগত বিভিন্ন জাহাজ হইতে অল্প হারে শুল্ক আদায় এবং নিজের মালিকানাধীন গুদামঘর ভাড়া দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করে।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দোষগুণ (Demerits and Merits of the Local Bodies)—স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান গুণ হইতেছে এইগুলি স্থানীয় স্বার্থের সহিত সম্যকভাবে পরিচিত বলিয়া সুষ্ঠুভাবে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়া এত সুষ্ঠুভাবে ইহা করা যাইত না। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন জনগণকে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাপ্রদান করে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন ধরনের কাজে স্থানীয় জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করিলে একদিকে যেমন বিভিন্ন কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, অপরদিকে এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্র সফল হয়।

কিন্তু স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অনেক দোষ দেখা যায়। প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে কর্মকুশল কর্মচারীর অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মও আশাপ্রদ হয় নাই। ইহার কারণ হইতেছে দুইটি, যথা,

অর্থের অনটন, এবং নাগরিক কর্তব্য সম্পাদনে জনগণের উদাসীনতা। দেশের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা আরও উন্নত করিতে হইলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারের দিক হইতে আর্থিক সাহায্য দিতে হইবে। তাহা ছাড়া, নাগরিকদের উপযুক্ত রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা এবং কর্তব্যবোধ বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় সেইজন্য ইহার কর্মচারীদের উচিত স্থানীয় জনগণের সহিত বিশেষ যোগাযোগ রাখা।

Exercise

1. Describe the various institutions for Local Self-Government in West Bengal. Point out briefly the functions that each of them performs.
(পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি বর্ণনা কর এবং ইহাদের প্রত্যেকটির কাজ সংক্ষেপে আলোচনা কর।) (১৩৩-১৩৫ পৃষ্ঠা)

2. Describe the composition and functions of the Calcutta Corporation.
(কলিকাতা কর্পোরেশনের গঠন এবং কাজগুলি বর্ণনা কর।) (১৩৬-১৩৮ পৃষ্ঠা)

3. Give an idea of how administration is carried on in a mofussil municipality. (মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটিতে কিভাবে শাসনকাজ চলে, তাহার একটা ধারণা দাও।) (১৩৬ পৃষ্ঠা)

4. What are the functions of a municipality? Mention the principal sources of revenue of a municipality.
(একটি মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্ম কি কি? একটি মিউসিপ্যালিটির আয়ের কি কি প্রধান উৎস আছে সেগুলি উল্লেখ কর।) (১৩৬ পৃষ্ঠা)

5. How far do the Panchayets help to solve the rural problems of Bengal?
(বাংলাদেশে গ্রামীণ জীবনের সমস্যাগুলির সমাধানে পঞ্চায়েৎগুলি কি পরিমাণ সাহায্য করে লিখ।) (১৩৩-৩৫ পৃষ্ঠা)

6. Describe briefly the constitution and functions of the Village Panchayets.
(গ্রামীণ পঞ্চায়েতের গঠন এবং কাজকর্ম খুব সংক্ষেপে আলোচনা কর।) (১৩৩-৩৫ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the merits and demerits of Local Self-Government.
(স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থার গুণ এবং দোষগুলি আলোচনা কর।) (১৩৮-১৩৯ পৃষ্ঠা)

সপ্তদশ অধ্যায়

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা (The Preamble to the Indian Constitution)

শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য (Objectives of a Preamble to the Constitution)—যে কোন শাসনতন্ত্রেরই প্রস্তাবনায় শুধু শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য ও নীতির বর্ণনা থাকে এবং ইহার আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি সম্বন্ধে শুধু একটি ইঙ্গিত দেওয়া হয়।

যে কোন আইনের প্রস্তাবনায় সেই আইনের উদ্দেশ্য ও নীতির উল্লেখ থাকে এবং কি কি অসুবিধা ও অন্যায়ের প্রতিকার করিবার জন্য আইনটি প্রণীত হইল তাহার বর্ণনা থাকে। অর্থাৎ কোন আইনের প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট আইনটি প্রণয়ন করিবার পিছনে আইনসভার উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছাকে প্রকাশ করে। শাসনতন্ত্র হইতেছে একটি দেশের মৌলিক আইন। সুতরাং শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা ইহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে এবং ইহার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র-প্রণেতাগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় শাসনতন্ত্রের উৎস, আইনগত এবং নৈতিক ভিত্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা দেওয়ার উদ্দেশ্য এবং ইহার আইনগত ও নৈতিক ভিত্তি

শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনাকে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। রাষ্ট্রের শাসন-বিভাগ, আইনবিভাগ এবং বিচার বিভাগের মূল ক্ষমতার (Substantive powers) ভাষা অথবা উদ্দেশ্য যদি পরিষ্কারভাবে বিধিবদ্ধ থাকে তবে শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা ইহার অর্থকে পরিবর্তিত করিতে পারে না। তবে শাসনতন্ত্রের কার্যকরী অংশে যদি কোন অস্পষ্টতা থাকে তবে ইহার ব্যাখ্যা শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনার মাধ্যমে করা যায়। কিন্তু যদি প্রস্তাবনার সহিত কার্যকরী অংশের অসামঞ্জস্য দেখা যায়, তবে প্রস্তাবনার পরিবর্তে কার্যকরী অংশই বলবৎ হয় প্রত্যেক শাসনতন্ত্রেরই একটি প্রস্তাবনা থাকা উচিত যাহাতে ইহার মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য এবং দার্শনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যায়। কোন কোন দেশের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় অনেক বড় বড় আদর্শের কথা বলা হয়—এবং আবার কোন কোন দেশের শাসনতন্ত্রে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্র প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

শাসনতন্ত্রের কার্যকরী অংশের সহিত প্রস্তাবনার সম্পর্ক

শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনার তাৎপর্য

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা (Preamble to the Indian Constitution)—ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনাটি এইরূপ, "আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিতে এবং ইহার সকল নাগরিকই যাহাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার এবং চিন্তার,

মত প্রকাশের, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা, এবং সুযোগ-সুবিধার ক্ষমতা লাভ করে ; এবং তাহাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তার অনুকূল ভ্রাতৃভাব রচিত হয়, তাহার জন্য আমরা সত্যনিষ্ঠার সহিত দৃঢ় সংকল্প হইয়া আমাদের এই গণপরিষদ আজ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতেছি, বিধিবিদ্ধ করিতেছি এবং নিজেদের প্রদান করিতেছি।"[১]

'ভারতের জনগণ' কথাটির তাৎপর্য

প্রস্তাবনা কখনই শাসনতন্ত্রের কার্যকরী অংশের অন্তর্গত নয়। "ভারতের জনগণ" প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারতের শাসনতন্ত্র গ্রহণ এবং বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে—গণপরিষদের সদস্যগণ ভারতের মাত্র শতকরা ১৪ জন লোকের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন, দেশের প্রাপ্তবয়স্ক সব নাগরিকের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। সুতরাং প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাঁহারা "ভারতের জনগণের" পক্ষে কোন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে এবং বিধিবদ্ধ করিতে পারেন কিনা। কিন্তু ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি, যেহেতু গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী দেশে সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান হইতেছে এবং এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকার পরিচালনার ব্যবস্থা ও জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে জনগণ সম্পূর্ণভাবে ও পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত মানিয়া চলিয়াছে, সেইজন্য এই শাসনতন্ত্রকে আমরা "ভারতের জনগণের" শাসনতন্ত্র বলিতে পারি। মুখবন্ধ অনুযায়ী ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আইনগত এবং নৈতিক ভিত্তি হইল ভারতের জনগণ। সুতরাং জনগণ সরকারের সমালোচনা করিতে পারিলেও সংবিধানের অমর্যাদা করিতে পারেন না।

ভারতের জনগণ নিজেরাই নিজেদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ; সেইজন্য ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত সরকার হইতেছে জনগণের সরকার, জনগণ কর্তৃক গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার। ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং মর্যাদা ও সুযোগের সমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। দেখা যাইতেছে, মুখবন্ধের প্রথমেই ভারতীয় শাসনতন্ত্র যে সম্পূর্ণভাবে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র তাহা সূচিত হইয়াছে।

প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারতবর্ষ একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। "সার্বভৌম

---

১ ("WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens, JUSTICE, social, economic and political, LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship, EQUALITY of status and of opportunity ; and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the nation ; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT and GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION").

কথাটির তাৎপর্য হইল ভারতবর্ষ সর্বপ্রকার বিদেশী শাসন ও নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত। ভারত সরকারের বিভিন্ন কাজে কোন বিদেশী রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। ইহার ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে কমনওয়েলথের সদস্যপদ ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রতিবন্ধক কিনা। কমনওয়েলথের সদস্যগণকে পূর্বে ইংলণ্ডের রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হইত। কিন্তু ভারতের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কমনওয়েলথের সদস্যপদ ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে কিনা সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠায় ১৯৪৯ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে স্থির করা হয় যে ভারত প্রজাতন্ত্র হইলেও ইচ্ছা করিলে কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের পূর্ণ মর্যাদার সহিত থাকিতে পারে। ভারতকে রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে না ; স্বেচ্ছামূলক রাজশক্তিকে কমনওয়েলথের প্রধান বলিয়া স্বীকার করা হইবে। কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে থাকিবার জন্য কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ভারত সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসাবে যে কোন সময়েই কমনওয়েলথ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। সুতরাং ভারতের কমনওয়েলথে থাকিবার সিদ্ধান্ত হইতেছে আইনের বাধ্যবাধকতামুক্ত (extra-legal) সিদ্ধান্ত। ভারতের নিকট ইংলণ্ডের রাজা বা রানী আনুগত্য পাইবেন না ; তিনি শুধু কমনওয়েলথের প্রতীক হিসাবেই থাকিবেন। ভারত নিজেই ইহার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিবে এবং সরকার গঠন করিবে। সরকারের নীতি যে বৃটিশ সরকারের নীতি অনুসরণে গঠিত হইবে এমন কোন কথা নাই। প্রকৃতপক্ষে বিগত কয়েক বৎসরে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি এবং ইংলণ্ড ও কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্যদের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে একটি বিরাট পার্থক্য দেখা গিয়াছে। কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত কোন দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হইলে ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে না, অথবা কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক গৃহীত কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে ভারত বাধ্য থাকিবে না। সুতরাং কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ায় ভারতের সার্বভৌমত্ব মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আমাদের শাসনতন্ত্রটি শুধু একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রই গঠন করে নাই, এই সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রটিকে গণতান্ত্রিকও করিয়াছে।

“সার্বভৌম” কথাটির তাৎপর্য

কমনওয়েলথের সদস্য থাকায় ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিনা

ভারতীয় জনগণ এই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে, বিধিবদ্ধ করিয়াছে, এবং গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং সার্বভৌম শক্তি জনগণের হাতেই ন্যস্ত। প্রস্তাবনায় প্রত্যেক নাগরিককে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় ও চিন্তা, মতপ্রকাশ, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রে জনগণের কতিপয় মৌলিক অধিকারও দেওয়া হইয়াছে। জনগণের এই অধিকারগুলিই শাসনতন্ত্রটিকে গণতান্ত্রিক করিয়াছে।

গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র

সর্বশেষে প্রস্তাবনা অনুযায়ী আমাদের শাসনতন্ত্রটি একটি “প্রজাতন্ত্র” গঠন করিয়াছে। প্রজাতন্ত্রে রাজা বা রাজতন্ত্রের কোন চিহ্ন থাকে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতও একটি প্রজাতন্ত্র। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রের প্রধান। মূলরাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করা হইয়াছে। রাজ্যপুনর্গঠন করিয়া পূর্বতন দেশী রাজ্যগুলির রাজপরিবার হইতে রাজপ্রমুখ নিযুক্ত করার প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর রাজ্যগুলির মধ্যে সমস্ত ব্যবধান দূর করা হইয়াছে। পূর্বে জম্মু ও কাশ্মীরের যিনি 'সদর-ই-রিয়াসৎ' অর্থাৎ রাজ্যের শাসনকর্তা, তিনিও রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন এবং সেই নির্বাচন ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত হইতেন। বর্তমানে কাশ্মীরে সদর-ই-রিয়াসৎ পদটি তুলিয়া দিয়া রাজ্যপালের পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারত প্রকৃতই একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

"প্রজাতন্ত্র"

Exercise

1. "The Preamble to the constitution of India states that India shall be a Sovereign Democratic Republic." Explain the statement.

("ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হইবে"—এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।) (১৪০-৪৩ পৃষ্ঠা)

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights of the Indian Citizens)

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার দেওয়া হইয়াছে যাহাতে তাহারা নিজেদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষায় শুধু শাসন-বিভাগের নহে আইন-প্রণয়ন বিভাগের ক্ষমতাকে সীমিত করিতে পারে; যদিও ভারতে 'মৌলিক' অধিকারগুলি কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে ভারতীয় শাসনতন্ত্রে পার্লামেণ্টারী সার্বভৌমত্ব এবং বিচার-বিভাগীয় স্বাধীনতার মধ্যে একটি আপস করা হইয়াছে।[১] একদিকে যেমন বিচার-বিভাগ মৌলিক অধিকারগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারে অথবা সেইগুলিকে কার্যকর করিতে পারে, অপরদিকে তেমনি পার্লামেণ্টও শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়া মৌলিক অধিকারগুলির পরিবর্তন করিতে পারে, বিচার-বিভাগের সিদ্ধান্তকে অকেজো করিয়া দিতে পারে। শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশ (Part III) ১২ নম্বর হইতে ৩৫ নম্বর ধারা পর্যন্ত মৌলিক অধিকারগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে।

অধিকারগুলি মৌলিক কেন?

ভারতের শাসনতন্ত্রের নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলির বিশ্লেষণ (Analysis of the Fundamental Rights of the citizens in the Indian Constitution)—এই অধিকারগুলি "মৌলিক" ("fundamental"); কেননা নাগরিকগণ শাসন-

১ D. Basu—Introduction to the Constitution of India. (1960) p. 64

তন্ত্র হইতে এই অধিকারগুলি লাভ করিয়াছে। এই অধিকারগুলি স্বীকার না করিয়া লওয়ার ক্ষমতা সরকারের নাই। তবে দেশে যদি জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য সরকার এই অধিকারগুলির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ সময়ে রাষ্ট্র যদি নাগরিকের এই অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করে তবে নাগরিকগণ বিচার-বিভাগের নিকট সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে। ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকে সাত-ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা, (১) সাম্যের অধিকার (Right to Equality) (২) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom), (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation), (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right of Freedom of Religion), (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Rights), (৬) সম্পত্তির অধিকার (Right to Property) এবং (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)।

এই অধিকারগুলির মধ্যে কতিপয় অধিকার আছে যেগুলি শুধু নাগরিকগণই ভোগ করে। ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ, জন্মভূমি প্রভৃতির ভিত্তিতে পারস্পরিক তারতম্যের হাত হইতে সংরক্ষণ (১৫ নম্বর ধারা), সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে সুযোগের সমান অধিকার (১৬ নম্বর ধারা), বাক্-স্বাধীনতা, সভাসমিতি করিবার অধিকার, সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার, চলাফেরার স্বাধীনতা, সম্পত্তি এবং পেশার অধিকার (১৯ নম্বর ধারা) এবং সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক অধিকার (৩০ নম্বর ধারা) শুধু নাগরিকগণই ভোগ করিয়া থাকে। আবার কতিপয় অধিকার আছে যেগুলি নাগরিক না হইলেও দেশের যে কোন অধিবাসী ভোগ করিতে পারে ;—যেমন আইনের চোখে সমতা এবং আইনের সংরক্ষণের সমতা (১৪ নম্বর ধারা), শাস্তির বিপক্ষে সংরক্ষণ অথবা একই অপরাধে দুইবার শাস্তির বিপক্ষে সংরক্ষণ (২০ নম্বর ধারা), আইন বিবর্জিত কাজের বিপক্ষে জীবনধারণ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষণ (২১ নং ধারা), শোষণের বিপক্ষে অধিকার (২৩ নং ধারা), ধর্মের অধিকার (২৫ নম্বর ধারা), বিশেষ একটি ধর্মের উন্নতির জন্য কর প্রদান সম্পর্কিত অধিকার (২৭ নম্বর ধারা), শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় উপদেশ অথবা পূজার্চনায় যোগদানের অধিকার (২৮ নম্বর ধারা) এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত অন্য কোন যুক্তিতে সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত না হইবার অধিকার (৩১ নম্বর ধারা) প্রভৃতি। ইহা উল্লেখযোগ্য যে শাসনতন্ত্রের ১৯ নম্বর, ২১ নম্বর এবং ৩১ নম্বর ধারা অনুযায়ী নাগরিকদের অধিকারগুলি হইতেছে রাষ্ট্রের কাজের বিপক্ষে অধিকার।

প্রথমত, **সাম্যের অধিকার** (**Right to Equality**) বলিতে আমরা সাধারণত বুঝি আইনের চোখে সব নাগরিকেরই সমান অধিকার থাকিবে। ধনী-নির্ধন, অথবা ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী-নির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ সব নাগরিকই যাহাতে সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, সেইভাবে আইনের প্রয়োগ করিতে হইবে (১৪ নম্বর ধারা)। তাহা ছাড়া, প্রত্যেক নাগরিকেরই সরকারের ক্রিয়াকলাপে প্রত্যক্ষ অথবা

পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার সমান অধিকার থাকিবে। সরকারী কাজের জন্য লোক মনোনয়ন অথবা নির্বাচনে প্রার্থী হইবার সমান অধিকার সব নাগরিকেরই থাকে (১৬ নম্বর ধারা)। ভোট প্রদান করিবার অধিকারও সব নাগরিকের সমান থাকিবে। তবে ভারতে রাজ্যবিধানমণ্ডলীর উচ্চ কক্ষের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় শিক্ষকগণকে অথবা স্থানীয় পৌরশাসন সংস্থাকে (local municipal bodies) ভোট দিবার এবং প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, ইহা জাতীয় স্বার্থে বিশেষ একটি শ্রেণীর অধিকার মাত্র। কিন্তু ইহাতে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোট প্রদানের সমান অধিকার ব্যাহত হয় নাই। বিদ্বজ্জনের ক্ষেত্রে উপাধি বিতরণ অথবা সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে উপাধি বিতরণের সময় সম্মানিত ব্যক্তি উপাধি ব্যবহার করিতে পারেন। অন্যত্র রাষ্ট্র কর্তৃক সম্মানিত ব্যক্তিগণ (যেমন, পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ প্রভৃতি) নিজেদের নামের পাশে সম্মান-উপাধি বসাইতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, **স্বাধীনতার অধিকার** (**Right to Freedom**) বলিতে আমরা বুঝি, বাক্-স্বাধীনতার অধিকার (Right to freedom of speech, ১৯ নম্বর ধারা), সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (Freedom of the press), স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অধিকার (Right to work, and Right to move freely) স্বাধীনভাবে আইন-সঙ্গত চুক্তি করার অধিকার (Right of contract), বিদেশে থাকাকালীন জীবনরক্ষার অধিকার (Right to protection while staying abroad) স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিবার অধিকার, যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার ও উপ-জীবিকা চালাইবার অধিকার (Right to occupation) এবং বাসস্থানের অধিকার (Right to residence)।

বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং নাগরিকদের সভা-সমিতি আহ্বান করিবার অধিকার গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকার বলিতে স্বাধীনভাবে ভোট প্রদান করিবার অধিকার, সরকারী-চাকুরী করিবার অধিকার এবং নাগরিকদের যদি সরকারের বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভের কারণ থাকে, তাহার প্রতিকার-কল্পে স্বাধীনভাবে আবেদন করিবার অধিকারও বুঝায়। তাহা ছাড়া, ভারতীয় নাগরিকদের স্বাধীনভাবে সংঘ, সমিতি অথবা রাজনৈতিক দল গঠন করিবার স্বাধীনতা আছে। স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অধিকার অর্থাৎ, নিজের বৃত্তি অথবা উপজীবিকা, নিজের নির্বাচন করিবার অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে স্বাধীনভাবে আইনসঙ্গত চুক্তি করার অধিকারও ভারতীয় নাগরিকদের আছে। বিদেশে থাকাকালীন অবস্থায় নিজের জীবনরক্ষার জন্য এবং স্বাধীনসত্তা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের সাহায্য পাইবার অধিকারও ভারতীয় নাগরিকদের আছে। এক কথায়—স্বাধীনতার অধিকার বলিতে আমরা ভারতীয় নাগরিকদের পৌর, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রের স্বাধীনতার অধিকার বুঝি।

স্বাধীনতার অধিকার কখনই নিরঙ্কুশ নহে। প্রয়োজনবোধে সরকার স্বাধীনতার অধিকারের উপর যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ আরোপ করিতে পারেন। এই বাধা-নিষেধগুলি—(১) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার কারণ ঘটিলে (২) বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইলে (৩) জনশৃঙ্খলা বজায় রাখিবার দরকার হইলে (৪) সদাচার বা শ্লীলতা বজায় রাখিবার স্বার্থে প্রয়োজন হইলে (৫) বিচার বিভাগের অবমাননার কাজ ঘটিলে (৬) মানহানির ব্যাপার হইলে এবং (৭) কাহাকেও অপরাধ অনুষ্ঠানে প্ররোচিত করিবার ব্যাপার হইলে—নাগরিকদের উপর আরোপ করা যাইতে পারে। স্বাধীনতার অধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, শাসনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদটিতে যে সকল অধিকারের কথা বলা হইয়াছে সেইগুলির দ্বারা রাষ্ট্রের অযথা হস্তক্ষেপ হইতে স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করা হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষ এই অধিকারগুলি ভঙ্গ করিলে তাহার প্রতিকারের জন্য সাধারণ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার উপর বাধা-নিষেধগুলি যুক্তিসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। এই বাধা-নিষেধগুলির পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে কিনা তাহা বিচার করিবার দায়িত্ব হইল আদালতের। তবে দেখিতে হইবে, এই বাধা-নিষেধগুলি যেন অতিরিক্ত মাত্রায় না হয়। নিবর্তনমূলক আটক আইন অনুযায়ী যাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাঁহাদের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারাটি কার্যকরী হইবে না। শাসনতন্ত্রের ২০ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, যে অবস্থার এবং যে সময়ের কাজকে অপরাধজনক বলিয়া ধরা হয়, সেই সময়কার প্রচলিত আইনভঙ্গের জন্য অপরাধ হইলেই তাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু শাসনতন্ত্রের ২০ নম্বর ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, একই অপরাধের জন্য দুইবার একটি নাগরিককে শাস্তি দেওয়া চলিবে না। একই অপরাধের জন্য একাধিকবার বিচার সংক্রান্ত অধিকারটি শুধু কোন ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে বিচারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য বিচারের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে।[১] যেমন কোন সরকারী কর্মচারী নিজের অপরাধের জন্য আদালতে দণ্ডিত হইতে পারেন; আবার সেই সঙ্গে সরকার তাহার বিভাগীয় কাজের জন্য তদন্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

তৃতীয়ত, ভারতীয় নাগরিকগণ সর্বপ্রকার **শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার** ভোগ করে। নাগরিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরি ও নির্দিষ্ট কার্যকাল পাইবার **(Right to reasonable wages and hours of work)** অধিকার আছে। এইজন্য ভারত সরকার কারখানা আইন, সর্বনিম্ন মজুরি আইন ইত্যাদি আইনপ্রণয়ন করিয়াছে। কেহ কাহাকেও জোরজবরদস্তি করিয়া কোন কাজ করাইতে পারিবে না (২৩ নম্বর ধারা)।

---

১ Venkataraman vs. Union of India (1954)

চতুর্থত, নাগরিকদের **ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার** বলিতে ধর্মাচরণ এবং বিবেকের স্বাধীনতা (**Freedom of worship and conscience**) বুঝায়। ভারত একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সুতরাং ভারতীয় নাগরিকদের নিজের ইচ্ছানুযায়ী ধর্মাচরণ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে (২৫-২৮ নম্বর ধারা)।

পঞ্চমত, ভারতীয় নাগরিকগণ **সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার (Cultural and educational rights)** ভোগ করে। নাগরিকগণ যাহাতে নাগরিক দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইতে পারে, সেইজন্য তাহাদের শিক্ষা লাভ করিবার অধিকার আছে। তাহা ছাড়া, নিজের কৃষ্টি ও ভাষা রক্ষা করিবার অধিকারও নাগরিকদের আছে।

ষষ্ঠত, নাগরিকদের **সম্পত্তির অধিকার (Right to Property)** আজকাল সব দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিকদেরও সম্পত্তি রক্ষার পূর্ণ অধিকার আছে। অবশ্য এই অধিকারটি সামাজিক স্বার্থে অনেকক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। যেমন, প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র কোন সম্পত্তি জাতীয়করণ করিতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সম্পত্তির অধিকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে। বিভিন্ন দেশে দেখা যায়, রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে বিভিন্নভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে; এই হস্তক্ষেপের মাধ্যম হইতেছে সর্বোচ্চ ক্ষমতা (eminent domain); পুলিশী ক্ষমতা (police power) এবং করস্থাপন ক্ষমতা (power of taxation)। সম্পত্তির মালিকের সম্মতি ব্যতীতই রাষ্ট্র এই ক্ষমতা বলে সম্পত্তি দখল করিতে পারে। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে তিনটি সর্ত আছে: (১) ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আইনের নির্দেশ থাকা প্রয়োজন; (২) জনস্বার্থ বর্তমান থাকা প্রয়োজন; এবং (৩) ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পুলিশী ক্ষমতা হইতেছে সেই ক্ষমতা যাহার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনকল্যাণ এবং জনস্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। পুলিশী ক্ষমতা বলে যদি রাষ্ট্র কোন সম্পত্তি ধ্বংস বা দখল করেন, তাহার জন্য রাষ্ট্র সর্বদা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নহেন। তবে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩১ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আইনের নির্দেশ ব্যতীত সম্পত্তিচ্যুত করা যায় না এবং ৩১ (২) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্র যদি কোন সম্পত্তি দখল করিতে চাহে, তবে ইহার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে; তাহা ছাড়া, সর্বজনীন উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র কাহারও সম্পত্তি দখল করিতে পারিবে। ১৯৫৫ সালে শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনী আইন অনুযায়ী সর্বজনীন উদ্দেশ্যে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানকারী আইনের ভিত্তিতে ছাড়া অন্য কোন ভাবে রাষ্ট্র কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে দখল করিতে পারিবে না। জনস্বার্থের খাতিরে এবং পরিচালনার উন্নয়নের জন্যও কোনও কোম্পানীর শাসনভার সরকার গ্রহণ করিতে পারেন।

সর্বশেষ, নাগরিকগণকে **শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার (Right to constitutional remedies)** দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতা অনুযায়ী নাগরিকগণ

নিজেদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন করিতে পারেন। দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি না হইলে রাষ্ট্র নাগরিকগণকে তাহাদের মৌলিক অধিকারগুলি প্রদান করিতে বাধ্য। কিন্তু, আমাদের দেশে সরকার যে কোন সময়েই নিবর্তনমূলক আটক আইন (Preventive Dentention Act) চালু রাখিতে পারেন। চীনা আক্রমণের ফলে জরুরী অবস্থায় সৃষ্টি হওয়ায় ভারত সরকার ১৯৬২ সালের ৩০শে অক্টোবরও ভারত প্রতিরক্ষা আইনও (Defence of India Act) প্রবর্তন করিয়াছেন। বিনা বিচারে আটক না থাকিবার অধিকার ভারতীয় নাগরিকগণের আছে। কিন্তু ভারত প্রতিরক্ষা আইনে নাগরিকদের সেই অধিকারকেও নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। সাধারণভাবে কোন নাগরিককে কি কারণে আটক রাখা হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য সুপ্রীম কোর্ট অথবা হাইকোর্ট অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ জারী করিতে পারে, ইহাকে "Habeas corpus" বলা হয়। আবার হাইকোর্ট অথবা সুপ্রীম কোর্ট চরম আদেশ বা "Mandamus" জারী করিয়া কোন ব্যক্তি, সংস্থা, অধস্তন আদালত অথবা সরকারকে নিজের দায়িত্ব পালন করিতে নির্দেশ দিতে পারে। তাহা ছাড়া, প্রতিষেধের (Prohibition) সাহায্যে উর্ধ্বতন বিচারালয় নিম্নতর আদালতকে আপন এক্তিয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য করে। ইহা শুধু বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শাসন বা আইন সংক্রান্ত কাজের বেলায় প্রযুক্ত হয় না। *Quo warranto* বা অধিকার-পৃচ্ছা অনুযায়ী যখন কোন ব্যক্তি যে-পদ অধিকারে যোগ্যতাসম্পন্ন নয় সেই পদ বা অধিকার দাবি করে, তখন তাহার দাবি বৈধ কিনা তাহা অনুসন্ধান করা হয় এবং অবৈধ প্রমাণিত হইলে তাহাকে পদচ্যুত করা হয়। উৎপ্রেষণ (*Certiorari*) অনুযায়ী নিম্নতন আদালত বা বিচার বিভাগের কিছু ক্ষমতা আছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান আইনগত ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করিলে ঐ বিচারালয় বা প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে বিচারককে উচ্চতর বিচারালয়ের হাতে অর্পণ করা যায় কিংবা ক্ষমতা-বহির্ভূত সিদ্ধান্তকে বাতিল করা যায়। শাসনতন্ত্রের ৩২ নম্বর ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের অধিকারকে উপরোক্ত উপায়গুলির মাধ্যমে কার্যকর করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা অথবা জননিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত শক্তিসমূহের সদস্যরা কতটা এই মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করিবে তাহা পার্লামেন্ট আইনপ্রণয়ন করিয়া স্থির করিবে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে দণ্ডমকুব আইনপ্রণয়ন করারও ব্যবস্থা হইয়াছে। সামরিক শাসন থাকাকালীন অবস্থায় যদি সশস্ত্র বাহিনী এমন কোন কাজ করে যাহা শাসনতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অবৈধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বৈধ ঘোষণা করিয়া আইনপ্রণয়ন করিবার অধিকার পার্লামেন্টের আছে।

সশস্ত্র বাহিনীর অথবা জননিরাপত্তা রক্ষার নিযুক্ত লোকের মৌলিক অধিকার

ভারতীয় নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি খুবই গণতান্ত্রিক, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু, এই অধিকারগুলি কখনই সর্তবিহীন (absolute) নহে।

জরুরী অবস্থায় সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের এই অধিকারগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। তবে দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় যদি নিবর্তনমূলক আটক আইন (Preventive Detention Act) চালু থাকে, তবে শাসকগোষ্ঠী এই আইনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন—এই আশঙ্কা অমূলক নহে।

মৌলিক অধিকারগুলি গণতান্ত্রিক

মৌলিক অধিকার কিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়? (How are Fundamental Right enforced?)—মৌলিক অধিকারগুলি যাহাতে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঠিকভাবে কার্যকর হয় সেইজন্য ভারতীয় শাসনতন্ত্রে নিম্নলিখিত বিধান আছে। প্রথমত, শাসনতন্ত্র নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার দিয়াছে, তাহা শুধু শাসনবিভাগের বিপক্ষেই নহে, তাহা আইনপ্রণয়ন বিভাগের বিপক্ষেও বটে। শাসনবিভাগের কোন কাজ অথবা আইনপ্রণয়ন বিভাগের কোন আইন যদি নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হয়, তবে শাসনবিভাগের সেই কাজকে অথবা আইনপ্রণয়ন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সেই আইনকে বাতিল করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের আছে (১৩ নম্বর ধারা)। দ্বিতীয়ত, যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে বিচার বিভাগের ক্ষমতা আছে Habeas Corpus বা আদেশপত্র জারী করিয়া রাষ্ট্রের যে কোন কর্তৃপক্ষের বিপক্ষে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারকে কার্যকর করার। শাসনতন্ত্রের ৩২ নম্বর ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্টের এই আদেশপত্র জারী করিবার ক্ষমতা আছে। শাসনতন্ত্রের ২৬৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী পার্লামেন্টেরও ক্ষমতা আছে অন্য যে কোন আদালতকে এই জাতীয় আদেশপত্র জারী করিবার ক্ষমতা দেওয়ার। তৃতীয়ত, যদি দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি না হয় তবে এই মৌলিক অধিকারগুলির কার্যকারিতা বন্ধ করিয়া রাখা যায় না। শুধু জরুরী অবস্থায় শাসনতন্ত্রের ৩৫৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকারগুলির কার্যকারিতা বন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন।

শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলির সংশোধন করা সম্ভব নয়। ১৯৬৭ সালে গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব সরকার (Goloknath vs. The State of Punjab) মামলায় সুপ্রীম কোর্ট এই রায় দেন যে শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির সংশোধন করা অথবা সেইগুলিকে খর্ব করার অধিকার পার্লামেন্টের নাই; এই অধিকার আছে শুধু এই উদ্দেশ্যে গঠিত একটি গণপরিষদের।

মৌলিক অধিকারগুলি কি নিরঙ্কুশ? (Are the Fundamental Rights absolute?)—মৌলিক অধিকারগুলি সর্বজনীন নহে। কোন কোন অবস্থায় এই অধিকারগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা চলে। প্রথমত, শাসনতন্ত্রের ৩৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর লোকদের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের

প্রয়োগ পার্লামেণ্টের সংশোধন করিবার ক্ষমতা আছে। দ্বিতীয়ত, শাসনতন্ত্রের ৩৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী দেশে যদি সামরিক আইন চালু থাকে তবে দেশের নিরাপত্তা অথবা শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য কেন্দ্র অথবা রাজ্যের যে কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে। তৃতীয়ত, শাসনতন্ত্রের ৩৫২ নম্বর ধারা অনুযায়ী যদি দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে শাসনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী আইন-সভাগুলির আইনপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতার উপর যে সীমা আরোপিত আছে তাহা উঠিয়া যায় এবং আইনসভা জরুরী অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যে কোন রকমের আইন প্রচলন করিতে পারে। ইহাতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে এবং শাসনতন্ত্র তাহা অনুমোদন করে। কিন্তু জরুরী অবস্থার অবসান হইলেই শাসনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারাটি পুনরায় কার্যকরী হয়।

মৌলিক অধিকারের নিয়ন্ত্রণ

চতুর্থত, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকারের কার্যকারিতা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন এবং আদালতে নাগরিকদের নিজেদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য আবেদন করা সেই সময়ে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন (৩৫৯ নম্বর ধারা)।

Exercise

1. Discuss the Fundamental Rights that an Indian citizen enjoys. Are these rights absolute? (ভারতীয় নাগরিক যে মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করেন, সেইগুলি আলোচনা কর। এই অধিকারগুলি কি নিরঙ্কুশ?) (১৪৩-৪৮ পৃষ্ঠা ; ১৪৯ পৃষ্ঠা।)

2. How are the Fundamental Rights enforced? Are these Rights absolute? (মৌলিক অধিকারগুলিকে কিভাবে কার্যকরী করা হয়? এই অধিকারগুলি কি নিরঙ্কুশ?) (১৪৯-৫০ পৃষ্ঠা)

3. Write a note on the Right to Freedom. (স্বাধীনতার অধিকারের উপর একটি টীকা লিখ।)

উনবিংশ অধ্যায়

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি
(Directive Principles of State policy in the Indian Constitution)

ভারতের শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে শাসনতন্ত্রের কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতি বর্ণিত হইয়াছে। এইগুলির প্রধান বিষয়বস্তু হইতেছে দেশের জনগণকে এমন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাহাতে আমাদের রাষ্ট্র একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে (Welfare state) পরিণত হইতে পারে। এই নীতিগুলি বাস্তবে রূপায়িত হইলে দেশ সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইবে।

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি (Directive Principle of State Policy)—ভারতীয় শাসনতন্ত্রের চতুর্থ অংশে (৩৭—৫১ নম্বর ধারা) রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতির বিধান রাখা হইয়াছে। নীতিগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমত, এমন কতিপয় নীতি আছে যেগুলি প্রধানত অর্থনৈতিক, এবং শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণের মতে যেগুলি কার্যকরী করিবার জন্য রাষ্ট্রের সর্বদা চেষ্টা করা উচিত। দ্বিতীয়ত, আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের কাজের পরিচালনার জন্য কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতি আছে। তৃতীয়ত, নাগরিকদের কতিপয় অধিকারের বিধান করা হইয়াছে। এই নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক গ্রাহ্য নয়। কিন্তু এইগুলি রাষ্ট্রপরিচালনার এমন কতিপয় নীতি যেগুলিকে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করিতে পারে না। শাসনতন্ত্রের ৩৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী এই নীতিগুলি কোন আদালত কর্তৃক কার্যকর হইবে না ; কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে এই নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা। রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য হইল এমন একটি সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করা যেখানে জনগণ সামাজিক ; অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার পাইবে ; রাষ্ট্র এমনভাবে নীতি পরিচালনা করিবে যেন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নাগরিকগণ পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের অধিকার ভোগ করিতে পারে। জনগণের স্বার্থে সমাজের সমুদয় আর্থিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে, সকলের জন্যই সমান কাজের ক্ষেত্রে সমান মজুরির ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, দেশের সমুদয় অর্থনৈতিক শক্তি যাহাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়া সামাজিক স্বার্থের হানি না করে এবং যাহাতে ইহা ন্যায়সঙ্গতভাবে ও সমানভাবে বণ্টিত হয়, সেদিকে রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাখা উচিত। শিশু এবং যুবক-যুবতীগণকে সর্বপ্রকার শোষণ হইতে এবং নৈতিক ও পার্থিব দুর্গতির হাত হইতে রক্ষা করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য। শাসনতন্ত্রের ৪০ নম্বর ধারা অনুযায়ী গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং সেইগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েৎ আইন প্রবর্তিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক অর্থ

সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী সমগ্র দেশকে একটি "কল্যাণ রাষ্ট্রে" (welfare state) পরিণত করিতে হইবে। রাষ্ট্রের উচিত পঞ্চায়েৎ সংগঠন করা এবং চৌদ্দ বৎসরের নীচের সব শিশুদের জন্য বিনা বেতনে এবং বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। কর্ম, শিক্ষা, বেকার ভাতা কাজের ন্যায়সঙ্গত সর্তাবলী শ্রমিকদের বার্ধক্য এবং দুর্ঘটনা অথবা অসুস্থতার জন্য সরকারী ভাতা, প্রসূতিদের কল্যাণের জন্য অর্থসাহায্য প্রভৃতি জীবন-ধারণের উপযোগী সবরকম ব্যবস্থা করার দায়িত্ব হইবে রাষ্ট্রের। গ্রামাঞ্চলে শিল্পোন্নয়নের, বিশেষত, কুটিরশিল্পগুলির উন্নতির চেষ্টা করিয়া কর্মসংস্থান

একটি কল্যাণ-রাষ্ট্রের সংগঠন

সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে (৪৩ নং ধারা)। তপশীলশ্রেণীভুক্ত জনসাধারণের এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সম্প্রদায়ের জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, জনস্বার্থের সংরক্ষণ করা এবং মাদক পানীয় নিষিদ্ধ করা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও পশুপালন সংগঠন করা এবং গরু প্রভৃতি অত্যাবশ্যক গৃহপালিত জন্তুবধ রহিত করাও রাষ্ট্রের কর্তব্যগুলির অন্যতম। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যতদূর সম্ভব এই নীতিগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভারত সরকার শিল্পশ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করিয়াছেন।

শিল্প-শ্রমিকের নিরাপত্তা

তাহা ছাড়া, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন অথবা চারুকলার দিক হইতে উন্নত এবং পার্লামেণ্টে প্রণীত আইন কর্তৃক জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ঘোষিত স্মারক স্থান ও বিভিন্ন বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। অপর একটি বিধান (৫০ নম্বর ধারা) অনুযায়ী রাষ্ট্রের উচিত শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগকে ক্রমশ পৃথক করা। এই কাজে ভারত সরকার এখনও সম্পূর্ণভাবে সফল হইতে পারেন নাই। সর্বশেষে ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কি হওয়া উচিত, সেই বিষয়েও নির্দেশাত্মক নীতিগুলিতে কিছুটা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। নির্দেশমূলক নীতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বর্ধন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্মানজনক, ন্যায়সঙ্গত সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রক্ষা, আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ানো এবং পারস্পরিক মীমাংসার সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদসমূহের সমাধানে উৎসাহ প্রদান করিতে ভারতবর্ষের চেষ্টা করা উচিত।

ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্বশান্তির প্রয়াস

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি অনেকটা সমাজতান্ত্রিক। রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা, বেকার ভাতা প্রদান করা, শিশু ও যুবক-যুবতীগণকে শোষণের হাত হইতে রক্ষা করা সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় আমাদের শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে সম্পত্তি রক্ষার অধিকার দেওয়া হইয়াছে কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার দেওয়া হয় নাই। শুধু নির্দেশাত্মক নীতিতে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রাষ্ট্রের চেষ্টা করা উচিত; কিন্তু ইহা করিতে রাষ্ট্র আইনগতভাবে বাধ্য নহে। যদি জনগণের অর্থনৈতিক সাম্যের মৌলিক অধিকার (Fundamental Right to Economic Equality) থাকিত, তবে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে দেশ হইতে আয় ও ধনের বৈষম্য দূর করিতে হইত। ভারতে বর্তমান বেকারসমস্যা খুবই তীব্র; কিন্তু এই পর্যন্ত ভারত সরকার কাহাকেও বেকার ভাতা প্রদান করে নাই। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিকে উল্লিখিত কর্তব্য যে রাষ্ট্র সর্বদাই পালন করে,

অর্থনৈতিক সাম্য, বেকার ভাতা, শোষণ-মুক্তি

মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে অর্থনৈতিক সাম্যের ব্যবস্থা নাই, অর্থনৈতিক অধিকারের ব্যবস্থা আছে

তাহা নহে; কিন্তু যদি এই নীতিগুলিকে জনগণের মৌলিক অধিকাররূপে গণ্য করা হইত, তবে দেশে সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গঠিত হইত।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলির উপযোগিতা (Utility of the Directive Principles)—যখন ভারতীয় শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়, তখন অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি যেহেতু আদালত-গ্রাহ্য নহে, সেইজন্য শাসনতন্ত্রে বজায় রাখার কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু এই ধারণা যে সুবিবেচনাপ্রসূত নহে তাহা পরে প্রমাণিত হইয়াছে। যদিও আমাদের দেশের আদালত নির্দেশাত্মক নীতির বিরোধী বলিয়া কোনও আইনকে বাতিল করিতে পারে না, তবুও অনেক আইনের শাসনতান্ত্রিক কার্যকারিতা বজায় রাখা হইয়াছে, যেহেতু সেইগুলি নির্দেশাত্মক নীতি অনুসরণ করিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন আইন শাসনতন্ত্রের ১৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী আমাদের মৌলিক অধিকারের উপর 'অকারণ নিয়ন্ত্রণ' চাপাইয়া দেয় বলিয়া কেহ অভিযোগ করে, এবং যদি সেই আইন শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলির কোন উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় তবে আদালত সেই আইনটি অকারণে জনগণের মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করিবে। ১৯৫১ সালে 'বোম্বাই রাজ্য বনাম বালসার'[১] মামলায় আদালত অনুরূপ রায় প্রদান করেন। যদিও শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলি কখনও মৌলিক অধিকারগুলিকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না, তবুও মৌলিক অধিকারের ভূমিকা এবং প্রক্রিয়ার বিবেচনা করিবার সময় আদালত নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। বরং দেখা গিয়াছে যে নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কার্যকরী করিবার জন্যও কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের সংশোধন (প্রথম ও চতুর্থ সংশোধন) করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে ৩৯ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে দেশের বিভিন্ন সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে বণ্টন করিতে হইবে যেন ইহাতে সকলের কল্যাণ হয়। এই নীতি অনুযায়ী কৃষি এবং অর্থনৈতিক সংস্কার করিবার জন্য ভারত সরকার দুইবার নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের সংশোধন করিয়াছেন। কিন্তু যদি কখনও রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি এবং মৌলিক অধিকারের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তবে মৌলিক অধিকারকে প্রাধান্য দিতে হইবে। শাসনতন্ত্রের ৩৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য নহে; কিন্তু ৩২ নম্বর ধারা অনুযায়ী মৌলিক অধিকারগুলি আদালত-গ্রাহ্য; সুতরাং কোন অবস্থায়ই নির্দেশাত্মক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত-গ্রাহ্য না হইলেও বিশেষ উপযোগী

প্রয়োজন বোধে নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কার্যকরী করার জন্য শাসনতন্ত্র সংশোধন করা হয়

১ Bombay State vs. Balsara.

যদিও নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত-গ্রাহ্য নহে তবুও আমাদের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে এই নীতিগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কোন গণতান্ত্রিক দেশই এই নীতিগুলিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। এই নীতিগুলির পিছনে কোন আইনগ্রাহ্য অনুমোদন নাই সত্য, কিন্তু, এইগুলির অনুমোদন (sanction) হইতেছে রাজনৈতিক। রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হইতেছে সরকারের প্রতি শাসনতন্ত্রের সাধারণ নির্দেশ। রাষ্ট্র যদি এই নীতিগুলি অনুযায়ী পরিচালিত না হয়, তবে সরকারকে এইজন্য নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে।[১]

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত-গ্রাহ্য না হইলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ

যদি সরকার এই নীতিগুলি অনুযায়ী নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে পরিচালিত না করেন, তবে পার্লামেন্টের বিরোধাপক্ষ ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে এবং ইহার ভিত্তিতে সরকারের সমালোচনা করিতে পারে। এখানেই রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির সার্থকতা। বলা যাইতে পারে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হইতেছে রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের জন্য কতিপয় নৈতিক উপদেশ। এইগুলির অন্তত একটি শিক্ষামূলক উপযোগিতা আছে।

ভারত সরকার এই নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার (৪০ নম্বর ধারা) এবং জাতীয় আয় বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। দেশের আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইয়া দিয়া অর্থনৈতিক শক্তির সমবণ্টন করিবার প্রচেষ্টা নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী প্রচলিত হইতেছে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই নীতিগুলি অনেকটা সমাজতান্ত্রিক। অপরদিকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি হইতেছে গণতান্ত্রিক। এইভাবে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ হইয়াছে।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি ভারতকে সমাজতন্ত্রের পথে চালিত করিতেছে

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য (Differences between the Directive principles of State Policy and the Fundamental Rights)—রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইতেছে নিম্নরূপ :—(১) এই নীতিগুলি আদালত-গ্রাহ্য নহে ; সুতরাং আদালত কর্তৃক এইগুলিকে কার্যকরী করা যায় না। (২) এই নীতিগুলি যদিও রাষ্ট্রের উপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, তবুও ইহারা রাষ্ট্রকে আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করে নাই। (৩) নির্দেশাত্মক নীতিগুলির সহিত মৌলিক অধিকারের সংঘাতের সৃষ্টি হইলে মৌলিক অধিকারগুলি বজায় থাকিবে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি নহে।

---

১ গণপরিষদে এই শাসনতন্ত্রের বিধানগুলি লইয়া আলোচনাকালে ডক্টর আম্বেদকর মন্তব্য করিয়াছিলেন, "If any Government ignores them, they will certainly have to answer for them before the *electorate* at the election time."

শাসনতন্ত্রের তৃতীয় খণ্ডে নাগরিকদের উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের সঙ্গে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির কতিপয় ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে।

মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রের উপর সীমা আরোপ করে, নির্দেশাত্মক নীতি দায়িত্ব আরোপ করে

প্রথমত, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের—কতিপয় কাজের উপর সীমা আরোপ করে। কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতিগুলি রাষ্ট্র কিভাবে কাজ করিবে অথবা কিভাবে নিজেদের দ্বারা কতিপয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে, সেই ব্যাপারে দায়িত্ব আরোপ করে এবং নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকে।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কার্যকরী করার অজুহাতে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা যায় না

দ্বিতীয়ত, নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে সেই মর্মে আইনপ্রণয়ন করিতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই নীতিগুলিকে কার্যকরী করিবার জন্য কোন আইন প্রণীত না হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই নীতিগুলি অনুসরণ করিবার অজুহাতে আইন অমান্য করিবার অধিকার নাই। কিন্তু নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকে কার্যকরী করিবার জন্য আলাদা আইনপ্রণয়ন করিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ শাসনতন্ত্রই নাগরিকদের এই অধিকারগুলি দিয়াছে এবং এইজন্যই এইগুলি হইতেছে "মৌলিক" অধিকার।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত-গ্রাহ্য নহে, মৌলিক অধিকারগুলি আদালত-গ্রাহ্য

তৃতীয়ত, নির্দেশাত্মক নীতি আদালত-গ্রাহ্য নহে। সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন আইন যদি কোন নির্দেশাত্মক নীতির বিরোধী হয় তাহা হইলে আদালত সেই আইনকে বাতিল করিতে পারে না। কিন্তু যদি কোন আইন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে, তবে আদালত সেই আইন বাতিল করিয়া দিতে পারে। আবার আদালত কোন অবস্থায়ই সরকারকে এই নীতিগুলি অনুসরণে বাধ্য করিতে পারে না।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারকে অতিক্রম করিতে পারে না

চতুর্থত, যদি নির্দেশাত্মক নীতি এবং মৌলিক অধিকারের মধ্যে কোন বিরোধের সৃষ্টি হয় তবে মৌলিক অধিকারটিই বজায় থাকিবে, নির্দেশাত্মক নীতিটি নহে। সর্বশেষে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি উদ্দেশ্যের দিক হইতে সমাজতান্ত্রিক, কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি হইতেছে গণতান্ত্রিক। রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা, বেকারভাতা প্রদান করা, শিশু ও যুবক-যুবতীগণকে শোষণের হাত হইতে রক্ষা করা সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার আমরা দেখিতে পাই। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, আমাদের শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে সম্পত্তি রক্ষার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার দেওয়া হয় নাই। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মৌলিক অধিকারগুলি হইতেছে গণতান্ত্রিক এবং নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হইতেছে সমাজতান্ত্রিক।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সমাজতান্ত্রিক—মৌলিক অধিকারগুলি গণতান্ত্রিক

Exercise

1. Discuss the scope and utility of the Directive Prineiples of State Policy.
(রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির পরিধি এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (১৫১-৫৪ পৃষ্ঠা)

2. Give an outline of the Directive Principles of State Policy.
(রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির বর্ণনা দাও।) (১৫১-৫২ পৃষ্ঠা)

3. In what respects do the Directive Principles of State Policy differ from the Fundamental Rights ? Have these principles any utility ? (১৫৫-৫৫ পৃষ্ঠা)
(রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির সহিত মৌলিক অধিকারের পার্থক্য কোথায় ? এই নীতিগুলির কি কোন উপযোগিতা আছে ?)

4. What is meant by Directive Principles of state policy as adopted in the Constitution of India. Illustrate your answer. (H. S. 1962) (১৫০-৫২ পৃষ্ঠা)
(ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি বলিতে কি বোঝায় ? উদাহরণ সহ আলোচনা কর।)

বিংশ অধ্যায় — ভারতীয় ইউনিয়ন এবং ইহার বিভিন্ন অংশ (Indian Union and Its Units)

ভারতের এলাকা (Territory of India)—ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ১ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নাম হইতেছে "ভারত"। রাজ্য পুনর্গঠনের পূর্বে ভারতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম তপশীলে রাজ্যগুলি তিনভাগে বিভক্ত ছিল। 'ক' শ্রেণীতে নয়টি রাজ্য ছিল। ১৯৫৩ সালে অন্ধ্ররাজ্য গঠিত হইবার পর মূল রাজ্যের সংখ্যা ৯ হইতে ১০-এ দাঁড়ায়। 'খ' শ্রেণীতে ছিল আগেকার কতিপয় বৃহৎ দেশীয় রাজ্য (Native States), যেমন, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, এবং মধ্যভারত, রাজস্থানের মত দেশীয় রাজ্যসংঘ। 'গ' শ্রেণীতে ছিল অংশত চীফ্ কমিশনার শাসিত অঞ্চল এবং অংশত দেশীয় রাজ্য। তাহা ছাড়া, প্রথম তপশীলের 'ঘ' শ্রেণীতে ছিল আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপপুঞ্জ ভারতের এলাকাভুক্ত হইলেও ভারতীয় ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্য ছিল না। 'ক' শ্রেণীর রাজ্যগুলি ছিল পরাধীন ভারতের গভর্নর-শাসিত প্রদেশ।

রাজ্য পুনর্গঠনের পূর্বে ভারতীয় এলাকা

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে মুখ্যত ভাষার ভিত্তিতে এবং গৌণত শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজন, আর্থিক সুবিধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী রাজ্য পুনর্গঠন করা হয়। এই পুনর্গঠনের পর সব মূলরাষ্ট্রগুলিই একই মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছে। রাজপ্রমুখের পদ তুলিয়া দিয়া সর্বত্র রাজ্যপাল বা গভর্নরের পদ প্রবর্তিত হয় এবং শুধু জম্মু ও কাশ্মীরের

১৯৫৬ সালের রাজ্য-পুনর্গঠন

রাজ্যপ্রধানকে সদর-ই-রিয়াসৎ আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৬৫ সালের এক সংশোধনী দ্বারা সদর-ই-রিয়াসৎকেও রাজ্যপাল আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩নং ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্ট কোন রাজ্য হইতে একটি এলাকা বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্যকে একত্রিত করিতে পারে, কোন রাজ্যের আয়তন বাড়াইতে পারে, কোন রাজ্যের আয়তন কমাইতে পারে, কোন রাজ্যের সীমানার পরিবর্তন করিতে পারে এবং কোন রাজ্যের নাম পরিবর্তন করিতে পারে।[১] অবশ্য এইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন বিল পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করা যায় না। অর্থাৎ পার্লামেণ্টের কোন বে-সরকারী সদস্য নিজের ইচ্ছানুযায়ী এই জাতীয় কোন বিল পার্লামেণ্টে উত্থাপন করিতে পারেন না। ১৯৫৫ সালের শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধন অনুযায়ী যে ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের বিল কোন রাজ্যের আয়তন, সীমানা এবং নাম পরিবর্তনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে, সেইক্ষেত্রে পার্লামেণ্টে বিল উত্থাপন করিবার আগে রাষ্ট্রপতিকে এই বিলটি সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিধানমণ্ডলীর মতামতের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। তবে জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের তিন নম্বর ধারা প্রযুক্ত হইবে না। কিন্তু অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে এই নিয়মের প্রয়োগ দেখা যায় না।

রাজ্য পুনর্গঠন ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা

১৯৫৩ সালে অন্ধ্ররাজ্য গঠিত হইবার পর ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে এবং ভারত সরকার একটি রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশন গঠন করেন। ১৯৫৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রদান করেন। (১) মোট রাজ্যসংখ্যা ২৭ হইতে ১৬তে দাঁড় করাইতে হইবে এবং এই ১৬টি রাজ্য হইবে—অন্ধ্র, আসাম, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক, বিদর্ভ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমবঙ্গ, (২) 'গ' শ্রেণীর রাজ্যগুলিকে বিলোপ করিতে হইবে এবং 'খ' শ্রেণীর রাজ্যগুলিকে 'ক' শ্রেণীর রাজ্যগুলির সহিত সমান মর্যাদাসম্পন্ন করিতে হইবে। (৩) মণিপুর এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্রীয় শাসনে থাকিবে। হিমাচল প্রদেশকেও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত রাখিতে হইবে। এই সুপারিশ প্রকাশিত হইবার পর কমিশনের বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রবল হইয়া উঠে। সরকারও অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। দ্বিভাষাভিত্তিক বোম্বাই রাজ্য গঠন করিয়া—১৯৫৬ সালের রাজ্যপুনর্গঠন আইন

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ

১ Parliament may by law—

(a) Form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more state or parts of states or by uniting any territory to a part of any State; (b) Increase the area of any State; (c) Diminish the area of any State; (d) Alter the boundaries of any State; alter the name of any State. (সংবিধানের ৩নং ধারা)

অনুযায়ী ১৪টি মূলরাজ্য এবং ৬টি ইউনিয়ন অঞ্চল (Union Territories) গঠিত হইল। রাজ্যপুনর্গঠনের ফলে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, এবং মাদ্রাজ রাজ্যের সীমানার কিছু অংশ পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এই রাজ্য পুনর্গঠন প্রথমে বোম্বাইয়ে তীব্র অশান্তির সৃষ্টি করে এবং পরে ১৯৬০ সালের মে মাসে গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র আলাদাভাবে দুইটি রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনে সরকারের দৃঢ়তার অভাব

ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনে ভারত সরকার দৃঢ়তার পরিচয় দিতে না পারায় ভারতীয়দের ঐক্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখনও বাংলা-ভাষাভাষী; স্বতন্ত্র বিদর্ভ রাজ্য গঠিত না হওয়ায় মহারাষ্ট্রের একটি অংশ এখনও ক্ষুব্ধ। নাগারাজ্য লইয়া যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, ভারত সরকার ইহার কোনই নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাজ্য

বর্তমানে নাগারাজ্য সমেত ভারতের মোট রাজ্যের সংখ্যা হইতেছে ১৭টি এবং সেইগুলি হইতেছে—অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, হরিয়ানা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং নাগারাজ্য। সম্প্রতি শাসনতন্ত্রের দ্বাবিংশতম সংশোধন করিয়া আসামের পার্বত্য অঞ্চলে মেঘালয় রাজ্য গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ভারতে ১১টি কেন্দ্র-শাসিত (নেফা সমেত) অঞ্চল আছে। এই অঞ্চলগুলি হইতেছে, ১। দিল্লী, ২। চণ্ডীগড়, ৩। মনিপুর, ৪। হিমাচল প্রদেশ, ৫। ত্রিপুরা, ৬। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ৭। লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমীন দ্বীপপুঞ্জ, ৮। দাদরা ও নগর হাভেলী, ৯। পণ্ডিচেরী, ১০। গোয়া, দমন ও দিউ; এবং ১১। নেফা। যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের এলাকার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতেছে সেই রাজ্যগুলি যেগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কিছু ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে। কিন্তু, ভারতের এলাকা বলিতে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এই প্রকার অঞ্চলও বুঝায়। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত (administrator) দ্বারা শাসিত হইত। কিন্তু, ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই হইতে এই অঞ্চলগুলিতেও মন্ত্রিসভাচালিত সরকারের প্রবর্তন করা হইয়াছে। পূর্বে ফরাসী সরকার কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলগুলি (পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, কারিকল, মাহে প্রভৃতি) ১৯৫৪ সালে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় (যেমন, আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলি সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র অথবা স্বয়ংশাসিত নহে। একটি সাম্প্রতিক বিধান অনুযায়ী মূলরাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্য দাবি করিতে পারে না।

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারতকে একটি 'রাজ্যসংঘ' বা *Union of States* বলিয়া

অভিহিত করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশ একটি যুক্তরাষ্ট্র হইলেও ইহাকে একটি 'ইউনিয়ন' হিসাবে অভিহিত করা হয়। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি The British North America Act, 1867 প্রস্তাবনা অনুসরণ করিয়া ভারতকে 'ইউনিয়ন' হিসাবে বর্ণনা করেন। ডক্টর আম্বেদকরের মতে দুইটি জিনিসের সরল ব্যাখ্যার জন্যই ইচ্ছা করিয়া 'যুক্তরাষ্ট্রের' পরিবর্তে 'ইউনিয়ন' শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রথমত, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মূলরাজ্যগুলির মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী গঠিত হয় নাই, এবং দ্বিতীয়ত, চুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় নাই বলিয়া কোন মূলরাষ্ট্রের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার নাই। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অবিনশ্বর। দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনতন্ত্র এক-কেন্দ্রিক এবং সেইজন্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে "ইউনিয়ন" বলা হয়; আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং ইহা ১৩টি স্বাধীন উপনিবেশের মধ্যে চুক্তির ফলে সৃষ্ট হইলেও শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় আমেরিকাকে "ইউনিয়ন" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র হিসাবে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রও শাসনতন্ত্রে দেশকে "The Union of the Soviet Socialist Republics" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। উপরোক্ত উদাহরণগুলি হইতেই বুঝা যায়, যে কোন দেশের ক্ষেত্রে "ইউনিয়ন" শব্দটির ব্যবহার যে একটি নির্দিষ্ট ধরনের শাসনব্যবস্থাকে বুঝায় তাহা নহে।

জম্মু ও কাশ্মীরের মর্যাদা (Status of Jammu and Kashmir)—রাজ্য-পুনর্গঠনের ফলে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সমান মর্যাদা লাভ করিলেও প্রথমে এই রাজ্যটির অন্য একটি আলাদা শাসনতন্ত্র আছে। তবে জম্মু ও কাশ্মীরের শাসনতন্ত্রের কোন বিধান যদি ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কোন বিধানের সহিত সংঘাতের সৃষ্টি করে তবে সেই ক্ষেত্রে ভারতীয় শাসনতন্ত্রই কার্যকর হয়। পূর্বে কাশ্মীরের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাজ্যপ্রধান ছিলেন সদর-ই-রিয়াসৎ। কিন্তু সম্প্রতি ভারত সরকার এই পদটি 'রাজ্যপালের' পদে পরিবর্তিত করিয়াছেন। অন্যান্য রাজ্যের রাজ্যপালের ন্যায় তিনিও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। জম্মু ও কাশ্মীরের শাসনতন্ত্র প্রণীত হইয়াছে সেই রাজ্যের গণপরিষদ কর্তৃক; জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানমণ্ডলে দুইটি কক্ষ আছে। বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা হইতেছে ৩৬ জন এবং বিধানসভায় সদস্য সংখ্যা হইতেছে ৭৫ জন। তাহা ছাড়া আরও ২৫টি আসন সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইয়াছে বর্তমানে কাশ্মীর রাজ্যের পাকিস্তান অধিকৃত অঞ্চলগুলির জন্য। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বিধানমণ্ডল যতটা ক্ষমতা ভোগ করে জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানমণ্ডল তাহা অপেক্ষা বেশী ক্ষমতা ভোগ করে। প্রথমত, জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানমণ্ডল রাজ্যপাল নির্বাচন করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভারতের শাসনতন্ত্রের ৩৭০ নম্বর ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইলে সেই রাজ্যের সরকারের সম্মতি লইতে হইবে, এবং সেই সম্মতি অনুমোদন করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা জম্মু ও কাশ্মীরের

বিধানমণ্ডলের। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে একটি মহা ধর্মাধিকরণ (High Court) ও একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন (Public Service Commission) রহিয়াছে। এই কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সভ্যগণকে রাজ্যের রাজ্যপাল নিয়োগ করেন।

নাগাভূমি (**Nagaland)**—নাগাজাতি ফিজোর নেতৃত্বে অনেকদিন যাবৎ আলাদা রাজ্য গঠনের জন্য আন্দোলন করিতেছিল। কিন্তু ফিজোর দেশদ্রোহী কার্যকলাপ সরকার সমর্থন করিতে পারেন নাই। তবে ১৯৫৭ সালে নাগা পাহাড় তুয়েনসাং অঞ্চলকে (The Naga Hills Tuensang Area) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়। পরে ১৯৬১ সালে Nagaland Transitional Provisions Regulations 1961, অনুযায়ী ঐ অঞ্চলকে 'নাগাভূমি' নামে অভিহিত করিয়া একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা (Status of a separate state) প্রদান করা হয়। ১৯৬২ সালের একটি বিল অনুযায়ী নাগাভূমিকে সম্পূর্ণভাবে অঙ্গরাজ্যে পরিণত করিবার প্রস্তাব করা হয়। এই বিল অনুযায়ী নাগারাজ্যে এক-পরিষদ সম্পন্ন বিধানমণ্ডল (বিধানসভা) গঠিত হইয়াছে; প্রথম ১০ বৎসরের জন্য ইহার সদস্য সংখ্যা হইবে ৪৬ জন এবং পরে ইহার সদস্য সংখ্যা হইবে ৬০ জন। বর্তমানে পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট একটি শাসনপরিষদ রাজ্যপালকে কাজে সাহায্য করিয়া থাকে। নাগাভূমিতে প্রত্যেক গ্রামের জন্য গ্রাম-পরিষদ (Village Council) ও প্রত্যেক এলাকার জন্য এলাকা পরিষদ (Range Council) এবং প্রত্যেক উপজাতির জন্য উপজাতীয় পরিষদ (Tribal Council) গঠন করা হইয়াছে। ১৯৬৪ সালে নাগারাজ্যে নির্বাচন কার্য সমাপ্ত হয় এবং ইহার ফলে গঠিত মন্ত্রিপরিষদের হস্তে নাগারাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত হয়।

ত্রিপুরা, হিমাচল ও মণিপুর (Tripura, Himachal and Manipur)—১৯৬৩ সালের ১০ই মে তারিখে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত একটি আইন অনুযায়ী ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই হইতে ত্রিপুরা, হিমাচল-প্রদেশ ও মণিপুরে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আইন অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের ২৩৯ নম্বর ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসক (Administration) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। প্রত্যেক অঞ্চলে একটি বিধানসভা থাকিবে। হিমাচল প্রদেশে বিধানসভার আসন সংখ্যা হইতেছে ৪০ এবং ত্রিপুরা ও মণিপুরে আসন সংখ্যা হইতেছে ৩০ করিয়া। জনসাধারণের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হইবেন। কেন্দ্রীয় সরকার ৩ জন পর্যন্ত সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন।

আঞ্চলিক বিধানসভার ক্ষমতা

বিধানসভায় তপশীলী সম্প্রদায় এবং খণ্ডজাতীয়দের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিবে। অ-ভারতীয় এবং ২৫ বছরের কম বয়স্ক ব্যক্তি বিধানসভায় নির্বাচনের যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে না। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিধানসভা প্রথম অধিবেশনের পর হইতে পাঁচ বৎসর স্থায়ী হইবে। ভারতীয় পার্লামেন্টের লোকসভার সদস্যগণ যে সুযোগ-

সুবিধা ভোগ করেন, আঞ্চলিক বিধানসভার সদস্যগণও অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন।

শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত রাজ্য তালিকা (State List) ও যুগ্ম তালিকা (Concurrent List) অনুযায়ী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে বিধানসভা সমগ্র অঞ্চল অথবা যে কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। অবশ্য কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে বিল উত্থাপন অথবা কোন সংশোধনের জন্য প্রশাসকের অনুমতি প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি হইতেছে—(১) জুডিসিয়াল কমিশনারের আদালত গঠন ; (২) জুডিসিয়াল কমিশনারের আদালতের ক্ষমতা এবং এক্তিয়ার ; (৩) যে কোন কর প্রবর্তন ; রদ, সংশোধন অথবা পরিবর্তন ; (৪) আঞ্চলিক সরকারের আর্থিক দায় সংশ্লিষ্ট যে কোন আইনের সংশোধন।

বিধানসভায় যে বিল পাস হইবে তাহা উপস্থিত করিতে হইবে প্রশাসকের কাছে। তিনি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সেই বিল গ্রহণ করিবেন।

আঞ্চলিক সরকার পরিচালনা করেন একটি মন্ত্রিসভা। এই মন্ত্রিসভা আঞ্চলিক বিধানসভার নিকট নিজের কাজের জন্য দায়ী।

Exercise

1, Write a note on the territory of the Indian union.
(ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এলাকার উপর একটি টীকা লিখ।) (১৫৬—১৫৯ পৃষ্ঠা।)

2. Write notes on the state of—

(a) Jammu and Kashmir (b) Tripura (c) Himachal (d) Monipur and (e) Nagaland. [(ক) জম্মু ও কাশ্মীর (খ) ত্রিপুরা (গ) হিমাচল (ঘ) মণিপুর, এবং (ঙ) নাগারাজ্য,—প্রভৃতির মর্যাদার উপর একটি টীকা লিখ।] (১৫৯—১৬১ পৃষ্ঠা।)

একবিংশ অধ্যায়

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Features of the Indian Constitution and the Nature of the Indian Federation)

যদিও ভারতের শাসনতন্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন শাসনতন্ত্রের উপাদান লইয়া গঠিত হইয়াছে, তবুও ইহার এমন কতিপয় বিষয় আছে যাহা ইহাকে পৃথিবীর অন্যান্য শাসনতন্ত্র হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে। যদিও আমাদের শাসনতন্ত্রের অনেক

জিনিসই বৈদেশিক শাসনতন্ত্রগুলি হইতে ধার করা হইয়াছে, তবুও শাসনতন্ত্র-রচয়িতাদের কৃতিত্ব এই যে বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র হইতে শুধু ভাল জিনিস-গুলিই ধার করিয়াছে। অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্রের যে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দেখা যায়, ভারতের শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণ সেইগুলি পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে যেমন প্রজাতন্ত্র গঠিত হইয়াছে অনুরূপভাবে ব্রিটেনের অনুকরণে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতের শাসনতন্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জটিল। ভারতের শাসনতন্ত্র এত বড় হইবার কারণ হইল ইহাতে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার কথাই উল্লেখ করা হয় নাই, রাজ্যগুলির শাসন-ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সম্পর্কও খুব জটিল। অনেক ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের বিধানসমূহ পরিষ্কার নয়। শুধু তাহাই নহে, মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতির বর্ণনা—সরকারী চাকুরী, সরকারী ভাষা, তপশীলভুক্ত জাতি এবং তপশীলভুক্ত গোষ্ঠী সম্বন্ধে বিবিধ ধারা শাসনতন্ত্রে স্থান পাওয়ায় শাসনতন্ত্রটির আকার এত বড় হইয়াছে। তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রে একটি অংশ সরকারী ভাষা এবং অপর একটি অংশ জরুরী অবস্থাকালীন বিধানের সম্পর্কে জড়িত।

ভারতের শাসনতন্ত্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা করা যাইতেছে। (১) ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) হিসাবে গঠিত হইয়াছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব থাকিলেও কাঠামোর দিক হইতে ইহা একটি যুক্তরাষ্ট্র। মোট ১৭টি রাজ্য ও ১১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। সম্প্রতি আসামের পার্বত্য জেলাগুলি লইয়া আলাদা মেঘালয় রাজ্য গঠন করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার কেন্দ্রিকতার ঝোঁক। বিশেষত, দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইলে সমগ্র শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক হইয়া যাইতে পারে। শাসনতন্ত্রে উল্লেখিত ক্ষমতাগুলির বাহিরে অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (Residuary Powers) কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পিত হইয়াছে। এই অবস্থার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবার কারণ ঘটিয়াছে। ভারতীয় শাসনব্যবস্থার বিধান অনুযায়ী যদি কখনও কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন এবং রাজ্য সরকারের বিধানমণ্ডলী কর্তৃক আইনের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়, তবে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রণীত আইনই গৃহীত হইবে, রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন বাতিল হইবে। এইজন্যই ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে অনেকেই কার্যক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক বলিয়া মনে করেন।

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রিকতার ঝোঁক দেখা যায়

(২) ভারতীয় শাসনতন্ত্রটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বলিয়াই লিখিত (written)। ইহাতে

এমন অনেক বিষয় উল্লেখিত আছে, যেমন সরকারী ভাষা ও সরকারী চাকুরি ইত্যাদি সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে শাসনব্যবস্থার সহিত জড়িত নয়। কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্রটি সম্পূর্ণভাবে অনমনীয় নয়। ইহার মধ্যে আমরা নমনীয়তা এবং কঠোরতার সংমিশ্রণ (Partly rigid and partly flexible) দেখিতে পাই। **ভারতের শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার তিনটি পদ্ধতি আছে।** প্রথমত, ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে সংশোধন করিতে হইলে সংশোধনী প্রস্তাবটি পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের প্রতিটিরই অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়া চাই। কিন্তু, এই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য আবার পার্লামেণ্টে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সমস্ত সদস্যসংখ্যার অর্ধেকের বেশী হওয়া চাই। দ্বিতীয়ত, কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে যথা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নিয়ম, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে আইনগত সম্পর্ক, শাসনতন্ত্র সংশোধনের নিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে কোন সংশোধনী প্রস্তাব প্রথমে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অনুমোদিত হওয়া চাই এবং তৎপর ইহা মোট রাজ্য বিধানমণ্ডলীগুলির অন্তত অর্ধেক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। শাসনতন্ত্রের কোন বিধানই সংশোধনের অযোগ্য নহে। তৃতীয়ত, সাধারণভাবে আইনপ্রণয়নের জন্য শাসনতন্ত্রের অনেক বিধানেরই সংশোধন করার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভোটের জোরে পার্লামেণ্ট তাহা করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ভারতের শাসনতন্ত্রের ৪নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যগুলির সীমানা, আয়তন এবং নামের পরিবর্তন, শাসনতন্ত্রের ১৬৯ নং ধারা অনুযায়ী কোন রাজ্যে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠন করা অথবা তুলিয়া দেওয়া এবং ৭ নম্বর অনুচ্ছেদের ৫ নম্বর তালিকা ও ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের ৬ নম্বর তালিকা অনুযায়ী তপশীল অঞ্চল অথবা তপশীল উপজাতি শাসন করা প্রভৃতি ব্যাপারে পার্লামেণ্ট প্রয়োজনবোধে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে পারে।

শাসনতন্ত্রটি লিখিত, কিন্তু ইহা খুব কঠোর অথবা খুব নমনীয় নয়, যদিও নমনীয়তার দিকে ইহার বেশী প্রবণতা দেখা যায়

ভারতীয় শাসনতন্ত্র সংশোধনের পদ্ধতি

(৩) ভারতের শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)। শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে (Part III) ২২ হইতে ৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদে ইহা আলোচিত হইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলি হইতেছে, (ক) সাম্যের অধিকার (Right to equality), (খ) স্বাধীনতার অধিকার (Right to freedom), (গ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against exploitation), (ঘ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to religious freedom), (ঙ) সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ে অধিকার (Cultural and educational rights), (চ) সম্পত্তির অধিকার (Right to constitutional remedies)।

মৌলিক অধিকার

(৪) মৌলিক অধিকারগুলি ছাড়া শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপরিচালনার কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতির (Directive Principles of State Policy) কথা উল্লেখ করা

হইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলির ন্যায় নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে আদালত কর্তৃক কার্যকরী করা যায় না। নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী নাগরিকদের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ন্যায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতিগুলি অনুসৃত হইলে আমাদের দেশ একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হইবে।

রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতি

(৫) ভারতে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (Supremacy of the constitution) স্বীকার করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রই সমুদয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং নাগরিক অধিকারের উৎস। ভারতের সুপ্রীম কোর্টই শাসনতন্ত্রের রক্ষক। তাহা ছাড়া, যদি কখনও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন সুপ্রীম কোর্ট প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়া বাতিল করিতে পারে।

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য

(৬) শাসনতন্ত্রের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে বিশেষ ক্ষেত্রে আইনপ্রণয়নের উপর বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতাধারী একটি মোটামুটি স্বাধীন বিচার বিভাগ। প্রকৃতপক্ষে একদিকে পার্লামেন্টারী সার্বভৌমত্ব এবং লিখিত শাসনতন্ত্র এবং অপরদিকে বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার (Judicia Review) বিধান, এই দুইটির মধ্যে সমন্বয় সাধন আমাদের শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ বাস্তবে অসম্ভব। ভারতের পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত কোন আইন যদি শাসনতন্ত্রের ক্ষমতার বণ্টননীতি অনুসরণ না করে এবং ইহা যদি ক্ষমতা বণ্টননীতি অনুযায়ী পার্লামেণ্টের এক্তিয়ারের বহির্ভূত হয় তবে সেই আইনকে শাসনতন্ত্র বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার ভারতের সুপ্রীম কোর্টের আছে। কিন্তু, সাধারণ ক্ষেত্রে আইনসভার ক্রিয়াকলাপের উপর "বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা" করিবার ক্ষমতা ভারতের সুপ্রীম কোর্টের নাই। স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত মৌলিক অধিকার পার্লামেণ্ট সংশোধন করিতে পারে, যদি বিচার বিভাগীয় ক্রিয়াকলাপ হইতে জটিলতার সৃষ্টি করে।

বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা এবং পার্লামেন্টের প্রাধান্যের মধ্যে আপস

ভারতের শাসনতন্ত্র লিখিত শাসনতন্ত্রের আওতার মধ্যেই আইনসভাকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়াছে। কিন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত না মূল শাসনতন্ত্রটি সংশোধিত হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত শাসনতন্ত্রটি ব্যাখ্যা করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হাতে থাকিবে।

(৭) ভারতের শাসনতন্ত্রে দায়িত্বশীল সরকারের (Responsible Government) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অথচ সরকারের কাঠামো রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের ন্যায়। রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার এবং মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের এই সমন্বয় আমরা ভারতীয় শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাই। সরকারের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ভারতীয় শাসনতন্ত্রে করা হয় নাই। মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে আইনসভার সদস্য হইতে হয় এবং আইনসভার নিকট নিজেদের কাজের

দায়িত্বশীল সরকার

লিখিত শাসনতন্ত্র এবং পার্লামেন্টারী সার্বভৌমত্বের মধ্যে আপস

জন্য দায়ী থাকিতে হয়। রাষ্ট্রপতি যদিও রাষ্ট্রপ্রধান, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী পরিচালিত মন্ত্রিসভাই দেশের শাসনবিভাগের কাজ পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিদের পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী কাজ করেন।

প্রথাগত বিধানের ভূমিকা

(৮) যদিও ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রণেতাগণ একটি বিরাট লিখিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তবুও এই শাসনতন্ত্রে প্রথাগত বিধান (Conventions) গড়িয়া উঠিবার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, এমন একটি প্রথাগত বিধান গড়িয়া উঠিয়াছে যে রাষ্ট্রপতি সর্বদাই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে পরিচালিত হইবেন।

এক-নাগরিকতা

(৯) ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ভারতীয়দের এক-নাগরিকতার (single citizenship) বিধান। ভারতীয়গণ সকলেই ভারতের নাগরিক,—কোন রাজ্য বিশেষের নাগরিকতা তাহাদের নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইস যুক্তরাষ্ট্রে আমরা দ্বি-নাগরিকতার ব্যবস্থা দেখিতে পাই। ভারতীয় নাগরিকগণকে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শুধু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হয়।

ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং সামাজিক সাম্যের প্রতিশ্রুতি

(১০) ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারত একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ (Secular) রাষ্ট্র। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ভারতীয় নাগরিক সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। ভারতের শাসনতন্ত্রে সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security) প্রতিষ্ঠা করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। শাসনতন্ত্রে ধর্ম, জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, জন্মস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে কোন তারতম্য করা হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণতান্ত্রিক দেশেও এখন পর্যন্ত বর্ণগত বৈষম্য (racial discrimination) দেখা যায়। তাহা ছাড়া, ভারতে মাত্র শতকরা ২৩ জন শিক্ষিত, অথচ এই দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং এই ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব (Communal representation) বর্জন করা হইয়াছে।

কাঠামো এবং প্রকৃতির দিক হইতে বিচার করিলে ভারতের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও কেন্দ্রিকতার দিকে ইহার ঝোঁক খুব বেশী। শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা-বণ্টন এইরূপভাবে করা হইয়াছে যে, রাজ্যসরকারগুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল থাকিতে হয়। ক্ষমতা বণ্টনের দিক হইতে শাসনতন্ত্র খুব অনমনীয়। তাহা ছাড়া, জরুরী অবস্থায় আমাদের শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রপতিকে প্রভূত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। সেইজন্যই সামগ্রিকভাবে শাসনতন্ত্রটির কেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of the Indian Federation) —কোন দেশের শাসনব্যবস্থা প্রকৃতই যুক্তরাষ্ট্রীয় কিনা তাহা জানিবার পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের মনে রাখা দরকার।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই কতিপয় মূলরাজ্য নিজেদের ক্ষমতা কিছু পরিমাণে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে সমর্পণ করে। সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আমরা একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলির সহাবস্থান (co-existence of Governments) দেখিতে পাই। উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে ক্ষমতা লাভ করে। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয় এবং রাজ্য সরকারকে নিজ ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ক্ষমতা দেওয়া হয়। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য এবং ক্ষমতার বণ্টন এই দুইটি হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য; তাহা ছাড়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত জনগণের দ্বি-নাগরিকতা (double citizenship) দেখা যায়। শাসনতন্ত্রের বহির্ভূত ক্ষমতাগুলিও (Residuary powers) সাধারণত রাজ্যসরকারগুলি ভোগ করে।

যুক্তরাষ্ট্রে দুই ধরনের সরকারের সহাবস্থান দেখা যায়

ভারতীয় শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মোট ১৭টি রাজ্য (নাগা রাজ্য সমেত) এবং ১১টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল (নেফা সমেত) লইয়া এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। প্রত্যেকটি রাজ্যেরই আলাদা সরকার আছে এবং সেইগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে। সমগ্র দেশের স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইতেছে ক্ষমতার বণ্টন, লিখিত শাসনতন্ত্র, অনমনীয় শাসনতন্ত্র, শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি। যুক্তরাষ্ট্রের সবগুলি বৈশিষ্ট্য মোটামুটিভাবে (পরিপূর্ণভাবে না হইলেও) ভারতীয় শাসনতন্ত্রে অনুসৃত হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় (Union) রাজ্য (State) এবং যুগ্ম (Concurrent) তালিকার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্গত বিষয়গুলির সংখ্যা হইতেছে ৯৭টি। রাজ্য তালিকায় ৬৬টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং যুগ্মতালিকায় ৪৭টি বিষয় স্থান পাইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকায় আইনপ্রণয়ন সম্পর্কিত সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও স্থান পাইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ম অনুযায়ী ভারতেও ক্ষমতার বণ্টন করা হইয়াছে

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের মূল রাষ্ট্রগুলি যে সমান মর্যাদা ভোগ করে, ভারতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মূলরাজ্য সেই সমান মর্যাদা পায় নাই। একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া ভারতের অন্য কোন রাজ্যের আলাদা শাসনতন্ত্র নাই। পার্লামেন্টের রাজ্যসভায়ও মূল রাজ্যগুলির সমান-প্রতিনিধিত্ব নাই।

তৃতীয়ত, ভারতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহাদের কার্যকাল রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে (১৫৫-১৫৬ নম্বর ধারা)। আবার যখন রাজ্যপাল ইচ্ছা করেন (২০১ নম্বর ধারা), তখনই রাজ্যবিধানমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিল তিনি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য

পাঠাইতে পারেন। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর কেরালায় কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা থাকাকালে সেই রাজ্যের বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাবিল রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই ভারতীয় শাসনতন্ত্রের এককেন্দ্রিকতা প্রমাণিত হয়। তাহা ছাড়া, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিগণও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

ভারতের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির অধীন

চতুর্থত, ভারতীয় শাসনতন্ত্রের শুধু পার্লামেন্টেই সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে কোন মূল রাজ্যের সীমানা বা আয়তন পরিবর্তন করিতে পারে (৪ নম্বর ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদ), এবং এইজন্য মূল রাজ্যের আইনসভার সম্মতির প্রয়োজন হয় না। এইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট বিলটি পার্লামেন্টে সুপারিশ করিবার পূর্বে শুধু রাজ্যসরকারের আইনসভার অভিমত জানিয়া লইবেন। কিন্তু শাসনতন্ত্রের তিন নম্বর ধারার সংশোধন অনুযায়ী ইহাও রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে।

ভারতের পার্লামেন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করিতে পারে

পঞ্চমত, ভারতের নাগরিকগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণের ন্যায় দ্বি-নাগরিকতা ভোগ করেন না। শাসনতন্ত্রের পাঁচ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিক শুধু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেরই নাগরিক, কোন রাজ্য সরকারের নাগরিক নহেন।

ভারতে দ্বি-নাগরিকতা নাই

ষষ্ঠত, বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চপদস্থ নাগরিকগণ যে শুধু রাজ্য সরকারের আইন বা বিধান অনুযায়ীই কাজ করেন তাহা নহে,—তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রণীত আইনগুলিকে কার্যকরী করার চেষ্টা করেন। তাহা ছাড়া, রাজ্যসরকারের উচ্চপদস্থ সচিবগণও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং এই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের ৩১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী সর্বভারতীয় সরকারী কাজেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণও অনেক-ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারের কিছু কিছু কাজ করিয়া দিয়া থাকেন। শাসনতন্ত্রের ২৫৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার, কোন রাজ্যকে কিছু শাসন-সংক্রান্ত কাজের ভার দিতে পারে, এবং ২৫৮ (ক) নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকারও শাসনবিভাগ সম্পর্কিত কতিপয় কাজের ভার কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে পারে। যদিও শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন আছে, তবুও শাসনকার্য সম্পর্কিত ব্যাপারে উভয় সরকারের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কও আছে। সম্ভবত শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণ যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত ত্রুটিগুলি এইভাবে দূর করিতে চাহিয়াছিলেন।

রাজ্যসরকারের শাসন সম্পর্কিত কাজের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা আছে

সপ্তমত, দেশে জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যে ক্ষমতা ভোগ করেন, তাহা শাসনতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রপ্রবণ করিয়াছে। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যে কোন রাজ্যের শাসন পরিচালনার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন। যদি কোন

রাজ্য সরকার কখনও গুরুতর আর্থিক সংকটের অথবা শাসনতান্ত্রিক সংকটের সম্মুখীন হয়, তবে রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া সেই রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন। স্বাভাবিক সময়ে কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ রাজ্য সরকারগুলিকে কতিপয় ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু, জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত সমুদয় বিষয়েও আইনপ্রণয়ন করিতে পারে (শাসনতন্ত্রের ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৭ নম্বর ধারা)। শুধু তাহাই নহে, জরুরী অবস্থা ছাড়াও পার্লামেণ্টের রাজ্যসভা যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে এই রকম প্রস্তাব গ্রহণ করে যে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় লইয়া পার্লামেণ্টের আইনপ্রণয়ন করা উচিত, তবে পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্রের ২৪৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী সেই বিষয়ে আইনপ্রণয়ন করিতে পারে। তবে এইক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় উপাদান এইটুকু আছে যে রাজ্যসভার সম্মতি ব্যতীত রাজ্য সরকারের আইনপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিস্তৃত হইতে পারে না।

জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা থাকায় শাসনতন্ত্রটি কেন্দ্রপ্রবণ হয়

অষ্টমত, অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলিতেও রাজ্য সরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আয়কর, মূলধন, মুনাফা কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি ধার্য করিবার এবং সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, যদিও বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীগণই এই কর প্রদান করে। তাহা ছাড়া, অন্তঃশুল্ক এবং অন্যান্য কর ধার্যের ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। রাজ্য সরকারের লেন-দেন ও আয়-ব্যয়ের সমুদয় হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য যে একাউনটেণ্ট জেনারেল (Accountant General) থাকেন, তিনিও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। একাউনটেণ্ট জেনারেলের উপর যিনি কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেল (Comptroller & Auditor General) থাকেন, তাঁহাকেও রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। রাজ্য সরকারগুলি আর্থিক সাহায্যের জন্য সর্বদাই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল থাকে, এবং রাজ্য সরকারগুলি কতটা আর্থিক সাহায্য লইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি ফিনান্স কমিশন (Finance Commission) নিযুক্ত করেন। ফিনান্স কমিশনের বিধানগুলি রাজ্য সরকারগুলিকে মানিয়া চলিতে হয়।

অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ ক্ষমতা

নবমত, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে আঞ্চলিক ভাষাগুলির যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। তবে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দী এবং ইংরাজী ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন। বিভিন্ন রাজ্যে প্রচলিত ভাষাগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতেই সরকারী ভাষা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

সর্বশেষে আন্তর্জাতিক সন্ধির সর্তাদি পালনের জন্য পার্লামেণ্ট যে কোন বিষয়ে যে কোন রাজ্যের জন্য আইনপ্রণয়ন করিতে পারেন। তাহা ছাড়া দুই বা আরও

বেশী রাজ্যসরকার অনুরোধ করিলে পার্লামেণ্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির জন্য আইনপ্রণয়ন করিতে পারেন। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার নিয়মকানুন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারগুলিতে একই প্রকার। তাহা ছাড়া, পার্লামেণ্ট এককভাবে আইন প্রণয়ন করিয়া মূলরাজ্যগুলির সীমানার পরিবর্তন করিতে পারেন। এই কাজ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে যদিও সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারের মতামত জানিতে হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে রাজ্য-সরকারের মতামত গ্রহণে রাষ্ট্রপতি বাধ্য নহেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন আইন রাজ্যসরকারগুলি পালন করিতে বাধ্য হয়। তাহা না হইলে কেন্দ্রীয় সরকার জরুরী অবস্থাকালীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রাজ্যসরকারের কর্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারে। তত্ত্বের কথা বাদ দিলেও বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখিতেছি শাসন বিভাগের সর্বত্রই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য। সমগ্র দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার ব্যবস্থা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিশেষত পাঁচসালা পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অক্লান্ত প্রয়াস ইত্যাদি সবই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর রাজ্যসরকারগুলির ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা সূচিত করে। এইজন্যই বলা হয়, ভারতীয় শাসনতন্ত্র কাঠামোর দিক হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও প্রকৃতির দিক হইতে এককেন্দ্রিক। সেইজন্য অধ্যাপক হোয়ের (Prof. Wheare) ভারতীয় শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন যে এই শাসনতন্ত্র হইতেছে "অর্ধ-পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রীয়"।

ভারতীয় পার্লামেণ্টের ক্ষমতা

আমাদের শাসনব্যবস্থা যে সম্পূর্ণভাবে এককেন্দ্রিক নয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার নীতিগুলি যে বেশ কিছু পরিমাণে অনুসৃত হয় তাহার প্রমাণ হইতেছে এই যে কেন্দ্রীয় সরকারে জাতীয় কংগ্রেস এবং কতিপয় রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার একসঙ্গে শাসনকার্য চালাইতেছেন। আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে স্বাভাবিক সময়ে ভারতীয় শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে না হইলেও যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় পরিণত হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু শাসনতন্ত্রের মধ্যেই এমন বিধান আছে যাহাতে প্রয়োজন হইলে শাসনব্যবস্থাটি এককেন্দ্রিক করা যাইতে পারে। আমাদের শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহা ৫৫২টি দেশীয় রাজ্যকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করিয়াছে। এই সংহতি বজায় রাখিবার জন্য শাসনতন্ত্রটি কিছু পরিমাণে এককেন্দ্রিক না করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

ভারতের শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ এবং কেন্দ্র-প্রবণতার মধ্যে সমন্বয় হইয়াছে

Exercise

1. Discuss the salient features of the Constitution of India.
(ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।) (১৬১—১৬৫ পৃষ্ঠা)
2. Discuss the nature of the Indian federation and state whether strictly conforms to the principles of federation.

(ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ আলোচনা কর এবং দেখাও যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগুলি প্রকৃতই ভারতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে কিনা আলোচনা কর।) (১৬৬—১৬৯ পৃষ্ঠা)

3. "The Indian Constitution is more unitary than federal."—Discuss.

(ভারতীয় শাসনতন্ত্র যতটা যুক্তরাষ্ট্রীয় তাহা অপেক্ষা বেশী এককেন্দ্রিক"—এই উক্তিটি আলোচনা কর।) (১৬৬—১৬৯ পৃষ্ঠা)

4. "The Constitution of India is neither purely federal nor purely unitary but is a combination of both."—Discuss. ("ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় নহে, সম্পূর্ণভাবে এককেন্দ্রিকও নহে, ইহা উভয়েরই একটি সংমিশ্রণ"—এই উক্তিটি আলোচনা কর।) (১৬৬—১৬৯ পৃষ্ঠা)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the Union and the State under the Indian Constitution)

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারসমূহের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে তিনটি তালিকার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে,—যথা, কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List), রাজ্য তালিকা (State List) এবং যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)। এই তালিকার বহির্ভূত যদি কোন বিষয় সম্পর্কে ক্ষমতা প্রয়োগের প্রশ্ন উঠে তবে রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রযুক্ত হইবে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা বণ্টন (Distribution of Legislative Powers under the Constitution)—ভারতের শাসনতন্ত্রে আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ;—কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List), রাজ্য তালিকা (State List), এবং যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)। এই তিনটি তালিকার বহির্ভূত ক্ষমতাগুলি (Residuary Powers) কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় তালিকা বা ইউনিয়ন তালিকায় দেশরক্ষা, মুদ্রাব্যবস্থা, রেলওয়ে, সরকারী ঋণ, ডাক ও তার, ব্যাংক-ব্যবসায়, জীবনবীমা, পররাষ্ট্র ব্যাপার প্রভৃতি ৯৭টি বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয় তালিকাটি হইতেছে রাজ্য তালিকা এবং ইহাতে কৃষি, শিক্ষা, কারাবিভাগ, জনস্বাস্থ্য, সমবায় প্রভৃতি ৬৬টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। যুগ্ম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ৯টি বিষয়। যেমন বিবাহ, চুক্তি, ভূমি রাজস্ব, সমাজ বীমা, রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা,

তিনটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদি। শাসনতন্ত্রের ২৪৫ নম্বর ধারার বিভিন্ন অনুচ্ছেদে কেন্দ্র এবং রাজ্যের আইনপ্রণয়নের এক্তিয়ার সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৪৬ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইনপ্রণয়ন করিবার অনন্য ক্ষমতা হইতেছে পার্লামেন্টের। যদিও রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইনপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতা রাজ্যসরকারের হাতে, তবুও ২৪৬ নম্বর ধারার ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যে এই ক্ষমতা ইউনিয়ন তালিকা এবং যুগ্ম সম্পর্কে পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের দ্বারা সীমিত। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে আইনপ্রণয়ন করিবার অধিকার রাজ্য সরকারেরও আছে। তবে ইউনিয়ন তালিকা সম্বন্ধে পার্লামেন্ট যে আইন প্রণয়ন করিয়াছে তাহা দ্বারা রাজ্য সরকারের এই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে রাজ্য-সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের সহিত যদি পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের বিরোধ হয়, তবে পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনই কার্যকরী হইবে। তবে যদি এক্ষেত্রে বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়টি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয় এবং যদি রাষ্ট্রপতি ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন, তবে রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনই কার্যকরী হইবে।

যুগ্ম তালিকা সংক্রান্ত সমস্যা

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা পার্লামেন্টের প্রাধান্য দেখিতে পাই তিন অবস্থায়। প্রথমত, যদি কোন বিষয় ইউনিয়ন তালিকা এবং রাজ্য তালিকা উভয়ের প্রতি সম্পর্কযুক্ত থাকে, তবে সেই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার পার্লামেন্টের থাকে। দ্বিতীয়ত, যদি কোন বিষয় ইউনিয়ন তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা উভয়ের মধ্যে পড়িয়া যায়, তবে ইহা ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত ধরিয়া লইতে হইবে এবং সেইক্ষেত্রে পার্লামেন্টের হাতে থাকিবে আইনপ্রণয়নের অধিকার। তৃতীয়ত, যদি কোন বিষয় রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা উভয়ের আওতার মধ্যে পড়ে তবে ইহা যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত ধরিয়া লইতে হইবে এবং সেইক্ষেত্রে ঐ বিষয় সম্পর্কে আইন-প্রণয়নের অধিকার পার্লামেন্টের থাকিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের এই বিশেষ প্রাধান্য শাসনতন্ত্রটিকে কেন্দ্রপ্রবণ করিয়া তুলিয়াছে।

আইনপ্রণয়নে পার্লামেন্টের প্রাধান্য

যদি কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত আইন এবং রাজ্য সরকার প্রণীত আইনের বিষয়বস্তু কোন্ তালিকার অন্তর্ভুক্ত তাহা লইয়া বিরোধের সৃষ্টি হয়, তবে প্রথমে চেষ্টা করা হয় সেই বিরোধ মিটাইয়া ফেলিতে। সেই ক্ষেত্রে প্রকৃত বিষয়বস্তুর নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে। এই সমস্যাটির আগাগোড়া বিচার বিবেচনা করিতে হইবে। যদি দেখা যায়, রাজ্য তালিকা অনুযায়ী সেই বিষয়টি সম্পর্কে আইনপ্রণয়ন করিবার অধিকার সংশ্লিষ্ট রাজ্যটির আছে, তাহা হইলে সেই আইনটি অবৈধ হইবে না; তবে যদি প্রমাণিত হয় যে আইনটি প্রকৃতই রাজ্য বিধানমণ্ডলের অধীনস্থ

কেন্দ্রীয় তালিকা এবং রাজ্য তালিকার মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইলে পার্লামেন্টের আধিপত্য

বিষয়গুলির কোনটির সম্পর্কে নয়, তবে সেইক্ষেত্রে পার্লামেন্টের আধিপত্য স্বীকার করিতে হইবে।

তাহা ছাড়া, কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কেও পার্লামেন্ট আইনপ্রণয়ন করিতে পারে। শাসনতন্ত্রের ২৪৯ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে রাজ্য সভা (Council of States) যদি উপস্থিত এবং ভোট প্রদানকারী সদস্যদেরই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে যে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কোন বিষয়ে আইনপ্রণয়নের দায়িত্ব রাজ্যসরকারের হাতে না রাখিয়া পার্লামেন্টের নিজের হাতে আনা উচিত, তবে সেইক্ষেত্রে পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকার সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

কতিপয় রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

শাসনতন্ত্রের ২৪৯ নম্বর ধারা ছাড়াও অপর একটি কারণে পার্লামেন্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্য সম্বন্ধে আইনপ্রণয়ন করিতে পারে। যদি দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়, বা কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন রাষ্ট্রপতি রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেইক্ষেত্রে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে পার্লামেন্ট আইনপ্রণয়ন করিতে পারে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে মূলরাজ্যগুলির আইনপ্রণয়নের উপর কেন্দ্রীয় সরকার এত প্রাধান্য লাভ করেন না। যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে, কোন রাজ্যে আর্থিক এবং শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তবে তিনি সেই রাজ্যে জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিয়া রাজ্যবিধানমণ্ডলীর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। যদি রাজ্যপাল রাজ্য বিধানমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত বিল সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির মতামত জানিবার জন্য সংশ্লিষ্ট বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করেন তবে রাজ্যের আইনপ্রণয়ন ক্ষমতার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। আন্তর্জাতিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক সন্ধি প্রভৃতি সর্ত পালনের ক্ষেত্রেও পার্লামেন্ট রাজ্যের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। তাহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রের ২৫৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী দুই বা ততোধিক রাজ্য বিধানমণ্ডলীর অনুরোধে পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সম্বন্ধে আইনপ্রণয়ন করিতে পারে। আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারের উপর পার্লামেন্টের এই প্রাধান্য আমাদের শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রপ্রবণতা সূচিত করে।

রাজ্যগুলি সম্পর্কে পার্লামেন্টের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা

শাসন-বিভাগের ক্ষমতার বণ্টন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত সম্পর্ক (Distribution of Executive Powers and the administrative relations between the Union and the States)—

আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন সমস্যার সৃষ্টি করে, শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই দুইটি সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নানাপ্রকার সমস্যার সৃষ্টি করে। আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে যে ক্ষমতার

বণ্টন হয়, তাহার সহিত শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন বিশেষ ভাবে সম্পর্কযুক্ত। সাধারণত, কেন্দ্রীয় সরকার যে বিষয়গুলি সম্পর্কে আইনপ্রণয়নের অনন্য ক্ষমতা ভোগ করে, সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে ইহা শাসনক্ষমতা বণ্টন করে। রাজ্য সরকারের শাসনক্ষমতাও রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের এক্তিয়ার সব সময় আলাদা করিয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়। দেশের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালিত করিবার জন্য উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সহযোগিতার ভাব বজায় থাকে। কিন্তু সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের অজুহাত আমাদের দেশে রাজ্যসরকারগুলির শাসন পরিচালন নীতির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য এত ব্যাপক হইয়াছে যে দেশের শাসনব্যবস্থাটি প্রকৃতপক্ষে একক হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের ২৫৬নং ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত কোন আইন অথবা অর্ডিন্যান্স পালন করিতে রাজ্যসরকারগুলি বাধ্য থাকে।

শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা

যুগ্ম তালিকার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত বিস্তর ক্ষমতা আছে। শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত যে কোন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে নির্দেশ পাঠাইতে পারে এবং রাজ্যসরকার সেই নির্দেশ গ্রহণ করে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩৬৫ নম্বর ধারায় পরিষ্কার ভাবে বলা আছে যে কোন রাজ্য যদি ইউনিয়ন সরকারের সহিত সহযোগিতা না করে তবে রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন। শাসন পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে মূলরাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ, এবং এই সহযোগিতার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ নিম্নলিখিত বিষয়ে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে। (ক) জাতীয় স্বার্থ অথবা দেশ রক্ষার কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইয়াছে এইরূপ যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণের জন্য, এবং (খ) রাজ্যের ভিতরে রেলপথ সংরক্ষণের জন্য। তাহা ছাড়া, ডাক ও তার, মুদ্রা ব্যবস্থা, দেশ রক্ষার প্রস্তুতি, ব্যাংক ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে সমগ্র দেশে যাহাতে একই ধরনের নীতি অনুসৃত হয় তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব থাকিবে বিভিন্ন রাজ্যের শাসনব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে। এই উদ্দেশ্যে রাজ্য পুনর্গঠনের পর সমগ্র ভারতে পাঁচটি আঞ্চলিক পরিষদ (Zonal Councils) গঠন করা হইয়াছে। ইহাদের কাজ হইতেছে কেন্দ্রীয় শাসন এবং রাজ্য শাসনের মধ্যে সংহতি বজায় রাখার চেষ্টা করা। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে শাসন বিভাগীয় সম্পর্ক অনুধাবন করিলে দেখা যায় এই বিশেষ ক্ষেত্রেও শাসনতন্ত্র খুবই কেন্দ্র-প্রবণ হইয়াছে। রাজ্য সরকারের শাসনকাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, সেইজন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হাতে। রাজ্যে

কেন্দ্রে ও রাজ্যের মধ্যে আথক অবস্থা

অর্থনৈতিক সাহায্য (Grants-in-aid) প্রদানের মাধ্যমেও কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় কর আদায় এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করিবার যৌথ প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

Exercise

1. Give an account of the distribution of legislative powers between the Union Government and State Governments under the Indian Constitution.
(ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার বন্টন সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (১৭০—৭২ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the distribution of executive powers and administrative relations between the Union and the States. (শাসন বিভাগের ক্ষমতার বণ্টন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসন পরিচালনা ক্ষমতার বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা কর।) (১৭২—৭৪ পৃষ্ঠা)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ (The Union Executive of India)

কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামো (Structure of the Union Government)—কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি বিভাগ আছে। যথা—আইন প্রণয়ন বিভাগ (Legislature), শাসন বিভাগ (Executive) এবং বিচারবিভাগ (Judiciary)। আইনপ্রণয়ন বিভাগে আমরা আইনসভার বা পার্লামেণ্টের দুইটি কক্ষ দেখিতে পাই; পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের উপর আছেন রাষ্ট্রপতি। পার্লামেণ্টের কক্ষ দুইটির নাম হইতেছে, লোকসভা (House of the People) এবং রাজ্যসভা (Council of States)। লোকসভা হইতেছে নিম্নকক্ষ এবং রাজ্যসভা হইতেছে উচ্চকক্ষ। উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। লোকসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পীকার (Speaker)। কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ গঠিত হয় রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভা এবং সরকারী কর্মচারিগণ কর্তৃক। বিচার বিভাগের সর্বশীর্ষে হইতেছে সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ (Union Executive)—ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভা ও সরকারী কর্মচারী লইয়া গঠিত।

কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন বিভাগের প্রধান হইতেছেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির

পর হইতেছেন উপরাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতিকে শাসনকাজে সাহায্য করিবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা আছে। সরকারের অনেক স্থায়ী কর্মচারী থাকেন যাঁহারা দৈনন্দিন কাজে মন্ত্রিসভাকে সাহায্য করেন।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন (Election of the President)—ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন একটি নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক। শাসনতন্ত্রের ৫৪ নং ধারা অনুযায়ী পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং রাজ্যবিধানসভার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া এই নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। নির্বাচকমণ্ডলী (Electoral College) একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোট প্রদান পদ্ধতির মাধ্যমে (Single Transferable Proportional Voting System) রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলীতে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি সংখ্যার পরিমাণ রাজ্যসমূহের জনসংখ্যা ও ইহাদের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের সংখ্যা দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে। ভোটের পরিমাণ স্থির করিবার জন্য প্রথমে প্রত্যেক রাজ্যের জনসংখ্যাকে বিধানসভায় সদস্যসংখ্যা দ্বারা ভাগ দিতে হইবে। ভাগফলকে আবার ১০০০ দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। ইহার ফলে যে ভাগফল পাওয়া যাইবে উক্তরাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ততগুলি করিয়া ভোট দিতে পারিবেন। যদি ভাগশেষ ৫০০ অপেক্ষা বেশী হয় তবে প্রত্যেক সদস্যের ভোটসংখ্যা একটি করিয়া বাড়িবে। সংসদে নির্বাচিত সদস্যের ভোটের সংখ্যা নির্ধারিত করিতে হইলে রাজ্যসভার সদস্যগণের মোট ভোটের সংখ্যা নির্ধারিত করিতে হইবে। ঐ সংখ্যাকে উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ইহার ফলে যে ভাগফল পাওয়া যাইবে তাহাই হইল সংসদের প্রত্যেক সভ্যের মোট ভোটসংখ্যা। যদি কিছু ভাগশেষ থাকে এবং ইহা ভাজকের অর্ধেকের বেশী হয় তবে সদস্যগণের ভোট সংখ্যা একটি বাড়িয়া যাইবে। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করিবার সময়ে রাষ্ট্রপতিকে মোট ভোটসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগের বেশী ভোট লইতে হইবে। যদি কোন প্রার্থী প্রথম পছন্দের ভোটে নির্বাচিত না হইতে পারেন, তবে দ্বিতীয় পছন্দের ভোট গণনা করিতে হয়। সমস্ত প্রার্থীর প্রথম পছন্দের ভোটসংখ্যাকে ২ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলের সহিত ১ যোগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে "কোটা" (Quota) বলা হয়। রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থীকে এই কোটা পাইতেই হইবে।

রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা: রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনপ্রার্থীকে অন্তত (১) পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক, এবং (২) লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিক হইতে হইবে। (৩) রাষ্ট্রপতি কোন লাভজনক ব্যবসায়ের সহিত জড়িত থাকিতে পারিবেন না, (৪) কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্যসরকারের অধীনস্থ কর্মচারী থাকিতে পারিবেন না। (৫) তিনি পার্লামেন্টের অথবা রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্য হইতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত

হন। তবে শাসনতন্ত্রের ৫৬ এবং ৫৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হইতে পারেন। পদমর্যাদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির জন্য আয়কর বহির্ভূত মাসিক বেতন দশহাজার টাকা এবং অন্যান্য ভাতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবশ্য রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে নির্বাচিত বেতন অপেক্ষা কম বেতন লইতে পারেন। তাঁহার কার্যকাল সমাপ্ত হইলে অথবা তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিলে বাৎসরিক ১৫০০০ টাকা অবসরকালীন পেন্সন পাইয়া থাকেন।

রাষ্ট্রপতির অপসারণ (Impeachment of the President)—রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। কিন্তু, যদি অসদাচরণের অভিযোগে অথবা শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। তবে তাঁহাকে পার্লামেণ্টের সদস্যগণ শাসনতন্ত্রের ৬১ নং ধারা অনুযায়ী পদচ্যুত (Impeach) করিতে পারেন। পার্লামেণ্টের কোন কক্ষ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি অপসারণের প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে অপর কক্ষ ইহা লইয়া বিস্তৃত অনুসন্ধান করে। রাষ্ট্রপতির বিপক্ষে অভিযোগ যে কক্ষে উত্থাপিত হয় সেই কক্ষের সদস্যসংখ্যার অন্তত ¼ অংশের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি প্রস্তাবের বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার ১৪ দিন পর সেই প্রস্তাব অনুসন্ধানের জন্য পেশ করিতে হয়। যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপতি প্রকৃতপক্ষে দোষী, তবে উক্ত কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন পাওয়া গেলে অপসারণ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং রাষ্ট্রপতি অপসারিত হন। রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিতে চাহিলে উপরাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করিতে হয়। যদি পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার আগে রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হয় অথবা তিনি পদত্যাগ করেন, তবে উপরাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হন।

রাষ্ট্রপতির মর্যাদা ও ক্ষমতা (Position and Powers of the President)—রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান, শাসন বিভাগেরও তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। শাসনতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী তিনি পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান করেন। মন্ত্রীদলের পরামর্শ অনুযায়ীই তিনি স্বাভাবিক সময়ে সমুদয় কার্য নির্বাহ করেন। কিন্তু জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি কতিপয় বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করেন। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থায় যে ক্ষমতা ভোগ করেন, পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রপ্রধান এত ক্ষমতা ভোগ করেন না। রাষ্ট্রপতির পদ খুবই মর্যাদাসম্পন্ন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে থাকেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাগুলিকে আমরা কতিপয় অংশে বিভক্ত করিতে পারি।

শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Executive Powers)—শাসনতন্ত্রের ৫৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাসন বিভাগের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি যাবতীয় শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের সব কাজই রাষ্ট্রপতির নামে নির্বাহ করা হয়। রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন এবং তাঁহার পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। তাহা ছাড়া,

বিভিন্ন মূলরাজ্যের রাজ্যপাল, সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদের ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের, এবং কম্প্‌ট্রোলার ও অডিটর-জেনারেল, তাঁহাদের সকলকেই রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। তাহা ছাড়া, আন্তঃরাজ্য পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণকে এবং কেন্দ্রীয় রাজ্যসরকারের খুব উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। বিভিন্ন দেশের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা, বিদেশে দূত প্রেরণ করা এবং বিদেশ হইতে আগত দূতকে গ্রহণ করাও রাষ্ট্রপতির অন্যতম কাজ। তবে শাসনতন্ত্রের ৫৩নং ধারার ২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে রাষ্ট্রপতির উক্ত ক্ষমতার উপর পার্লামেণ্টের পূর্ণ কর্তৃত্ব রহিয়াছে। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমুদয় ব্যাপারে পার্লামেণ্ট আইনপ্রণয়ন করেন। পার্লামেণ্টের সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি অনির্দিষ্টকালের জন্য জরুরী অবস্থার ক্ষমতাগুলি কার্যকর করিতে পারে না। রাষ্ট্রপতি দেশের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, এবং পদাধিকার বলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা অথবা শান্তি সংস্থাপন করিতে পারেন।

মন্ত্রিসভার সহিত রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক : পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর উপদেশের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্যান্য মন্ত্রিদের নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি কোন মন্ত্রী, এটর্নী জেনারেল, রাজ্যপাল এবং অতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে পদচ্যুত করিতে পারেন। ১৯৬৯ সালে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি সহকারী প্রধানমন্ত্রী এবং আরও কয়েকজন মন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী তাঁহার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। শাসনতন্ত্রের ৭৪ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য কিনা তাহা শাসনতন্ত্রে বলা হয় নাই। রাষ্ট্রপতিকে দলের অবস্থা সম্পর্কে এবং সরকারের কাজ সম্পর্কে অবহিত করার দায়িত্ব হইতেছে মন্ত্রিসভার এবং বিশেষত প্রধানমন্ত্রীর। রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার নিকট সরকারের কাজকার্ম সম্পর্কে খোঁজখবর লইতে পারেন। যদি পার্লামেণ্টের কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তবে বৃহত্তম দলের নেতা অথবা সম্মিলিতভাবে সরকার গঠনে প্রয়াসী কোন দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে আহ্বান করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। ভারতে এই প্রকার বিধান গড়িয়া উঠিয়াছে যে রাষ্ট্রপতি তাঁহার সমুদয় কাজে মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও উপদেশ দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Powers)—রাষ্ট্রপতির কতিপয় আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতাও আছে। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক যথারীতি অনুমোদিত বিল আইনে পরিণত করিতে হইলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়। অবশ্য রাষ্ট্রপতি যদি সেই বিলটিকে আইনে পরিণত করিতে সম্মতি প্রদান না করেন এবং যদি বিলটি দ্বিতীয়বার পার্লামেণ্ট কর্তৃক

অনুমোদিত হয়, তবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়াও বিলটি আইনে পরিণত হয়। সমুদয় অর্থবিল (Money Bills) রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইয়া পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয়। কোন রাজ্যপাল কর্তৃক প্রেরিত এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যবিধানমণ্ডল কর্তৃক অনুমোদিত বিলেও তিনি সম্মতি প্রদান করিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে, বজায় রাখিতে এবং ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে অথবা আলাদা অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ভাষণ প্রদান করিতে পারেন। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করার সময় রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং অধিবেশনের কার্যসূচী কী হইবে, তাহা বক্তৃতায় উল্লেখ করেন।

পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স (ordinance) জারী করিতে পারেন। কিন্তু, যখন পার্লামেন্টের পুনরায় অধিবেশন বসে, তখন এই অর্ডিন্যান্স লইয়া আলোচনা করিবার, ইহা অনুমোদন করিবার অথবা না করিবার অধিকার পার্লামেন্টের আছে। যখন অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়, তখন যদি পার্লামেন্টের অধিবেশন না চলে, তবে পার্লামেন্টের পুনরধিবেশনের ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই অর্ডিন্যান্সটি পার্লামেন্টকে দিয়া অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে ; নতুবা অর্ডিন্যান্সটি কার্যকরী হইবে না।

রাষ্ট্রপতির বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা (Judicial Powers of the President)—রাষ্ট্রপতি বিচার-বিভাগীয় কতিপয় ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে ক্ষমাপ্রদর্শন করিবার ক্ষমতাই সমধিক প্রসিদ্ধ। এইরূপ কিছু কিছু ক্ষমতা প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধানেরই হাতে কম-বেশী পরিমাণে ন্যস্ত থাকে। সংবিধানের ৭২নং ধারা অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তিগণের দণ্ড মকুব করা, দণ্ডের মাত্রা কমাইয়া দেওয়া, ক্ষমা করা প্রভৃতি বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ভোগ করেন। সামরিক আদালত কর্তৃক দণ্ডিত অপরাধীগণকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারভুক্ত আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত অপরাধীগণকে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করিতে অথবা তাহাদের দণ্ড লঘু করিতে পারেন। যুগ্মবিষয়ক আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত অনুরূপ অপরাধীর দণ্ড তিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালের সহিত যুগ্মভাবে মকুব অথবা কমাইতে পারেন। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অপরাধীকে একমাত্র রাষ্ট্রপতিই ক্ষমা করিতে অথবা তাহার দণ্ড হ্রাস করিয়া অন্য দণ্ড দান করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর শাস্তি হ্রাস অথবা একজাতীয় দণ্ডের পরিবর্তে অন্য জাতীয় দণ্ডের আদেশ দান করিতে পারেন, তবে এইরূপ অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করার ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রপতিরই আছে। রাজ্য সরকারগুলির আইনলঙ্ঘনজনিত দণ্ডের দ্বারা আবদ্ধ অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য দণ্ডে ক্ষমা প্রদর্শন করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত নাই।

অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers)—রাষ্ট্রপতি কতিপয় অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতাও (Financial Powers) ভোগ করেন। আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবার সময় রাষ্ট্রপতি প্রথমেই সরকারের সম্ভাব্য আয় এবং ব্যয় হিসাব বাজেট আকারে পার্লামেণ্টে অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে উপস্থিত করান। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত অর্থ দাবি সংক্রান্ত কোন বিল পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয় না। তাহা ছাড়া, আয়কর, মৃত্যুকর, কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক, রেলযাত্রীর উপর করের মাশুলের অংশ এবং অন্যান্য সাহায্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত ফিনান্স কমিশনের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বণ্টিত হয়।

জরুরী ক্ষমতা (Emergency Powers)—জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি কতিপয় বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করেন। মনে রাখিতে হইবে দেশের সামগ্রিক জরুরী অবস্থা এবং দেশের কোন রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা এক জিনিস নহে। জরুরী অবস্থায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সাময়িকভাবে রদ করা যাইতে পারে।

(১) শাসনতন্ত্রের ৩৫২ নং ধারা অনুযায়ী পররাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধের সময় অথবা যুদ্ধের আশঙ্কা থাকিলে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে এবং (২) কোন রাজ্যে আর্থিক সংকট উপস্থিত হইলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হইলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে সমগ্র দেশের অথবা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি যদি কোন রাজ্যের রাজ্যপালের নিকট হইতে সংবাদ পান অথবা অন্য কোন ভাবে যদি রাষ্ট্রপতির এই বিশ্বাস হয় যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তবে শাসনতন্ত্রের ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী তিনি এই মর্মে একটি ঘোষণা করিতে পারেন এবং হাইকোর্ট ছাড়া রাজ্যের সমুদয় শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা পার্লামেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত হইবে। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে হরিয়ানা রাজ্যে ইহা করা হইয়াছিল। ১৯৫১ সালে পাঞ্জাবে, ১৯৫৩ সালে পেপ্সু, ১৯৫৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ, ১৯৫৬ সালে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, ১৯৫৯ সালে এবং ১৯৬৫ সালে কেরালায়, ১৯৬৭ সালে হরিয়ানায় এবং ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষণা করা হয়। যদি জরুরী ঘোষণা পার্লামেণ্ট কর্তৃক সমর্থিত হয়, তবে ইহা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে। জরুরী অবস্থায় দরকার হইলে রাষ্ট্রপতি লোকসভার পাঁচ বৎসরের মেয়াদকে আরও এক বৎসর বাড়াইয়া দিতে পারেন। শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইলে কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইতে পারে; কিন্তু, এজন্য নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রদ করা যাইতে পারে না। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির পক্ষে পার্লামেণ্ট রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয় সম্বন্ধে আইনপ্রণয়ন করিতে পারে। এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য

সরকারের রাজস্ব বণ্টনের যে ব্যবস্থা বরাবর প্রচলিত থাকে, তাহারও রদবদল হইতে পারে। নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলিও জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সাময়িক-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিটি ঘোষণাও পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে উপস্থিত করিতে হয়। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সম্মতি না থাকিলে জরুরী অবস্থা মাত্র দুই মাস কাল বজায় রাখা চলে। যদি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ জরুরী অবস্থা মানিয়া লয় তবে অনির্দিষ্টকালের জন্য জরুরী অবস্থা চলিতে পারে। যদি পার্লামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন কোন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় অথবা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার পর দুইমাসের ভিতর যদি পার্লামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ হয়, তবে পার্লামেণ্টের পুনরায় অধিবেশন আরম্ভ হইবার ৩০ দিন পর জরুরী ঘোষণাটি বাতিল হইয়া যায়। তবে যদি ইতিমধ্যে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ ইহা আরও অধিককাল চালু রাখা সমর্থন করে, তবে ইহা চালু থাকে।

শাসনতন্ত্রে ২৫০ (১) নম্বর ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থায় পার্লামেণ্ট রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয় লইয়া আইনপ্রণয়ন করিতে পারে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে যেমন চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর রাজস্থানে রাজ্য বিধানমণ্ডলী বাতিল না করিয়া রাষ্ট্রপতি সাময়িকভাবে রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন।

জরুরী অবস্থায় বৈধতা বিচারের অধিকার আদালতের নাই। যুদ্ধের সময়ে জরুরী অবস্থা এবং শান্তির সময়ে জরুরী অবস্থার মধ্যে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষ পার্থক্য নাই।

রাষ্ট্রপতি কি একনায়কে পরিণত হইতে পারেন? (Can the President become a Dictator?)—রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও মর্যাদা আলোচনা করিলে যে প্রশ্ন মনে জাগে, তাহা হইতেছে রাষ্ট্রপতি কখনও একনায়কে পরিণত হইতে পারেন কি না। শাসনতন্ত্রে ৭৪ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে সর্বদা সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করিবেন।[1] কিন্তু, আইনত তিনি তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন। সুতরাং অনেকের মতে রাষ্ট্রপতি দেশের একমাত্র শাসকে পরিণত হইতে পারেন না, এরকম জোর করিয়া বলা যায় না। কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায়, রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আহ্বান জানাইতে হইবে। কিন্তু যদি তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ না মানিয়া চলেন, তবে প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে অন্য একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু, পদত্যাগকারী প্রধানমন্ত্রী যদি পুনরায় পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত

রাষ্ট্রপতির সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক

---

[1] "There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions."

হন, তবে বুঝিতে হইবে, প্রধানমন্ত্রীর পিছনে জনগণের সম্মতি আছে। রাষ্ট্রপতি বড় জোর পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু, পদত্যাগকারী প্রধানমন্ত্রীর দল যদি পুনরায় নির্বাচনে জয়লাভ করে, তবে বুঝিতে হইবে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার দলের প্রতি জনগণের পূর্ণ আস্থা আছে এবং রাষ্ট্রপতি একনায়ক হইবার লোভে ইচ্ছাপূর্বক শাসনতান্ত্রিক সংকটের সৃষ্টি করিতেছেন। সেই অভিযোগে পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত (Impeach) করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলেই একনায়ক হইতে পারেন না। শুধু লোকসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ক্ষমতা ব্যতীত, ভারতের রাষ্ট্রপতি শুধু নামেমাত্র রাষ্ট্রের প্রধান। প্রকৃতপক্ষে, মন্ত্রিসভার পরামর্শেই রাষ্ট্রপতি সব কাজ করেন এবং মন্ত্রিগণকে সম্মিলিতভাবে নিজেদের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। শাসন-বিভাগের প্রকৃত প্রধান হইতেছেন প্রধানমন্ত্রী।

উপরাষ্ট্রপতি (Vice-President)—রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় একজন উপ-রাষ্ট্রপতিও নির্বাচন করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন প্রার্থীর যে যোগ্যতা ও সর্ত থাকা উচিত, সাধারণভাবে উপরাষ্ট্রপতিরও সেই যোগ্যতা ও সর্ত থাকা উচিত। কিন্তু, রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার জন্য যেখানে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা থাকা উচিত, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার জন্য সেখানে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা থাকা উচিত। উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয় পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন প্রথার ন্যায় উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন ক্ষেত্রেও একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোট প্রদানের নিয়ম অনুসৃত হয়। কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য আইনসভার সদস্যের পক্ষে উপরাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হইতে বাধা নাই। তবে একই সঙ্গে দুইটি পদে অধিষ্ঠিত থাকা যায় না। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট আইনসভার সদস্যপদ ছাড়িয়া দিতে হইবে। শাসনতন্ত্র লঙ্ঘনের অপরাধে উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে হইলে সাধারণ পর্যায়ে অপসারণ পদ্ধতির (Process of impeachment) আশ্রয় গ্রহণ না করিলেও চলে। রাজ্যসভার সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের ভোটের দ্বারা গৃহীত প্রস্তাবে উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা চলে অবশ্য যদি লোকসভার ইহাতে সম্মতি থাকে। রাষ্ট্রপতির পর মর্যাদার দিক হইতে উপরাষ্ট্রপতির পদই শ্রেষ্ঠ। শাসন-বিভাগের দ্বিতীয় প্রধান হইয়াও তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চ কক্ষের কাজ পরিচালনা করেন। উপরাষ্ট্রপতির প্রধান কাজ রাজ্যসভার (Council of States) অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা। রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপতির কাজ করেন। শাসনতন্ত্রের ৬৫ নম্বর ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতি কাজ না করিতে পারিলে রাষ্ট্রপতি কাজে যোগদান না করা পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কাজ চালাইয়া যাইবেন। এখানে উল্লেখ

করা যাইতে পারে, ১৯৬০ সালের জুন মাসে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন রাশিয়ায় গিয়াছিলেন, এবং ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে যখন অসুস্থতার দরুন তিনি কার্যসম্পাদনে অক্ষম হইয়াছিলেন, তখন প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি (ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ) রাষ্ট্রপতির কর্মভার গ্রহণ করেন। পদত্যাগ অথবা মৃত্যুজনিত কারণে যখন রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হয় তখন উপরাষ্ট্রপতি নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করেন। তবে অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অনুরূপ কোনও কারণে রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যনির্বাহে অসমর্থ হইলে তাঁহার স্থলে যদি উপরাষ্ট্রপতি কাজ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলা যায় না। শাসনতন্ত্রে এই পার্থক্য বজায় রাখার জন্য বলা হইয়াছে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করিবেন ("Shall act as President") এবং অন্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কাজগুলি সম্পন্ন করিবেন ("Shall discharge the functions of the President"। এই সকল ক্ষেত্রে এই পার্থক্য উপরাষ্ট্রপতির শাসন গ্রহণ ব্যাপারেও পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে শপথের ধরন—"I will faithfully execute the office of the President." এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শপথের ধরন—"I will faithfully discharge the functions of the President." উপরাষ্ট্রপতি যখন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করিবেন, তখন তিনি আর রাজ্যসভার সভাপতি হিসাবে কাজ করিবেন না। সেইক্ষেত্রে রাজ্যসভার উপসভাপতি সভাপতি হিসাবে কাজ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতির কাজ করার বিধান

মন্ত্রিসভার ক্রিয়াকলাপ (Functions of the Council of Ministers) সাধারণত পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা যে সকল কাজ করে, ভারত সরকারের মন্ত্রিসভাও সেই কাজগুলি করে। প্রথমত, মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে হয়। যদি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার সময় কোন মন্ত্রী পার্লামেণ্টের সদস্য না থাকেন, তবে মন্ত্রী হইবার ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহাকে পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে হয়। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষ বৃটেনের শাসনব্যবস্থা অনুসরণ করিয়াছে। ভারতে আমরা তিন প্রকারের মন্ত্রী দেখিতে পাই। যথা, ক্যাবিনেট সদস্য, রাষ্ট্রমন্ত্রী (Ministers of State) এবং উপমন্ত্রী (Deputy Ministers)। রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রিগণ ক্যাবিনেটের সদস্য নহেন। এই তিন প্রকার মন্ত্রী ছাড়াও কতিপয় পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী (Parliamentary Secretaries) আছেন। কিন্তু শাসনতন্ত্রে শুধু মন্ত্রিসভার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে; ক্যাবিনেটের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। ভারতে অবশ্য কার্যক্ষেত্রে ক্যাবিনেট গঠিত হইয়াছে।

ভারতে তিন প্রকার মন্ত্রী

মন্ত্রিগণ প্রত্যেকেই একটি না একটি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হন। সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির ভার অর্পিত হয় ক্যাবিনেট সদস্যগণের হাতে। মন্ত্রিগণের

সাহায্যের জন্য থাকেন উপমন্ত্রিগণ। শাসন পরিচালনা, আইনপ্রণয়ন এবং সরকারের আয়-ব্যয় ব্যাপারে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করা এবং সেই নীতি কার্যকর করা মন্ত্রিসভার কাজ। সরকারের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী আইনপ্রণয়ন এবং সরকারের আয়-ব্যয় ব্যাপারে বিভিন্ন নীতি কার্যকর করা মন্ত্রিসভার কাজ।

সরকারের সব কাজের দায়িত্ব মন্ত্রিদের, রাষ্ট্রপতির নহে

সরকারের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী আইনপ্রণয়ন করার প্রাথমিক কাজ অর্থাৎ বিল তৈয়ার ও উত্থাপন, মন্ত্রিসভাকেই করিতে হয়। রাষ্ট্রপতির নামে দেশের শাসনবিভাগের কাজ চালিত হয় বটে, কিন্তু, সব কাজের দায়িত্ব মন্ত্রিসভাকেই বহন করিতে হয়। পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার দায়িত্বও মন্ত্রিসভার। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ যে সকল দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেগুলি সম্পর্কে তাঁহারা যে বিশেষজ্ঞ তাহা নহে। সেজন্য মন্ত্রিদের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের (Permanent civil servants) উপর নির্ভর করিতে হয়। মন্ত্রিসভার সমুদয় কাজের জন্য মন্ত্রিদের যৌথ দায়িত্ব থাকে বলিয়া সরকারের কোন নীতি গৃহীত হইবার পূর্বে ক্যাবিনেটের বৈঠকে তাহা অধিকসংখ্যক সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। ক্যাবিনেট এবং মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিদের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার দায়িত্ব হইতেছে ক্যাবিনেটের। সমগ্র মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট সদস্যগণের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

পার্লামেণ্টের সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক (Relation between the Parliament and the Council of Ministers)—পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে পার্লামেণ্টের সহিত মন্ত্রিসভার যে সম্পর্ক থাকে, ভারতেও তাহা অনুসৃত হইয়াছে। মন্ত্রিগণ পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষের সদস্য হইতে পারেন। মন্ত্রী হওয়া কালে তাঁহারা যদি পার্লামেণ্টের সদস্য না থাকেন, তবে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইবার ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাদের পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে হয়। প্রত্যেক মন্ত্রীই পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। পার্লা-মেণ্টের সদস্যগণ যদি সরকারের নীতি অথবা কাজকর্ম সম্বন্ধে মন্ত্রিদের কোন প্রশ্ন করেন, তবে মন্ত্রিগণ সেই প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য। তবে তিনি যে কক্ষের সদস্য, শুধু সেই কক্ষেই ভোট প্রদানকালে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, অন্য কক্ষে তিনি বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিতে পারিলেও ভোট প্রদানে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না।

মন্ত্রিগণ লোকসভার নিকট সরকারের কাজের জন্য যুক্তভাবে দায়ী। রাষ্ট্রপতি কখনও এজন্য দায়ী থাকেন না। ক্যাবিনেটের সদস্যগণের অধিকাংশ সম্মিলিতভাবে যে নীতি গ্রহণ করেন, সেইনীতি সব মন্ত্রীকেই গ্রহণ করিতে হয় এবং অনুসরণ করিতে হয়। যদি কোন মন্ত্রী ইহার বিরোধিতা করেন, তবে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। অবশ্য তিনি লোকসভায় স্পীকারের সম্মতি লইয়া পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে বিবৃতি

প্রদান করিতে পারেন। নূতন শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবার পর যখন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডক্টর দেশমুখ অন্যান্য ক্যাবিনেট সদস্যগণের সহিত মতভেদ হওয়ায় পদত্যাগ করেন, তখন তিনি পার্লামেন্টে তাঁহার পদত্যাগ সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের অনুকরণেই আমাদের দেশে মন্ত্রিদের লোকসভার নিকট যৌথ দায়িত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লোকসভার অন্তত ত্রিশ জন সদস্য মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব আনিতে পারেন এবং যদি এই প্রস্তাব লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তবে মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকেন। পার্লামেন্টের সদস্যগণ সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে মন্ত্রিদের বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এবং মন্ত্রিগণও সেগুলির জবাব দিতে বাধ্য। ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতেও আইনসভা অপেক্ষা মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। দলীয় শৃঙ্খলা বজায় থাকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পক্ষে এখন পর্যন্ত পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রিত করা মোটেই অসুবিধাজনক হয় নাই। যদি মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টে কখনও সংকটের সম্মুখীন হয়, তবে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেন্টের অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দিবার পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের সদস্যগণের পক্ষে পুনর্নির্বাচনের ঝুঁকি গ্রহণ না করাই স্বাভাবিক। ইহা হইতেছে পার্লামেন্টের উপর মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত ক্ষমতা। জেনিংস ইংলণ্ডে পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভার মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিতে পারি,—"The House of the People (The House of Commons in England) makes the Ministry, the Ministry can unmake the House."

ভারতের প্রধানমন্ত্রী (Prime Minister of India)—ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৭৪ (১) নম্বর ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কাজে সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করিবে।[১]

শাসনতন্ত্রের ৭৫ (১) নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী তাঁহার মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের নিযুক্তির জন্য রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ প্রদান করেন এবং রাষ্ট্রপতিও প্রধানমন্ত্রীর উপদেশানুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী তখন অন্যান্য মন্ত্রিদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। মন্ত্রিসভা গঠন করিবার সময় প্রধানমন্ত্রী এমন কতিপয় সহকর্মী নিয়োগ করেন যাঁহাদের নিয়োগকরিলে আইনসভায় তাঁহার নেতৃত্ব এবং তিনি যে দলের সভাপতি সেই দলের ঐক্য, সংহতি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। আইনসভার ভিতরে প্রধানমন্ত্রীই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। দলের মর্যাদা এবং দলীয় নেতার মর্যাদা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আইনসভার ভিতরে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সরকারের পক্ষে সর্বদা দলীয় সমর্থন অর্জন

দলীয় নেতা হিসাবে নিজের দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক

১ ("There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid advise the President in the exercise of his functions.")

করা এবং নির্বাচনের সময় যাহাতে নিজের দল জয়যুক্ত হয় সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা, ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দায়িত্ব আছে। যদি কখনও দলের ভিতরে উপদলের সৃষ্টি হয়, তবে সেই উপদলগুলি যাহাতে দলের সামগ্রিক স্বার্থের বিরুদ্ধে না যায়, সেইদিকে প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। সেইজন্য প্রধানমন্ত্রী সরকারগঠনকারী পার্লামেন্টারী রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে প্রায়ই দলীয় সদস্যদের সভা আহ্বান করেন এবং দলের নীতিগুলিকেই সরকার কর্তৃক অবলম্বিত বিভিন্ন নীতির মধ্যে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করেন। নিজের দলের সহিত প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক প্রধানত প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। যদি প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দৃঢ়চেতা হন, তবে তিনি দলীয় শৃঙ্খলা অনায়াসে বজায় রাখিতে পারেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে "*First among the Equals*" বলিয়া আমরা অভিহিত করিতে পারি। কারণ, যদিও ভারতে একজন উপ-প্রধানমন্ত্রী আছেন, তবুও শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ক্যাবিনেট সদস্যদের সকলেরই মর্যাদা সমান। তবুও দলীয় নেতা এবং মন্ত্রিসভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর এমন কতিপয় কাজ আছে যেগুলি তাঁহাকে ক্যাবিনেট সদস্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মর্যাদাসম্পন্ন করে।

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার মধ্যে সম্পর্ক

মন্ত্রিসভার সভায় প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ক্যাবিনেটের সদস্যগণ মন্ত্রিসভার জন্য সরকারী নীতি কি হইবে, তাহা বিবেচনা করেন এবং মন্ত্রিসভার সব সদস্যদেরই সেই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। যদি কোন মন্ত্রী সরকারের গৃহীত নীতি অনুসরণ না করেন অথবা ইহার বিরোধিতা করেন, তবে সেই মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দিতে পারেন। আমাদের শাসনতন্ত্রের ৭৫ (২) নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে "The ministers shall hold office during the pleasure of the President"। এই বিধানের তাৎপর্য হইতেছে এই যে প্রধানমন্ত্রীর উপদেশক্রমে প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতি কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন। যদি ক্যাবিনেট সদস্যদের মধ্যে সরকারী নীতি লইয়া মতভেদের সৃষ্টি হয়, তাহা মীমাংসা করিবার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর; কেননা তিনিই ক্যাবিনেটের সদস্যগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখেন। আইনসভার নিকট ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্ব থাকায় বিভিন্ন মন্ত্রী প্রয়োজন অনুসারে নিজ নিজ দপ্তরের সহিত জড়িত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রীও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মসূচীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। ক্যাবিনেটকে সর্বদাই প্রধানমন্ত্রীর পরিচালনাধীন থাকিতে হয়।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৭৮ নম্বর ধারায়[১] বলা হইয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রের শাসন এবং আইনপ্রণয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানাইবার কর্তব্য হইতেছে

---

১ শাসনতন্ত্রের ৭৮ নম্বর ধারাটি নিম্নরূপ :—
"It shall be the duty of the Prime Minister—(a) to communicate the

প্রধানমন্ত্রীর। রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের শাসন এবং আইনপ্রণয়নের প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে যখন যাহা জানিতে চাহিবেন, তাহা জানাইবার কর্তব্যও প্রধানমন্ত্রীর। তাহা ছাড়া, যদি কোন মন্ত্রী কোন বিষয়ে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তাহা মন্ত্রিসভা কর্তৃক বিবেচিত না হয় তবে রাষ্ট্রপতির জানা দরকার হইলে তাহা রাষ্ট্রপতিকে জানাইবার কর্তব্যও প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু শাসনতন্ত্রের ৭৪ (১) নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সাহায্য ও উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি সেই সাহায্য এবং উপদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য কিনা সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া শাসনতন্ত্রে কিছু বলা হয় নাই। কিন্তু এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে রাষ্ট্রপতি যদি প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য ও উপদেশ গ্রহণ না করেন তবে শেষপর্যন্ত হয়ত তিনি নিজেই শাসনতান্ত্রিক গোলযোগ ডাকাইয়া আনিবেন। কারণ, সেই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইবে এবং পদত্যাগকারী প্রধানমন্ত্রী যদি পুনরায় পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হন তবেই বুঝিতে হইবে প্রধানমন্ত্রীর পিছনে জনগণের সম্মতি আছে। সেইক্ষেত্রেও যদি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ ও সাহায্য গ্রহণ না করেন তবে বুঝিতে হইবে যে শাসনতন্ত্রের ৬১ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক সংকটের সৃষ্টি করিতেছেন। এই যুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ (impeached) করা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রপতিকে পরিচালিত করেন, এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে সরকারের প্রধান শাসনকর্তা।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক

লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাসম্পন্ন। তিনি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। লোকসভার অধিবেশন কখন আহ্বান করা হইবে, কতদিন ইহার অধিবেশন বজায় রাখা হইবে এবং কখন ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে প্রভৃতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন এবং প্রধানমন্ত্রী যে প্রকার পরামর্শ প্রদান করেন, তাহাই এক্ষেত্রে কার্যকরী হয়। প্রধানমন্ত্রী দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া নিজের দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে পার্লামেন্টের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করেন। বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিয়া যাহাতে পার্লামেন্টের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, সেইদিকেও প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্য রাখেন। পার্লামেন্টকে কোন ব্যাপারে স্বমতে আনিতে না পারিলে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে

লোকসভার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক

President all decisions of Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation ; (b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation as the President may call for ; and (c) if the President so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council.'

পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন ক্ষমতা আলোচনা করিলে ইহা পরিষ্কার হয় যে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নিজের দেশে যে মর্যাদা এবং নিজের সরকারে যে ক্ষমতা ভোগ করেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীও অনুরূপ মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করেন। জরুরী অবস্থায় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে একটি সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হয়। কিন্তু জরুরী অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হয় না। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যে ক্ষমতাগুলি ভোগ করেন, সেইগুলি প্রয়োগ করিবার সময় তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হন।

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা প্রায় একরূপ

Exercise

1. Indicate the powers of the President of the Union. How is he elected? [H. S. 1960]

(ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বর্ণনা কর। তিনি কিভাবে নির্বাচিত হন?) (১৭৬-৮০ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the position and powers of the Indian President.

(ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (১৭৬-১৮০ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the relation between (a) the President and his Council of Ministers (H.S. 1963) and (b) the Council of Ministers and Parliament.

(রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে এবং মন্ত্রিপরিষদ ও পার্লামেণ্টের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (১৭৭ পৃষ্ঠা ; ১৮০-৮১ পৃষ্ঠা ; ১৮৫-১৮৬ পৃষ্ঠা)

4. Describe the relation between the Legislature and the Union Executive in the Constitution of India. (১৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা) [H. S. c 1961]

(ভারতের শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা কর।)

5. Discuss the position and powers of the Vice-President of India.

(ভারতের উপরাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা এবং ক্ষমতা বর্ণনা কর।) (১৮১-৮২ পৃষ্ঠা)

6. Can the Indian President become a dictator? Give your answer with reference to his relation with the Council of Ministers.

(ভারতের রাষ্ট্রপতি কি একনায়ক হইতে পারেন? মন্ত্রিসভার সহিত রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দাও।) (১৮০-৮১ পৃষ্ঠা ; ১৮৫-১৮৬ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the functions of the Council of Ministers of India. What is the relation between the Council of Ministers and the Parliament? (১৮২-৮৪ পৃষ্ঠা)

(মন্ত্রিপরিষদের বিভিন্ন কাজ আলোচনা কর। মন্ত্রিপরিষদের সহিত পার্লামেণ্টের সম্পর্ক কি প্রকার?)

8. Write a note on the position and powers of the Prime Minister.

(প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে একটি টীকা লিখ) (১৮৪-৮৭ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the emergency powers of the President.

(রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থাকালীন ক্ষমতাগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।) (১৭৯-১৮০পৃষ্ঠা)

10. Describe how the President of India is elected. What are the qualifications required for the Presidency? [H. S. 1965]

(ভারতের রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন বর্ণনা কর। রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনপ্রার্থীর কি কি যোগ্যতা থাকা দরকার?) (১৭৭-১৭৮ পৃষ্ঠা)

চতুর্বিংশ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় আইনসভা (Union Legislature)

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা বা পার্লামেন্টের গঠন (Composition of the Union Legislature or the Indian Parliament)—ভারতের কেন্দ্রীয় আইনপ্রণয়ন বিভাগ হইতেছে রাষ্ট্রপতি-সহ-পার্লামেন্ট (President-in-Parliament)। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের সদস্য নহেন ; কিন্তু তিনি আইনপ্রণয়ন বিভাগের একটি অংশ। শাসনতন্ত্রের ৭৯ নং ধারা অনুযায়ী পার্লামেন্টের দুইটি কক্ষ আছে।

দুইটি কক্ষ

নিম্ন-কক্ষটির নাম লোকসভা (House of the People)। ইহার সদস্যসংখ্যা ৫২৫ জনের বেশী হয় না, এবং ভোটাধিকার আছে এই রকম নাগরিকদের ভোটে (ভোটারের অন্তত ২১ বৎসর বয়স হওয়া চাই) ইহার সদস্যগণ নির্বাচিত হন। অনধিক ৫০০ জন সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন বিভিন্ন মূলরাজ্য হইতে। এবং কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল অনধিক ২৫ জন সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন। পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষের নাম রাজ্যসভা (Council of States)। ইহার সদস্যসংখ্যা ২৫০ জনের বেশী হয় না। তন্মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। যে ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন, তাঁহাদিগকে বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা, চারুকলা প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী হইতে হয়। রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ এবং পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ রাজ্যসভার অনধিক ২৩৮ জন সদস্য নির্বাচন করিতে পারেন (৮০ নং ধারা)। লোকসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত স্পীকার। রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন উপরাষ্ট্রপতি। স্পীকারকে লোকসভার সদস্য হিসাবে, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতে হয়। কিন্তু, উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সদস্য নহেন। তিনি শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী পদাধিকার বলে রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন।

পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হইলে প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে ; রাজ্যসভার সদস্য হইতে হইলে অন্তত ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে এবং লোকসভার সদস্য হইতে হইলে অন্তত পঁচিশ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। মন্ত্রী অথবা পার্লামেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত কোন পদাধিকার ব্যতীত পার্লামেন্টের সদস্যপদ প্রার্থীকে

পার্লামেন্টের সদস্য হইবার যোগ্যতা

ভারত সরকার অথবা রাজ্যসরকারের অধীনে কোন লাভজনক কাজ গ্রহণ করা চলিবে না। কোন আদালত কর্তৃক কেহ বিকৃতমস্তিষ্ক ঘোষিত হইলে অথবা কেহ দেউলিয়া ঘোষিত হইলে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারেন না। যদি কেহ দুইটি কেন্দ্র হইতে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন তবে তাঁহাকে একটি কেন্দ্রের সদস্যপদ ছাড়িয়া দিতে হয়।

পার্লামেণ্টের অধিবেশন এবং স্থায়িত্বকাল (Session of the Parliament and the duration of the Parliament)—রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রের ৮৫নং ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন, ইহার অধিবেশন (adjourn) রাখিতে পারেন, এবং ইহার অধিবেশন শেষ করিয়া দিতে পারেন এবং ইহা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। শাসনতন্ত্রের ৮৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন এবং কেন পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকা হইল সেই কথা সদস্যদের জানান। শাসনতন্ত্রের ৮৫ (১) নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্টের অধিবেশন এমনভাবে আহ্বান করিতে হইবে যেন গত অধিবেশনের শেষ বৈঠক এবং পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছয় মাসের বেশী না হয়। পার্লামেণ্টের নিম্ন-কক্ষকেই অর্থাৎ শুধু লোকসভাকেই রাষ্ট্রপতি ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন; উচ্চ-কক্ষ অথবা রাজ্যসভাকে নহে। শাসনতন্ত্রের ৮৫ নম্বর ধারার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দুইটি কারণে লোকসভার অধিবেশন ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; প্রথমত, পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেলে অথবা জরুরী অবস্থা ঘোষণা অনুযায়ী সময়ের মেয়াদবৃদ্ধি অতিক্রান্ত হইয়া গেলে, এবং দ্বিতীয়ত, শাসনতন্ত্রের ৮৫ (২) নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে।

পার্লামেণ্টের সদস্যদের স্থায়িত্ব ও তাঁহাদের বেতন—সাধারণত যতদিন লোকসভার অস্তিত্ব থাকে, ততদিন লোকসভার সদস্যগণও নিজপদে আসীন থাকেন। কিন্তু পূর্বে পার্লামেণ্টের প্রার্থীদের যোগ্যতার যে শর্তগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলির কোন একটির অভাব দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে পার্লামেণ্টের সদস্য পদ ত্যাগ করিতে বলা হয়। পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষের সদস্য ইচ্ছা করিলে পদত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু সভার অনুমতি না লইয়া দুই মাসের জন্য যদি কোন সদস্য পার্লামেণ্টের অধিবেশনে যোগদান করা হইতে বিরত থাকেন, তবে তাঁহাকে পার্লামেণ্টের সদস্য পদ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। রাজ্যসভার নির্বাচিত সদস্যগণের এক-তৃতীয়াংশ আবর্তনের মাধ্যমে (by rotation) নির্দিষ্ট সময়ান্তর অবসর গ্রহণ করেন। পার্লামেণ্টের সাধারণ স্থায়িত্বকাল হইতেছে পাঁচ বৎসর; তবে জরুরী অবস্থায় ইহার মেয়াদ বাড়ানো যাইতে পারে; একেবারে একবৎসরের বেশী পার্লামেণ্টে মেয়াদ বাড়ানো যায় না এবং শাসনতন্ত্রের ৮৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থা শেষ হইয়া গেলে ছয় মাসের বেশী পার্লামেণ্টের মেয়াদ অতিরিক্ত বাড়ানো যায় না।

পার্লামেণ্টের সদস্যগণ ৫০০ টাকা মাসিক বেতন লইয়া থাকেন, এবং পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলাকালে দৈনিক ভাতা লইয়া থাকেন। তাহা ছাড়া, পার্লামেণ্টের অধিবেশনে যোগদানের জন্য বিনা ভাড়ায় রেল ভ্রমণের সুযোগ এবং পার্লামেণ্ট সম্পর্কিত কাজের জন্য ঘোরাঘুরি করিতে হইলে ভ্রমণ-খরচ ইত্যাদির সুযোগ লইয়া থাকেন।

পার্লামেন্টের কাজ (Functions of the Parliament)—পার্লামেন্টারী শাসনে পার্লামেন্টের প্রথম কাজ হইতেছে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। ভারতের লোকসভার প্রথম অধিবেশনেই একজন নেতা নির্বাচন করিতে হয়। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই সেই পদে নির্বাচিত হন এবং তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পার্লামেন্টের দ্বিতীয় কাজ হইতেছে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করা। (ভারতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সঙ্গে পার্লামেন্টের সম্পর্ক সম্বন্ধে পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে)। মন্ত্রিসভার কাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে সেইজন্য সাহায্য করা এবং প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার কাজের তীব্র সমালোচনা করিয়া সরকারের কাজ বা নীতির সংস্কার করাও পার্লামেন্টের কাজ। মন্ত্রিসভাকে সব সময়েই লোকসভার আস্থাভাজন থাকিতে হয়। তৃতীয়ত, পার্লামেন্ট হইতেছে সংবাদ পরিবেশনের বাহন (an organ of information); সমগ্র দেশে কি হইতেছে বা হইতেছে না, ইত্যাদি সব ব্যাপারে পার্লামেন্ট খোঁজ খবর রাখিতে পারে এবং পার্লামেন্টের সদস্যগণ মন্ত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারেন। চতুর্থত, আইন-প্রণয়ন করা হইতেছে পার্লামেন্টের শ্রেষ্ঠ কাজ। মূলত পার্লামেন্ট হইতেছে আইন-প্রণয়ন বিভাগ। সর্বশেষে, সরকারের আর্থিক ব্যাপারেও পার্লামেন্টের অনেক কর্তৃত্ব থাকে।

আইনপ্রণয়ন ব্যাপারে পার্লামেন্টের কাজ (Functions of the Parliament regarding Law making)—পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি। ইহার অধিবেশন বজায় রাখা এবং ভাঙ্গিয়া দেওয়া রাষ্ট্রপতির উপর নির্ভর করে। অবশ্য এই কাজে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত হন।

পার্লামেন্টের মুখ্য কাজ হইতেছে আইনপ্রণয়ন করা। সরকারী এবং বে-সরকারী বিলগুলি লইয়া বিতর্কের অনুষ্ঠান করিয়া ও সেইগুলি অনুমোদন করিয়া রাজ্যসভায় বিলটি প্রেরণ করাই লোকসভার মুখ্য কাজ। কিন্তু, অর্থ-সংক্রান্ত বিল শুধু লোকসভাতেই উত্থাপিত হইতে পারে, শুধু লোকসভাই ইহার সংশোধন করিতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত বিল লইয়া রাজ্যসভা বিতর্ক করিতে পারে বটে, কিন্তু ইহার সংশোধন করিতে পারে না। সাধারণত, কেন্দ্রীয় তালিকার (Union List) এবং যুগ্ম তালিকার (Concurrent List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধেই পার্লামেন্ট আইনপ্রণয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু যদি দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়, অথবা কোন আন্তর্জাতিক চুক্তির বিভিন্ন শর্ত পালন করিবার জন্য প্রয়োজন হয় অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য কর্তৃক পার্লামেন্ট অনুরুদ্ধ হয়, তবে পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকার (State List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধেও আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। যদি রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কমপক্ষে এই রকম প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে জাতীয়

স্বার্থে পার্লামেন্ট কর্তৃক আইনপ্রণয়ন করা উচিত, তবে পার্লামেন্ট সেই বিষয়ে আইনপ্রণয়ন করিতে পারে। যদি যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় লইয়া রাজ্য বিধানমণ্ডল এবং পার্লামেন্টের প্রণীত আইনের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা যায়, তবে পার্লামেন্টের আইনটি কার্যকর হইবে এবং রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইনটি বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত তালিকায় উল্লেখ করা হয় নাই এইরূপ যে কোন বিষয়ে (Residuary Powers) আইনপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে রহিয়াছে।

কেন্দ্রীয় আর্থিক ব্যাপারে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব (Parliament's control over Union Finances)—কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কে পার্লামেন্টের ক্ষমতা কিছুটা সীমাবদ্ধ। কেননা, সরকারের সুপারিশ ব্যতীত কোন নূতন কর ধার্যের দাবি অথবা ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি করা যায় না। লোকসভার ক্ষমতা হইল ব্যয় হ্রাস বা না-মঞ্জুর করার অথবা কর হ্রাস বা বিলোপ করার—ইহা ছাড়া, সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর লোকসভার প্রত্যক্ষভাবে অন্য কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কে সমালোচনা করিবার এবং কৈফিয়ৎ তলব করিবার অধিকার লোকসভার আছে। কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট এবং পাবলিক একাউন্টস্ কমিটির (Public Accounts Committee) রিপোর্টের উপর লোকসভায় বিতর্কের অনুষ্ঠান হয় এবং যদি দেখা যায় যে সরকার পার্লামেন্টের সম্মতি ছাড়াই কোন খাতে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, অথবা সরকারী অর্থের অপব্যয় হইয়াছে তবে তাহার জন্য লোকসভা সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ দাবি করিতে পারেন। তাহা ছাড়া, ব্যয় মঞ্জুর কমিটি বা Estimates Committee (যাহা লোকসভার সদস্যদের দ্বারা গঠিত হয়) সরকারী ব্যয়ের কর্মসূচী পূর্ব হইতেই খুঁটিনাটি পরীক্ষা করিয়া ব্যয় সংকোচনের ব্যবস্থা করিতে পারে। সরকারের আয় হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজ্যসভার সিদ্ধান্ত লোকসভার সিদ্ধান্তকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। সরকারের কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত আছে। যেমন, রাষ্ট্রপতির বেতন, ভাতা ইত্যাদি। এইগুলি কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund of India) হইতে খরচ করা হয়। এইগুলি পার্লামেন্টের অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যয় (Votable expenditures) নহে; কিন্তু পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ এইগুলি লইয়া আলোচনা করিতে পারে।

পার্লামেন্টের দুই কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক এবং আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি (Relation between the Two Houses in the Parliament and the Process of Law-making)—অর্থ-সংক্রান্ত ব্যতীত যে কোন বিল পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষে প্রথম উত্থাপিত হইতে পারে, এবং এক কক্ষে ইহা অনুমোদিত হইলে অপর কক্ষে ইহা প্রেরিত হয়। উভয় কক্ষই বিলটির রদবদল করিতে পারে। কিন্তু অর্থ বিলগুলি (Money Bills) প্রথমে লোকসভায় উত্থাপিত হয়। রাজ্যসভা

এই বিলগুলি লইয়া বিতর্ক করিতে পারে, কিন্তু লোকসভার সিদ্ধান্তের উপর বিলগুলির কোনও প্রকার সংশোধন করিতে পারে না।

অর্থ-বিল প্রথমে লোকসভায় উত্থাপিত হয়

অর্থ-বিলগুলি লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর রাজ্যসভায় প্রেরিত হইলে রাজ্যসভাকে ১৪ দিনের মধ্যে ইহার সুপারিশসহ বিলটি লোকসভার নিকট ফেরত পাঠাইতে হয়। এই সুপারিশগুলি গ্রহণ করা অথবা না-করা লোকসভার উপর নির্ভর করে। যদি রাজ্যসভা ১৪ দিনের মধ্যে বিলটি ফেরৎ না পাঠায়, তবে বিলটি অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় এবং যথারীতি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য ইহাকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অন্যান্য বিলগুলিকে আইনপ্রণয়ন করার ব্যাপারে দুইটি কক্ষই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। অর্থ-বিল ব্যতীত অন্য যে কোন বিল যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়। যদি একটি কক্ষ কোন সাধারণ বিল অনুমোদন করে অথচ অপর কক্ষ ইহা প্রত্যাখ্যান করে, অথবা বিলটির সংশোধন সম্পর্কে উভয় কক্ষের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয় অথবা একটি কক্ষ কর্তৃক বিলটি অনুমোদিত হইবার পর অপর কক্ষ ছয় মাসের মধ্যেও বিলটি অনুমোদন না করে, তবে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন এবং উপস্থিত সভ্যদের ভোটাধিক্যে বিলটিকে অনুমোদিত করাইয়া লইতে পারেন। কোন বিলকে আইনে পরিণত করিতে হইলে ইংল্যাণ্ডের ন্যায় ভারতেও পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে বিলটির তিনটি পাঠ (Three Readings) হয় এবং ইহার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাইলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। রাজ্যসভার কোন কোন সদস্য লোকসভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। তাহা ছাড়া, সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে রাজ্যসভা অপেক্ষা লোকসভা অধিকতর শক্তিশালী।

লোকসভার স্পীকার (Speaker of the House of the People)—ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৯৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর লোকসভার প্রথম অধিবেশনেই সদস্যগণ একজন স্পীকার (Speaker) এবং একজন ডেপুটি স্পীকার (Deputy Speaker) নির্বাচন করিবেন। আইনসভার নিম্নকক্ষের অধিবেশনে যিনি সভাপতিত্ব করেন তাঁহাকে স্পীকার (Speaker) বলা হয়।

স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের কাজের মেয়াদ থাকিবে লোকসভার স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত। কিন্তু যদি পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ স্পীকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেন, তবে স্পীকারকে পদত্যাগ করিতে হয় (৯৪ নম্বর ধারা)। কিন্তু এই জাতীয় অনাস্থা প্রস্তাব লোকসভায় পেশ করিবার পূর্বে অন্তত ১৪ দিনের একটি নোটিশ দিতে হইবে। যখন এই অনাস্থা প্রস্তাব লইয়া লোকসভায় আলোচনা চলিবে, তখন স্পীকার আলোচনায় যোগদান করিতে পারিবেন, কিন্তু তিনি সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন না অথবা তাঁহার প্রতি অনাস্থা প্রস্তাবের অনুমোদনে

স্পীকারের কার্যকাল ও অপসারণ

লোকসভায় সরকার পক্ষ এবং উভয়পক্ষের সমান সংখ্যক ভোট হইলে তিনি নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) প্রদান করিতে পারিবেন না।

স্পীকারের ক্ষমতা

লোকসভায় অন্যান্য সমুদয় অধিবেশনেই স্পীকার সভাপতিত্ব করেন। কোনও বিল অনুমোদিত হইবার সময় প্রথমেই স্পীকার ভোট প্রদান করেন না। যদি বিলের পক্ষে অথবা বিপক্ষে কখনও সমান সংখ্যক ভোট হয় তবে স্পীকার নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) প্রদান করেন। লোকসভার স্পীকার সর্বদাই দল নিরপেক্ষ থাকেন এবং তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেন না। তিনি রাজনৈতিক দলগুলির সভাসমিতিতেও যোগদান করেন না। তাঁহার প্রধান দায়িত্ব হইতেছে লোকসভার শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ইহার ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন নিয়মকানুনের ব্যাখ্যা প্রদান করা। যদি লোকসভার অধিবেশনে প্রয়োজনীয় কোরাম (quoram) বা যতজন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন ততজন সদস্য উপস্থিত না থাকেন, তবে স্পীকার লোকসভার অধিবেশন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে পারেন। শাসনতন্ত্রের ১২২ নম্বর ধারা অনুযায়ী লোকসভায় স্পীকারের আচরণ সম্বন্ধে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাইবে না। শুধু লোকসভায় সভাপতিত্ব করা ছাড়াও স্পীকার আরও কতিপয় ক্ষমতা ভোগ করেন যেগুলি রাজ্যসভার সভাপতি (উপরাষ্ট্রপতি) ভোগ করেন না। শাসনতন্ত্রের ১১৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের যুক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারেন শুধু স্পীকার। কোন অর্থসংক্রান্ত বিল লোকসভা হইতে রাজ্যসভায় পাঠাইবার সময় শাসনতন্ত্রের ১১০ নম্বর ধারার ৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্পীকার সেই বিলটি যে অর্থ-বিল তাহা অনুমোদন করেন। স্পীকার হইতেছেন লোকসভার নির্বাচিত ব্যক্তি; কিন্তু রাজ্যসভার সভাপতি (উপরাষ্ট্রপতি) পদাধিকার বলে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হন। রাজ্যসভার সভাপতি এবং লোকসভার স্পীকার উভয়ের মাসিক বেতন ২২৫০ টাকা এবং ইহার অতিরিক্ত তাঁহারা ৫০০ টাকা ভাতা পাইয়া থাকেন। কিন্তু, যখন উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করেন তখন তিনি রাষ্ট্রপতির প্রাপ্য বেতন ও ভাতা পাইয়া থাকেন। লোকসভায় স্পীকার যে ক্ষমতা ভোগ করেন, রাজ্যবিধানসভার স্পীকারও অনুরূপ ক্ষমতা ভোগ করেন।

স্পীকার এবং রাজ্য সভার সভাপতির মধ্যে পাথর্ক্য

পার্লামেন্টের এবং ইহার সদস্যদের কতিপয় সুবিধা (Privileges of the Parliament and its members) – ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্যগণ সমষ্টিগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে কতিপয় সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ যাহাতে সম্পূর্ণ দায়িত্বের সহিত নিজেদের কাজ করিয়া যাইতে পারেন, সেইজন্য তাঁহাদের এই সুবিধাগুলি থাকা দরকার। পার্লামেণ্টের সদস্যদের এই সুবিধাগুলি আছে বলিয়াই তাঁহারা নির্ভয়ে নিজেদের কাজ করিয়া যাইতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, তাঁহাদের যদি

সম্পূর্ণ বাক্-স্বাধীনতা না থাকিত তবে তাঁহারা ঠিকভাবে একটি গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেন না। পার্লামেন্টের সদস্যদের এই সুবিধাগুলি দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, সাধারণ নাগরিক অপেক্ষা একটি উচ্চ শ্রেণীতে তাঁহাদের ফেলা হইয়াছে ; তাঁহারা যাহাতে নিজেদের কাজ সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া এবং ঠিকভাবে করিয়া যাইতে পারেন সেইজন্য তাঁহাদের এই সুবিধাগুলি থাকা দরকার। শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী এবং পার্লামেন্টের স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার অথবা নিয়মের অধীন থাকিয়া পার্লামেন্টের সদস্যগণ সম্পূর্ণভাবে বাক্-স্বাধীনতা ভোগ করেন। পার্লামেন্টের অধিবেশনে কোন সদস্য সরকার সম্বন্ধে যাহা কিছুই বলেন না কেন, তাহা লইয়া আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যায় না। পার্লামেন্টের বিতর্কের বিবরণীও আদালতে প্রেরণ করা যায় না। শুধু বাক্-স্বাধীনতাই নহে, সমষ্টিগতভাবে পার্লামেন্টের সদস্যগণের লিখিতভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশের (Right of Publicatio) স্বাধীনতা আছে। তাহা ছাড়া পার্লামেন্টের ভিতরে যদি কোন সদস্যের আচরণ অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার পার্লামেন্টের আছে। তাহা ছাড়া বাহিরের কোন লোক যদি পার্লামেন্টের কোন সদস্যের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেন, তবে তাঁহাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকারও পার্লামেন্টের আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ১৯৬১ সালে পার্লামেন্টের সদস্য আচার্য কৃপালনীর অভিযোগক্রমে লোকসভা বোম্বাইয়ের 'Blitz' কাগজের সম্পাদককে ভর্ৎসনা করে। ব্যক্তিগতভাবে পার্লামেন্টের সদস্যদের তিনটি অধিকার আছে ; যথা—(১) গ্রেপ্তার না হইবার অধিকার, (২) জুরী অথবা সাক্ষী হিসাবে আদালতে উপস্থিত না থাকিবার অধিকার এবং (৩) বাক্-স্বাধীনতা। পার্লামেন্টের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে এবং পরে ১৪ দিনের মধ্যে পার্লামেন্টের কোন সদস্যকে বিশ্বাসঘাতকতা অথবা নাশকতামূলক কোন ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ ব্যতীত গ্রেপ্তার করা যায় না।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় আইনসভা বনাম আদালতের অধিকার লইয়া একটি চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল।

পার্লামেন্টের আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি (Process of law making in the Parliament)—শাসনতন্ত্রের ১০৭ (১) নম্বর ধারা অনুযায়ী অর্থ-বিল ব্যতীত অন্য যে কোন বিল পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়। সরকারী বিল হইলে কোন মন্ত্রী বিলটি উত্থাপন করিবেন এবং বে-সরকারী বিল হইলে পার্লামেন্টের যে কোন সদস্য বিলটি উত্থাপন করিবেন। মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য যদি বিলটি উত্থাপন করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে এই ব্যাপারে পূর্বেই নোটিশ দিতে হয় এবং সভার অনুমতি লইতে হয়। কিন্তু কোন বিল যদি পার্লামেন্টে উত্থাপিত হইবার

১ রাজ্য আইনসভার সদস্যদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আলোচনাকালে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

পূর্বেই সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়, তবে তাহা পার্লামেণ্টে উত্থাপন করিবার জন্য সভার অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

কোন বিল পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হইবার পর সেই বিলটি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়; যথা—(ক) বিলটি বিবেচিত হোক্। (খ) বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হোক্। (গ) অপর কক্ষের সম্মতি-সাপেক্ষে বিলটি উভয় কক্ষের একটি যৌথ-কমিটির নিকট প্রেরণ করা হোক্। (ঘ) জনমত গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিলটি প্রচারিত হোক্।

এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে যে কোন একটি প্রস্তাব গৃহীত হইবার পরেই একটি নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত বিলটির আলোচনা স্থগিত রাখা হয়। যদি বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয় তবে সিলেক্ট কমিটি বিলটি বিবেচনা করিয়া পার্লামেণ্টের সংশ্লিষ্ট কক্ষে ইহার রিপোর্ট প্রদান করে। তখন সেই কক্ষ সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্ট অনুযায়ী বিলটি বিবেচিত হোক্ এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর সভার সদস্যগণ বিলটির বিভিন্ন ধারার সমালোচনা করিতে পারেন এবং ইহার সংশোধন করিতে পারেন।

যদি বিলটির কোন সংশোধন না হয়, অথবা যদি বিলটিকে সংশোধিত করা হয় এবং ইহা সংশোধিত হইবার পর সংশ্লিষ্ট কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় তখন সেই কক্ষে বিলটি অনুমোদিত হইল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। একটি কক্ষে বিলটি অনুমোদিত হইয়া গেলে অপর কক্ষে বিলটি প্রেরিত হয়। অপর কক্ষে বিলটিকে অনুরূপভাবে অনুমোদিত হইতে হয়। অপর কক্ষ ইচ্ছা করিলে বিলটিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে। যদি তাহাই হয় তবে শাসনতন্ত্রের ১০৮ (১) নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের একটি যৌথ অধিবেশনে বিলটি উত্থাপন করিবার নির্দেশ দিতে পারেন। তাহা ছাড়া, অপর কক্ষ ইচ্ছা করিলে বিলটিকে সংশোধিত করিয়া ইহা অনুমোদন করিতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে বিলটি প্রথম যে কক্ষে উত্থাপিত হইয়াছিল সেই কক্ষে ইহাকে পুনরায় ফেরত পাঠানো হয়। যদি প্রথম কক্ষ এই সংশোধন অনুমোদন করে, তবে ইহা শাসনতন্ত্রের ১১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। আবার যদি প্রথম কক্ষ এই সংশোধন গ্রহণ না করিতে চাহে, তবে শাসনতন্ত্রের ১০৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের একটি যৌথ-অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। সর্বশেষে এক-কক্ষ কর্তৃক বিলটি অনুমোদিত হইয়া যাইবার পর যদি অপর কক্ষ ছয় মাসের মধ্যেও ইহা টেবিলে ফেলিয়া রাখে এবং ইহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করে তবে রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রের ১০৮ (১) (গ) নম্বর অনুযায়ী উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন।

উভয় কক্ষের মধ্যে মতভেদ হইলে কি করা হইবে?

যখন উভয় কক্ষ কর্তৃক এককভাবে অথবা যৌথভাবে বিলটি অনুমোদিত হয় তখন রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য ইহা প্রেরিত হয়। যদি রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদান করেন, তবে

বিলটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতি অবশ্য পুনর্বিচারের জন্য বিলটিকে পার্লামেন্টের নিকট ফেরৎ পাঠাইতে পারেন।

কিন্তু রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া না গেলে যদি বিলটি পুনরায় পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয় এবং যদি পুনরায় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক ইহা অনুমোদিত হয়, তবে রাষ্ট্রপতি ইহাতে সম্মতি প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে পারেন না।

অর্থ-বিল এবং অর্থসংক্রান্ত বিল (Money bills and Financial bills)—অর্থ-বিল হইতেছে সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কোন বিল। কর ধার্য করা, কর তুলিয়া দেওয়া, করের হার পরিবর্তন করা এবং কোন ক্ষেত্রে করের নিয়ম পরিবর্তন করা সংক্রান্ত কোন বিল, সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোন বিল এবং Consolidated Fund of India অথবা Contingency Fund of India অনুযায়ী খরচ সংক্রান্ত কোন বিল, Consolidated Fund of India থাকে কোন অর্থপ্রাপ্তি, ভারতের Public Account সংক্রান্ত কোন বিল অথবা মুদ্রানিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোন বিল ইত্যাদি সবই অর্থ-সংক্রান্ত বিলের (Financial bills) আওতায় পড়ে। অর্থ-বিল অথবা অর্থ-সংক্রান্ত কোন বিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না। যদি কোন বিল প্রকৃতই অর্থ-সংক্রান্ত বিল কিনা এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠে, তবে স্পীকার সেই বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

লোকসভায় অর্থ-বিল উত্থাপিত হইলে স্পীকার একটি দিন ধার্য করেন সেই দিনের মধ্যে বিলটি অনুমোদনের কাজ শেষ করিতে হয়। যদি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে লোকসভায় বিতর্ক শেষ না হয় এবং অর্থ-বিলটি অনুমোদিত না হয়, তবে স্পীকার গিলোটিন প্রয়োগ করিয়া নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বিলটি বিতর্ক ব্যতিরেকেই সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে অনুমোদিত করাইয়া লইতে পারেন। অর্থ-সংক্রান্ত বিল অনুমোদিত হইয়া যাইবার পর ইহা রাজ্যসভা কর্তৃক সমর্থিত হইবার জন্য প্রেরিত হয়। রাজ্যসভা কোন অর্থ-সংক্রান্ত বিল অগ্রাহ্য করিতে পারে না। বিলটি পাইবার ১৪ দিনের মধ্যেই রাজ্যসভা নিজের সুপারিশসহ ইহাকে লোকসভায় পাঠাইয়া থাকে। লোকসভা ইচ্ছা করিলে রাজ্যসভার সুপারিশ গ্রহণ করিতে পারে অথবা নাও করিতে পারে। যদি ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা অর্থ সংক্রান্ত বিলটিকে লোকসভার নিকট ফেরত না পাঠায়, তবে ধরিয়া লইতে হইবে যে উভয় কক্ষ কর্তৃকই বিলটি অনুমোদিত হইয়া গিয়াছে।

Exercise

1. Describe the composition and functions of the Parliament.
(পার্লামেন্টের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।) [১৮৮ পৃষ্ঠা ; ১৮৮-১৯১ পৃষ্ঠা]
2. Discuss the relation between the two Houses of the Union Legislature.
(যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দুইটি কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর।) [১৯১-১৯৪ পৃষ্ঠা]
3. Discuss the role of the speaker of the House of the People.
(লোকসভার স্পীকারের ভূমিকা আলোচনা কর।) (১৯১-১৯৪)

4. Describe the Parliament's control over Union finances.
(যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আর্থিক ব্যাপারে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব বর্ণনা কর।) [১৯১ পৃষ্ঠা]

6. Discuss the process of law making in the Parliament.
[পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি আলোচনা কর।] (১৯৪-১৯৬ পৃষ্ঠা)

5. Write a note on the Privieges of the Par'iament.
[পার্লামেন্টের সুযোগ সুবিধাগুলির উপর একটি টীকা লিখ।] (১৯০-১৯৪ পৃষ্ঠা)

পঞ্চবিংশ অধ্যায় — রাজ্যসরকার (State Government)

রাজ্যপাল (Governor)—কোন রাজ্যের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচন প্রার্থীর যে যোগ্যতা থাকা উচিত, রাজ্যপালকেও সেই যোগ্যতার অধিকারী হইতে হয় এবং অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়। রাজ্যপালের কার্যকালের মেয়াদ রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে পাঁচ বৎসরের বেশী রাখিতে পারেন। রাজ্যপাল নিজের পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন কোন বিচারালয়ের নিকট দায়ী হন না, অথবা তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার ফৌজদারী মামলার পরোয়ানা বাহির হয় না।

রাজ্যপালের মর্যাদা, ক্ষমতা ও কাজ (Position, Powers and Functions of the Governor)—রাজ্যপাল রাজ্যের শাসন-বিভাগের প্রধান। রাষ্ট্রপতি যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে অবস্থান করেন রাজ্যপালও সেইরূপ রাজ্যের মন্ত্রিসভা ও বিশেষত মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হন। অবশ্য রাজ্যপালের কতিপয় বিশেষ ক্ষমতা আছে। সেগুলি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। আসামের রাজ্যপালের কতিপয় স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary power) আছে; সেই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার মধ্যে উপজাতির অঞ্চল সংক্রান্ত শাসন পরিচালনা প্রধান। তাহা ছাড়া, যদি রাজ্যবিধানমণ্ডলে কোনও দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করিতে পারে এবং বিভিন্ন দলের সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্ন উঠে সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্যপাল বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। যদি রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক সংকটের সৃষ্টি হয় এবং রাষ্ট্রপতি উক্ত রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, তবে রাজ্যপালকে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতে হয় এবং তিনি কিছু পরিমাণ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার সুযোগ পান। যদি বিধানসভা না ভাঙিয়াও রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়, তবে কখন তা প্রত্যাহার করিয়া লওয়া উচিত সে সম্পর্কে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ পাঠাইতে পারেন। যদি

রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা

একাধিক দলগোষ্ঠী মন্ত্রিসভা গঠন করিবার দাবি করে তবে কাহাকে মুখ্যমন্ত্রী হইবার জন্য আমন্ত্রন জানানো হইবে তাহা স্থির করিবার সময় রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা-প্রয়োগ করেন।

এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজ্যপাল সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে কাজ করেন। রাজ্যপালের শাসন বিভাগীয় ক্ষমতার (Executive powers) প্রথম কাজ হইল তিনি রাজ্যবিধানমণ্ডলের সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন এবং তাঁহার পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। তাহা ছাড়া, তিনি রাজ্যের এ্যাড্‌ভোকেট-জেনারেল (Advocate-General), রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং রাজ্য সিভিল সার্ভিসের সরকারী কর্মচারিগণকে নিয়োগ করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তিনি রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান

রাজ্যপাল রাজ্যবিধানমণ্ডলের একটি অঙ্গ ; তিনি ইহার সদস্য নহেন। রাজ্যপাল তাঁহার আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার (Legislative powers) বলে রাজ্যবিধানমণ্ডলের অধিবেশন আহ্বান করিতে, বজায় রাখিতে অথবা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তাহা ছাড়া, যে-সব রাজ্যে রাজ্যবিধানমণ্ডলের উচ্চ কক্ষ আছে সেগুলিতে তিনি কয়েকজন সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। সেই সদস্যগণকে অবশ্যই বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা, চারুকলা, সমবায় আন্দোলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রখ্যাতনামা হইতে হইবে। রাজ্যবিধান মণ্ডল কর্তৃক কোন বিল অনুমোদিত হইয়া রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরিত হইলে রাজ্যপাল ইহাতে নিজের সম্মতি প্রদান না করিয়া রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। অবশ্য রাজ্যপাল সম্মতি প্রদান করিলেই রাজ্যবিধানমণ্ডলের অনুমোদিত কোন বিল আইনে পরিণত হইতে পারে। রাজ্যসরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কোন বিল রাজ্যপালের সম্মতি ব্যতীত রাজ্যবিধানসভায় উত্থাপন করা যায় না। রাজ্যবিধানমণ্ডলের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে রাজ্যপাল অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারেন। পরে বিধানমণ্ডলের অধিবেশন আরম্ভ হইলে তাহা বিধানমণ্ডল কর্তৃক অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়।

রাজ্যবিধানমণ্ডলের উপর তাঁহার ক্ষমতা

আর্থিক ক্ষমতা

রাজ্যপালের আর্থিক ক্ষমতা (Financial powers) অনুযায়ী তিনি সরকারের যাবতীয় সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব বাজেটের আকারে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীকে দিয়া বিধানসভায় উত্থাপিত করিতে পারেন। যে কোন প্রকার অর্থ-সংক্রান্ত বিল রাজ্যপালের অনুমতি ব্যতীত বিধানসভায় উত্থাপিত হইতে পারে না। যদি বিধানমণ্ডলের উভয় কক্ষের মধ্যে কোন বিষয় লইয়া মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তবে রাজ্যপাল উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। রাজ্যপালের যাবতীয় শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলির সহিত জড়িত।

যদি আদালতের বিচারে দোষী কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তি এমন কোন মামলায় হারিয়া যায় যাহার উপর রাজ্যের শাসন-বিভাগ নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারে, তবে রাজ্যপাল সেক্ষেত্রে অপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারেন এবং দণ্ডাদেশ লাঘব করিয়া দিতে পারেন।

বিচার-বিভাগের উপর ক্ষমতা

সুতরাং দেখা যাইতেছে রাজ্যের প্রধান হিসাবে রাজ্যপাল প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। তবে সাধারণ অবস্থায়, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত না হইলে এবং তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রয়োজন দেখা না গেলে, তিনি রাজ্যের মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী যাবতীয় কাজকর্ম করেন, তবে তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক শাসক বলা চলে না। তাহা ছাড়া, তাঁহার কার্যকাল প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর।

অনেকে বলেন, রাজ্যপাল রাজ্যের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়া উচিত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হওয়া উচিত নয়। ভারতে যে কোন রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন এবং তাঁহার ইচ্ছাধীনে রাজ্যপাল পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই ব্যবস্থা আমাদের শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রপ্রবণতা সূচিত করে। তবে এই নিয়মের স্বপক্ষে বলা যায়, যদিও রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন, তবুও তিনিই প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের শাসনকাজ পরিচালনা করেন না। রাজ্যের শাসন-বিভাগীয় কাজ প্রকৃতপক্ষে পরিচালনা করেন রাজ্যের মন্ত্রিসভা। সুতরাং, রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হওয়ায় রাজ্যের শাসনব্যবস্থা মোটেই অ-গণতান্ত্রিক হয় নাই। বরং, যেহেতু রাজ্যপালকে সর্বদাই দলনিরপেক্ষ থাকিতে হয়, সেজন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপাল নিযুক্ত করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করায় এবং রাজ্যপালকে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখায় ভালই হইয়াছে।

রাজ্যপাল মনোনয়ন করিবার নীতি গণতান্ত্রিক কি না

রাজ্য সরকারের মন্ত্রিসভা (Council of Ministers of the State)—শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাজ্যপালকে উপদেশ এবং পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যেই একটি মন্ত্রিসভা আছে। রাজ্যবিধানমণ্ডলে যে রাজনৈতিক দল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। মন্ত্রিগণকে রাজ্যবিধানমণ্ডলের যে কোন কক্ষের সভ্য হইতে হয়। যদি মন্ত্রী হইবার পর ছয় মাসের মধ্যে কোন মন্ত্রী বিধানমণ্ডলের সদস্য না হইতে পারেন, তবে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিগণ প্রত্যেকেই রাজ্যের স্বার্থের সহিত জড়িত এক বা একাধিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হন। রাজ্য মন্ত্রিসভায় আমরা ক্যাবিনেট সদস্য, রাষ্ট্রমন্ত্রী (Minister

রাজ্যবিধানমণ্ডলের সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক

of State) এবং উপমন্ত্রী—এই তিন প্রকার মন্ত্রী দেখিতে পাই। মন্ত্রিগণ সমষ্টিগতভাবে রাজ্য বিধানসভার নিকট দায়ী। যদি বিধানসভার সদস্যগণ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করেন অথবা নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তবে মন্ত্রিসভাকে একযোগে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে রাজ্যবিধানমণ্ডলের সদস্যগণের নিকট সরকারের ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত সমুদয় প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।

রাজ্যপালের সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক (Relation between the Governor and the Council of Ministers)—রাজ্যপাল স্বাভাবিক অবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্যগণের পরামর্শ অনুযায়ী চলেন। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শেই রাজ্যপাল বিধানমণ্ডলের অধিবেশন আহ্বান করেন, অধিবেশন বজায় রাখেন অথবা ইহা ভাঙ্গিয়া দেন। কিন্তু রাজ্যপাল সর্বদাই যে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করেন তাহা নহে; যদি মন্ত্রিসভা কখনও পদত্যাগ করে, তখন বিকল্প মুখ্যমন্ত্রী মনোনয়ন করার দায়িত্ব রাজ্যপালের হাতে আসে। বিশেষত, যদি রাজ্যবিধানমণ্ডলে কোনও রাজনৈতিক দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারে, তবে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগে রাজ্যপাল বিধানসভায় বিভিন্ন দলের অবস্থা পর্যালোচনা করিবার পর যিনি স্থায়ী সরকার গঠন করিতে পারিবেন বলিয়া রাজ্যপাল মনে করেন তাঁহাকে মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারেন। ভারতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর রাজ্যপাল সর্দার হুকুম সিং এইভাবে শ্রীসুখাড়িয়াকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনকালেও রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করিয়া নিজের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। স্বাভাবিক সময়ে রাজ্যপাল যে ভাষণ প্রদান করেন, তাহাও মুখ্যমন্ত্রীই তৈয়ার করিয়া দেন। জরুরী অবস্থায় রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন বলিয়া শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত সমুদয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হইবার পর রাজ্যপালের সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক কি হইবে সেই সম্বন্ধে বহুবিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

রাজ্যপাল কি মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন? (Can the Governor dismiss the Council of Ministers?)—রাজ্যপাল মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন কিনা তাহা লইয়া সম্প্রতি তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯৬৭ সালের ২১শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে সংবিধানের ১৬৪ (১) নম্বর ধারা অনুযায়ী বরখাস্ত করিবার পর এই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সংবিধানের ১৬৪ (১) নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে "The Council of Ministers will hold their office during the pleasure of the Governor." কিন্তু এই ধারায় এমন কোন কথা বলা হয় নাই যে, রাজ্যপাল নিজের ইচ্ছায় যখন খুশী তখন তাঁহার অভিরুচি অনুযায়ী মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন। বরং

সংবিধানের ১৬৪ (২) নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে রাজ্যের মন্ত্রিসভা রাজ্যপালের এবং রাজ্য সরকারের পক্ষে যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়ী থাকিবেন। অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত বিধানসভায় মন্ত্রিসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিতে পারিবেন ততক্ষণই ইহা নিজপদে সমাসীন থাকিতে পারিবেন। মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিবার পিছনে রাজ্যপাল কারণ দেখাইয়াছেন যে, ২৮৬ জন সদস্য বিশিষ্ট বিধানসভায় কংগ্রেসদলের সদস্য ছিল ১৩০ জন এবং আরও ১৭ জন যুক্তফ্রন্ট হইতে দলত্যাগ করায় এবং লিখিত ভাবে রাজ্যপালের নিকট তাঁহাদের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় রাজ্যপাল স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মন্ত্রিসভা রাজ্যবিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছেন, সুতরাং সংখ্যালঘিষ্ঠ মন্ত্রিসভাকে একদিনের জন্যও বজায় রাখা উচিত নহে। সেইজন্য তিনি সংবিধানের ১৬৪ (১) নম্বর ধারা অনুযায়ী এক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য এমন একজনকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন যিনি রাজ্যে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ও স্থিতিশীল মন্ত্রিসভা গঠনে সক্ষম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাজ্যপাল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাই করিবার জন্য অবিলম্বে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন এবং এই অনুরোধ জানানো হইয়াছিল নভেম্বর মাসের ছয় তারিখে। এই অনুরোধ অনুযায়ী যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু রাজ্যপালের নিকট এই তারিখ মনঃপূত না হওয়ায় (কারণ, তাঁহার মতে বিধানসভার অধিবেশন অনেক দেরীতে ডাকা হইয়াছিল) এবং তিনি এই মন্ত্রিসভার সংখ্যালঘিষ্ঠতা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হওয়ায়, সংবিধানের ১৬৪ (১) নং ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন।

এখানে স্বভাবতই কতিপয় সাংবিধানিক প্রশ্নের সৃষ্টি হইতে পারে। যথা,—(১) যতক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা স্বপদে বহাল আছেন ততক্ষণ পর্যন্ত রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারেন কিনা। (২) মন্ত্রিসভা যদি রাজ্যপালের পরামর্শ অনুযায়ী বিধানসভার অধিবেশনের তারিখ নির্দিষ্ট দিন হইতে আরও আগে ধার্য না করিতে চাহেন, তবে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন কিনা। (৩) বিধানসভার অধিবেশনে মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যপাল মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন কিনা। (৪) বিধানসভার অধিবেশনে শক্তি পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যপালের এমন কোন ধারণা করা উচিত কিনা যে, মন্ত্রিসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছেন এবং এই ধারণার বশবর্তী হইয়া রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রিসভা বজায় রাখিবার অভিরুচি (Pleasure) প্রত্যাহার করিয়া লওয়া উচিত কিনা। এই প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে সুপ্রীম কোর্টের।

১৬৩ নম্বর ধারায় পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, রাজ্যপালকে উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য এবং তাঁহার কার্যে সহায়তা করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যেই একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে। সংবিধানের ১৬৪ নম্বর ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাজ্য

বিধানসভায় যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতা রাজ্যপাল কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। একটি মন্ত্রিসভা থাকাকালীন সেই মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী বিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছেন কিনা এবং তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া রাজ্যপাল যাঁহাকে নূতন মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করিতে চাহেন তিনিই বিধানসভায় নূতন ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হইতে পারিয়াছেন কিনা তাহা যাচাই করিবার একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র হইতেছে বিধানসভা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল বিধান সভার অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া আগে (১) ক্ষমতাসীন মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়াছেন, (২) নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া নূতন একজন নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠনে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন, এবং (৩) নূতন মন্ত্রিসভার পিছনে বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আছে কিনা তাহা যাচাই করিবার জন্য নূতন মন্ত্রিসভার উপদেশ অনুযায়ী বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। রাজ্যপালের এই কাজ বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে,—আইন এবং সংবিধান বিশারদগণের মধ্যে অনেকেই রাজ্যপালের কাজকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী কাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার অনেকে ইহাকে শাসনতন্ত্র-সম্মত কাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; কিন্তু রাজ্যপালের এই কাজকে আপাততদৃষ্টিতে 'সংবিধান বিরোধী' বলিয়া অ্যাখ্যা প্রদান করিয়া পশ্চিমবাংলার বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালের এই কাজের যৌক্তিকতা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং রাজ্যপাল কর্তৃক আহূতবিধানসভার অধিবেশন একটি সংবিধান-বিরোধি মন্ত্রীসভার পরামর্শে আহূত মনে করিয়া, বিধানসভার স্পীকার বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করেন।

স্পীকার তাঁহার রুলিং-এ বলেন যে, বিধানসভার পূর্বতন অধিবেশনের শেষদিন পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সংবিধানের ১৬৪ (২) নম্বর ধারা অনুসারে যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়ী ছিলেন। সংবিধানিক অবস্থা সম্পর্কে স্পীকার মনে করেন যে, মন্ত্রি-সভা ক্ষমতায় আসীন থাকিবেন কি থাকিবেন না সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার একমাত্র এক্তিয়ার বিধানসভার। মন্ত্রিসভা যদি বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থা হারান তবে সংবিধানের ১৬৪ (২) নম্বর ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিসভা পদত্যাগে বাধ্য থাকেন। স্পীকার বলেন, "সংধিধানের ১৬৪ (১) নম্বর ধারা সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করিলে রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রিসভা খারিজের এইরূপ কোন ক্ষমতা ন্যস্ত আছে বলিয়া প্রকটিত হয় না"। সুতরাং রাজ্যপাল কর্তৃক সংবিধানের ১৬৪ (১) নম্বর ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিবার কোন আইনসম্মত ভিত্তি স্পীকার খুঁজিয়া পান নাই। সেজন্য স্পীকার মনে করেন, বিধানসভার এই অধিবেশন রাজ্যপাল কর্তৃক বিধানসভার অজ্ঞাতসারে গঠিত মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী আহূত হইয়াছে বলিয়া বে-আইনী ও সংবিধান-বিরোধী। স্পীকার ইহাও বলেন যে, সংবিধানের এই গুরুত্বপূর্ণ ধারা সম্পর্কে সংবিধানের ১৪৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের অভিমত গ্রহণের ব্যবস্থা করিলে

ভাল হইত। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান রুলিং প্রদান করেন যে, রাজ্যপাল সংবিধান বিরোধী কোন কাজ করেন নাই। কিন্তু বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে স্পীকারের রুলিংকে কেন্দ্র করিয়া।

অনেকে মনে করেন, রাজ্যপালের কোন কাজের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা স্পীকারের এক্তিয়ারের মধ্যে নহে; স্পীকার শুধু বিধানসভার ক্রিয়া-কলাপের মধ্যেই নিজের ক্ষমতা সীমিত রাখিবেন। কিন্তু কোন কোন আইনজীবী মনে করেন যে স্পীকার ঠিক কাজই করিয়াছেন এবং বিধানসভার অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এই জাতীয় যে কোন কাজ (তাহা যে কোন লোকেরই হোক না কেন) সম্পর্কে রুলিং প্রদান করিবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা স্পীকার সংবিধান হইতে পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্পীকার মনে করিতে পারেন যে রাজ্যপালের এই কাজের ফলে বিধানসভার অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; সুতরাং রাজ্যপালের এই কাজের উপর বিধান-সভার অধিকাররক্ষক হিসাবে স্পীকারের রুলিং দেওয়ার ক্ষমতা আছে এবং ইহার জন্য স্পীকারের বিরুদ্ধে আদালতেও যাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া, বিধানসভায় স্পীকার কি বলিয়াছেন তাহা লইয়া কটাক্ষ অথবা বিরূপ মন্তব্য করিবার অধিকার কাহারও নাই। সুতরাং স্পীকার আদৌ সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন কিনা তাহা বলা সম্ভবপর নহে।

মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থার একটি প্রথা হইতেছে (এবং তাহা ভারতীয় শাসনতন্ত্রেও স্বীকৃত হইয়াছে) যে বিধানসভার সদস্য না হইয়াও ছয়মাসের জন্য কেহ মন্ত্রী হিসাবে কাজ করিতে পারেন। অর্থাৎ, কোন মন্ত্রিসভার উপর বিধান-সভার আস্থা আছে কি নাই, তাহা বিচার করিবার জন্য ছয়মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে এবং তাহা সংবিধান সম্মত। বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার জন্য মন্ত্রিসভাকে সুযোগ না দিয়া ইহাকে বরখাস্ত করিয়া রাজ্যপাল সংসদীয় গণতন্ত্রের (Parliamentary Democracy) ঐতিহ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন কিনা সেই বিষয়ে অনেকের মতে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। ১৯৫৫ সালে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি একটি মামলায় রায় প্রদান করিবার ক্ষেত্রে বলিয়া-ছিলেন যে, ভারতে যে কোন রাজ্যের রাজ্যপাল হইতেছেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান; মন্ত্রিসভার পরামর্শেই তিনি কাজ করেন। শাসনতন্ত্রের ১৬৩ নম্বর ধারায়ও ইহাই বোঝানো হইয়াছে। রাজ্যপালের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায় না অথবা কোন কিছুর জন্য রাজ্যপালকে দায়ী করা যায় না। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে রাজ্য-পালের পক্ষে মন্ত্রিসভাই বিধানসভার কাছে দায়ী থাকেন। সংবিধানের ১৬৪ (২) নম্বর ধারায় ইহা বলা হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী বি. সি. মিত্র একটি (Quo warranto) আবেদনের রায় দিতে যাইয়া মন্তব্য করেন যে, কোন মন্ত্রিসভাকে বাতিল করিবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রাজ্যপালের আছে। কিন্তু, সুপ্রীমকোর্টের মতামতই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত; সুপ্রীম কোর্টের মতামত এক্ষেত্রে পাওয়া যায় নাই।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (Chief Minister of a State)—রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীরই অনুরূপ বলা যায়। তিনি রাজ্যের বিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং তিনি রাজ্যপাল কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হন। মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইলে এই পদের প্রার্থীকে রাজ্য বিধানসভা অথবা বিধান পরিষদের সদস্য হইতে হইবে। মুখ্যমন্ত্রী নিজপদে অধিষ্ঠিত হইবার সময়ে দলীয় নেতা হওয়া সত্ত্বেও যদি রাজ্য বিধানসভা অথবা বিধান পরিষদের সদস্য না হন, তবে মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইবার ছয়মাসের মধ্যে তাঁহাকে রাজ্য বিধানসভা অথবা বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইতে হয়। তাঁহার পরামর্শ অনুসারেই রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রিবর্গকে নিযুক্ত করেন। কোন মন্ত্রীর পদচ্যুতিও তাঁহার সুপারিশ-ক্রমে রাজ্যপাল কর্তৃক সমাধা হইয়া থাকে। মুখ্যমন্ত্রী কেবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং মন্ত্রিবর্গের অন্যান্য সভাও তাঁহারই নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। মন্ত্রিমণ্ডলীর ভিতর যদি কোন ব্যাপারে পারস্পরিক মতভেদের সৃষ্টি হয়, তবে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব হইতেছে সেই বিরোধ মিটাইয়া ফেলা। কারণ সংহতি বজায় রাখাই মুখ্যমন্ত্রীর সর্বপ্রধান দায়িত্ব। মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যগণ যাহা কিছু করিবেন, তাহার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্য বিধানমণ্ডলীর নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে রাজ্য বিধানমণ্ডলীর নিকট দায়ী থাকেন এবং রাজ্য বিধানসভা ও বিধান পরিষদের সদস্যগণ যদি সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে মন্ত্রীদের কোন প্রশ্ন করেন, তবে মন্ত্রিগণ সেই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়া থাকেন, তাহার চূড়ান্ত দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর। সেইজন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান কাজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এমনভাবে সরকারী নীতি স্থির করা যাহাতে সমগ্র মন্ত্রিসভা যৌথ দায়িত্বে সুষ্ঠুভাবে সরকারের সমুদয় কার্য নির্বাহ করিতে পারে। যদি মন্ত্রিসভার বৈঠকে কোন ব্যাপারে মন্ত্রিগণ সমানভাবে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যান এবং উভয় দিকেই ভোটের সংখ্যা সমান হয়, তবে মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) প্রদান করিতে পারেন। যদি কোন মন্ত্রীর ক্রিয়াকলাপের দরুন মন্ত্রিসভাকে বিধানমণ্ডলে অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হইবার আশঙ্কা থাকে তবে তাহা এড়াইবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে অনুরোধ করিয়া পদত্যাগ করাইতে বাধ্য করিতে পারেন অথবা রাজ্যপালকে দিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করাইতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রীর যোগ্যতা

মন্ত্রিমণ্ডলীর সভার সভাপতিত্ব এবং কেবিনেটের সহিত মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক

আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা হিসাবেও মুখ্যমন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আইনসভার কাছে নিজের নীতি ও ক্রিয়াকলাপের জন্য মুখ্যমন্ত্রী দায়ী থাকেন। তিনি আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা বলিয়াই দলের সংহতি যাহাতে বজায় থাকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার মন্ত্রিসভা গঠন করা এবং মন্ত্রি-সভাকে পরিচালিত করা কর্তব্য। বিরোধী দলগুলির সহিত একটি বোঝাপড়ার

আইনসভা ও দলের সহিত মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক

সৃষ্টি করিয়া এবং ইহাদের সমালোচনা বিবেচনা করিয়া মুখ্যমন্ত্রীকে নিজের নীতি নির্ধারণ করিতে হয়। তাহা না হইলে অনেক ক্ষেত্রেই মুখ্যমন্ত্রীকে অসুবিধায় পড়িতে হয়। অবশ্য ইহা করিতে যে মুখ্যমন্ত্রী বাধ্য তাহা নহে। মুখ্যমন্ত্রীকে এমনভাবে নিজের কাজে অগ্রসর হইতে হয়, যাহাতে আইনসভার পূর্ণ আস্থা তাঁহার উপর থাকে এবং জনমতও তাঁহার পক্ষে সর্বদাই অনুকূল থাকে।

এডভোকেট জেনারেল (Advocate General for the State)—শাসনতন্ত্রের ১৬৫ নং ধারা অনুয়ায়ী রাজ্যপাল রাজ্যে একজন এডভোকেট জেনারেলকে নিয়োগ করিবেন। এডভোকেট জেনারেলের পদে অভিষিক্ত ব্যক্তির হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা থাকিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহাকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে, বিচার বিভাগীয় কোন পদে দশ বৎসর আসীন থাকিতে হইবে অথবা কমপক্ষে তাঁহার দশ বৎসর কালের জন্য হাইকোর্টের এডভোকেট হওয়া চাই। রাজ্যের আইন বিষয়ক মুখ্য পরামর্শদাতা এডভোকেট জেনারেল। রাজ্যপাল কর্তৃক প্রেরিত আইন বিষয়ক ব্যাপারে তিনি রাজ্যসরকারকে পরামর্শ দান করিবেন অথবা রাজ্যপাল কর্তৃক নির্ধারিত আইন-সংক্রান্ত কার্যাবলী স্বয়ং সম্পাদন করিবেন। এডভোকেট জেনারেল সাধারণত রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং রাজ্যপালের সন্তোষের উপরই এডভোকেট জেনারেলের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। রাজ্যপাল এডভোকেট জেনারেলের বেতন স্থির করেন।

রাজ্য বিধানমণ্ডলের গঠন (Composition of the State Legislatures)—শাসনতন্ত্রের ১৬ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যের কোন কোন বিধানমণ্ডল দুইটি কক্ষ-বিশিষ্ট আবার কোন কোন বিধানমণ্ডল এককক্ষ-বিশিষ্ট হয়। দুইকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার নিম্ন-কক্ষকে বিধানসভা (Legislative Assembly) এবং উচ্চ-কক্ষকে বিধান পরিষদ (Legislative Council) বলা হইয়া থাকে। এককক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভাকে বিধানসভা (Legislative Assembly) বলা হয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে আটটি রাজ্যে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা আছে এবং অবশিষ্ট রাজ্যগুলিতে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা দেখা যায়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানের সংশোধন দ্বারা মধ্যপ্রদেশের জন্য বিধান পরিষদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে উহা এখনও কার্যকরী করা হয় নাই। শাসনতন্ত্র কোন রাজ্যে বিধান পরিষদের গঠন করিবার অথবা বিলুপ্ত করিবার ব্যবস্থাও রাখিয়াছে (১৬৯নং ধারা)। কোন রাজ্যের বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যার এবং উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য সমর্থন করিলে সেই রাজ্যে বিধান পরিষদ পার্লামেন্টের আইন অনুসারে বিলুপ্ত বা গঠিত হইতে পারিবে।

দ্বি-কক্ষ ও এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

বিভিন্ন রাজ্যের বিধানপরিষদ ও বিধানসভার সদস্য সংখ্যা

রাজ্য	বিধান পরিষদ	বিধান সভা
১। অন্ধ্র প্রদেশ	৯০	২৮৭
২। আসাম	—	১২৬
৩। উড়িষ্যা	—	১৪০
৪। উত্তর প্রদেশ	১০৮	৪২৫
৫। কেরল	—	১৩৩
৬। গুজরাট	—	১৬৮
৭। জম্মু ও কাশ্মীর	৩৬	৭৫
৮। নাগাভূমি	—	৪৬
৯। পশ্চিমবঙ্গ	—	২৮০ (নির্বাচিত সদস্য)
১০। পাঞ্জাব	—	১০৪
১১। বিহার	৯৬	৩১৮
১২। মধ্যপ্রদেশ	৯০ (এখনও গঠিত হয় নাই)	২৯৬
১৩। মহারাষ্ট্র	৭৮	২৭০
১৪। মহীশূর	৬৩	২১৬
১৫। তামিলনাডু	৬৩	২৩৪
১৬। রাজস্থান	—	১৮৪
১৭। হরিয়ানা	—	৮১

বিধান পরিষদ (Legislative Council)—কোন রাজ্যের বিধান পরিষদ কত বড় হইবে তাহা উক্ত রাজ্যের বিধানসভার সদস্যসংখ্যার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। শাসনতন্ত্রের ১৭১নং ধারা অনুযায়ী বিধান পরিষদ বা উচ্চ-কক্ষের সদস্য সংখ্যা বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যার ১/৩ ভাগের বেশী হইতে পারে না, তবে উক্ত-সংখ্যা ৪০-এর কম হইবে না। বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা কিছু পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন (আনুমানিক ৫/৬ অংশ) এবং কিছু রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হন।

উচ্চ কক্ষের গঠন

উচ্চ-কক্ষের সদস্য সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যবৃন্দের দ্বারা অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড ইত্যাদি) প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোট (Single Transferable Proportional Voting System) দ্বারা, এক-দ্বাদশাংশ রাজ্যের স্নাতক কেন্দ্র হইতে গ্রাজুয়েটগণ কর্তৃক এবং আর এক-দ্বাদশাংশ কমপক্ষে তিন বৎসরকাল রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত জড়িত শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত হন। বাকী অংশ বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা, চারুকলা, সমবায় আন্দোলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রথিতযশা ব্যক্তিবৃন্দ

বিধান পরিষদের স্থায়িত্ব

হইতে মনোনয়ন করেন। বিধান পরিষদ একটি স্থায়ী পরিষদ, ইহাকে কখনও ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় না। তবে শাসনতন্ত্রের ১৭২ (২) নং ধারা অনুযায়ী দুই বৎসরে ইহার এক তৃতীয়াংশ সদস্যকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। কোন্ কোন্ সদস্যগণ অবসর গ্রহণ করিবেন তাহা লটারীর সাহায্যে স্থির করা হয়।

বিধান পরিষদের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি (Chairman) এবং একজন সহকারী সভাপতি (Deputy Chairman) নির্বাচিত করেন। উক্ত সভাপতি অথবা তাঁহার অবর্তমানে সহ-সভাপতি পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সভার কার্য পরিচালনা করিয়া বিধান পরিষদের অধিবেশন চলাকালে ইহার শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইতে হইলে তাঁহাকে (ক) ভারতীয় নাগরিক হইতে হয়, (খ) ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হয় এবং (গ) রাজ্যের বিধান সভার ভোটার হইতে হয়। কোন বিচারালয় কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বিবেচিত হইলে অথবা নির্বাচনে অসদুপায় অবলম্বনের জন্য বিচারালয় কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে অথবা ভারত সরকার কিংবা রাজ্যসরকারের কোন লাভজনক পদে আসীন থাকিলে, কোন ব্যক্তি বিধান পরিষদ কিংবা বিধানসভার সদস্যপদের যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইবেন না।

পরিষদের সভ্য পদের যোগ্যতা

বিধানপরিষদের বিলোপ (Abolition of the Legislative Council)—বর্তমানে ভারতের ১৭টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ৭টির বিধানমণ্ডলে দুইটি করিয়া কক্ষ আছে,—এই সাতটি রাজ্য হইল,—অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ, মহীশূর এবং জম্মু ও কাশ্মীর। পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ এবং পাঞ্জাবেও বিধান পরিষদ ছিল ; সম্প্রতি এই দুইটি রাজ্যে বিধান পরিষদ বিলোপ করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিয়া মধ্যপ্রদেশের জন্য বিধান পরিষদের ব্যবস্থা করা হইলেও ইহা এখন পর্যন্ত গঠিত হয় নাই। ভারতের শাসনতন্ত্রে ১৬৯নং ধারা অনুযায়ী কোন রাজ্যের বিধানসভার মোট সভ্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সভ্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য সমর্থন করিলে সেই রাজ্য বিধান পরিষদ পার্লামেণ্টের আইন অনুসারে বিলুপ্ত বা গঠিত হইতে পারে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সর্বসম্মতিক্রমে বিধানপরিষদ বিলোপ করিবার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করিলে পার্লামেণ্টের আইনের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ বিলুপ্ত হইয়াছে। পাঞ্জাবেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানপরিষদ বিলোপের যৌক্তিকতা (Justification of the abolition of the Legislative Council in West Bengal)—পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ বিলুপ্ত করার প্রস্তাবটি বিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় (১৯৬৯) এবং ইহার পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শিত হয়। প্রথমত, বিধানমণ্ডলীতে অর্থ বিল প্রণয়ন এবং অনুমোদনের সর্বময় ক্ষমতা যখন বিধানসভাই ভোগ করে এবং

প্রয়োগ করে, তখন অনর্থক বিধান পরিষদ বজায় রাখা ব্যয়বহুল ব্যাপার মাত্র। অর্থ বিল ব্যতীত অন্যান্য বিল বিধানমণ্ডলের যে কোন কক্ষেই যখন উত্থাপিত হইতে পারে তখন শুধু বিধানসভা বজায় রাখিলেই চলে। বরং বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিল যদি বিধান পরিষদ বাতিল করিয়া দেয়, তবে অনর্থক আইন-প্রণয়নে বিঘ্ন ঘটে। এই বিঘ্ন এড়াইবার জন্য বিধান পরিষদ বজায় না রাখাই ভাল। চূড়ান্ত পর্যায়ে বিধানসভার ইচ্ছাই আইনে প্রতিফলিত হয়; বিধানপরিষদ শুধু সেই আইনের বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করার পথে বিলম্ব ঘটাইতে পারে। হয়ত ইহারও প্রয়োজন আছে। কারণ, অনেকক্ষেত্রে বিধানসভার সদস্যগণ ভাবাবেগে পরিচালিত হইতে পারেন এবং তখন বিধান পরিষদ তাহা প্রতিরোধ করিতে পারেন। তাহা ছাড়া, যদি বিধানসভায় সমাজের সব শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব না থাকে তবে বিধান পরিষদে সেই প্রতিনিধিত্ব আনা সম্ভব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা রাজ্যপালকে দিয়া নিজেদের পছন্দমত লোককে বিধান পরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনীত করিতে পারেন এবং এভাবে অনেকেরই ন্যায়সঙ্গত দাবি উপেক্ষিত হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিধান পরিষদ বিলুপ্তির পক্ষে এই যুক্তিও দেখানো হইয়াছিল যে রাজ্য মন্ত্রিসভা যখন শুধু বিধানসভা কাছেই দায়ী, তখন অনর্থক বিধান পরিষদ বজায় রাখিয়া লাভ নাই। তৃতীয়ত, ইহাও অনুভূত হইয়াছিল যে ১৯৬৯ সালের পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় যে দলগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল (যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলসমূহ) বিধান পরিষদে সেই দলগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল কংগ্রেস দলের। ইহার ফলে আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে উভয় কক্ষের মধ্যে প্রায়ই মতভেদের সম্ভাবনা ছিল। ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর বিধানমণ্ডলে রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর একটি সংশোধন গৃহীত হইয়াছিল। উভয় কক্ষের মধ্যে এইরূপ অবাঞ্ছিত মতভেদের প্রশ্ন এড়াইবার জন্যও অনেকে বিধান পরিষদ বিলুপ্ত করার কথা ভাবিয়াছিলেন। চতুর্থত, বিধান পরিষদ বজায় রাখা ব্যয়বহুল ছিল; অথচ, ইহা দ্বারা রাজ্যসরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা কোন প্রকারেই সম্ভব হইতেছিল না। সুতরাং বিধান পরিষদ তুলিয়া দেওয়া একপক্ষে ভালই হইয়াছে; কারণ ইহাতে সরকারের কিছু খরচ বাঁচিয়াছে।

বিধানসভা (Legislative Assembly)—রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। নির্বাচনের জন্য বিভক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন এলাকা (Territorial Constituency) এইরূপভাবে করিতে হইবে যেন প্রত্যেক ৭৫ হাজার জনসাধারণের জন্য অনধিক একজন সদস্য নির্বাচিত হন। বিধানসভার সদস্য-সংখ্যা ৬০ জনের কম এবং ৫০০ জনের বেশী হইতে পারে না। রাজ্যপাল শাসনতন্ত্রের ৩৩নং ধারা অনুযায়ী বিধানসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য মনোনীত করিতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন বিধানসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের উপযুক্তরূপ প্রতিনিধিত্ব হয় নাই।

বিধানসভার গঠন

শাসনতন্ত্রের ১৭২নং ধারা অনুযায়ী রাজ্য বিধানসভার স্থায়িত্বকাল ৫ বৎসর। রাজ্যপাল এই পরিষদকে ৫ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরী অবস্থা থাকা কালে পার্লামেণ্ট রাজ্য বিধানসভার কার্যকাল প্রতিবারে এক বৎসর করিয়া বাড়াইয়া দিতে পারেন; তবে উহার স্থায়িত্বকাল কোনক্রমেই জরুরী অবস্থার প্রত্যাহারের পর ৬ মাসের অধিক বাড়ানো চলে না।

বিধানসভার স্থায়িত্ব

বিধান পরিষদের সভ্যপদে নির্বাচিত হইবার যে যোগ্যতা থাকা দরকার তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। বিধানসভার সদস্য-বৃন্দেরও সেই একই যোগ্যতা থাকা দরকার। কেবলমাত্র বিধানসভার সদস্যপদে নির্বাচিত হইতে হইলে কোন সদস্যকে ২৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়; কিন্তু বিধান-পরিষদের সদস্যদের ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়।

বিধানসভার সদস্যপদের যোগ্যতা

রাজ্য বিধানসভার স্পীকার (Speaker of the State Legislative Assembly)—বিধানসভার সভ্যবৃন্দ নিজেদের মধ্য হইতেই একজন স্পীকার এবং একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করেন। রাজ্য বিধানসভার স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার পার্লামেণ্টের স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের অনুরূপ কার্য এবং ক্ষমতা উপভোগ করিয়া থাকেন।

তাঁহাদের কাজের মেয়াদ থাকে রাজ্যবিধানসভার স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত। কিন্তু যদি রাজ্যবিধানসভার সদস্যগণ স্পীকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেন, তবে স্পীকারকে পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু এই জাতীয় অনাস্থা প্রস্তাব বিধানসভায় পেশ করিবার পূর্বে অন্তত ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হইবে; তারপর স্পীকার এই প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য গৃহীত হইবে কিনা তাহা স্থির করিবার জন্য একটি দিন স্থির করেন। প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য গৃহীত হইলে তাহা লইয়া বিতর্কের জন্য একটি দিন ধার্য করা হয়। সেই বিতর্কে স্পীকার ইচ্ছা করিলে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। যখন এই অনাস্থা প্রস্তাব লইয়া আলোচনা চলিবে, তখন তিনি সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন না অথবা তাঁহার পক্ষে ও বিপক্ষে সমানসংখ্যক ভোট হইলে শুধু সেইক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) প্রদান করিতে পারিবেন। বিধানসভার অন্যান্য সমস্ত অধিবেশনেই স্পীকার সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার দায়িত্ব হইতেছে, বিধানসভার অধিবেশন চলাকালে বিধানসভার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বিধানসভার কার্যপ্রণালী যথাযথভাবে অনুসরণ করা। বিধানসভার ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন নিয়মকানুনের ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং সামগ্রিকভাবে ও আলাদাভাবে বিধানসভার সদস্যদের অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধাদি সংরক্ষণ করা স্পীকারের দায়িত্ব। বিধানসভায় কোন বিল অনুমোদিত হইবার সময় স্পীকার ভোট প্রদান করেন না। কিন্তু যদি কোন বিলের পক্ষে ও বিপক্ষে সমানসংখ্যক ভোট প্রদত্ত হয়, তবে স্পীকার তাঁহার নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) প্রদান করিতে পারেন।

বিধানসভায় যদি শাসনতন্ত্রের কোন বিধান সম্পর্কে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, তবে স্পীকার সেই ব্যাখ্যা প্রদান করেন, এবং বিধানসভার কাছে তাহাই চূড়ান্ত ব্যাখ্যা। কারণ স্পীকারের রুলিং লইয়া আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যায় না অথবা ইহার বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আদালতের কাছে উপস্থিত করা যায় না। স্পীকার তাঁহার নিজ ক্ষমতাবলে যে কোন সময়েই বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯৬৭ সালের ২৯শে নভেম্বর যখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের পরামর্শে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করেন তখন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই মর্মে একটি সাময়িক রুলিং দেন যে, বিধানসভার অধিবেশন এমন একটি মন্ত্রিসভার পরামর্শে রাজ্যপাল কর্তৃক আহূত হইয়াছে যাহা সংবিধানসম্মত নহে; সুতরাং তিনি তাঁহার সাময়িক রুলিং-এর মাধ্যমে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিতেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, স্পীকারের এই রুলিং-এর বিরুদ্ধে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা সম্ভবপর হয় নাই। রাজ্যপালও সেইদিনই বিধানসভার অধিবেশন শেষ হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। দেখা যাইতেছে, বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করা এবং ইহা শেষ হইয়াছে ঘোষণা করার ক্ষমতা রাজ্যপালের আছে; কিন্তু বিধানসভার অধিবেশন আহূত হইলে তাহা চলিতে দেওয়া অথবা না-দেওয়া স্পীকারের হাতে। বিধানসভার ক্রিয়াকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে রুলিং প্রদান করার ক্ষমতা স্পীকারের আছে, এবং তাঁহার ক্ষমতা চূড়ান্ত। বিধানসভার অধিবেশনে শক্তি পরীক্ষা না হওয়ার আগেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে ১৯৬৭ সালের ২১শে নভেম্বর পদচ্যুত করেন, সেই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, ইহাতে বিধানসভার সামগ্রিক অধিকার অবহেলিত ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি ইহা সংবিধান বহির্ভূত [শাসনতন্ত্রের ১৬৪ (২) নং ধারা অনুযায়ী] বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন; কেননা, মন্ত্রিসভা তাহার কাজের জন্য শুধু বিধানসভার নিকট দায়ী বলিয়া বিধানসভাই অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করাইতে পারে। যদিও কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী বি. সি. মিত্র ঘোষণা করেন যে, রাজ্যপাল কর্তৃক মন্ত্রিসভাকে খারিজ করা [শাসনতন্ত্রের ১৬৪ (১) নং ধারা অনুযায়ী] সম্পূর্ণ বৈধ; তবুও স্পীকারের রুলিং লইয়া আদালতে কোন প্রশ্ন উঠে নাই এবং বিচারপতির রায়েও স্পীকারের রুলিং-এর কোন উল্লেখ করা হয় নাই। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির রায়ও স্পীকারের রুলিং-এর কোনও পরিবর্তন করিতে পারে নাই। স্পীকারের এই রুলিং-এর ফলে যে শাসনতান্ত্রিক সংকটের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইতিপূর্বে ভারতের কোন বিধানসভায়ই স্পীকারের রুলিং লইয়া এত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নজীর

যদি বিধানসভার অধিবেশনে প্রয়োজনীয় কোরাম (Quorum) বা যতজন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন ততজন সদস্য উপস্থিত না থাকেন, তবে স্পীকার বিধানসভার অধিবেশন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে পারেন। রাজ্যবিধানমণ্ডলের উভয়কক্ষের যুক্ত অধিবেশন কখনও বসিলে তাহাতে স্পীকার সভাপতিত্ব করেন। কোন অর্থসংক্রান্ত বিল রাজ্যবিধানসভা হইতে বিধানপরিষদে পাঠাইবার সময় স্পীকারকেই ঠিক করিতে হয় বিলটি প্রকৃতপক্ষে অর্থসংক্রান্ত বিল কিনা। অবশ্য যে সকল রাজ্যের আইনসভায় দুইটি কক্ষ আছে শুধু সেই রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেই এই প্রশ্ন উঠে। সংসদীয় গণতন্ত্রে স্পীকারকে সর্বদা দল নিরপেক্ষ থাকিতে হয় বলিয়া বিধানসভার ভিতরে এবং বাহিরে স্পীকার সর্বদাই দল নিরপক্ষ থাকেন।

যদি কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান রাজ্যবিধানসভার অধিকারকে অবমাননা করেন অথবা স্পীকারের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেন, তবে সেই ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমা চাহিতে বাধ্য করার, ভৎর্সনা করার অথবা সাতদিনের জন্য কারাদণ্ড দেওয়ার অধিকার স্পীকারের আছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৬৪ সালে উত্তর প্রদেশ বিধানসভার স্পীকার বিধানসভাকে অবমাননা করার জন্য শ্রীকেশব সিংকে সাত দিনের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। বিচার বিভাগের অবমাননা করা যেমন অপরাধ, স্পীকারের অবমাননা করাও সেই প্রকার অপরাধ।

রাজ্য বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা (Powers and Functions of the State Legislature)—রাজ্যবিধানমণ্ডলের প্রধান কাজ রাজ্যতালিকার (State List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইনপ্রণয়ন করা। ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি, কোন কোন ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপরও আইনপ্রণয়ন করিতে পারে। রাজ্য বিধানমণ্ডলের আইনসমূহ এইসব ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না। শাসনতন্ত্রের ৩৫৬ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থার ঘোষণা করা হইলে সমস্ত রাজ্যের উপর শাসনতন্ত্রের ২৫০ নং ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্ট আইনপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতা লাভ করে। এইভাবে রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর রাজ্য বিধানমণ্ডলের আইনপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতা সীমিত করা হইয়াছে। যুগ্মতালিকার বিষয় (Concurrent List) সম্পর্কেও রাজ্য বিধানমণ্ডল আইনপ্রণয়ন করিতে পারে। তবে রাজ্যবিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত যুগ্মতালিকার কোন বিষয় সম্পর্কিত আইন পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত উক্ত বিষয়ের আইনের বিরোধী হইলে রাজ্যের বিধানমণ্ডলের প্রণীত আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু বাতিল হইয়া যায় এবং পার্লামেণ্টের আইন কার্যকরী হয়। অবশ্য রাজ্যবিধানমণ্ডল যদি এই আইন সম্পর্কে পূর্বেই রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে, তাহা হইলে সেই আইন পার্লামেণ্টের আইনের সহিত আপাত-বিরোধী হইলেও উহা বাতিল হইবে না।

আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাজ্যসরকারের মন্ত্রিগণ যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়ী থাকেন। বিধানসভার সদস্যগণ মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধে অনাস্থামূলক অথবা নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে মন্ত্রিসভাকে একযোগে পদত্যাগ করিতে হয়। বিধানমণ্ডলকে সেইজন্য সরকারের সহিত জনগণের যোগসূত্র হিসাবে অভিহিত করা যায়। মন্ত্রিদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সরকারের কাজের সমালোচনা, বিতর্ক, মুলতবী প্রস্তাব প্রভৃতি দ্বারা বিধানমণ্ডলের উভয় কক্ষই রাজ্য মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। তবে এক্ষেত্রে বিধানসভা বিধান পরিষদ হইতে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন।

শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা

কর ধার্য করার এবং সরকারের ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করার ক্ষমতা বিধানসভার আছে। তবে বিধানসভার অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতাও সীমাহীন নহে। এমন কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি বিধানসভার অনুমোদনসাপেক্ষ নহে; যেমন, রাজ্যপাল, বিধানসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার, বিধান পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি, হাইকোর্টের বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা এবং রাজ্যের ঋণ-সংক্রান্ত ব্যয় ইত্যাদি। এইগুলি রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য হয় (Consolidated Fund of the State)। বিধানসভার নিকট ব্যয় বরাদ্দের যে কোন দাবি রাজ্যপালের সুপারিশ ব্যতীত করা যায় না।

অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা

রাজ্য বিধানমণ্ডলের অর্থ-সংক্রান্ত বিল সম্বন্ধে আইনপ্রণয়ন (Law-making in case of Money bill in Legislature)—অর্থ-সংক্রান্ত যে কোন বিল কেবলমাত্র বিধানসভায়ই উত্থাপন করা যাইতে পারে। বিধান পরিষদে এইরূপ বিল উত্থাপন করা যায় না; যদি কোন রাজ্যে বিধান পরিষদ থাকে তবে উক্ত বিল বিধান পরিষদে আলোচনার জন্য প্রেরণ করা যাইতে পারে। তবে বিলটি প্রাপ্তির ১৪ দিনের মধ্যে বিধানসভায় পুনরায় ফেরৎ পাঠাইতে হয় এবং যদি বিধান পরিষদ কর্তৃক বিলটি অনুমোদিত না হয়, অথবা বিধান পরিষদ যদি উক্ত বিলে কোনরূপ সংশোধন করে অথবা ইহার বিরোধিতা করে, তবুও বিধানসভা উহা পূর্বের আকারেই অনুমোদিত করিয়া লইলে রাজ্যপালের সম্মতির জন্য বিলটি প্রেরিত হয়। বিধানসভা কর্তৃক অর্থ বিলটি অনুমোদিত হইলেই রাজ্যপাল ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন, তখন বিলটি আইনে পরিণত হয়। সুতরাং অর্থ-সংক্রান্ত আইনপ্রণয়নে বিধানসভার ক্ষমতা অনন্য।

অর্থ-সংক্রান্ত বিল ও উভয় কক্ষের সম্পর্ক

রাজ্য বিধানমণ্ডলের অর্থ-সংক্রান্ত নহে এইরূপ ক্ষেত্রে আইনপ্রণয়ন (Law-making in case of non-money bills in State Legislature)—অর্থ-সংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্যান্য বিল বিধানমণ্ডলের যে কোন কক্ষেই উত্থাপিত করা যাইতে পারে। এইরূপ কোন বিল যদি বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত হয় এবং

বিধান পরিষদ যদি (ক) উহা গ্রহণ না করে অথবা (খ) যদি বিধান পরিষদ বিধানসভা কর্তৃক গ্রহণযোগ্য নয় এই মর্মে কোন প্রস্তাবসহ বিলটিকে গ্রহণ করে, অথবা (গ) যদি বিধান পরিষদের নিকট প্রেরিত হইবার তিন মাসের মধ্যে উক্ত বিলটি বিধান পরিষদ গ্রহণ না করে,—তাহা হইলে বিধানসভা উহা কিছু সংশোধনসহ অথবা বিনা সংশোধনে এই বিলটিকে পুনরায় বিধান পরিষদের নিকট প্রেরণ করে। বিধান পরিষদ দ্বিতীয় বারেও প্রথম বারের ন্যায় বিলটিকে অনুমোদন করিতে পারে অথবা নাও করিতে পারে অথবা কিছু সংশোধনী প্রস্তাব দিতে পারে। কিন্তু বিলটিকে বিধান-পরিষদ একমাস পর্যন্তই কেবল ধরিয়া রাখিতে পারে। দ্বিতীয় বার বিধান পরিষদের নিকট প্রেরিত হইবার একমাস পরে উক্ত বিলটি বিধান পরিষদের অনুমোদন ছাড়াই উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। রাজ্যপালের অনুমোদন লাভ করিলেই বিলটি আইনে পরিণত হয়। ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, রাজ্যপাল নিজে অনুমোদন না করিয়া যে কোন বিলকে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য ধরিয়া রাখিতে পারেন; এবং রাষ্ট্রপতি ঐ বিলে সম্মতি দিতেও পারেন অথবা নাও দিতে পারেন।

অর্থ ব্যতীত অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক

রাজ্যবিধানমণ্ডলের সদস্যদের বিভিন্ন অধিকার (Privileges of the members of the legislature)—পার্লামেন্টের সদস্যগণ যেরূপ কতিপয় সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার ভোগ করেন, রাজ্যবিধানমণ্ডলের সদস্যগণও সেইরূপ কতিপয় অধিকার ভোগ করেন। শাসনতন্ত্রের ১৯৪ নং ধারার ১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্য-বিধানমণ্ডলের সদস্যদের আইনসভায় বাক্‌-স্বাধীনতা থাকিবে। এই ধারার ২নং অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে আইনসভায় কিছু বলিবার জন্য অথবা ভোটপ্রদানে নিজের স্বাধীনতা অনুযায়ী চলিবার জন্য রাজ্যবিধানমণ্ডলের কোন সদস্যকে আদালতে অভিযুক্ত করা যাইবে না। আইনসভার কোন সদস্য যদি সভার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত কোন রিপোর্ট অথবা কাগজপত্র প্রকাশ করেন তবে তাহা আদালতের এক্তিয়ার-বহির্ভূত থাকিবে; কিন্তু স্পীকার কর্তৃক নিষিদ্ধ আইনসভার ক্রিয়াকলাপের কোন অংশ প্রচারের জন্য এই অব্যাহতি পাওয়া যায় না। রাজ্যবিধানমণ্ডলের কোন সদস্য যদি বাক্‌-স্বাধীনতা ভোগ করিবার দাবিতে এমন কোন কথা বলেন যে, ইহাতে আইনসভার শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, তবে স্পীকার তাঁহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। রাজ্যবিধানমণ্ডলের সদস্যদের অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের কমন্স সভা অথবা ইহার বিভিন্ন কমিটির অধিকারগুলি অনুসৃত হয়।

রাজ্যবিধানমণ্ডলের কোন সদস্যকে রাজ্যবিধানমণ্ডলের অধিবেশন আরম্ভ হইবার ৪০ দিন পূর্ব হইতে ৪০ দিন পর পর্যন্ত ফৌজদারী অথবা নিবর্তনমূলক আটক আইন ছাড়া গ্রেপ্তার করা চলে না। যখন আইনসভার অধিবেশন চলে, তখন কোন সদস্যকে আদালতে সাক্ষী প্রদান করিবার জন্য কিংবা জুরী হিসাবে কাজ করিবার

জন্য আহ্বান জানানো যায় না। রাজ্যবিধান সভা অথবা বিধান পরিষদের কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করিলেই তৎক্ষণাৎ ইহা রাজ্য বিধানমণ্ডলকে জানাইতে হয়। বিধানসভার অভ্যন্তরে স্পীকারের সম্মতি ব্যতীত এবং বিধান পরিষদের অভ্যন্তরে উক্ত পরিষদের সভাপতির সম্মতি ব্যতীত কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা যায় না। রাজ্য বিধানমণ্ডলে কোন ক্রিয়াকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার আদালতের নাই। কেহ যদি বিধানসভার বা বিধান পরিষদের অবমাননা করেন তবে তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিবার অধিকার বিধানসভার বা বিধান-পরিষদের আছে।

Exercise

1. Briefly describe the position and powers of the Governor of a State. (H. S Comp. 1960, 1962)
(রাজ্যপালের মর্যাদা এবং বিভিন্ন ক্ষমতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।) (১৯৭-১৯৯ পৃষ্ঠা)

2. How can a Legislation Council be abolished ? Justify the abolition of the Legislative Council in West Bengal. (বিধান পরিষদ কিভাবে বিলোপ করা যায় ? পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিলোপ করার যৌক্তিকতা দেখাও।) (২০৭-২০৮ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the relation between : (*a*) Governor and Council of Ministers and (*b*) Council of Ministers and the State Legislature. [(*a*) রাজ্যপাল এবং মন্ত্রিপরিষদ এবং (*b*) মন্ত্রিপরিষদ ও রাজ্যবিধানমণ্ডলের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা কর।] (১৯৯-২০০ পৃষ্ঠা)

4. Discuss briefly the composition and functions of the State Legislature.
(রাজ্যবিধানমণ্ডলের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ সংক্ষেপে আলোচনা কর।) (২০৫-২০৭ পৃষ্ঠা ; ২০৮-২০৯ পৃষ্ঠা ; ২১১-২১৩ পৃষ্ঠা)

5. Answers the position and powers of the speaker in the Legislating Assembly. (রাজ্য বিধানসভার স্পীকারের মর্যাদা এবং ক্ষমতা আলোচনা কর।) (২০৯-২১১ পৃষ্ঠা)

6. Explain how a Ministry is formed in an Indian State. Discuss the relation between the Ministry and the State Legislature. [H. S. 1963]
(একটি ভারতীয় রাজ্যে কিভাবে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ব্যাখ্যা কর। মন্ত্রিসভা এবং রাজ্য আইনসভার মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।)

7. Can the Governor dismiss the Council of Ministers ?
(রাজ্যপাল কি মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন ?) (২০০-২০৩ পৃষ্ঠা)

8. Write a note on the process of law-making in State Legislature.
(রাজ্যবিধানমণ্ডলে আইন প্রণয়ন পদ্ধতির উপর একটি টীকা লিখ।)

ষড়বিংশ অধ্যায় | ভারতের বিচার-ব্যবস্থা (Indian Judicial System)

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট (Supreme Court of India)—ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে আছে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট। এই সুপ্রীম কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি এবং আরও তেরজন বিচারপতি আছেন ; তাঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত

হন। প্রধান বিচারপতির সহিত অথবা বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে এই বিচারপতিগণ নিযুক্ত হন, তাঁহাদের ৬৫ বৎসর বয়সে কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে আইন করিয়া বিচারপতির সংখ্যা বাড়াইতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইতে গেলে বিচারপতিকে (১) ভারতের নাগরিক হইতে হইবে; এবং একটি হাইকোর্টে অন্তত পাঁচ বৎসরের জন্য বিচারপতি থাকিতে হইবে; অথবা (২) দশ বৎসরের জন্য কোন হাইকোর্টের অথবা সুপ্রীম কোর্টের এড্ভোকেট হিসাবে কাজ করিতে হইবে; অথবা (৩) রাষ্ট্রপতির মতে তাঁহাকে একজন উঁচুদরের আইনশাস্ত্র-বিশারদ হইতে হইবে।

বিচারপতির যোগ্যতা

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ কোন হাইকোর্টের আইনব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে পারেন না। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মাসিক বেতন পাঁচ হাজার টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিগণের মাসিক বেতন চারিহাজার টাকা। শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী কতিপয় বিশেষ কাজের জন্য বিচারপতি নিয়োগ করা যায়। যেমন, বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচন ট্রাইবুন্যালের বিচারকরূপে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি-গণকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। যদি কখনও কখনও বিচারপতি শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করেন অথবা অসদাচরণের অপরাধে অপরাধী হন, তবে পার্লামেণ্টের প্রতি কক্ষের মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে অপসারণ (Impeach) করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

বিচারপতির অপসারণ

সুপ্রীম কোর্টের মর্যাদা এবং ক্ষমতা (Position and Powers of the Supreme Court)—সুপ্রীম কোর্টের কিছু মূল ক্ষমতা (Original powers), আপীল সংক্রান্ত ক্ষমতা (Appellate powers) এবং উপদেশ প্রদানের ক্ষমতা (Advisory powers) আছে। (১) ভারত সরকারের সহিত কোন অথবা কতিপয় রাজ্য সরকারের গোলযোগ হইলে, অথবা (২) কোন ক্ষেত্রে ভারত সরকার এবং একাধিক মূল রাজ্য একদিকে থাকিলে এবং অন্যান্য রাজ্য অপরদিকে থাকিলে অথবা (৩) বিভিন্ন মূল রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক গোলযোগের সৃষ্টি হইলে সুপ্রীম কোর্ট ইহার মূল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া এই সব বিবাদের বিচার করিয়া থাকে।

মূল ক্ষমতার প্রয়োগ

বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে বিবাদ বা এক রাজ্যের অধিবাসীর সঙ্গে অন্য কোন রাজ্যের অধিবাসীর বিবাদের বিচার সুপ্রীম কোর্টের মূল ক্ষমতার আওতায় পড়ে না।

সুপ্রীম কোর্টের আপীল সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে। সাধারণত তিনটি ক্ষেত্রে আপীল হইতে পারে; যথা,—(১) শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য আপীল, (২) দেওয়ানী

মামলার এবং (৩) ফৌজদারী মামলার আপীল। কোন মামলা সম্বন্ধে যদি হাইকোর্ট এমন কোনও মন্তব্য করে যে উহাতে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন নিহিত আছে, তবে সেই মামলার জন্য হাইকোর্ট হইতে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়। যদি কোন দেওয়ানী মামলার বিষয়বস্তুর পরিমাণ বা মূল্য অন্তত বিশ হাজার টাকা (অথবা, যে পরিমাণ টাকা এই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা ধার্য করিবে) হয়, তবে সেই মামলা সম্বন্ধেও সুপ্রীম কোর্টেও আপীল করা চলে। যদি হাইকোর্ট কোনও মামলার রায় প্রদানকালে এমন কোন মন্তব্য করে যে ইহা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়, এবং যদি হাইকোর্টের বিচারে দেখা যায় যে কোন ডিক্রি, আদেশ অথবা রায় অন্তত বিশ হাজার টাকা মূল্যের পরিমাণের সহিত জড়িত, তবে সুপ্রীম কোর্টের কাছে সেই সম্বন্ধে আপীল করা যায়। ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে যদি হাইকোর্ট কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ বাতিল করিয়া দিয়া অথবা মামলাটি নিম্ন আদালত হইতে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়, তবে সেই মামলা লইয়া সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলে। তাহা ছাড়া, যদি কোন ফৌজদারী মামলা সম্বন্ধে হাইকোর্ট এমন কোন প্রমাণপত্র (Certificate) দেয় যে মামলাটি সুপ্রীম কোর্টে আপীলযোগ্য, তবে সেই মামলা লইয়া সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলে।

আপীল সংক্রান্ত ক্ষমতা

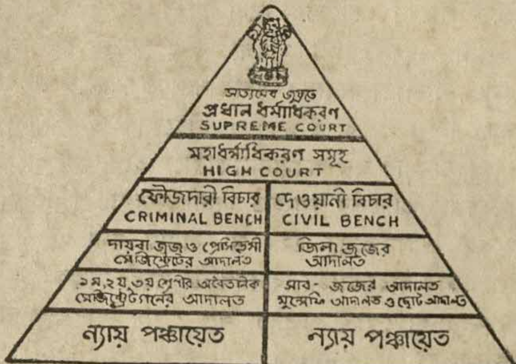
সুপ্রীম কোর্ট আমাদের শাসনতন্ত্রের রক্ষক। সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধানের ব্যাখ্যা করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন বিষয়ের আইনগত অথবা শাসনতান্ত্রিক তাৎপর্য সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ বা উপদেশ দিতে পারে। কিছুকাল পূর্বে কেরালা সরকারের শিক্ষার সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের অভিমত চাহিয়াছিলেন। সরকার যদি কখনও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ করে, তবে নাগরিকগণ সুপ্রীম কোর্টের বিচার দাবি করিতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট প্রয়োজনমত বন্দীকে আদালতে দেখা করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া (Habeas Corpus), চরমাদেশ প্রদান করা (Mandamus), নিষেধ করা (Prohibition), অধিকারের কথা জিজ্ঞাসা করা (Quo Warranto) প্রভৃতি মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করিতে পারেন। পার্লামেণ্ট এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলি শাসনতন্ত্রের সীমা লঙ্ঘন করিতেছে কিনা তাহা দেখিবার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের। ইহাকে আমরা "আইন-প্রণয়নের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা" (Judicial Review of Legislation) বলিতে পারি।

সুপ্রীম কোর্ট শাসনতন্ত্রের রক্ষক

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ভারতীয় পার্লামেণ্টের উপর কোন প্রাধান্য নাই। অনেকক্ষেত্রে আইনসভা প্রণীত আইনের বৈধতা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিলে সুপ্রীম কোর্ট ইহার বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছে এবং আইনসভাও সেই বিধান অনুযায়ী আইনের সংশোধন করিয়াছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের

আইনপ্রণয়নের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা

ন্যায় ভারতের সুপ্রীম কোর্ট আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইনকে বাতিল করিতে



পারে না। সুপ্রীম কোর্টের পর আমরা প্রত্যেক রাজ্যে হাইকোর্ট (High Court) এবং অন্যান্য আদালত দেখিতে পাই।

রাজ্যের হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণ (High Court)—রাজ্যের প্রধান আদালতের নাম হইতেছে হাইকোর্ট (High Court)। একজন প্রধান বিচারপতি এবং যে কয়জন বিচারপতি নিয়োগ করা রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন, ততজন বিচারপতি লইয়া হাইকোর্ট গঠিত হয়। বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতিগণ কর্তৃক নিযুক্ত হন, এবং ৬২ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সময় সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করেন। শুধু অকর্মণ্যতা, অসদাচরণ অথবা শাসনতন্ত্র লঙ্ঘনের অপরাধে পার্লামেণ্টের মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা সমর্থিত অপসারণ প্রস্তাবের দ্বারা অভিযুক্ত হইলে রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন। কাহাকেও হাইকোর্টের বিচারপতি হইতে হইলে অন্তত দশ বৎসর তাঁহাকে ভারতের বিচারবিভাগের কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে, অথবা অন্তত দশ বৎসর কোন হাইকোর্টে এড্ভোকেট হিসাবে কাজ করিতে হইবে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি চার হাজার টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ প্রত্যেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতন পান। কোন কোন রাজ্যের হাইকোর্ট-গুলির, যেমন বোম্বাই ও কলিকাতা হাইকোর্টের কিছু মূল ক্ষমতা (Original powers) আছে। এই ক্ষমতাবলে ইহারা রাজ্যের প্রধান দেওয়ানী আদালত। ইহা ছাড়া, শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য হাইকোর্ট নিজ এলাকার মধ্যে কোন কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নির্দেশ, আদেশ অথবা কোন কিছুর কারণ দেখাইবার জন্য নোটিশ দিতে পারে। যদি কোনও হাইকোর্ট মনে করে যে, কোন মামলার সহিত

হাইকোর্টের গঠন

হাইকোর্টের ক্ষমতা

শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা জড়িত, তবে সেই ধরনের মামলা ইহা নিম্ন আদালত হইতে নিজের হাতে তুলিয়া লইতে পারে। রাজ্যের মধ্যে হাইকোর্ট হইতেছে সর্বোচ্চ আপীল আদালত। ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা উভয় ক্ষেত্রেই হাইকোর্টে আপীল করা চলে। মূল এলাকায় ফৌজদারী মামলার বিচার সম্প্রতি বোম্বাই ও মাদ্রাজ হাইকোর্টে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। একমাত্র কলিকাতা হাইকোর্ট এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে। আদালত অবমাননার জন্য অবমাননাকারীকে হাইকোর্ট শাস্তি প্রদান করিতে পারে। রাজ্যর হাইকোর্ট ভারতের সুসংহত বিচার-ব্যবস্থার (integrated judicial system) একটি অঙ্গ, শাসনতন্ত্রের ২২০ নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর কোন হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন এমন কোন ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্ট অথবা হাইকোর্ট ব্যতীত অন্য কোন আদালত কিংবা কর্তৃপক্ষের সামনে ওকালতি করিতে পারিবেন না।

সংবিধান-সম্মত মৌলিক অধিকার কার্যকর করিবার জন্য এবং যে কোন উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট নিজ এলাকার মধ্যে যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ আদেশ অথবা লেখ (writ) জারি করিতে পারে। রাজ্যের হাইকোর্ট একটি অভিলেখ আদালত (court of record) হিসাবেও কাজ করে।

অন্যান্য আদালত

অন্যান্য আদালত (Other Courts)—দেওয়ানী আদালত হিসাবে হাইকোর্টের অধীনে আমরা দেখিতে পাই বিভিন্ন জিলা শহরে জজ-কোর্ট, ইহার নীচে প্রতি মহকুমায় অথবা কোন কোন জিলা-শহরে মুন্সেফ কোর্ট থাকে। এমন কি বর্ধিষ্ণু গ্রামে অথবা যেখানে থানা আছে, এই রকম স্থানেও মুন্সেফ আদালত দেখা যায়। বড় বড় শহরে ছোট ছোট মামলার জন্য ছোট আদালতও (Small Causes Court) দেখিতে পাওয়া যায় জজ-কোর্টগুলিতে মূল এবং আপীল সংক্রান্ত বিচার উভয়ই হয়। অনুরূপভাবে ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই হাইকোর্টের পর প্রতি জিলায় দায়রা জজ এবং ইহার পর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। ইহার নীচে দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত আছে। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার হয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। সর্বনিম্ন ফৌজদারী আদালত হইল গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েতগুলি। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি শহরের হাইকোর্টসমূহ জুরীর সাহায্যে ফৌজদারী মামলার বিচার করে।

Exercise

1. Give a brief outline of the Judicial System of India.
(ভারতের বিচার-ব্যবস্থার একটি বিবরণী দাও।) (২১৪-২১৮ পৃষ্ঠা)
2. Discuss the composition and the functions of the Supreme Court of India.
[H. S. (c) 1962 ; H. S. 1965]
(ভারতের সুপ্রীম কোর্টের গঠন এবং বিভিন্ন কাজের আলোচনা কর।) (২১৪-২১৭ পৃষ্ঠা)